আন্দ্রেই আনিকিন

অর্থশাস্ত্র বিকাশের ধারা

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

আন্দ্রেই আনিকিন

অর্থশাস্ত্র বিকাশের ধারা

প্রগতি প্রকাশন • মস্কো

অনুবাদ: বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

А. В. Аникин

ЮНОСТЬ НАУКИ

На языке бенгали

A. Anikin

A SCIENCE IN ITS YOUTH

In Bengali

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

A $\frac{10701-029}{014(01)-83}$ 560—82

0602000000

সূচি

ভূমিকা

অর্থনীতি প্রসঙ্গে মননের ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা আছে কুড়ি-কুড়ি, কিংবা বরং শত-শত, সেই সংগ্রহে আর-একখানা যোগ করা এই লেখকের উদ্দেশ্য নয়। এই বইখানা লেখা হয়েছে সাধারণ্যে বোধগম্য বিভিন্ন প্রবন্ধের আকারে, যাতে সবচেয়ে বিশিষ্ট জীবনী-সংক্রান্ত এবং বৈজ্ঞানিক দফাগুলিকে নির্দিষ্ট করে দেখান সম্ভব হয়েছে। যেসব প্রশ্ন আজকালও খুবই প্রাসঙ্গিক সেগুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষিত জ্ঞান যাঁদের না থাকতে পারে সেই পাঠকসাধারণের জন্যে বইখানা উদ্দিষ্ট। অর্থশাস্ত্রকে নীরস এবং একঘেয়ে-বিরক্তিকর বিষয় বলে ভাবতে কেউ-কেউ অভ্যস্ত। অথচ সমাজের আর্থনীতিক গঠনের মধ্যে চিত্তাকর্ষক সমস্যা এবং রহস্য রয়েছে প্রকৃতির রাজ্যে যা তার চেয়ে কম নয়। বিভিন্ন প্রামাণিক বিজ্ঞান এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞান ক্ষেত্রের পণ্ডিতেরা ইদানীং অর্থনীতি-সংক্রান্ত প্রশ্নাবলিতে মনোযোগ দিচ্ছেন বিশেষত হামেশাই।

অর্থনীতি বিজ্ঞানের সূচনায় আমরা দেখতে পাই বিশিষ্ট চিন্তাবীরদের, যাঁরা মানব-সংস্কৃতির উপর রেখে গেছেন এমন ছাপ যা মুছে যাবার নয়, তাঁদের মনন ছিল বহুবিস্তৃত এবং মৌলিক, তাঁদের বৈজ্ঞানিক আর সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল বিপুল — এটাও কোন আপতিক ব্যাপার নয়।

অর্থনীতিবিদ্যা বরাবরই মানবজাতির জীবনে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থেকেছে, আর সেটা বিশেষত যথার্থ আজকাল।

প্রাচীনকালের মনীষীরা রাজনীতি নিয়ে, আর মধ্যযুগ ক্যাথলিকতন্ত্র নিয়ে জীবন কাটিয়ে গেছেন, এমন মত কী আজগবি সেটা বলেছেন মার্কস। মানবজাতি বরাবরই 'জীবন কাটিয়েছে অর্থনীতিবিদ্যা নিয়ে', আর রাজনীতি ধর্ম বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা থাকতে পেরেছে শুধু অর্থনীতিবিদ্যার ভিত্তিতে। অর্থনীতিবিদ্যা অতীতে অপরিণত ছিল, এটাই ঐসব কালপর্যায় সম্বন্ধে অমনসব মত দেখা দেবার প্রধান কারণ। আমাদের একেবারে প্রত্যেকেরই জীবনে একটা অপরিহার্য ভূমিকায় রয়েছে আধুনিক অর্থনীতিবিদ্যা।

আজকের দুনিয়াটা প্রকৃতপক্ষে পৃথক-পৃথক দুটো দুনিয়া — সমাজতান্ত্রিক আর পুঁজিতান্ত্রিক — এর প্রত্যেকটার রয়েছে নিজস্ব অর্থনীতি এবং নিজস্ব অর্থশাস্ত্র। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে গেছে উন্নয়নশীল দেশগুলি — এইসব দেশও ক্রমেই আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আসছে বিশ্ব রঙ্গভূমিতে। উন্নয়নের কোন্ পথটা ধরতে হবে, এটা স্থির করার প্রয়োজনটা ক্রমেই আরও বেশি জরুরী হয়ে উঠছে এই দেশগুলির পক্ষে। অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে সেটা আধুনিক দুনিয়ার সমস্যাবলি বুঝতে, বিশ্ববীক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে অর্থনীতিবিদ্যাটাকে বুঝতে সহায়ক হয়।

মানুষের ইচ্ছার অনপেক্ষ কিন্তু মানুষের বোধগম্য বিভিন্ন বিষয়গত নিয়ম যাতে চালু থাকে এমন একটা তন্ত্র হিসেবে অর্থনীতি-সংক্রান্ত তত্ত্বটাকে সর্বপ্রথমে গড়ে তোলেন বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা, বিশেষত অ্যাডাম স্মিথ এবং ডেভিড রিকার্ডো। তাঁরা মনে করতেন, রাষ্ট্রের আর্থনীতিক কর্মনীতি এইসব নিয়মের পরিপন্থী হওয়া চলে না, এইসব নিয়ম হওয়া চাই ঐ কর্মনীতির অবলম্বন।

বিভিন্ন আর্থনীতিক প্রক্রিয়ার মাত্রিক বিশ্লেষণের ভিত্তি স্থাপন করেন উইলিয়ম পেটি, ফ্রাঁসোয়া কেনে এবং অন্যান্য মনীষী। একরকমের বিপাক হিসেবে এইসব প্রক্রিয়া বিচার-বিশ্লেষণ করতে এবং সেটার বিভিন্ন অভিমুখ আর পরিধি নির্ণয় করতে তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন। মার্কস তাঁর সামাজিক

উৎপাদ পুনরুৎপাদন-সংক্রান্ত তত্ত্বে কাজে লাগিয়েছিলেন তাঁদের বৈজ্ঞানিক সাধনসাফল্যগুলিকে। ভোগ্যপণ্য আর উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে আপেক্ষিকতা, সঞ্চয়ন আর ভোগ-ব্যবহারের অনুপাত এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে সম্পর্ক আধুনিক অর্থনীতি আর আর্থনীতিক গবেষণার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকে। অর্থনীতিবিদ্যাক্ষেত্রে এইসব পথিকৃতের কাজ থেকে পয়দা হয় আধুনিক আর্থনীতিক পরিসংখ্যান, সেটার গুরুত্বের কোন অতিরঞ্জন হতে পারে না।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে আর্থনীতিক বিশ্লেষণে বিভিন্ন গাণিতিক প্রণালী প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছিল, এখন সেটা ছাড়া অর্থনীতিবিদ্যার বহু শাখার বিকাশের কথা কল্পনা করা অসম্ভব। এক্ষেত্রে একজন পথিকৃৎ হলেন ফরাসী অর্থনীতিবিদ আঁতোয়াঁ কুর্নো।

বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এবং পেটি-বুর্জোয়া আর ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারাও পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির বহু দ্বন্দ্ব-অসংগতি বিশ্লেষণ করেছিলেন। বুর্জোয়া সমাজে মহা যন্ত্রণাকর আর্থনীতিক সংকটের কারণ বুঝতে যাঁরা সর্বপ্রথমে চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের একজন হলেন সুইজারল্যান্ডের অর্থনীতিবিদ সিসমন্দি। মহান ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে, ওয়েন এবং তাঁদের অনুগামীরা পুঁজিতন্ত্রের জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা করেছিলেন এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক ধারায় সমাজ পুনর্গঠনের জন্যে।

ভ. ই. লেনিন লিখেছেন, 'মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবীরেরা আগেই যেসব প্রশ্ন তুলেছিলেন সেগুলির উত্তর যুগিয়ে দিলেন মার্কস, ঠিক এটাই তাঁর মহাপ্রতিভার পরিচায়ক। দর্শন, অর্থশাস্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মহত্তম প্রতিনিধিদের শিক্ষার সরাসর এবং অব্যবহিত অনুবৃত্তি হিসেবে উদ্ভূত হল তাঁর মতবাদ।'*

ক্ল্যাসিকাল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র হল মার্কসবাদের অন্যতম আকর। তবু মার্কসের শিক্ষা হল অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে বৈপ্লবিক বাঁক। মার্কস দেখালেন পুঁজি হল একটা সামাজিক সম্পর্ক, যেটা মূলত প্রলেতারিয়ানদের মজুরি-শ্রম শোষণ। মার্কস তাঁর উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বে এই শোষণের প্রকৃতিটার অর্থ করে

* ভ. ই. লেনিন, 'সংগৃহীত রচনাবলি', ১৯ খণ্ড, ২৩ পৃঃ (এখানে এবং পরে ইংরেজী সংস্করণ অনুসারে)।

পুঁজিতন্ত্রের ইতিহাসক্রমিক প্রবণতা: সেটার বুঝিয়ে দেখিয়েছেন বৈরিতামূলক, শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব-অসংগতিগুলোর প্রকোপন এবং শেষে পুঁজির উপর শ্রমের বিজয়। এইভাবে মার্কসের অর্থনীতি তত্ত্বে রয়েছে একটা দ্বান্দ্বিক একত্ব: এতে তাঁর পূর্বসূরিদের বুর্জোয়া ধারণাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, আবার তাঁদের সৃষ্টি করা বাস্তবিক সবকিছুর সৃজনী বিকাশ ঘটানোও হয়েছে। এই একত্বটাকে খুলে ধরা এবং তার ব্যাখ্যা করাই এই বইখানার লক্ষ্য।

মার্কস এবং তাঁর পূর্বসূরিরা

দর্শন, অর্থশাস্ত্র এবং বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজম হল মার্কসবাদের তিনটি অঙ্গ-উপাদান। মার্কসবাদের দর্শন হল দ্বান্দ্বিক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। সমাজ বিকাশের ভিত্তি হল সেটার আর্থনীতিক গঠনে বিভিন্ন পরিবর্তন — এটাই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূলনীতি। অর্থশাস্ত্র এই গঠনটা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক বিন্যাসের গতির এবং একটা থেকে অন্য বিন্যাসে উত্তরণের নিয়মাবলি খুলে ধরে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, নতুন, কমিউনিস্ট সমাজ গড়ার উপায়াদি এবং এই সমাজের বিভিন্ন মূল পর্ব আর বিশেষত্বের তত্ত্ব হল বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজম।

মার্কসবাদের প্রত্যেকটি অঙ্গ-উপাদান আবার পূর্ববর্তী চিন্তাবীরদের ভাব-ধারণাগুলির এক-একটা বিকশিত রূপ, বিশ্ব বিজ্ঞানের এক-একটা বিকশিত রূপ। এই তিনটি অঙ্গ-উপাদান মার্কসবাদের তিনটি আকরের প্রতিষঙ্গী। ভ. ই. লেনিন লিখেছেন, 'মার্কস... উনিশ শতকের প্রধান তিনটি ভাবাদর্শ-ধারাকে প্রসারিত করেন এবং সেগুলিকে সুসম্পূর্ণ করে তোলেন, সেগুলি হল মানবজাতির সবচেয়ে উন্নত তিনটি দেশের সাধনসাফল্য: ক্ল্যাসিকাল জার্মান দর্শন, ক্ল্যাসিকাল বৃটিশ অর্থশাস্ত্র এবং সাধারণভাবে ফরাসী বৈপ্লবিক মতবাদের সঙ্গে সংযুক্ত ফরাসী সমাজতন্ত্র।'*

---

* ভ. ই. লেনিন, 'সংগৃহীত রচনাবলি', ২১ খন্ড, ৫০ পৃঃ।

এই বিখ্যাত থিসিসটি অতি প্রগাঢ় এবং সুনির্দিষ্ট আকারে প্রকাশ পেয়েছে প্রথমত মার্কসের নিজের রচনাগুলিতে। হেগেল আর ফয়েরবাখ, স্মিথ আর রিকার্ডো, সাঁ-সিমোঁ আর ফুরিয়ের কাছ থেকে মার্কস যাকিছু নিয়েছেন সেসবই তিনি খুবই প্রগাঢ় বিশ্লেষণের সাহায্যে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। মার্কসের সদগুণগুলির মধ্যে একটি হল তাঁর অসাধারণ বিদ্বজ্জনোচিত বিবেকবুদ্ধি। বিশেষত আঠার শতক এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধের অর্থনীতি-সংক্রান্ত সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান ছিল বস্তুত সর্বাত্মক।

মার্কসের সর্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক রচনা 'পুঁজি'-র উপ-শিরনাম হল 'অর্থশাস্ত্রের বৈচারিক সমীক্ষা'। এই বইয়ের চতুর্থ খন্ড 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল তত্ত্ব'-র বিষয়বস্তু হল পূর্ববর্তী সমস্ত অর্থশাস্ত্রের বৈচারিক বিশ্লেষণ। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর গতির নিয়ম খুলে ধরা — পুঁজিতান্ত্রিক অর্থশাস্ত্রের এই প্রধান কাজটা হাসিল করতে যেসব বৈজ্ঞানিক উপাদান কিছু-না-কিছু পরিমাণে সহায়ক সেগুলিকে প্রত্যেক লেখকের রচনায় বেছে নেওয়াই এতে মার্কসের প্রধান প্রণালী। তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন অতীতের এইসব অর্থশাস্ত্রকারের অভিমতে নানা বুর্জোয়া বাধ-বদ্ধতা এবং অসামঞ্জস্য।

মার্কস যেটাকে বলেছেন ইতর অর্থশাস্ত্র, কেননা সেটার লক্ষ্য নয় যথার্থ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার সপক্ষতা করা এবং এটাকে প্রকাশ্যে সমর্থন করাই সেটার লক্ষ্য, সেই ইতর অর্থশাস্ত্রের সমালোচনার জন্যে মার্কস বিস্তর জায়গা দিয়েছেন। বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের এই মতধারার প্রধান-প্রধান প্রবক্তারা এই বইয়েও অনেকটা স্থান পেয়েছেন স্বভাবতই। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের সাফাই-গাওনার অভিমতের সমালোচনা করতে গিয়ে মার্কস গড়ে তোলেন প্রলেতারিয়ান অর্থশাস্ত্র।

'পুঁজি' এবং মার্কসের অর্থনীতি-সংক্রান্ত অন্যান্য রচনার পাঠকের সামনে এসে যায় অতীত বিজ্ঞানক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটা গোটা গ্যালারি। অন্যান্য সমস্ত বিজ্ঞানের মতো অর্থশাস্ত্রও গড়ে তুলেছেন সর্বজনস্বীকৃত বিশারদ মনীষীরাই শুধু নন, প্রায়ই অপেক্ষাকৃত কম-বিশ্রুত বহু পন্ডিতের প্রচেষ্টাও তাতে প্রযুক্ত হয়। অর্থশাস্ত্রের ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়টি দেড় শতক ধরে ছিল খুবই বিস্তৃত মতধারা, সেটার ভিতরে থেকে কাজ করে এবং লিখে গেছেন বহু পন্ডিতব্যক্তি। যেমন স্মিথের আগে ছিলেন অর্থনীতিবিদদের

গোটা-গোটা পুরুষ-পর্যায়, তাঁরা সর্বত জমিন প্রস্তুত করেছিলেন তাঁর জন্যে। কাজেই প্রধানত সবচেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবন আর ধ্যান-ধারণার উপর গভীর মনোনিবেশ করেও, অপেক্ষাকৃত কম-বিশ্রুত কিন্তু প্রায়ই গুরুত্বসম্পন্ন চিন্তাবীরদের অবদান কিছু পরিমাণে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন এই বইখানার লেখক — বিজ্ঞান হিসেবে অর্থশাস্ত্রের বিকাশের অপেক্ষাকৃত পূর্ণ বিবরণ দেওয়াই সেটার উদ্দেশ্য। এইসব পণ্ডিতব্যক্তি জীবনযাপন এবং কাজ করেছিলেন যে-পরিবেশে, যে-সামাজিক এবং মনোজাগতিক 'বাতাবরণে' তার ব্যাখ্যা করাটা গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থশাস্ত্রের ইতিহাসটাকে স্মিথ, কেনে এবং রিকার্ডোর কর্মকাণ্ডের চৌহদ্দির ভিতরে রেখে দিলে সেটা হবে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, গণিতের সমগ্র ইতিহাস দেকার্ত, নিউটন এবং লাপ্লাস-এর ক্রিয়াকলাপের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করার মতোই ভুল। ১৭ শতকের শিল্পকলার ইতিহাসে যেমন মহান রেমব্রাঁ তেমনি 'অপ্রধান ওলন্দাজ শিল্পীরা'ও স্বীকৃত।

এক শতাব্দীর বেশি হল, বিজ্ঞানী হিসেবে মার্কসের ভূমিকাটিকে বিকৃত করার চেষ্টা চলে আসছে বুর্জোয়া বিজ্ঞানে আর প্রচারে। এতে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় দুটো করণধারা। তার প্রথমটাতে মার্কসকে এবং তাঁর বৈপ্লবিক শিক্ষাকে তুচ্ছ করা হয়, তাতে দেখান হয় তিনি যেন বৈজ্ঞানিক গুরুত্বের দিক থেকে নগণ্য, কিংবা তিনি যেন 'পশ্চিমী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের' বহির্ভূত মানুষ, তাই কাজেকাজেই তিনি 'সাচ্চা' বিজ্ঞানের বার। মার্কস এবং তাঁর পূর্বসূরিদের, বিশেষত ক্ল্যাসিকাল বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের মধ্যে যোগসূত্রটাকে এতে খাটো করে দেখান হয়, সেটাকে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

সাম্প্রতিক কয়েক দশকে কিন্তু আরও বেশি নমুনাসই হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় করণধারাটা: এতে মার্কসকে মামুলি (এমনকি অসাধারণই) হেগেলপন্থী এবং রিকার্ডোপন্থীতে পরিণত করা হয়। রিকার্ডো এবং সমগ্র ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের সঙ্গে মার্কসের নৈকট্যের উপর প্রবল জোর দেওয়া হয়, আর মার্কস অর্থশাস্ত্রের যে-বাঁক ঘুরিয়ে দিয়েছেন সেটার বৈপ্লবিক প্রকৃতির অপব্যাখ্যা দেওয়া হয়। অর্থনীতি বিষয়ে চিন্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশ শতকের সবচেয়ে ঢাউস বুর্জোয়া রচনাগুলির একটার লেখক জে. এ. শুম্পিটার ঐ মনোভাব অবলম্বন করেন। মার্কসকে রিকার্ডোপন্থীদের

শ্রেণীভুক্ত করে তিনি বলেন, অর্থনীতি বিষয়ে মার্কসের মতবাদ রিকার্ডোর মতবাদ থেকে বড় একটা পৃথক নয়, কাজেই সেটা সেই একই ন্যূনতাগ্রস্ত। প্রসঙ্গত বলি, এমনকি শুম্পিটারও মেনে নিয়েছেন যে, মার্কস 'এইসব' (রিকার্ডোর — **আ. আ.**) 'আকারকে রূপান্তরিত করেন এবং শেষে তিনি পৌঁছন খুবই পৃথক বিভিন্ন সিদ্ধান্তে'।*

প্রায়ই এই মত প্রকাশিত হয় যে, আধুনিক বুর্জোয়া সমাজবিদ্যা এবং অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে মার্কসবাদের মিলমিলাও ঘটিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কেননা, এতে বলে দেওয়া হয়, ঐসবই এসেছে একই আকর থেকে। সুবিদিত বৃটিশ লেবর তত্ত্বজ্ঞ জন স্ট্রেচি লিখেছেন তিনি মনে করেন, তাঁর বইখানা হবে 'যে-পশ্চিমী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে মার্কসবাদ উদ্ভূত কিন্তু সেটা থেকে মস্ত ব্যবধানে ভিন্নমুখী হয়ে গেছে সেটার সঙ্গে তার প্রয়োজনীয় পুনঃসমন্বয় প্রক্রিয়ায় একটা নাতিদীর্ঘ পদক্ষেপ'।**

জানাই আছে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মার্কস এবং মার্কসবাদ সম্বন্ধে আগ্রহ অনেক বেড়েছে। মার্কসের মতবাদের পৃথক-পৃথক উপাদান তাঁরা কাজে লাগাচ্ছেন হামেশাই। পরিস্থিতির বাস্তবতাসম্মত মূল্যায়ন দেওয়া যাতে আবশ্যক এমনসব বুনিয়াদী প্রশ্নে (অর্থনীতির উন্নতি, সঞ্চয়ন, জাতীয় আয়ের বণ্টন) আর্থনীতিক কর্মনীতি সম্বন্ধে প্রস্তাব রচনা করতে গিয়ে অপেক্ষাকৃত দূরদর্শী পণ্ডিতব্যক্তিরা অনেক সময়ে মার্কসীয় বিশ্লেষণের প্রণালী এবং ফলের দিকে ঝোঁকেন।

মার্কসবাদ সম্বন্ধে এই আগ্রহবৃদ্ধি দেখা যেতে পারে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, আর. এল. হেইলব্রোনার-এর এখনকার সময় অবধি অর্থনীতি-সংক্রান্ত চিন্তনের ইতিহাস থেকে। মার্কসের জীবন এবং কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে একটি আগ্রহজনক বিবরণ রয়েছে এই বইখানায়। ঐ লেখক বলেছেন, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে যত বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে গভীরপ্রসারী হয়ে রয়েছে মার্কসীয় আর্থনীতিক বিশ্লেষণ। 'নৈতিক প্রণালীতে মাথা নেড়ে-নেড়ে জিব-চুকচুক করে এই বিচার-বিবেচনা করা

* Joseph A. Schumpeter, 'History of Economic Analysis', New York, 1955, p. 390.

** J. Strachey, 'Contemporary Capitalism', London, 1956, pp. 14-15.

হয় নি। ...এতে যতই প্রবল আবেগ থাকুক, এটা ধীর-স্থিরভাবে করা মূল্যায়ন; এর অপ্রসন্ন সিদ্ধান্তগুলি স্থিরমস্তিস্কে বিবেচিত হওয়া চাই সেই কারণেই।'*

ইদানীং পশ্চিমে দেখা দিয়েছে যে-'র‍্যাডিকাল' অর্থশাস্ত্র তাতে বিভিন্ন চিরাগত মতবাদের গোঁড়ামিতে আপত্তি তোলা হচ্ছে। প্রধান-প্রধান মত-সম্প্রদায়গুলি সামাজিক-আর্থনীতিক বিশ্লেষণ প্রত্যাখ্যান করে বলে, আর তাঁদের আনুষ্ঠানিকতা এবং নিষ্ফলতার জন্যে এই মতধারার প্রতিনিধিরা তাঁদের সমালোচনা করেন বিশেষত। রিকার্ডোর সঙ্গে মার্কসের যোগসূত্র যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটার কার্যকরতার উপর তাঁরা জোর দেন: সেটা হল সমাজে আয় বণ্টন-সংক্রান্ত প্রশ্নটার শ্রেণীগত বিশ্লেষণ।

স্বভাবতই এইসব ব্যাপার সাদরে গ্রহণীয়। তবে যা প্রত্যাখ্যান করা চাই তা হল মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র এবং বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র 'মিলেমিশে গিয়ে' একক বৈজ্ঞানিকমতধারা গড়ে ওঠার ধারণাটা। মার্কসবাদীদের বিবেচনায় অর্থনীতি-সংক্রান্ত তত্ত্ব হল সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধনের আবশ্যকতার সপক্ষে যুক্তি তোলার ভিত্তি, কিন্তু 'র‍্যাডিকালেরা' সমেত বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা এমন সিদ্ধান্ত করেন না।

সংস্কারবাদ, এবং কমিউনিস্ট আর শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে সংস্কারবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ মার্কসবাদকে গণ্য করতে চায় উনিশ শতকের সমাজ-চিন্তনের মানবতাবাদী, উদারপন্থী মত-সম্প্রদায়েই শুধু শিকড়-গাড়া মতধারা হিসেবে। মার্কসবাদ হল সর্বাগ্রে শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভাবাদর্শ, যেকোন রকমের উদারনীতির সঙ্গে এটার একেবারে কোন মিলই নেই, এই ব্যাপারটাকে চেপে যাওয়া হয়। মার্কসবাদের তাত্ত্বিক দিকটাকে সেটার বৈপ্লবিক চলিতকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখান হয় প্রায়শ।

'বাম'তরফা সংশোধনবাদ এবং গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রামটা জনসাধারণের মধ্যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শের প্রসারের পক্ষে মস্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বোক্ত মতধারায় মার্কসবাদের পূর্বসূরিদের বিভিন্ন তত্ত্ব এবং অভিমতকে

* R. L. Heilbroner, 'The Worldly Philosophers. The Lives, Times and Ideas of the Great Economic Thinkers', 3rd edition, New York, 1968, p. 153.

তুচ্ছ করতে চাওয়া হয়। মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক-বৈচারিক দিকটাকে, সমাজ বিকাশ একটা প্রক্রিয়া যা ঘটে বিষয়গত নিয়মাবলি অনুসারে এই মর্মে মার্কসবাদের বিবেচনাধারাটাকেও তারা খাটো করে দেখায়। অর্থনীতিবিদ্যাক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসর্বস্বতা এবং রাজনীতিক্ষেত্রে হঠকারিতা 'বাম'তরফা সংশোধনবাদের পক্ষে নমুনাসই।

'নয়া বামপন্থী'দের মধ্যে দেখা যায় এমনসব লোক যারা প্রুধোঁ আর ক্রপোৎকিনের নৈরাজ্যবাদী ভাব-ধারণার সঙ্গে মার্কসবাদকে সংশ্লিষ্ট করে দেখায়, তারা বলতে চায় ওঁদের সঙ্গে বিস্তর মিল আছে মার্কসের। কিন্তু মার্কস এবং এঙ্গেলস বহু বছর ধরে প্রচণ্ড লড়াই চালিয়েছিলেন প্রুধোঁ এবং তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে, এটা তো সুবিদিত তথ্য। 'পালটা-সংস্কৃতি' সংক্রান্ত ধারণাটা কখনও-কখনও বুর্জোয়া সংস্কৃতির সমস্ত দিক এবং সমস্ত উপাদান প্রত্যাখ্যান করায় পর্যবসিত হয়। কিছু-না থেকে একটা নতুন, বুর্জোয়াবিরোধী সংস্কৃতি বানাবার চেষ্টাটা কী আজগবি এবং হানিকর সেটা তত্ত্বের সাহায্যে এবং চলিতকর্মে দেখিয়ে দিয়েছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। নতুন সংস্কৃতি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে না পুরনটাকে; সেটার সেরা-সেরা, প্রগতিশীল উপাদানগুলিকে কাজে লাগায় নতুন সংস্কৃতি।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সাফাই গাওয়া যেগুলোর উদ্দেশ্য সেইসব বুর্জোয়া অর্থনীতি তত্ত্বের স্বরূপ খুলে ধরে সমালোচনা করেছেন মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিন, তাঁরা খুলে ধরেছেন সেগুলোর সামাজিক উদ্ভব আর তাৎপর্য, এবং আর্থনীতিক উন্নয়নের নিয়মাবলি আর প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সেগুলোর ভাসাভাসা, অবৈজ্ঞানিক বিবেচনাধারা। যে-ভাবাদর্শ শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের হানি ঘটাবার বিপদ সৃষ্টি করে এবং বৈপ্লবিক কাজগুলি থেকে ভিন্নমুখো করে এই আন্দোলনকে তার বিরুদ্ধে আক্রমণে তাঁরা ছিলেন বিশেষত আপসহীন ক্ষমাহীন।

তার সঙ্গে সঙ্গে, যেসব যুক্তিসংগত উপাদান বিষয়গত বাস্তব সত্তাটাকে বোঝার সহায়ক সেগুলিকে বুর্জোয়া আর্থনীতিক ধ্যান-ধারণা থেকে বেছে নিতে চেয়েছিলেন মার্কসবাদের আদি প্রবক্তারা। অর্থনীতি বিষয়ে বুর্জোয়া পণ্ডিতদের মূর্ত-নির্দিষ্ট রচনাগুলি অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর তাঁরা জোর দেন বিশেষত।

অর্থনীতিবিদদের নিজ-নিজ দেশে সমাজ আর অর্থনীতি বিকাশের মাত্রা দিয়ে বহুলাংশে নির্ধারিত হয়ে যায় তাঁদের ভাব-ধারণা। তাই তাঁদের জীবন এবং ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিবরণে সংশ্লিষ্ট কালপর্যায় আর দেশের আর্থনীতিক বিশেষত্বগুলির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তও পাবেন এই বইয়ের পাঠক।

সতর থেকে উনিশ শতাব্দীর অর্থশাস্ত্রের বিকাশ পূর্বনিরূপিত হয়ে গিয়েছিল একটা নতুন সমাজব্যবস্থার উদ্ভব দিয়ে — সেটা তখন ছিল প্রগতিশীল, সেটা পুঁজিতন্ত্র। দেখা দিয়েছিলেন মহাপ্রতিভাশালী এবং কর্মবীর মহামতিগণ, মহা-মহা চিন্তাবীর।

তিন শতাব্দীর অর্থনীতিবিদদের একটা বৈঠক বসিয়ে দেবার চেষ্টা করা যাক কিছু সময়ের জন্যে। বিচিত্র জমায়েতই বটে!

তাঁদের বেশির ভাগ ইংরেজ, তবে ফরাসীও রয়েছেন বেশকিছু। এটা তো বোঝাই যায়। ইংলন্ড ছিল আগুয়ান পুঁজিতান্ত্রিক দেশ, আর মার্কসের কালেও অর্থশাস্ত্র প্রধানত বৃটিশ বিজ্ঞান বলে গণ্য হত। ফ্রান্সেও পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভব শুরু হয়েছিল অন্যান্য বেশির ভাগ দেশের আগে, ফলে 'অর্থশাস্ত্র' কথাটা প্রথম গড়া হয়েছিল ফরাসী ভাষায়। এই কালপর্যায়ের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অল্প কয়েক জন আমেরিকানও আছেন, তাঁদের একজন হলেন মহাজ্ঞানী ফ্র্যাঙ্কলিন।

প্রথম-প্রথম অর্থনীতিবিদেরা সাধারণত ছিলেন — মার্কসের ভাষায় — 'ব্যবসায়ী এবং রাষ্ট্রপুরুষ'। অর্থনীতি-সংক্রান্ত প্রশ্নাবলি নিয়ে ভাবতে তাঁরা প্রবৃত্ত হয়েছিলেন অর্থনীতি, বাণিজ্য এবং রাজকার্যের ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে।

দেখা যাচ্ছে শেক্সপিয়রের সমসাময়িকদের: লম্বা-চুলওয়ালা লেস্-শোভিত মহাশয়গণ এবং আদি পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়নের যুগের বাহুল্যবর্জিত সংযত পোশাক-পরা ব্যবসায়ীরা। এঁরা হলেন রাজমন্ত্রীরা — অর্থসর্বস্ববাদী মঁৎক্রেতিয়েন, টমাস মান।

আর-একটি বর্গ। এখানে দেখছি আদি অর্থশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের — পেটি, বুয়াগিইবের এবং অ্যাডাম স্মিথের অন্যান্য পূর্বসূরি, তাঁদের পরনে বড়-বড় পরচুলো এবং পিছনে মোড়ান চওড়া আস্তিনের লম্বা ঝুলের কোট। অর্থশাস্ত্রে তাঁরা পেশাদার হিসেবে অংশগ্রহণ করেন না, কেননা এমন পেশা

এখনও নেই। পেটি একজন চিকিৎসক, রাজনীতিতে তিনি সফলকাম হতে পারেন নি; বুয়াগিইবের — জজ; লক্ — বিখ্যাত দার্শনিক; ব্যাঙ্কার ক্যান্টিলন। এঁদের বক্তব্য সাধারণত রাজা আর বিভিন্ন সরকারের উদ্দেশে, তবে শিক্ষিতদের জন্যেও এঁরা লিখতে শুরু করছেন। আর নতুন বিজ্ঞানটির তাত্ত্বিক সমস্যাগুলি এঁরা তুলে ধরছেন এই প্রথম। বিশেষত বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন পেটি। তিনি প্রতিভাশালী চিন্তাবীর শুধু তাই নয়, তার উপর ব্যক্তি হিসেবেও তিনি চমৎকার, অসাধারণ।

আর রয়েছেন কর্মবীর জন লো — মস্ত-মস্ত পরিকল্পনা রচনায় এবং দুঃসাহসিক কাজে লেগে যেতে পটু, কাগজী মুদ্রার 'উদ্ভাবক', মুদ্রাস্ফীতির প্রথম তত্ত্ববিদ এবং প্রবর্তক। লো-র উত্থান এবং পতন হল আঠার শতকের গোড়ায় ফ্রান্সের ইতিহাসে সবচেয়ে সতেজ একটা অধ্যায়।

মলিয়ের কিংবা সুইফ্টের প্রতিকৃতিতে আমরা যেমনটা দেখি সেইসব প্রকাণ্ড পরচুলোর জায়গায় এখন দেখছি খাটো খাটো পাউডার-লাগানো পরচুলো, তাতে দুটো কোঁকড়ান জুলফি। পায়ের গোছে সাদা রেশমী মোজা। এঁরা হলেন মাঝ-আঠার শতকের ফরাসী অর্থনীতিবিদেরা — ফিজিওক্র্যাটরা (প্রকৃতিতন্ত্রীরা), যাঁরা হলেন এনলাইটেনমেন্টের* মহান দার্শনিকদের মিত্র। এঁদের অবিসংবাদিত নেতা হলেন ফ্রাঁসোয়া কেনে, তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন চিকিৎসক হিসেবে, আর কাজ করতেন অর্থনীতিবিদ হিসেবে। আর-একজন বিশিষ্ট মনীষী হলেন তিউর্গো — প্রাক্-বৈপ্লবিক ফ্রান্সের সবচেয়ে বিজ্ঞ এবং প্রগতিশীল রাষ্ট্রপুরুষদের একজন।

অ্যাডাম স্মিথ। ...রাশিয়ায় তিনি এতই জনপ্রিয় ছিলেন যাতে পুশকিন তাঁর বিখ্যাত কাব্য-রমন্যাস 'ইয়েভগেনি ওনেগিন'-এ উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের অভিজাত সমাজের একজন তরুণকে চিত্রিত করতে গিয়ে লিখেছিলেন,

তালিম সে পেতে চেয়েছিল অ্যাডাম স্মিথের কাছে,
অর্থনীতিবিদ হিসেবে সে তুচ্ছ নয় নিজে;
অর্থাৎ কিনা, সোনার উপকারটা ছাড়াই
রাষ্ট্রের বাড়বাড়ন্ত আর স্বাস্থ্যলাভের কায়দাটা
সে বাতলাতে পারত সারভাগে,
গোপন কথাটা এই যে; মোটের উপর,
রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ঘটে **মূল পণ্যদ্রব্যগুলো** থেকে।

* আঠার শতকের ইউরোপে যুক্তিবাদী, জ্ঞানসন্ধায়ী দার্শনিক আন্দোলন। — অনুঃ

স্মিথের জীবনবৃত্তান্ত কিছুটা নিউটনেরই মতো: তাতে বহিস্থ ঘটনা খুব অল্পই, কিন্তু রয়েছে নিবিড় মানসরাজ্য।

স্মিথের অনুগামী অসংখ্য। আঠার শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কেউ অর্থশাস্ত্রে ব্যাপৃত বলতে বোঝাত তিনি স্মিথের অনুগামী। স্কটল্যান্ডের এই মহামানবকে 'যথাস্থানে বসানো' শুরু হল (এই 'যথাস্থান' বলতে বোঝায় 'সঠিক' শুধু নয়, অধিকন্তু রাজনীতিক অর্থে 'দক্ষিনে')। ফ্রান্সে সে' এবং বৃটেনে ম্যালথাসের মতো লোকেরা এটা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অর্থশাস্ত্রে শিক্ষাদান শুরু হল; বিশেষ-সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলির তরুণদের পক্ষে এটা হয়ে উঠল আবশ্যক।

এবার নাট্যমঞ্চে দেখা দিলেন ধনিক এবং স্বয়ংশিক্ষিত প্রতিভাধর ডেভিড রিকার্ডো। এটা নেপোলিয়নীয় যুগ, তাই স্বভাবতই তাঁর মাথায় পরচুলো নেই, তাঁর পরনে লং কোট আর হাঁটু-অবধি হোস্-এর বদলে লং কোট আর ব্রীচ। বুর্জোয়া ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রের বিকাশ সম্পূর্ণ করেন রিকার্ডো। তাঁর জীবৎকালেই তাঁর উপর আক্রমণ চলে; বুর্জোয়ারা আর শ্রমিকেরা — পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের এই প্রধান দুটো শ্রেণীর স্বার্থের সংঘাতটাকে তিনি দেখিয়ে দেন।

রিকার্ডোর অনুগামীরা চারটে বর্গে বিভক্ত। একদিকে সমাজতন্ত্রীরা তাঁর তত্ত্বকে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। অন্য দিকে, রিকার্ডোর মতবাদের অবশেষের ভিত্তিতে বুর্জোয়া বিজ্ঞানক্ষেত্রে গড়ে ওঠে ইতর অর্থশাস্ত্র। এইভাবে আমরা এসে পড়ি উনিশ শতকের পঞ্চম দশকের কাছে, যখন শুরু হয় কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের কর্মকান্ড।

বুর্জোয়াদের সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশের ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করতে গিয়ে ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের বিরোধ বাধে সামন্ততান্ত্রিক, ভূস্বামী অভিজাতকুলের সঙ্গে, এরা নিরাপদে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল ইংলন্ডে, আর আঠার শতকের শেষের দিকে বিপ্লব অবধি ফ্রান্সে এরা ছিল প্রাধান্যশালী। যেটা অভিজাতকুলের স্বার্থ তুলে ধরত সেই রাষ্ট্র এবং সরকারের অনুমোদিত ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধ ঐ অর্থনীতিবিদদের। তাছাড়া, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার সবকিছুই তাঁরা গ্রহণ এবং অনুমোদন করতেন না নিশ্চয়ই। তাই বহু অর্থনীতিবিদের জীবন ছিল প্রতিবাদ, বিদ্রোহ আর সংগ্রামে ঠাসা। সাবধানী স্মিথের উপর পর্যন্ত আক্রমণ চালিয়েছিল প্রতিক্রিয়াপন্থীরা।

প্রাক্-মার্কসীয় কালপর্যায়ের সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে উন্নত-নীতিনিষ্ঠ এবং নাগরিক হিসেবে আর ব্যক্তি হিসেবে সাহসী ব্যক্তিদের দেখা যায়।

রাশিয়ায় অর্থনীতিবিদ্যাক্ষেত্রে পথিকৃৎদের বিষয়ে এই বইয়ে আলোচনা করা হয় নি, যদিও সাহসী এবং মৌলিক ধারায় চিন্তাবীর রাশিয়ায় কিছু-কিছু দেখা দিয়েছিলেন আলোচ্য কালপর্যায়ে। জার ১ম পিটারের আমলের চমৎকার লেখক এবং বিজ্ঞানী ইভান পসশ্কোভের (১৬৫২-১৭২৬) কথা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট, ইনি হলেন বিশেষভাবে অর্থনীতি-সংক্রান্ত প্রশ্নে রাশিয়ায় লেখা প্রথম নিবন্ধের রচয়িতা। সমাজ ও অর্থনীতি-সংক্রান্ত প্রশ্নাবলিতে বিস্তর মনোযোগ দিয়েছিলেন আলেক্সান্দর রাদিশ্চেভ (১৭৪৯-১৮০২) — ইনি ছিলেন বৈপ্লবিক জ্ঞানপ্রচারক এবং 'সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে মস্কো যাত্রা' নামে বিখ্যাত বইয়ের লেখক, এতে তিনি সমালোচনা করেন ভূস্বামীদের, এমনকি রাজতন্ত্রেরও। গুরুত্বসম্পন্ন কিছু-কিছু রচনা ছিল ডিসেম্ব্রিস্টদের — এঁরা ছিলেন রাশিয়ায় প্রথম বৈপ্লবিক আন্দোলনে অংশগ্রাহী, ১৮২৫ সালে ডিসেম্বর মাসে এঁরা জারের বিরুদ্ধে একটা অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন। এগুলির মধ্যে নিকোলাই তুর্গেনেভ (১৭৮৯-১৮৭১) এবং পাভেল পেস্তেল (১৭৯৩-১৮২৬) এবং মিখাইল অরলোভের (১৭৮৮-১৮৪২) রচনাবলি বিশিষ্ট। মহান রুশী লেখক এবং বৈপ্লবিক-গণতন্ত্রী নিকোলাই চের্নিশেভ্স্কি (১৮২৮-১৮৮৯) ছিলেন অর্থনীতি বিষয়ে গভীরপ্রসারী চিন্তনে পারদর্শী এবং বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের প্রখর সমালোচক। তাঁর বৈজ্ঞানিক রচনাবলি এবং ক্রিয়াকলাপ উঁচু পর্যায়ের ছিল বলে মনে করতেন মার্কস।

তবে আঠার শতকে এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে আর্থনীতিক উন্নয়নে রাশিয়া ছিল পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশগুলি থেকে অনেকটা পিছনে। তখনও ছিল ভূমিদাসপ্রথা, আর বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্ক ছিল শুধু প্রাথমিক আকারে। অর্থনীতি বিষয়ে রুশী চিন্তন বিকাশের লক্ষণীয় বিশেষ ধরনটা আসে তারই থেকে। তার সঙ্গে সঙ্গে, অর্থনীতি বিষয়ে মার্কসের তত্ত্ব রাশিয়ায় পড়ে উর্বর মাটিতে, সেটা শিকড় গাড়ে অচিরে। মার্কসের শিক্ষা এবং 'পুঁজি'-র তরজমা হয় সর্বপ্রথমে রুশ ভাষায়। মার্কসের শিক্ষা এবং স্মিথ আর রিকার্ডোর মতবাদের মধ্যে সংযোগটার বিশ্লেষণ সর্বপ্রথমে যাঁরা করেন তাঁদের একজন হলেন কিয়েভের প্রফেসর ন. ন. জিবের (১৮৪৪-১৮৮৮)।

হেইলব্রোনার বলেন, 'উটের মতো সহনশীলতা এবং মুনি-ঋষির মতো ধৈর্য' না থাকলে অর্থশাস্ত্র বিষয়ে কোন-কোন গুরুচিন্তিত রচনা শেষ অবধি পড়া অসম্ভব, — আমরা এই আশা প্রকাশ করতে চাইছি যে, এই বইখানা পড়তে পাঠকের সেটা দরকার হবে না।

এখন তাহলে, দাস-মালিকানার সমাজের অর্থশাস্ত্র থেকে মাঝ-উনিশ শতকের অর্থশাস্ত্র অবধি। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা কয়েক বার থামব বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

গোড়ার কথা

আদিম মানুষ যখন তৈরি করেছিল প্রথম কুড়ুল আর ধনুক, সেটা **নয় অর্থনীতি**। সেটা ছিল বলা যেতে পারে প্রযুক্তি মাত্র।

কিন্তু তারপর কতকগুলো কুড়ুল আর ধনুক নিয়ে একদল শিকারী মারল একটা হরিণ। মাংসটাকে তারা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল খুব সম্ভব সমান-সমান করে: কেউ-কেউ অন্যান্যের চেয়ে বেশি পেলে ঐ অন্যান্যরা স্রেফ বেঁচে থাকতেই পারত না। লোক-সম্প্রদায়ের জীবন অপেক্ষাকৃত যৌগিক হয়ে উঠেছিল। দেখা দিয়েছিল ধরা যাক কারিগর, সে শিকারীদের জন্যে ভাল-ভাল হাতিয়ার তৈরি করত, কিন্তু নিজে শিকার করত না। মাংস আর মাছের একটা ভাগ তখন কারিগর ইত্যাদিদের জন্যে রেখে ভাগাভাগি করতে হল শিকারী আর মেছুয়াদের মধ্যে। বিভিন্ন লোক-সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং প্রত্যেকটা লোক-সম্প্রদায়ে শ্রমের উৎপাদের বিনিময় শুরু হয় কোন একটা পর্বে।

আদিম এবং অনুন্নত হলেও এইসব হল **অর্থনীতি**, কেননা ধনুক, কুড়ুল, কিংবা মাংস — এইসব জিনিসের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ব্যাপারই শুধু নয়, এটা আরও ছিল সমাজে মানুষে-মানুষে সম্পর্কের ব্যাপার। আর সেটা নয় সাধারণভাবে সম্পর্ক, সেটা হল মানুষের জীবনধারণের জন্যে অত্যাবশ্যক জিনিসের উৎপাদন আর বণ্টনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৈষয়িক সম্পর্ক। মার্কস এই সম্পর্কের নাম দিলেন **উৎপাদন-সম্পর্ক**।

বৈষয়িক জিনিসপত্রের সামাজিক উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন এবং ভোগ-ব্যবহার, আর সেই ভিত্তিতে উদ্ভূত উৎপাদন-সম্পর্কের সাকল্যটা হল অর্থনীতি। এই অর্থে অর্থনীতি মানব-সমাজের মতো সমানই প্রাচীন।

আদিম সমাজের অর্থনীতি স্বভাবতই ছিল অত্যন্ত সরল, কেননা লোকে যেসব হাতিয়ার ব্যবহার করত সেগুলোও ছিল খুবই সাদাসিধে, আর খুবই সীমাবদ্ধ ছিল তাদের কর্মপটুতা। অর্থাৎ কিনা, কোন সমাজের উৎপাদন-সম্পর্ক, অর্থনীতি এবং জীবনের অন্যান্য দিক যেটা দিয়ে নির্ধারিত হয় সেই **উৎপাদন-শক্তির** বিকাশ ছিল নিচু পর্যায়ে।

কে প্রথম অর্থনীতিবিদ

কেন আগুন জ্বলে, কেন বজ্র গর্জায়, এসব নিয়ে মানুষ ভেবে-চিন্তে দেখতে শুরু করেছিল কখন? সম্ভবত বহু হাজার বছর আগে। আর তেমনি, আদিম গোষ্ঠী সমাজ বদলে ক্রমে প্রথম শ্রেণীবিভক্ত সমাজ দাস-মালিকানার সমাজে পরিণত হবার সময়ে সেই সমাজের অর্থনীতি-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে ভেবে দেখাই-বা শুরু হয় কখন? তবে এইসব ভাবনা-চিন্তা ছিল না, হতে পারত না **বিজ্ঞান** — যেটা হল প্রকৃতি আর সমাজ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের একটা তন্ত্র।

ঢের বেশি উন্নত উৎপাদন-শক্তি ছিল পরিণত দাস-মালিকানার সমাজের ভিত্তি — এই সমাজের যুগ আসার আগে বিজ্ঞান দেখা দেয় নি। চার-পাঁচ হাজার বছর আগে ছিল সুমেরিয়া, বাবিলন এবং মিসরের প্রাচীন রাষ্ট্রগুলি — এইসব রাষ্ট্রে গণিতে কিংবা চিকিৎসাবিদ্যায় মানুষের জ্ঞান কোন-কোন সময়ে ছিল বেশ প্রগাঢ়। প্রাচীনকালের জ্ঞানের যেসব সেরা-সেরা নিদর্শন টিকে রয়েছে সেগুলি প্রাচীন গ্রীক এবং রোমকদের।

বিজ্ঞানের একটা বিশেষ শাখা **অর্থশাস্ত্র** সতর শতকে উদ্ভূত হবার দীর্ঘকাল আগেই আর্থনীতিক জীবনের তথ্যাদি বোঝার স্পষ্ট-নির্দিষ্ট প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। যেসব আর্থনীতিক ব্যাপার নিয়ে এই বিজ্ঞান পরীক্ষা-বিশ্লেষণ করেছে তার অনেকগুলিই জানা ছিল প্রাচীন মিসরীয়দের কিংবা গ্রীকদের আমলেই — যেমন বিনিময়, মুদ্রা, দাম, বাণিজ্য, লাভ, ঋণের সুদ। লোকে সর্বোপরি ভাবতে শুরু করেছিল সেই যুগের উৎপাদন-সম্পর্কের প্রধান বিশেষত্ব দাসপ্রথা সম্বন্ধে।

অর্থনীতি-সংক্রান্ত চিন্তন গোড়ায় সমাজ সম্বন্ধে অন্যান্য আকারের মনন থেকে আলাদা ছিল না, তাই এটা প্রথম দেখা দিয়েছিল ঠিক কখন সেটা বলা অসম্ভব। অর্থনীতির ইতিহাসকারেরা ভিন্ন-ভিন্ন কালাঙ্ক ধরে

এগোন, সেটা আশ্চর্য নয়। কোন-কোন ইতিহাস শুরু হয়েছে প্রাচীন গ্রীকদের থেকে, আবার প্রাচীন মিসরীয় পেপিরাসলিপি, হামুরাবি সংহিতার শিলালিপি কিংবা হিন্দুদের বেদ সম্বন্ধে গবেষণা দিয়ে শুরু হয়েছে অন্য কোন-কোন ইতিহাস। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় আর প্রথম সহস্রকে প্যালেস্টাইন এবং সন্নিহিত অঞ্চলগুলির বাসিন্দা হিব্রু এবং অন্যান্য জাতির আর্থনীতিক জীবন সম্বন্ধে বহু আর্থনীতিক পর্যবেক্ষণ উপাত্ত এবং ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বাইবেলে।

তবে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, অর্থনীতি বিষয়ে মার্কিন ইতিহাসকার প্রফেসর জে. এফ. বেল্ তাঁর বইয়ের একটা লম্বা পরিচ্ছেদ দিয়েছেন বাইবেলের জন্যে, আর ঐ কালপর্যায়ের অন্যান্য সমস্ত আকর-দলিলকে তিনি একেবারেই তুচ্ছ করেছেন, এর কারণটা তো ধরেই নিতে হয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ঘটিত গবেষণার সঙ্গে একেবারেই সংস্রবহীন কোন পরিস্থিতি — সেটা হল এই যে, বাইবেল হল খ্রিস্টধর্মের পবিত্র গ্রন্থ, আর বেশির ভাগ মার্কিন ছাত্র সেটা সম্বন্ধে অবগত হয় ছেলেবেলা থেকেই। গবেষণাকে তাহলে আধুনিক জীবনের এই অবস্থার সঙ্গে কিছুটা মানিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

আদিম সমাজের ক্ষয় যখন বহু দূর এগিয়ে গেছে, আর গড়ে উঠছে দাস-মালিকানার সমাজ, সেই পর্বের প্রাচীন গ্রীক সমাজের চমৎকার কথা-চিত্র তুলে ধরা হয়েছে হোমারের কবিতাগুলিতে। প্রায় তিন হাজার বছর আগে ইজিয়ান আর আইওনিয়ান সাগরকূলে অধিবাসী মানুষের জীবন আর দর্শনের জ্ঞানকোষ বলেই অভিহিত হতে পারে মানব-সংস্কৃতির এইসব স্মরণিক। ট্রয় নগরীতে আক্রমণাত্মক অবরোধ এবং অডিসিউসের পরিব্রাজনের রোমাঞ্চকর কাহিনীর বুনটে মুনশিয়ানা খাটিয়ে বুনে দেওয়া হয়েছে অতি বিচিত্র নানা আর্থনীতিক পর্যবেক্ষণ-উপাত্ত। 'অডিসি'-তে রয়েছে দাস-শ্রমের স্বল্প উৎপাদনশীলতার নিদর্শন:

কর্তা নেই তো, দাসদের উপর শাসন কোথায়?
মনুষ্যত্বেরই-বা স্থান কোথায় হুল্লোড়ের রাজত্বে?
জোভ কড়াক্কড় বেঁধে দিয়েছেন যে, যেকোন দিন
দাস বানায় মানুষকে, সেটা কেড়ে নেয় তার দামের অর্ধেক।*

---

* 'The Odyssey of Homer', translated from the Greek by Alexander Pope, London, 1806, p. 256.

স্বভাবতই, ইতিহাসকার এবং অর্থনীতিবিদেরা প্রাচীনকালের মানুষের **গার্হস্থ্য জীবন** সম্বন্ধে তথ্যাদির আকর হিসেবে ধরতে পারেন হাম্মুরাবি সংহিতা, বাইবেল এবং হোমারকে। **অর্থনীতি চিন্তন** বলতে ধরে নিতে হয় চলিতকর্ম, দূরকল্পনা আর বিমূর্তনের কিছু পরিমাণ সামান্যীকরণ — এই চিন্তনের নমুনা হিসেবে সেগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে শুধু গৌণভাবে। সুপরিচিত বুর্জোয়া পণ্ডিত জোসেফ এ. শুম্পিটার (অস্ট্রিয়ার মানুষ, যিনি জীবনের দ্বিতীয়ার্ধটা কাটিয়ে দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) নিজ বইখানাকে আর্থনীতিক বিচার-বিশ্লেষণের ইতিহাস বলে অভিহিত করেছেন, আর বইখানা শুরু করেছেন ক্ল্যাসিকাল গ্রীক চিন্তাবীরদের দিয়ে।

জেনেফেন্, প্লেটো এবং আরিস্টটলের রচনাগুলিতে রয়েছে গ্রীক সমাজের আর্থনীতিক গঠনের তত্ত্বগত ব্যাখ্যার প্রথম-প্রথম চেষ্টা, তা ঠিক। আমাদের আধুনিক সংস্কৃতি কত সূত্রে সংযুক্ত সেই ক্ষুদ্র জাতিটির অসাধারণ সভ্যতার সঙ্গে সেটা আমরা এক-এক সময়ে ভুলে যেতে থাকি। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বিভিন্ন উপাদানকে আত্মভূত করে নিয়েছে আমাদের বিজ্ঞান, আমাদের শিল্পকলা, আমাদের ভাষা। অর্থনীতি চিন্তন প্রসঙ্গে মার্কস বলেছেন: 'গ্রীকরা সময়ে-সময়ে এক্ষেত্রে যতখানি বিচরণ করেছেন তাতে তাঁরা প্রদর্শন করেছেন অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে যেমন সেই একই প্রতিভা আর মৌলিকতা। এই কারণে তাঁদের বিবেচনাধারা হল ইতিহাসক্রমে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বীয় আরম্ভস্থল।'*

অর্থনীতি (ঐকনমিয়া, **ঐকস্** — গৃহ, গৃহস্থালি, আর **নমস্** — নিয়ম, আইন, এই দুটো শব্দ থেকে) এই শব্দটা হল জেনেফেনের একটি বিশেষ রচনার নাম, এতে গৃহস্থালি আর তালুক ব্যবস্থাপনের বিচক্ষণ নিয়মাবলির বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শব্দটার ঐ অর্থ (গৃহস্থালি ব্যবস্থাপন বিদ্যা) বজায় ছিল বহু শতাব্দী ধরে। আমাদের গৃহস্থালি ব্যবস্থাপন বলতে যেমনটা সেই রকমের সীমাবদ্ধ ছিল না বটে গ্রীকদের আমলে। কেননা ধনী গ্রীকের গৃহ ছিল একটা গোটা দাস-মালিকানার অর্থনীতি — প্রাচীন জগতের একটা অণু-রূপ গোছের।

'Economy' এবং সেটা থেকে পাওয়া 'Economics' অভিধা-দুটোকে

---

* ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, 'অ্যান্টি-ড্যুরিং', মস্কো, ১৯৬৯, ২৭১ পৃঃ (অ্যান্টি-ড্যুরিং'-এর ২য় ভাগের দশম পরিচ্ছেদ মার্কসের লেখা)।

আরিস্টটল ব্যবহার করেন একই অর্থে। নিজ আমলে সমাজের মূল আর্থনীতিক ব্যাপারগুলো এবং নিয়মাবলি বিশ্লেষণ করেন সর্বপ্রথমে তিনি, আর অর্থনীতি বিজ্ঞানের ইতিহাসে সর্বপ্রথম অর্থনীতিবিদ হয়ে ওঠেন প্রকৃতপক্ষে তিনিই।

একেবারে শুরু: আরিস্টটল

খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৬ সালে ম্যাসিডনিয়ার ২য় ফিলিপকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করা হয় তাঁর মেয়ের বিয়ের আসরে। এই অপরাধে প্ররোচনাদাতাদের খুঁজে বের করা যায় নি কখনও। প্ররোচনাদাতারা ছিল পারস্যের শাসকেরা, এই মর্মে বিবরণ সত্যি হলে বলতে হয় নিজেদের পক্ষে এর চেয়ে সর্বনাশা কিছু তারা করতে পারত না: ফিলিপের বিশ বছর-বয়স্ক ছেলে আলেকজাণ্ডার সিংহাসন পেয়ে অল্প কয়েক বছরের মধ্যে পরাক্রমশালী পারসিক সাম্রাজ্য জয় করে নেন।

স্তাগিরা শহরের দার্শনিক আরিস্টটলের একজন শিষ্য ছিলেন আলেকজাণ্ডার। আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডনিয়ার সম্রাট হবার সময়ে আরিস্টটলের বয়স আটচল্লিশ, আর তার মধ্যেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা গ্রীক জগৎ জুড়ে। অল্পকাল পরেই আরিস্টটল ম্যাসিডনিয়া ছেড়ে এথেন্সে চলে যান কিসের তাগিদে সেটা আমাদের জানা নেই। কারণটা যা-ই হোক, সেটা আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে মতভেদ নয়: তাঁদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল অনেক পরে, যখন প্রতিভাশালী তরুণটি হয়ে দাঁড়ান সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত এবং খামখেয়াল জালিম। সম্ভবত আরিস্টটলকে এথেন্স টেনেছিল 'প্রাচীন জগতে'র সংস্কৃতিকেন্দ্র হিসেবে, এই শহরে বাস করেন এবং মারা যান তাঁর গুরু প্লেটো, আর এখানেই কেটেছিল আরিস্টটলের নিজের তরুণ-কাল।

কারণটা যা-ই হোক, স্ত্রী, কন্যা এবং দত্তক-পুত্রকে নিয়ে আরিস্টটল এথেন্সে উঠে যান ৩৩৫ কিংবা ৩৩৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। পরবর্তী দশ-বার বছরে আলেকজাণ্ডার যখন গ্রীকদের জানা সমস্ত লোক-অধ্যুষিত অঞ্চল জয় করছিলেন সেই সময়ে আরিস্টটল গড়ে তোলেন জমকাল বিজ্ঞান-সৌধটি, আশ্চর্য কর্মশক্তি দিয়ে তিনি নিজ জীবনের সাধনা সম্পাদন করেন, সেটার সামান্যীকরণ ঘটান। কিন্তু শিষ্য আর মিত্রদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ

বার্ধক্যযাপন তাঁর ভাগ্যে ছিল না। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ সালে আলেকজান্ডার মারা যান, তখন তাঁর বয়স সবে ৩৩। এথেন্সের মানুষ বিদ্রোহ করে ম্যাসিডনিয়ার শাসনের বিরুদ্ধে, দার্শনিকটিকে তাড়িয়ে দেয়। একবছর পরে তিনি মারা যান ইউবিয়ে দ্বীপে ক্যালসিস্-এ।

আরিস্টটল হলেন বিজ্ঞানের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী। তাঁর যেসব রচনা টিকে আছে এবং প্রামাণিক, সেগুলি তদানীন্তন সমস্ত জ্ঞানক্ষেত্র জুড়ে। বিশেষত তিনি হলেন মানব-সমাজ বিজ্ঞানের, সমাজবিদ্যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সেটার কাঠামের ভিতরে তিনি বিচার-বিশ্লেষণ করেন আর্থনীতিক প্রশ্নাবলিও। সমাজবিদ্যা বিষয়ে আরিস্টটলের রচনাগুলি তাঁর এথেন্সের জীবনের শেষ বছরগুলির কালপর্যায়ের। সেগুলির মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হল 'The Nicomachean Ethics' ('নিকোম্যাকীয় নীতিবিদ্যা') তাঁর ছেলের নাম নিকোম্যাকাস, তদনুসারে তাঁর উত্তরসূরিরা ঐ নাম দেন), আর 'রাজনীতি'-শীর্ষক নিবন্ধ রাষ্ট্রের গঠন সম্বন্ধে।

প্রকৃতি-বিজ্ঞান আর সমাজ-বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রে আরিস্টটল ছিলেন 'নতুন ধরনের' একজন বিজ্ঞানী। তিনি বিভিন্ন তত্ত্ব আর সিদ্ধান্ত গড়ে তোলেন বিমূর্ত দূরকল্পনার ভিত্তিতে নয়, সেটা তিনি সর্বদাই করেন তথ্যাদির সযত্ন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে। প্রাণিবিদ্যাক্ষেত্রের বিস্তৃত সংগ্রহের ভিত্তিতে তিনি রচনা করেন 'Historia animalium' ('জীব বৃত্তান্ত')। তেমনি, 'রাজনীতি'-র জন্যে তিনি এবং তাঁর একদল শিষ্য ১৫৮টা গ্রীক এবং অ-গ্রীক রাষ্ট্রের গঠন আর আইন-কানুন সংক্রান্ত মালমশলা জড়ো করে সেগুলি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন। সেগুলির বেশির ভাগই ছিল পলিস্ 'polis' অর্থাৎ নগররাষ্ট্র।

শিষ্য এবং ভক্ত পরিবেষ্টিত বিজ্ঞ গুরুদেব — এইভাবেই লোকে আরিস্টটলকে স্মরণে রেখেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। এথেন্সে জীবনের শেষ বার থাকার সময়ে তাঁর বয়েস ছিল পঞ্চাশের কোঠায়, আর ধরেই নেওয়া যেতে পারে তিনি মানুষটি ছিলেন কর্মিষ্ঠ, প্রফুল্ল। কথিত আছে, লিসিয়েম-এ একটা আচ্ছাদিত ভ্রমণপথ পেরিপাকোস্-এ পায়চারি করতে-করতে বন্ধু আর শিষ্যদের সঙ্গে গল্পসল্প করে তিনি আনন্দ পেতেন। তাঁর দর্শন-সম্প্রদায়টি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে পেরিপেটেটিক্স* নামে।

---

* পদচারণপথ — 'পেরিপাকোস' থেকে। — অনুঃ

আরিস্টটলের 'রাজনীতি' এবং 'নীতিবিদ্যা' লিখিত হয় লিপিবদ্ধ কথোপকথন কিংবা কখনও-কখনও স্বতঃউক্ত পরিচিন্তন আকারে। কোন ধ্যান-ধারণার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আরিস্টটল প্রায়শ সেটাতে ফিরে-ফিরে আসতেন, সেটাকে ধরতেন যেন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, আর এইভাবে উত্তর দিতেন শিষ্য-ভক্তমণ্ডলীর প্রশ্নের।

আরিস্টটল ছিলেন তাঁর কালেরই সন্তান। তিনি মনে করতেন, দাসপ্রথা স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক, আর দাস হল একটা কথা-কওয়া যন্ত্র। অধিকন্তু, এক অর্থে তিনি ছিলেন রক্ষণশীল। তাঁর আমলের গ্রীসে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আর্থ সম্পর্কের বিকাশ তাঁর মনঃপূত ছিল না। তাঁর কাছে আদর্শস্থানীয় ছিল ক্ষুদ্র কৃষি অর্থনীতি (স্বভাবতই তাতে খাটুনিটা দাসদের)। এই অর্থনীতি সেটাতে যোগাবে প্রায় সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় জিনিস, তাতে যে অল্প কয়েকটা জিনিস অমিল সেগুলো পাওয়া যেতে পারে প্রতিবেশীদের সঙ্গে 'ন্যায্য বিনিময়ে'র মাধ্যমে।

সর্বপ্রথমে আরিস্টটলই অর্থশাস্ত্রের কিছু-কিছু ধারণা-মৌল স্থির করেন এবং সেগুলোর পরস্পর-সংযোগ প্রদর্শন করেন কিছু পরিমাণে — এটাই অর্থনীতিবিদ হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব। নানা টুকরোটাকরা একত্র করে ধরলে দাঁড়ায় আরিস্টটলের যে-'অর্থনীতি ব্যবস্থা'টা সেটাকে অ্যাডাম স্মিথের 'The Wealth of Nations' ('জাতিসমূহের ধন-দৌলত')-এর প্রথম পাঁচটা পরিচ্ছেদ এবং কার্ল মার্কসের 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ডের ১ম ভাগের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় চিন্তনের আশ্চর্য ধারাবাহিকতা। চিন্তন উন্নীত হল নতুন পর্যায়ে পূর্ববর্তী পর্যায়গুলির ভিত্তিতে। লেনিন লিখেছেন, দাম গড়ে ওঠা এবং বদলে যাবার নিয়ম (অর্থাৎ মূল্য নিয়ম) বের করার তাগিদটা চলে আসছে আরিস্টটল থেকে গোটা ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রের ভিতর দিয়ে মার্কস অবধি।

উপযোগ-মূল্য এবং বিনিময়-মূল্য — যেকোন পণ্যের এই দুটো দিক স্থির করে আরিস্টটল বিনিময়-প্রক্রিয়াটাকে বিশ্লেষণ করেন। যে-প্রশ্নটা পরে হল অর্থশাস্ত্রের সর্বক্ষণের গরজের বিষয় সেটাকে তিনি তুলে ধরলেন: বিনিময়ের অনুবন্ধ কিংবা বিভিন্ন বিনিময়-মূল্য কিংবা সেগুলোর অর্থ-আকার অর্থাৎ দাম নির্ধারিত হয় কি দিয়ে। এই প্রশ্নের উত্তরটা তিনি জানেন না, কিংবা, বরং বলা ভাল, উত্তরটার সামনে থমকে প'ড়ে তিনি যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেটা থেকে সরে যান একপাশে। তবু অর্থের উদ্ভব এবং

কর্ম সম্বন্ধে কিছু-কিছু বিচক্ষণ ধারণা তিনি পয়দা করেন বটে, আর শেষে, যে-অর্থ পয়দা করে নতুন অর্থ সেই পুঁজিতে অর্থের রূপান্তর-সংক্রান্ত ধারণাটাকে তিনি প্রকাশ করেন নিজস্ব বিশিষ্ট ধরনে।

বিস্তর অপ্রাসঙ্গিকতা, অস্পষ্টতা এবং পুনরুক্তির ভিতর দিয়ে বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণের এমন পথই পার হয়ে যান এই মহামতি হেলান্।*

আরিস্টটলের বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকার বরাবরই বাদ-প্রতিবাদের বিষয়। দর্শন, বিভিন্ন প্রকৃতি-বিজ্ঞান এবং সমাজ সম্বন্ধে তাঁর ভাব-ধারণাগুলিকে অনড় আপ্তবাক্যে, অলঙ্ঘ্য অনুশাসনে পরিণত ক'রে খিৃস্টীয় যাজকতন্ত্র, অপবৈজ্ঞানিক দিগ্‌গজেরা এবং প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকেরা ব্যবহার করেছে যাকিছু নতুন আর প্রগতিশীল সেইসবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। অন্য দিকে, বিজ্ঞানে আমূল পরিবর্তন ঘটান যে-রেনেসাঁস প্রধানেরা তাঁরা আরিস্টটলের ভাব-ধারণাগুলিকে গোঁড়ামিমুক্ত আকারে কাজে লাগান। আরিস্টটলকে নিয়ে লড়াই চলছে অদ্যাবধি। আর সেটা হল অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাঁর অর্থনীতি-সংক্রান্ত তত্ত্ব নিয়ে।

এই গ্রীক মনীষীর অর্থনীতি-সংক্রান্ত বিবেচনাধারা সম্বন্ধে মূল্যায়ন রয়েছে নিম্নলিখিত দুটি উদ্ধৃতিতে — সেটা সযত্নে পড়ে দেখুন। প্রথম মূল্যায়নটা একজন মার্কসবাদীর — তিনি হলেন সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ ফ. ইয়া. পলিয়ান্স্কি। দ্বিতীয়টা হল অর্থনীতি চিন্তনের একটি বুর্জোয়া ইতিহাসের রচয়িতা মার্কিন অধ্যাপক জে. এফ. বেল-এর।

পলিয়ান্স্কি	বেল
'মূল্য সম্পর্কে আরিস্টটলের বিচারধারা বিষয়ীগত হবার ধারেকাছেও নয়, তিনি বরং মূল্য সম্পর্কে বিষয়গত ব্যাখ্যার দিকেই ঝুঁকেছেন। যা-ই হোক, উৎপাদন-পরিব্যয় মেটাবার সামাজিক আবশ্যকতাটা তিনি স্পষ্ট লক্ষ্য করেছেন বলেই মনে হয়। পরিব্যয়ের গঠন তিনি বিশ্লেষণ করে নি, এই প্রশ্নে তিনি আগ্রহান্বিতও ছিলেন না, তা ঠিক। তবে পরিব্যয়ের গঠনে শ্রমকে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থানই বোধহয় দেওয়া হয়েছে।'*	'মূল্যটাকে আরিস্টটল বিষয়ীগত বলে ধরেছেন, যেটা সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপযোগের উপর নির্ভর করে। বিনিময়ের অবলম্বন হল মানুষের চাহিদা।... কোন বিনিময় ন্যায্য হলে সেটার অবলম্বন নয় শ্রম-পরিব্যয় অর্থে পরিব্যয় — সেটা হল চাহিদার সমতা।'**

সহজেই দেখা যায় এই মূল্যায়ন দুটো ঠিক বিপরীত। উভয় রচনাংশে বলা হয়েছে **মূল্যের** কথা — মূল্য, যা হল অর্থশাস্ত্রের একটা বুনিয়াদী ধারণা-মৌল, যেটা আমাদের সামনে পড়বে বারবার।

মার্কসীয় অর্থনীতি তত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্গ হল **শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্ব,** এটাকে মার্কস গড়ে তোলেন ক্ল্যাসিকাল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের বৈচারিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে। এই তত্ত্বের সারমর্মটা হল এই যে, সমস্ত পণ্যের আছে একটা অভিন্ন মূল ধর্ম: সমস্ত পণ্যই মানুষের শ্রম-ফল। এই শ্রমের পরিমাণই পণ্যের মূল্য ধার্য করে। একখানা কুড়ুল তৈরি করতে যদি লাগে পাঁচ কর্ম-ঘণ্টা, আর এক কর্ম-ঘণ্টা যদি লাগে একটা মেটে পাত্র তৈরি করতে, তাহলে অন্যান্য সবকিছু সমান-সমান থাকলে কুড়ুলখানার মূল্য হবে পাত্রটার মূল্যের পাঁচগুণ। একখানা কুড়ুল সাধারণত বিনিময় হবে পাঁচটা মেটে পাত্রের সঙ্গে — এর থেকে দেখা যায় ঐ মূল্য-হিসাবটা। এটা হল কুড়ুলখানার **বিনিময়-মূল্য** — পাত্রের হিসাবে। এটা আরও হতে পারে মাংস কাপড় কিংবা অন্য যেকোন পণ্যের হিসাবে, কিংবা শেষে, অর্থের হিসাবে, অর্থাৎ কোন একটা পরিমাণ রূপো কিংবা সোনা হিসাবে। অর্থের হিসাবে কোন পণ্যের বিনিময়-মূল্য হল সেটার **দাম।**

যা মূল্য পয়দা করে এমন বস্তু হিসেবে শ্রমের ব্যাখ্যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যে কুড়ুল তৈরি করে তার শ্রমটাকে যে পাত্র তৈরি করে তার শ্রমের সঙ্গে

---

* গ্রীক। — অনুঃ

* 'অর্থনীতি চিন্তনের ইতিহাস', পাঠমালা, ১ম ভাগ, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৬১, ৫৮ পৃঃ (রুশ ভাষায়)।

** J. F. Bell, 'A History of Economic Thought', New York, 1953, p. 41.

তুলনা করতে হলে সেটাকে গণ্য করতে হবে কোন একটা নির্দিষ্ট বৃত্তির মূর্ত ধরনের শ্রম হিসেবে নয়, সেটাকে ধরতে হবে স্রেফ কোন একটা পরিমাণ সময় ধরে একজনের পেশী আর মনের শক্তিব্যয় হিসেবে — **বিমূর্ত শ্রম** হিসেবে, যা হবে সেটার মূর্ত আকারের অনপেক্ষ। কোন পণ্যের উপযোগ-মূল্য (উপকারিতা) নিশ্চয়ই পণ্যটার মূল্যের একটা অপরিহার্য পূর্বশর্ত, কিন্তু সেটা হতে পারে না ঐ মূল্যের উৎপত্তিস্থল।

এইভাবে মূল্যের অস্তিত্ব **বিষয়গত**। এটার অস্তিত্ব কোন লোকের অনুভবের অনপেক্ষ, কোন পণ্যের উপকারিতাটাকে কেউ বিষয়ীগতভাবে কেমন মূল্যবান মনে করে সেটার অনপেক্ষ। তাছাড়া, মূল্যের থাকে একটা সামাজিক প্রকৃতি। কোন বস্তু সম্বন্ধে, জিনিস সম্বন্ধে লোকের মনোভাব দিয়ে সেটা ধার্য হয় না, যারা তাদের শ্রম দিয়ে নানা পণ্য পয়দা করে এবং সেগুলি বিনিময় করে নিজেদের মধ্যে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক দিয়ে সেটা ধার্য হয়।

এই তত্ত্বের বিপরীতে আধুনিক বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রে বিনিময়-করা পণ্যগুলোকে **বিষয়ীগত উপকারিতাটাকে** ধরা হয় মূল্যের ভিত্তি হিসেবে। কোন পণ্যের বিনিময়-মূল্য স্থির করা হয় পরিভোগীর ইচ্ছার প্রাবল্য থেকে এবং বাজারে সংশ্লিষ্ট পণ্যটার যোগানের অবস্থা থেকে। তাতে করে সেটা হয়ে পড়ে আপাতিক, 'বাজারী' মূল্য। মূল্য-সংক্রান্ত প্রশ্নটাকে ব্যক্তির পছন্দের ক্ষেত্রে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বলে সেখানে মূল্যের সামাজিক প্রকৃতিটা খোয়া যায়, মূল্য আর থাকে না মানুষে-মানুষে একটা সম্পর্ক।

মূল্য-তত্ত্বের গুরুত্বটা আপনাতেই শুধু নয়। শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বের একটা অপরিহার্য সিদ্ধান্ত হল **উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব**, যাতে শ্রমিক শ্রেণীর উপর পুঁজিপতিদের শোষণের ক্রিয়া-বন্দোবস্তটার ব্যাখ্যা মেলে।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে পয়দা-করা পণ্যের মূল্যের যে-অংশটা মজুরি-শ্রমিকের শ্রম দিয়ে পয়দা হয় কিন্তু তার বাবত পুঁজিপতি কিছু দেয় না সেটা হল উদ্বৃত্ত মূল্য। সেটাকে পুঁজিপতি আত্মসাৎ করে অমনি, সেটাই পুঁজিপতি শ্রেণীর লাভের উৎপত্তিস্থল। উদ্বৃত্ত মূল্যই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের উদ্দেশ্য: এটা পয়দা করা পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ আর্থনীতিক নিয়ম। আর্থনীতিক বিরোধের, শ্রমিক এবং বুর্জোয়াদের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের জড়টা থাকে এই উদ্বৃত্ত মূল্যের মধ্যে। মার্কসীয় আর্থনীতিক মতবাদের ভিত্তি হয়ে উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব প্রমাণ করে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীতে দ্বন্দ্ব-অসংগতির উদ্ভব হয়ে সেটা গভীরতর হবার এবং শেষে এই উৎপাদন-প্রণালীর পতনের

অনিবার্যতা। মার্কসবাদের উপর বুর্জোয়া পণ্ডিতদের হামলাগুলো চালিত হয় প্রথমত এই উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বটাকে তাক করে। মূল্য-সংক্রান্ত বিষয়ীগত তত্ত্বে এবং বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের সমস্ত সংশ্লিষ্ট ভাব-ধারণায় শোষণ এবং শ্রেণী-দ্বন্দ্বটাকে একেবারেই বাদ দেওয়া হয়।

আরিস্টটল কি শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বের সুদূর প্রবক্তা ছিলেন, কিংবা যাতে মূল্যের উদ্ভব ধরা হয় উপকারিতা থেকে এমন তত্ত্বের পূর্বসূরি ছিলেন? — এটা নিয়ে কেন তর্ক চলে আসছে সুদীর্ঘ ২৪০০ বছর ধরে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় উল্লিখিত তথ্যটা থেকে। এই বিতর্ক সম্ভব হবার একমাত্র কারণ এই যে, পূর্ণাঙ্গ মূল্য-তত্ত্ব আরিস্টটল গড়ে তোলেন নি, গড়তে পারতেনও না।

বিভিন্ন পণ্য-মূল্যের সমীকরণ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন বিনিময়ের মাঝে, আর সমীকরণের একটা সাধারণী ভিত্তি খুঁজে বের করতে তিনি জোর চেষ্টা করেছিলেন। এটাতে আপনাতেই দেখা যায় চিন্তনের অসাধারণ প্রগাঢ়তা, আর এটা হল আরিস্টটলের বহু শতাব্দী পরে উত্তরকালীন আর্থনীতিক বিচার-বিশ্লেষণে এগবার আরম্ভস্থল। তাঁর বিভিন্ন উক্তিকে মনে হয় যেন শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বের খুবই আদিম ধরনের একটা রকমফের। উল্লিখিত রচনাংশে ফ. ইয়া. পলিয়ান্‌স্কি স্পষ্টত সেইসব উক্তির কথাই বলছেন। কিন্তু মূল্য-সংক্রান্ত **প্রশ্নটা** সম্বন্ধে অবগতিই বোধহয় আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যেটা দেখা যায় দৃষ্টান্তস্বরূপ 'নিকোম্যাকীয় নীতিবিদ্যা'র নিম্নলিখিত রচনাংশে:

'কেননা আমাদের মনে রাখতে হবে, কোন কাজ-কারবার হয় না একই বর্গের দুজনের মধ্যে, যেমন দুজন চিকিৎসক, কিন্তু তা হয় ধরুন একজন চিকিৎসক এবং একজন কৃষিজীবীর মধ্যে, কিংবা সাধারণভাবে বলতে গেলে, যারা ভিন্নরূপ কিন্তু সমান নয় তাদের মধ্যে, তবে বিনিময় ঘটতে হলে এদের সদৃশীকরণ আবশ্যক নিশ্চয়ই। ...তার থেকে আসছে সবকিছুর জন্যে কোন একই মানদণ্ডের আবশ্যকতা। ...উত্তম, তাহলে, সম্পর্কের সদৃশীকরণ হলে সেটা যাতে দাঁড়ায় এই অনুপাতে — কৃষিজীবী:মুচি= মুচির জিনিসপত্র : কৃষিজীবীর জিনিসপত্র, তখন ঘটে 'আদান-প্রদান'' (বিনিময়)।*

---

* Aristotle, 'The Nicomachean Ethics', translated by D. P. Chase, London, Toronto, New York, 1920, p. 113.

বিভিন্ন উপযোগ-মূল্যের বিভিন্ন পণ্য যারা পয়দা করে সেইসব মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক হিসেবে মূল্যের একটা ব্যাখ্যা এখানে পাওয়া যাচ্ছে প্রাথমিক আকারে। মনে হবে, আর এক-পা এগলেই সিদ্ধান্তটা হয় এই: কৃষিজীবী আর মুচি তাদের উৎপাদ বিনিময় করার মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয় স্রেফ একবস্তা শস্য এবং একজোড়া জুতো পয়দা করতে আবশ্যক কাজের, শ্রম-কালের পরিমাণ দিয়ে। কিন্তু আরিস্টটল এ সিদ্ধান্তে পৌঁছন নি।

তা তিনি পারেন নি, সেটা আর কিছু না হলেও শুধু এই কারণে যে, তিনি জীবনযাপন করেছিলেন প্রাচীন দাস-মালিকানার সমাজে, সেটা স্বধর্ম অনুসারেই সমতা-সংক্রান্ত ধারণার দিক থেকে, সমস্ত রকমের শ্রমের সম-মূল্য সংক্রান্ত ধারণার দিক থেকে বিজাতীয়। দাসদের শ্রম হিসেবে কায়িক শ্রম ছিল অবজ্ঞেয়। স্বাধীন কারিগর এবং স্বাধীন কৃষিজীবীও ছিল গ্রীসে, তবু অদ্ভুত বটে, সামাজিক শ্রমের ব্যাখ্যা করার বেলায় আরিস্টটল তাদের 'দেখেও-না-দেখে' গেছেন।

তবে মূল্য (বিনিময়-মূল্য) থেকে রহস্য-যবনিকা তুলে ফেলতে অপারক হয়ে আরিস্টটল যেন পরিতাপের নিশ্বাস ফেলে রহস্যটার ব্যাখ্যার জন্যে বিভিন্ন পণ্যের উপযোগে গুণীয় পার্থক্য-সংক্রান্ত ভাসাভাসা ব্যাপারটাকে অবলম্বন করলেন। এই উক্তিটা (তাঁর ধারণাটা মোটামুটি হল, 'আমরা জিনিসপত্র বিনিময় করি তার কারণ তোমার পণ্য আমার দরকার, আর আমারটা তোমার দরকার') অকিঞ্চিতকর এবং গুণীয় বিচারে আবছা, তা তিনি টের পান সেটা স্পষ্টই, কেননা তিনি বলেন, বিভিন্ন পণ্যকে তুলনীয় করে তোলে অর্থ: 'সমস্ত জিনিসের জন্যে কোন একই মানদণ্ডের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে সেটা থেকে। আর বস্তুত এবং যথার্থই সেটা হল সেগুলির জন্যে চাহিদা, যা কিনা এমন সমস্ত কাজ-কারবারের একই অভিন্ন যোগসূত্র। ...আর সর্বজন স্বীকৃত অনুসারে অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে চাহিদার একটা নিদর্শন।'*

এটা আমূল পৃথক মতাবস্থান; প্রফেসর বেল-এর বই থেকে যে-উদ্ধৃতিটা উপরে দেওয়া হয়েছে তেমন উক্তি সম্ভব হয়েছে তার ফলে।

---

* আরিস্টটল, উল্লিখিত রচনা, ১১৩ পৃঃ।

অর্থনীতিবিদ্যা এবং অর্থমৃগয়াবিদ্যা

এই বিজ্ঞানের ইতিহাসে পুঁজি বিশ্লেষণের প্রথম চেষ্টা হল ক্রেমাটিস্টিক্স [অর্থমৃগয়াবিদ্যা] আর অর্থনীতিবিদ্যার মধ্যে আরিস্টটলের পার্থক্য প্রদর্শন, এটা তাঁর আর-একটা আগ্রহজনক ধারণা। 'ক্রেমাটিস্টিক্স' অভিধাটাকে উদ্ভাবন করেন তিনিই, কিন্তু 'অর্থনীতিবিদ্যা'র মতো নয় — ঐ অভিধাটা আধুনিক ভাষায় চালু হয় নি। অভিধাটা আসে 'ক্রেমা' শব্দটা থেকে, শব্দটার মানে সম্পত্তি, তালুক। আরিস্টটলের দিক থেকে অর্থনীতিবিদ্যা হল স্বাভাবিক গৃহস্থালির ক্রিয়াকলাপ, যা জীবনধারণের জন্যে আবশ্যক জিনিসপত্র — উপযোগ মূল্য-বস্তু — পয়দা করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিনিময়ও পড়ে এর মধ্যে, কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাতে যা লাগে শুধু সেই পরিমাণে। এই ক্রিয়াকলাপের চৌহদ্দিও স্বাভাবিক: সেটা হল কারও নিজস্ব সংগত পরিভোগ।

'অর্থমৃগয়াবিদ্যা'টা তাহলে কী? সেটা হল 'ধন-দৌলত লাভ করার বিদ্যা', অর্থাৎ মুনাফা করার উদ্দেশ্যে, সম্পদ, বিশেষত অর্থ আকারে সম্পদ রাশীকৃত করার উদ্দেশ্যে চালান ক্রিয়াকলাপ। অর্থাৎ কিনা, ক্রেমাটিস্টিক্স হল পুঁজি লগ্নী করা এবং সঞ্চয়নের 'বিদ্যা'।

শিল্পক্ষেত্রের পুঁজি ছিল না প্রাচীনকালে, তবে বাণিজ্য পুঁজি এবং অর্থ (তেজারতি) পুঁজি একটা বড়রকমের ভূমিকায় এসে গিয়েছিল সেই তখনই। আরিস্টটলের বর্ণনায় সেটা এই: '...ধন-দৌলত লাভ করার বিদ্যাটা যে-পরিমাণে প্রকাশ পায় বাণিজ্য ক্রিয়াকলাপ হিসেবে তাতে লক্ষ্যটা হাসিল করার ব্যাপারে সেটায় কখনও কোন ইয়ত্তা নেই, কেননা অগাধ ঐশ্বর্য এবং অর্থপ্রাপ্তিই তাতে লক্ষ্যটা। ...অর্থ পরিচলনে ব্যাপৃত প্রত্যেকেই নিজ পুঁজি এত বাড়াতে সচেষ্ট থাকে যার কোন শেষ নেই।'*

আরিস্টটলের বিবেচনায় এই সবই **অস্বাভাবিক**, কিন্তু বিশুদ্ধ 'অর্থনীতিবিদ্যা' অসম্ভব বলে বুঝবার মতো বাস্তববাদী তিনি ছিলেন: দুর্দৈবক্রমে অর্থনীতিবিদ্যা পরিণত হয় ক্রেমাটিস্টিক্স-এ, তাতে ব্যত্যয় হয় না। এই মন্তব্যটা সঠিক: আমরা বলতে চাই — পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক

---

* আরিস্টটল, 'রাজনীতি', সেন্ট পিটার্সবুর্গ, ১৯১১, ২৫-২৬ পৃঃ (রুশ ভাষায়)।

অনিবার্যভাবেই এমন একটা অর্থনীতিতে পরিণত হয়, যাতে জিনিসপত্র পয়দা করা হয় পণ্য আকারে, বিনিময়ের জন্যে।

অর্থনীতিবিদ্যার স্বাভাবিকতা এবং ক্রেমাটিস্টিক্স-এর অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে আরিস্টটলের ধারণায় একটা অদ্ভুত রূপান্তর ঘটে গেছে। তেজারতি এবং অংশত ব্যবসা-বাণিজ্য সমৃদ্ধিশালী হবার 'অস্বাভাবিক' উপায় বলে তাতে ধিক্কার দেয়ায় মধ্যযুগের পণ্ডিতেরা আরিস্টটলকে অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রকমের সমৃদ্ধিসাধনই স্বাভাবিক, 'প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে' অনুমত বলে বোধ হতে থাকে। এরই ভিত্তিতে সতর এবং আঠার শতকে সামাজিক-আর্থনীতিক চিন্তনক্ষেত্রে দেখা দেয় homo oeconomicus-এর (অর্থনীতিগত মানুষ) প্রতিমা, যার কার্যকলাপের প্রেরণা হল ধনী হবার কামনা। অ্যাডাম স্মিথ বললেন, অর্থনীতিগত মানুষ নিজ মুনাফার জন্যে সচেষ্ট থেকে কাজ করছে সমাজকল্যাণের জন্যে, আর স্মিথ-এর জানা সম্ভাব্য জগৎগুলির মধ্যে সবার সেরাটার উদ্ভব ঘটল এইভাবে — বুর্জোয়া জগৎ। আরিস্টটলের কাছে homo oeconomicus কথাটা বোঝাত ঠিক উলটোটা: যা মোটেই ইয়ত্তাহীন নয় এমনসব ন্যায্য প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট লোক। যার রক্ত-মাংসের শরীর নেই, যে হল স্মিথের আমলের অর্থনীতি-সংক্রান্ত রচনাবলির নায়ক, সেই কল্পিত পুরুষটিকে আরিস্টটল হয়ত নাম দিতেন homo chrematisticus (অর্থশিকারী মানুষ)।

মহান হেলান্-কে ছেড়ে আমাদের এখন প্রায় দু'হাজার বছর পার হয়ে যেতে হচ্ছে ষোল শতকের শেষ এবং সতর শতকের গোড়ার দিককার পশ্চিম ইউরোপে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, অর্থনীতি চিন্তনক্ষেত্রে কোন চিহ্ন না রেখেই কেটে গিয়েছিল কুড়িটা শতাব্দী। আরিস্টটলের ভাব-ধারণাগুলির কোন-কোনটাকে আরও বিকশিত করেছিলেন হেলেনিক দার্শনিকেরা। যেটাকে আমরা বলি কৃষি অর্থনীতি সে-বিষয়ে বিস্তর বলেছিলেন রোমক লেখকেরা। মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর ছিল যে-ধর্মীয় আবরণ তাতে কখনও-কখনও লুকান থাকত কিছু-কিছু মৌলিক আর্থনীতিক ধ্যান-ধারণা। আরিস্টটল সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাষ্যে মধ্যযুগীয় পণ্ডিতেরা গড়ে তুলেছিলেন 'ন্যায্য দাম' সংক্রান্ত ধারণা। এই সবই পাওয়া যেতে পারে অর্থনীতি চিন্তন-সংক্রান্ত যেকোন ইতিহাসে। কিন্তু দাস-মালিকানার সমাজের ক্ষয়ের যুগ, সামন্ততন্ত্রের ক্রমবৃদ্ধি এবং আধিপত্যের

যুগ অর্থনীতিবিদ্যার বিকাশে উৎসাহ যোগায় নি। স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে অর্থশাস্ত্র দেখা দিয়েছিল শুধু পুঁজিতন্ত্র বিকাশের ম্যানুফ্যাকচারিং কালপর্যায়ে, যখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সবে গড়ে উঠছিল পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন এবং বুর্জোয়া সম্পর্কের কোন-কোন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

বিজ্ঞানটি পেল নিজ নাম

সামাজিক-আর্থনীতিক সাহিত্যে political economy [অর্থশাস্ত্র] অভিধাটা প্রথম চালু করেন আঁতোয়াঁ দ্য মঁৎক্রেতিয়েন, সেনিয়ার দ্য ভাস্তেভিলে। তিনি হলেন ৪র্থ হেনরি এবং ১৩শ লুইয়ের আমলের একজন ফরাসী অভিজাত, তেমন জাঁকাল ছিল না তাঁর আর্থিক সংস্থান। কোন দ্য'আর্তানাইনের সমতুল অ্যাডভেঞ্চারে ঠাসা ছিল তাঁর জীবন। কবি, দ্বন্দ্বযোদ্ধা, নির্বাসিত, রাজসভার কর্মচারী, বিদ্রোহী, রাজবন্দী এই মানুষটি তাঁর শত্রুদের পাতা একটা ফাঁদে পড়ে গিয়ে তরোয়ালের ঝনঝনা আর পিস্তলের অগ্ন্যুদ্গারের মধ্যে প্রাণ হারান। এতে কিন্তু তিনি ভাগ্যক্রমে পরিত্রাণ পেয়ে গেলেন, কেননা জীবন্ত ধরা পড়লে এই বিদ্রোহীকে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দিয়ে কলঙ্কিত করে বধ করা হত। তাঁর মৃতদেহটাকে পর্যন্ত লাঞ্ছিত করার রায় দেওয়া হয়েছিল: হাড়গুলো গুঁড়িয়ে ফেলা হয়েছিল লোহার ডাণ্ডা দিয়ে আর লাশটাকে পুড়িয়ে ছাই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল চারদিকে। রাজা এবং ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ফরাসী প্রটেস্ট্যান্ট (হিউগেনট)-দের অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা ছিলেন মঁৎক্রেতিয়েন। পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান ১৬২১ সালে, কিন্তু তাঁর 'Tracte de l'Oeconomie Politique' ('অর্থশাস্ত্র প্রসঙ্গে রচনা') প্রকাশিত হয় ১৬১৫ সালে রুয়েঁ-তে। তাঁর 'রচনা'টাকে ফেলে দেওয়া হয় বিস্মৃতির গর্ভে, আর কলঙ্কলেপন করা হয় মঁৎক্রেতিয়েন নামটিতে, সেটা আশ্চর্য নয়। দুঃখের কথা, তাঁর জীবনী সম্বন্ধে মালমশলার প্রধান আকর হল তাঁর অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের আংশিক কিংবা ডাহা কুৎসাজনক বিচার-সিদ্ধান্ত। প্রচণ্ড রাজনীতিক এবং ধর্মীয় দ্বন্দ্বের ছাপ রয়েছে এইসব বিচার-সিদ্ধান্তে। মঁৎক্রেতিয়েনকে বলা হয়েছে রাহাজান, জালিয়াত, হীন মুনাফালোভী, যিনি ধর্মান্তরিত হয়ে প্রটেস্ট্যান্ট হয়েছিলেন নাকি একজন ধনী হিউগেনট বিধবাকে বিয়ে করার জন্যে।

প্রায় তিন-শ' বছর কেটে যাবার পরে তাঁর নামটি সম্মানের স্থান পায় আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক চিন্তনের ইতিহাসে। তাঁর মর্মান্তিক পরিণতিটা আপতিক নয় সেটা আজ স্পষ্ট। হিউগেনট অভ্যুত্থানগুলি কিছু পরিমাণে ছিল সামন্ততান্ত্রিক-স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পদানত ফরাসী বুর্জোয়াদের শ্রেণীসংগ্রামের একটা আকার — অমন একটা হিউগেনট বিদ্রোহে তাঁর অংশগ্রহণটা হল জন্মসূত্রে সাধারণ (তাঁর বাবা ছিলেন ওষুধের দোকানি), দৈবাৎ অভিজাত, আর কর্মব্রত অনুসারে মানবতাবাদী এবং সংগ্রামী এই মানুষটির স্বাভাবিক পরিণতি।

তখনকার কালের পক্ষে উত্তম শিক্ষাই লাভ করে কুড়ি বছর বয়সে মঁৎক্রেতিয়েন লেখক হতে মনস্থ ক'রে উচ্চাঙ্গের বিষয়বস্তু নিয়ে ছন্দে-রচিত একখানা বিয়োগান্ত নাটক প্রকাশ করেন। তাঁর আরও কয়েকখানা নাটক এবং কাব্যরচনা প্রকাশিত হয় তারপর। তিনি 'Histoire de Normandie' ('নর্ম্যান্ডির ইতিহাস') সম্বন্ধেও লেখেন বলে জানা আছে। ১৬০৫ সালের মধ্যেই তিনি লেখক হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন — ঐ বছর একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নিহত হবার পরে তিনি বাধ্য হয়ে পালিয়ে যান ইংলণ্ডে।

ইংলণ্ডে চার-বছর তাঁর জীবনে এসেছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়: অপেক্ষাকৃত উন্নত অর্থনীতি এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত বুর্জোয়া সম্পর্কের একটি দেশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল। ব্যবসা-বাণিজ্য, কারিগরি এবং আর্থনীতিক কর্মনীতিতে সক্রিয় হয়ে জড়িয়ে পড়তে থাকলেন মঁৎক্রেতিয়েন। ইংরেজী জীবনযাত্রা-প্রণালী দেখে-দেখে তিনি সেটাকে ফ্রান্সে নিয়ে যেতে লেগেছিলেন মনে-মনে। ইংলণ্ডে দেশান্তরী বহু ফরাসী হিউগেনটের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ তাঁর নিয়তিক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় এসেছিল, তা হতে পারে। তাদের বেশির ভাগ ছিল কারিগর — অনেকে সুদক্ষ কারিগর। মঁৎক্রেতিয়েন লক্ষ্য করেন, তাদের শ্রম আর দক্ষতা ইংলণ্ডকে বিস্তর মুনাফা যোগায়, অথচ মস্ত লোকসান হয় ফ্রান্সের — যে-দেশটি তাদের দেশান্তরী হতে বাধ্য করে।

জাতীয় শিল্প-বাণিজ্য উন্নয়নের দৃঢ় সমর্থক হয়ে তৃতীয় বর্গের [বুর্জোয়াদের] স্বার্থের পতাকী হয়ে মঁৎক্রেতিয়েন ফ্রান্সে ফেরেন। নিজের নতুন ধ্যান-ধারণাগুলিকে চলিতকর্মে লাগাতে শুরু করেন। লোহার জিনিসের একটা কর্মশালা তিনি চালু করেন এবং প্যারিসে জিনিস বিক্রি শুরু করেন, সেখানে তাঁর একটা গুদাম ছিল। কিন্তু তাঁর 'Tracte' রচনা

করাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। নামটা জাঁকাল হলেও তিনি লিখেছিলেন একটা নিছক ব্যবহারিক নিবন্ধ, তাতে তিনি ফরাসী ম্যানুফ্যাকচারার এবং ব্যবসায়ীদের পূর্ণ পৃষ্ঠপোষণ করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সরকারের বিশ্বাস জন্মাবার চেষ্টা করেন। বৈদেশিক জিনিস আমদানির দরুন জাতীয় উৎপাদনের যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্যে তিনি ঐসব জিনিসের উপর চড়া হারে শুল্ক বসাবার প্রবক্তা ছিলেন। শ্রম সম্বন্ধে তিনি সপ্রশংস ছিলেন, আর যে-শ্রেণীটিকে তিনি দেশের ধন-সম্পদের প্রধান স্রষ্টা বলে গণ্য করতেন সেটার গুণকীর্তন করতেন, যা ছিল তাঁর কালের পক্ষে অসাধারণ: 'খাসা এবং চমৎকার কারিগরেরা হল যেকোন দেশের পক্ষে সবচেয়ে মূল্যবান এবং — আমি এমনটাও বলার সাহস রাখি — প্রয়োজনীয় এবং সম্মানাস্পদ।*

মঁৎক্রেতিয়েন ছিলেন **বণিকতন্ত্রের** একজন প্রধান প্রবক্তা — সেটা পরবর্তী পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু। দেশের অর্থনীতিটাকে তিনি দেখতেন প্রধানত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনের বিষয় হিসেবে। তাঁর বিবেচনায়, দেশের এবং রাষ্ট্রের (রাজার) সম্পদের উৎপত্তিস্থল হল প্রথমত এবং সর্বোপরি বহির্বাণিজ্য, বিশেষত কারখানাজাত এবং হস্তশিল্পজাত জিনিসপত্র রপ্তানি।

মঁৎক্রেতিয়েন তাঁর রচনাটিকে উৎসর্গ করেন নাবালক রাজা ১৩শ লুই এবং রাজস্থলাধিষ্ঠিতা মাতার নামে — সেটা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার একখানা তিনি পেশ করেছিলেন রাষ্ট্রীয় ন্যাসরক্ষকের (অর্থমন্ত্রীর) কাছে। দেখতে রাজভক্তিমূলক বইখানা রাজ-দরবারে গোড়ায় সমাদৃতই হয়েছিল সেটা স্পষ্ট। অর্থনীতি-সংক্রান্ত একজন মন্ত্রী গোছের একটাকিছু ভূমিকায় এসে যাচ্ছিলেন বইখানার লেখক; ১৬১৭ সালে তিনি শাতিলোঁ-অন-লোয়ার শহরের গভর্নর পদে নিযুক্ত হন। সম্ভবত এই সময়েই তাঁকে দেওয়া হয়েছিল পিয়ার খেতাব। মঁৎক্রেতিয়েন কখন্ প্রটেস্ট্যাণ্ট হন, হিউগেনট বিদ্রোহীদের কাতারে তিনি গিয়ে পড়েন কিভাবে, তা জানা নেই। হতে পারে রাজকীয় সরকার তাঁর পরিকল্পনা বলবৎ করবে বলে আশাটা তাঁর ছাড়তে হয়েছিল, আর ঐ সরকার তার বদলে নতুন ধর্মযুদ্ধ উসকে দিচ্ছিল বলে তিনি ত্যক্তবিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি হয়ত স্থির

---

* P. Dessaix in 'Montchrétien et l'économie politique nationale', Paris, 1901, p. 21. থেকে উদ্ধৃত।

করেছিলেন যে, তাঁর তুলে-ধরা মূলনীতিগুলি অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে প্রটেস্ট্যান্টতন্ত্রেরই অনুযায়ী, তাই স্থিরবুদ্ধি এবং নির্ভীক মানুষটি অস্ত্রধারণ করলেন ঐ তন্ত্রের সপক্ষে।

তবে 'অর্থশাস্ত্র প্রসঙ্গে রচনা'-র কথায় ফিরে আসা যাক। মঁৎক্রেতিয়েন তাঁর বইয়ের এই নাম দিলেন কেন? এতে ছিল কি কোন বিশেষ মূল্য? মনে হয় তা নয়। নতুন বিজ্ঞানটির নামকরণের কথা নিশ্চয়ই তাঁর মনে আসে নি। বলা যেতে পারে এটা এবং অনুরূপ অন্যান্য শব্দবিন্যাসের চল হয়েছিল তখন — রেনেসাঁসের হাওয়ায়, যখন প্রাচীনকালের সংস্কৃতির বহু ভাব আর ধারণাকে জিইয়ে তুলে পুনর্ব্যাখ্যাত করে সেগুলিকে দেওয়া হয়েছিল নবজীবন। নিজ কালের যেকোন সুশিক্ষিত মানুষের মতো মঁৎক্রেতিয়েন গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষা জানতেন, প্রাচীনকালের সাহিত্য পড়েছিলেন। 'রচনা'-য় তিনি সেগুলির উল্লেখ করেছেন প্রায়ই কালধর্ম অনুসারে। Economy (অর্থনীতি) এবং economics (অর্থনীতিবিদ্যা) শব্দ-দুটো কোন্ অর্থে প্রয়োগ করেছিলেন জেনেফেন্ এবং আরিস্টটল সে-সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। শব্দ-দুটোকে সংসারযাত্রা নির্বাহ, গৃহস্থালি আর নিজস্ব সম্পত্তির ব্যবস্থাপন অর্থেই প্রয়োগ করে চলেছিলেন সতর শতকের লেখকেরা। মঁৎক্রেতিয়েনের অল্প কিছুকাল পরে একজন ইংরেজ 'Observations and Advices Oeconomical' ('অর্থনীতি বিষয়ে মন্তব্য এবং পরামর্শ') নামে একখানা বই প্রকাশ করেছিলেন। এই লেখক অর্থনীতির সংজ্ঞার্থ দিয়েছিলেন 'কোন লোকের সংসারযাত্রা এবং বিষয়-সম্পত্তি সুপরিচালিত করার বিদ্যা', তাতে তাঁর বিবেচ্য বিষয়গুলির মধ্যে ছিল, দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপযুক্ত পত্নী নির্বাচনের ব্যাপার। তাঁর 'আর্থনীতিক' পরামর্শ অনুসারে কোন পুরুষের পত্নী হিসেবে এমন মহিলাকে বেছে নেওয়া চাই যে 'রাত্রে যেমন প্রীতিকর হবে তার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় হবে না দিনে'।

মঁৎক্রেতিয়েন যাতে আগ্রহান্বিত ছিলেন এটা ঠিক সেই একই অর্থনীতি নয় সেটা স্পষ্টই। **রাষ্ট্রীয়, জাতীয় সংস্থা** হিসেবে অর্থনীতির বাড়বাড়ন্তের উদ্দেশেই চালিত হয়েছিল তাঁর সমস্ত চিন্তন। **রাজনীতিক** এই বিশেষকটাকে তিনি প্রয়োগ করেন **অর্থনীতি** শব্দটার সঙ্গে, এটা আশ্চর্য নয়।

মঁৎক্রেতিয়েনের পরে ১৫০ বছর ধরে অর্থশাস্ত্র গণ্য হয় মুখ্যত **রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির** — সাধারণত নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসম্পন্ন রাজাদের শাসিত জাতীয় রাষ্ট্রের অর্থনীতির — বিজ্ঞান হিসেবে। শুধু অ্যাডাম স্মিথের বিচারে এবং বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায় গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এর প্রকৃতিটা বদলে গিয়ে এটা হয়ে দাঁড়ায় সাধারণভাবে অর্থনীতির নিয়মাবলি এবং বিশেষত শ্রেণীতে-শ্রেণীতে আর্থনীতিক সম্পর্ক-সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

মঁৎক্রেতিয়েন তাঁর বইখানায় এমন উপযোগী নামপত্র দিলেন, এটা অবশ্য নয় তাঁর মস্ত অবদানটা। এটা হল ফ্রান্সে এবং সমগ্র ইউরোপে বিশেষভাবে আর্থনীতিক সমস্যাবলি নিয়ে লেখা প্রথম-প্রথম বইগুলির একখানা। সমাজবিদ্যার অন্যান্য শাখা থেকে পৃথক একটা পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ক্ষেত্র আলাদা করে ধরে সেটার চৌহদ্দি নির্দেশ করল এই রচনাটি।

অর্থশাস্ত্র [Political Economy]
এবং অর্থনীতিবিদ্যা

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে **অর্থশাস্ত্র** অভিধাটা পশ্চিমে অপ্রচলিত হয়ে গেছে, সেটার জায়গায় চালু হচ্ছে **অর্থনীতিবিদ্যা** (economics) শব্দটা। এখন এটা ব্যবহৃত হয় দুই অর্থে: সমাজে উৎপাদন-সম্পর্কের সাকল্য — অর্থনীতি অর্থে, আর আর্থনীতিক নিয়মাবলি-সংক্রান্ত বিজ্ঞান অর্থে।

তবে **অর্থনীতিবিদ্যা** এবং **অর্থশাস্ত্র** অভিধা-দুটাকে অভিন্ন বলে ধরা চলে না। জ্ঞানের একটা শাখা অর্থে **অর্থনীতিবিদ্যা** অভিধাটাকে আজকাল অপেক্ষাকৃত বেশি করে বোঝা হয় **আর্থনীতিক বিজ্ঞানতন্ত্র** বলে। এইসব বিজ্ঞানের মধ্যে এখন পড়ে অর্থশাস্ত্র ছাড়াও বিভিন্ন আর্থনীতিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানের বিবিধ শাখা। উৎপাদন ব্যবস্থাপন, শ্রম, উৎপাদ বিক্রি, শিল্পে অর্থসংস্থান সবই আর্থনীতিক বিজ্ঞানতন্ত্রের বিষয়। পুঁজিতান্ত্রিক আর সমাজতান্ত্রিক উভয় ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। জানাই আছে, পুঁজিতান্ত্রিক পরিকল্পন করা হয় বড়-বড় পুঁজিতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কাঠামের ভিতরে, আর সেটার বিভিন্ন প্রণালী আর ধরনধারনও আর্থনীতিক বিজ্ঞানের বিষয়। অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া নিয়মন ছাড়া আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের কথা কল্পনা করা যায় না, এই নিয়মনের জন্যেও চাই সমগ্র অর্থনীতি এবং সেটার পৃথক-পৃথক শাখাগুলি সম্বন্ধে বিষয়গত জ্ঞানের ভিত্তি। এইভাবে, বেড়ে চলছে আর্থনীতিক বিজ্ঞানতন্ত্রের কৃত্যগুলো।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এখন অর্থনীতিবিদের বৃত্তির মধ্যে পড়ে খুবই বিবিধ নানা কৃত্য — খুবই মূর্ত-নির্দিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা পরিকল্পন কাজ থেকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অর্থশাস্ত্র শিক্ষণ এবং প্রচারের নিছক ভাবাদর্শগত ক্রিয়াকলাপ।

উৎপাদন-সম্পর্ক সংক্রান্ত ধারণাটার জটিলতা থেকে এই সবকিছুর অর্থ বোঝা যায় ঐ সম্পর্কের কোন-কোন আকারের প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত সাধারণ এবং সামাজিক। এগুলি হল অর্থশাস্ত্রের যথার্থ বিষয়। উৎপাদন-সম্পর্কের অপেক্ষাকৃত মূর্ত-নির্দিষ্ট অন্যান্য আকারগুলি প্রযুক্তির সঙ্গে, উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। কোন-কোন আর্থনীতিক-প্রযুক্তিগত প্রশ্ন উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শুধু পরোক্ষে। মূর্ত-নির্দিষ্ট আর্থনীতিক বিজ্ঞানগুলির গুরুত্ব বাড়তে থাকবে সেটা অবধারিত। আর্থনীতিক গবেষণায় এবং অর্থনীতির ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনে গণিত এবং কম্পিউটার প্রযুক্তি প্রয়োগের সঙ্গে সেগুলির উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট।

দর্শন একসময়ে ছিল সমস্ত বিজ্ঞানের বিজ্ঞান, জ্ঞানের কার্যত সমস্ত শাখাই জুড়ে দর্শন, সেটা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে 'বহুর মধ্যে একটা', ঠিক তেমনি আগে সমস্ত আর্থনীতিক ব্যাপার জুড়ে ছিল যে-অর্থশাস্ত্র সেটা এখন আর্থনীতিক বিজ্ঞানতন্ত্র পরিবারের কর্তা মাত্র। এটা খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে রয়েছে আরও কিছু। স্মিথ এবং রিকার্ডোর হাত থেকে যেমনটা দেখা দিয়েছিল তাতে অর্থশাস্ত্র মূলত ছিল বুর্জোয়া সমাজে মানুষে-মানুষে শ্রেণীগত সম্পর্ক-সংক্রান্ত বিজ্ঞান। সেটার কেন্দ্রী সমস্যা ছিল উৎপাদের (বা আয়ের) বণ্টন — একটা সামাজিক, তায় খুবই তীব্র সমস্যা। রিকার্ডোর অর্থশাস্ত্রের তীব্র সামাজিক প্রকৃতিটাকে মোলায়েম করার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর বহু অনুগামী। কিন্তু বুর্জোয়াদের পক্ষে সেটা যথেষ্ট হয় নি: কেননা তার সঙ্গে সঙ্গেই রিকার্ডোর তত্ত্বগুলির ভিত্তিতে দেখা দিল মার্কসের অর্থশাস্ত্র, এতে সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্ককে এই বিজ্ঞানের বিষয় বলে স্পষ্ট ঘোষণা করা হল, আর এতে সিদ্ধান্ত করা হল যে, পুঁজিতন্ত্রের পতনই স্বাভাবিক পরিণতি।

কাজেই গত শতকের অষ্টম দশকে এমন কোন-কোন নতুন আর্থনীতিক ধ্যান-ধারণা দেখা দিয়ে একই সময়ে কতকগুলি দেশে বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ায়

যেগুলি শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করে অর্থশাস্ত্র থেকে সামাজিক মর্মবস্তুটাকে কেড়ে নিতে চায়। এই বিজ্ঞানটিকে ঘোরান হতে থাকে সামাজিক এবং ঐতিহাসিক মর্মবস্তুবর্জিত কোন-কোন সাধারণ নীতিকে কেন্দ্র করে: ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের বিষয়ীগত উপযোগ হ্রাসের নীতি এবং আর্থনীতিক স্থিতি-সংক্রান্ত নীতি। প্রকৃতপক্ষে, এই অর্থশাস্ত্রের বিষয়টা ততটা নয় উৎপাদনের ব্যাপারে মানুষে-মানুষে সামাজিক সম্পর্ক যতটা কিনা জিনিসের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক।

আর্থনীতিক বিজ্ঞানের প্রধান সমস্যাটা হয়ে দাঁড়াল সামাজিক মর্মবস্তুবর্জিত 'প্রযুক্তিগত' সমস্যা — সংশ্লিষ্ট পণ্য কাজে লাগাবার বিভিন্ন বিকল্প সম্ভাবনার মধ্য থেকে বেছে নেবার সমস্যা, বা — যেমনটা বলার চল হল — আলোচ্য উৎপাদন-উপাদান সংক্রান্ত সমস্যা: শ্রম, পুঁজি বা ভূমি। সীমাবদ্ধ সংগতি-সংস্থানের সর্বোপযোগী ব্যবহার-সংক্রান্ত সমস্যাটা নিঃসন্দেহে যেকোন সমাজেরই পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, আর সেটা পড়ে আর্থনীতিক বিজ্ঞানতন্ত্রের মধ্যে। কিন্তু এটা অর্থশাস্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য বলে গণ্য হতে পারে না।

ঘোষিত হল অর্থশাস্ত্রের 'সামাজিক নিরপেক্ষতা'। বিভিন্ন শ্রেণী, শোষণ আর শ্রেণী-সংগ্রাম নিয়ে বিজ্ঞানের মাথা ঘামানোর দরকারটা কী? কিন্তু এতে প্রচ্ছন্ন রইল পুঁজিতন্ত্রকে ভাবাদর্শগত সমর্থন দেবার একটা নতুন কায়দা। ইংলণ্ডে জেভন্স, অস্ট্রিয়ায় মেঙ্গের আর ভাইসের, সুইজারল্যাণ্ডে ওয়াল্‌রাস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন বেট্‌স ক্লার্ক — এইসব অর্থনীতিবিদের হাতে পড়ে 'পুরন' অর্থশাস্ত্র এমনই রূপান্তরিত হয়ে যায় যাতে সেটাকে আর চেনাই যায় না। তখন সেটা একপ্রস্ত বিমূর্ত-যৌক্তিক এবং গাণিতিক পরিকল্প; আর্থনীতিক ব্যাপারগুলোকে বিষয়ীগত মানসতা অনুসারে ধরাই সেগুলোর ভিত্তি। স্বভাবতই অচিরে নতুন নামের দরকার হয়ে পড়েছিল এই বিজ্ঞানটার। আক্ষরিক অর্থে এবং ঐতিহ্যক্রমে একটা সামাজিক মর্মবস্তু আছে political economy ['রাজনীতিক অর্থনীতি', যেটাকে বলা হয় 'অর্থশাস্ত্র'। — অনুঃ] এই অভিধায় — সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা বালাই, তারা এতে বিব্রত বোধ করত।

আর্থনীতিক চিন্তন বিষয়ে মার্কিন ইতিহাসকার বেন্ বি. সেলিগ্‌ম্যান লিখেছেন, জেভন্স 'রাজনীতিক অর্থনীতি থেকে 'রাজনীতিক' শব্দটাকে সাফল্যের সঙ্গে বাদ দিয়ে অর্থনীতিবিদ্যাকে সমগ্রভাবে সমাজের আচরণের

চেয়ে বরং পৃথক-পৃথক ব্যক্তির আচরণ নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণে পরিণত করেন'।*

আর-একজন সুবিদিত বুর্জোয়া পন্ডিত ফরাসী অর্থনীতিবিদ এমিল জাম্‌স-এর রচনা থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটা দিলে আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে এই বিজ্ঞানে ঘটিত 'বিপ্লবে'র প্রকৃতিটা: 'এইসব মস্ত তত্ত্ববিদ সর্বোপরি ভেবেছিলেন যেকোন আর্থনীতিক ব্যবস্থায় যেগুলো চালু হতে পারে এমনসব কর্ম-বন্দোবস্তের বর্ণনা দেওয়াই আর্থনীতিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, তাঁরা প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদির উপর রায় জারি করার চেষ্টা করেন নি। সামাজিক সংগঠন-সংক্রান্ত প্রশ্নাবলি বিষয়ে তাঁদের মূল তত্ত্বগুলি ছিল নিরপেক্ষ, অর্থাৎ কিনা, সেগুলো থেকে কেউ বিদ্যমান ব্যবস্থার প্রশংসা কিংবা নিন্দা করা হল বলে ধরতে পারবেন না।'** নব্য অস্ট্রীয় অর্থনীতিবিদেরা 'পার্যন্তিক উপযোগ দিয়ে মূল্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছিলেন সর্বোপরি মার্কসীয় শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বের উপর'।***

পরবর্তী শতাব্দীতে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা এইসব নীতির ভিত্তিতে গড়ে তোলেন আর্থনীতিক বিশ্লেষণের বিভিন্ন কায়দা। দেখা দিল পেল্লায় সাহিত্য, তাতে জ্ঞানত কিংবা অজানতে আর্থনীতিক বিজ্ঞানের সামাজিক ধারটাকে ভোঁতা করে দেওয়া হল 'নতুন' প্রণালীগুলোর সাহায্যে। আদি কর্ম এবং মর্মবস্তু ভুলে যেতে থাকল এই বিজ্ঞান, যদিও সেটা বিচার-বিশ্লেষণ করতে থাকল বহু চিত্তাকর্ষক সমস্যা নিয়ে। এইভাবে, political economy এবং economics এই অভিধা-দুটো সংক্রান্ত প্রশ্নটা পরিভাষা নিয়ে কচকচানি নয়, এটা বুনিয়াদী মূলনীতি-সংক্রান্ত মতভেদের ব্যাপার।

---

* Ben B. Seligman, 'Main Currents in Modern Economics', New York, 1963, p. 499.

** Emile James, 'Histoire de la pensée économique au XX-e siècle', Paris, 1955, pp. 10-11.

*** ঐ।

ভক্তিবস্তু সোনা এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: বণিকতন্ত্রীরা

ভারতীয় মশলার জন্যে ইউরোপীয়দের খোঁজাখুঁজির ফলে আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়, আর আমেরিকা জয় করে সেখানে অনুসন্ধান চালান হয় ইউরোপীয়দের তৃপ্তিহীন স্বর্ণ-রৌপ্যতৃষ্ণার কারণে। বাণিজ্যিক মূলধন বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল মস্ত-মস্ত ভৌগোলিক আবিষ্কার, আর এগুলি আবার ঐ মূলধনের ভবিষ্য প্রসারে প্রচুর আনুকূল্য করে। বাণিজ্যিক মূলধন হল পুঁজির ইতিহাসক্রমিক আদি আকার, শিল্পক্ষেত্রের পুঁজি গড়ে উঠেছিল ঐ আকারের পুঁজি থেকে।

পনর থেকে সতর শতকে (অনেকটা আঠার শতকেও) আর্থনীতিক কর্মনীতিতে এবং আর্থনীতিক চিন্তনে প্রধান ধারাটা ছিল **বণিকতন্ত্র**। এটাকে চুম্বকে প্রকাশ করা যেতে পারে এইভাবে: আর্থনীতিক কর্মনীতিতে — সংশ্লিষ্ট দেশে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণে বহুমূল্য ধাতুগুলো জমানো; তত্ত্বক্ষেত্রে — পরিচলনক্ষেত্রে (বাণিজ্য এবং অর্থ-লেনদেন) আর্থনীতিক নিয়মাবলির সন্ধান।

'জীবনও বিপন্ন করো ধাতুর জন্যে,' যা বলেছেন গ্যেটে। সোনা ভক্তিবস্তু হল পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমগ্র বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, আর সোনা হল বুর্জোয়াদের জীবনযাত্রা-প্রণালী এবং চিন্তনের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তবে বাণিজ্যিক পুঁজির প্রাধান্যের যুগে এই দেবতার দ্যুতি ছিল বিশেষত ভাস্বর। বেশি দামে বিক্রির জন্যে কেনাই ছিল বাণিজ্যিক মূলধনের মূলনীতি। লাভটাকে দেখা হয় হলদে ধাতুটার আকারে। এই লাভটা দেখা দেয় শুধু উৎপাদন থেকে, শ্রম থেকে, সে-কথাটা তখনও কারও মনে হয় নি। বিদেশে যা কেনা হবে তার চেয়ে বেশি সেখানে বেচাই ছিল বণিকতন্ত্রের

রাষ্ট্রীয় বিচক্ষণতার পরাকাষ্ঠা। আবার, রাষ্ট্রের পরিচালক এবং যারা তাদের হয়ে লিখত আর ভাবত তারা লাভটাকে দেখত বিদেশ থেকে দেশে ঢেলে-পড়া সোনার (আর রুপোর) আকারে। তারা বলত, দেশে গাদা-গাদা অর্থ থাকলেই সবকিছু ঠিকঠাক।

আদি সঞ্চয়ন

আদি সঞ্চয়নের যুগ হল বুর্জোয়া উৎপাদন-প্রণালীর প্রাক্-ইতিহাস, ঠিক যেমন বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের প্রাক্-ইতিহাস হল বণিকতন্ত্র। **আদি সঞ্চয়ন** — ঠিক এই অভিধাটা রচনা করেছিলেন মনে হয় অ্যাডাম স্মিথ: তিনি লিখেছেন, উৎপাদনের বহু পরস্পর-সংশ্লিষ্ট শাখা বিকাশের মধ্য দিয়ে শ্রমের উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধির পূর্বশর্ত হল আদি সঞ্চয়ন।

আদি সঞ্চয়নের গোটা প্রক্রিয়াটার ফল হল পুঁজিপতি আর মজুরি-শ্রমিকদের শ্রেণী-দুটোতে সমাজের বিভাগ — সেটাকে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা চিত্রিত করেন একটা আর্থনীতিক 'রামরাজ্যে'র ধাঁচে: অনেক কাল আগে একদিকে ছিল অধ্যবসায়ী এবং, বিশেষত, সঞ্চয়ী, বিচক্ষণ বাছা-বাছা মানুষ, আর অন্য দিকে ছিল কুঁড়ে উড়নচণ্ডেরা, যারা খরচ করে ফেলত যথাসর্বস্ব এবং তার বেশিও... এইভাবে যা দাঁড়াল তাতে পূর্বোক্ত লোকেরা জমাল ধন-দৌলত, আর অবশেষে শেষোক্তদের যা দশা হল তাতে তাদের বেচার মতো রইল না নিজেদের গায়ের চামড়া আরকিছুই! নীতিপরায়ণতা আর ন্যায়বিচার বিরাজমান এই 'রামরাজ্যে': শ্রমের জন্যে পুরস্কার, আর কুঁড়েমি এবং অপব্যয়ের জন্যে শাস্তি।

এর চেয়ে অসত্য হতে পারে না আরকিছুই। পুঁজির আদি সঞ্চয়ন একটা বাস্তব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াই বটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ঘটেছিল হিংস্র শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে, এতে জড়িত ছিল উৎপীড়ন, বলপ্রয়োগ এবং প্রতারণা।

অসদভিপ্রায়, মানুষের 'আদ্য' হিংসাপ্রবণতা, ইত্যাদির পরিণতি নয় এটা। একটা সামাজিক বিন্যাস থেকে অন্যটায় — পুঁজিতান্ত্রিক বিন্যাসে — উত্তরণের বিষয়গত ঐতিহাসিক নিয়ম সবে সক্রিয় হচ্ছিল আদি সঞ্চয়নের সময়ে। কাজেই এই প্রক্রিয়াটা ছিল মূলত প্রগতিশীল, কেননা এটা সমাজের আর্থনীতিক ইতিহাস বিকাশে আনুকূল্য করেছিল। আদি সঞ্চয়নের যুগটা ছিল অপেক্ষাকৃত দ্রুত উৎপাদনবৃদ্ধির যুগ, শিল্প-নগর আর বাণিজ্য-নগর

গড়ে ওঠার যুগ, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যা উন্নয়নের যুগ। এটা ছিল রেনেসাঁসের যুগ, যখন সংস্কৃতি আর শিল্পকলার স্ফুরণ ঘটেছিল হাজার বছরের বদ্ধতার পরে।

তবে এই যুগে বিজ্ঞান আর সংস্কৃতির বিকাশ দ্রুত হতে পেরেছিল সাবেকী সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কতন্ত্র ভেঙে পড়ছিল এবং সেটার জায়গায় নতুন, বুর্জোয়া সম্পর্ক এসে যাচ্ছিল বলে। যখন লক্ষ-লক্ষ খুদে খামারী উচ্ছন্ন যাচ্ছিল, শহুরে এবং গ্রামীণ প্রলেতারিয়ানে পরিণত হচ্ছিল আধা-ভূমিদাস এবং আধা-স্বাধীন ভূমি-মালিকেরা তখন কোন 'রামরাজ্যে'র কথাই উঠতে পারে না। তখন গড়ে উঠছিল পুঁজিপতি-শোষকদের শ্রেণীটা, অর্থ যাদের দেবতা; এমন অবস্থায়ও উঠতে পারে না কোন 'রামরাজ্যে'র কথা।

ষোল শতকে পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটা দেশে — ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে এবং স্পেনে — দেখা দিয়েছিল বিভিন্ন কেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্র, সেগুলিতে ছিল শক্তিশালী রাজতন্ত্র। কয়েক শতাব্দী ধরে সংগ্রাম চালিয়ে রাজতন্ত্রগুলি স্বেচ্ছাচারী ব্যারনদের দমন ক'রে পদানত করেছিল। সামন্ততান্ত্রিক সশস্ত্র লোক-লশকরদের খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল; 'বেকার' হয়ে পড়েছিল সামন্ত-শাসকদের যোদ্ধারা এবং পোষ্য-অনুচরেরা। এরা খেতমজুর হতে না চাইলে ফৌজে এবং নৌবাহিনীতে ভরতি হয়ে বিভিন্ন উপনিবেশে যেত আমেরিকায় কিংবা ঈস্ট-ইণ্ডিয়ায় মোটা টাকা করার আশায়। খেতমজুর হয়ে তারা খামারী এবং জোতদার-জমিদারদের ধনী করত, আর সাধারণভাবে বণিক, বাগিচা-মালিক এবং জাহাজ-মালিকদের সমৃদ্ধি ঘটাত বিদেশে গেলে। এদের মধ্যে অল্প কিছু-কিছু লোক 'সিঁড়ি বেয়ে উঠে' বড়লোক হয়েছিল, নিজেরাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল বণিক কিংবা বাগিচা-মালিক। কেউ-কেউ বিপুল-ঐশ্বর্যশালী হয়েছিল জলদস্যুতা করে এবং স্রেফ ডাকাতি করে।

শহরগুলি, কুটিরশিল্পের এবং ব্যাপারী বুর্জোয়ারা ছিল ব্যারনদের বিরুদ্ধে রাজাদের সংগ্রামে মিত্র এবং অদতদার। এই সংগ্রামে রাজতন্ত্রকে অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র, কখনও-কখনও লোকজন যোগাত শহরগুলি। আর্থনীতিক জীবনের কেন্দ্রটা উঠে গেল শহরে — এরই ফলে খর্ব হল সামন্ত-শাসকদের ক্ষমতা আর প্রভাব-প্রতিপত্তি। আবার বুর্জোয়ারা দাবি করল রাষ্ট্রকে তাদের স্বার্থ সমর্থন করতে হবে সামন্ত-শাসক, 'ইতর জন' এবং বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে। এই সমর্থন রাষ্ট্র দিল। বাণিজ্য কম্পানি আর হস্তশিল্পের

যৌথসংস্থাগুলো বিভিন্ন বিশেষ সুযোগ এবং একচেটে সুবিধা পেল রাজাদের কাছ থেকে। বিভিন্ন আইন জারি করে গরিব মানুষকে মালিকদর জন্যে কাজ করতে বাধ্য করা হল, নারাজ হলে কঠোর শাস্তি, আর মজুরির সর্বোচ্চ হার বেঁধে দেওয়া হল। বণিকতন্ত্রের আর্থনীতিক কর্মনীতি চালান হল শহুরে বুর্জোয়াদের, বিশেষত ব্যাপারী বুর্জোয়াদের স্বার্থ অনুসারে। বহু ক্ষেত্রে বণিকতন্ত্রী কারবারগুলো ছিল অভিজাতদেরও স্বার্থের পক্ষে উপযোগী, কেননা এদের আয় কোন-না-কোনভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল বাণিজ্য আর ব্যবসায়ের কাজ-কারবারের সঙ্গে।

যেকোন ব্যবসায়ের ভিত্তি, আরম্ভস্থল হল অর্থ, সেটার মালিক সেটাকে যখন খাটায় মজুরি দিয়ে শ্রমিক নিয়োগের জন্যে এবং কিছু তৈরি করা কিংবা ফের বেচার পণ্য কেনার জন্যে তখন সেটা হয়ে দাঁড়ায় অর্থ-পুঁজি। বণিকতন্ত্রের মূলে এই ব্যাপারটা; অর্থ — বিভিন্ন বহুমূল্য ধাতু— এনে দেশের মধ্যে ফেলাই তার সারমর্ম এবং লক্ষ্য।

গোড়ার দিককার বণিকতন্ত্রের যুগে ছিল এইসব আদিম ধরনের ব্যবস্থা। বিদেশী বণিকরা কোন দেশে তাদের মাল বিক্রি করে যা লাভ করত সেই সবটাই সেখানেই সরাসরি খরচ করতে বাধ্য করা হত, আর সেটা তারা যাতে করে তার ব্যবস্থা করার জন্যে এমনকি বিশেষ-বিশেষ 'পরিদর্শক' নিয়োগ করা হত, তারা কখনও-কখনও থাকত ছদ্মবেশে। সোনা আর রুপো রপ্তানি স্রেফ নিষিদ্ধ ছিল।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি সেটা বদলে অপেক্ষাকৃত নমনীয় এবং গঠনমূলক কর্মনীতি ধরেছিল পরে — সতর এবং আঠার শতকে। শাসকেরা এবং তাদের উপদেষ্টারা বুঝতে পেরেছিল রপ্তানী মাল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা এবং রপ্তানি যাতে আমদানির চেয়ে বেশি হয় সেটা নিশ্চিত করাই দেশে অর্থ টেনে আনার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায়। কাজেই রাষ্ট্র শিল্পোৎপাদনে আনুকূল্য করতে, কর্মশালার পৃষ্ঠপোষকতা করতে এবং কর্মশালা বসাতে আরম্ভ করেছিল।

বণিকতন্ত্রী কর্মনীতির এই দুটো পর্ব সেটার অর্থনীতি-তত্ত্ব বিকাশের দুটো পর্বের অনুযায়ী। গোড়ার দিককার বণিকতন্ত্রকে **অর্থ ব্যবস্থা**ও বলা হয়, — দেশের মধ্যে অর্থ ধরে রাখার প্রশাসনিক ব্যবস্থাবলি স্থির করার বাইরে সেটা যায় নি। উন্নত বণিকতন্ত্রে জাতির সমৃদ্ধির উৎপত্তিস্থল নয় ধন-দৌলতের আদি সঞ্চয়ন, সেটা হল বহির্বাণিজ্যের প্রসার এবং অনুকূল

বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (আমদানির চেয়ে রপ্তানির আধিক্য)। এতে ছিল না পূর্বসূরিদের 'প্রশাসনিক উদ্দীপনা'। উন্নত বণিকতন্ত্রের প্রবক্তাদের মতে যা ছিল **স্বাভাবিক নিয়মের** নীতি অনুযায়ী শুধু সেই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপই তারা অনুমোদন করত। স্বাভাবিক নিয়মের দর্শনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়েছিল সতর এবং আঠার শতকে অর্থশাস্ত্র বিকাশের উপর। এই বিজ্ঞানটাই কিছু পরিমাণে গড়ে উঠেছিল স্বাভাবিক নিয়মের ধ্যান-ধারণার কাঠামের ভিতরে। আরিস্টটল এবং অন্যান্য প্রাচীনকালের চিন্তাবীরদের থেকে এইসব ধ্যান-ধারণার উৎপত্তি; সেগুলিতে নতুন মর্মবস্তু সঞ্চারিত হয় এই নবযুগে। স্বাভাবিক নিয়মের দার্শনিকেরা তাঁদের তত্ত্ব উৎপাদন করেছিলেন বিমূর্ত 'মানব-প্রকৃতি' এবং মানুষের 'স্বাভাবিক' অধিকার থেকে। এইসব অধিকার অনেকাংশে মধ্যযুগের অভিজাত এবং ধর্মীয় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বলে স্বাভাবিক নিয়ম দর্শনে ছিল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রগতিশীল উপাদান। রেনেসাঁস যুগের মানবতাবাদীরা অবলম্বন করেছিলেন স্বাভাবিক নিয়মের দৃষ্টিকোণ।

দার্শনিকেরা এবং তাঁদের পিছু-পিছু বণিকতন্ত্রী তত্ত্ববিদেরা মনে করতেন রাষ্ট্র সংগঠনটা মানুষের স্বাভাবিক অধিকারগুলি নিশ্চিত করতে সক্ষম; এইসব অধিকারের মধ্যে পড়ে নিজস্ব সম্পত্তি এবং নিরাপত্তা। বুর্জোয়াদের সম্পদবৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ রাষ্ট্র সৃষ্টি করুক, এটাই ছিল এইসব তত্ত্বের সামাজিক তাৎপর্য।

বিভিন্ন আর্থনীতিক তত্ত্ব এবং স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যকার সংযোগটা পরে সরে যায় বণিকতন্ত্র থেকে ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে। এই সংযোগের ধরনটা কিন্তু বদলে যায়, কেননা ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায় (ফ্রান্সে ফিজিওক্র্যাটরা বা প্রকৃতিতন্ত্রীরা এবং ইংলণ্ডে অ্যাডাম স্মিথের অনুগামীরা) গড়ে ওঠার আমলে বুর্জোয়াদের জন্যে রাষ্ট্রীয় অভিভাকত্বের প্রয়োজন তত ছিল না, তারা অর্থনীতিক্ষেত্রে বেশি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করত।

টমাস মান — একজন সাধারণ বণিকতন্ত্রী

ইংরেজরা লণ্ডনকে বলত 'the Great Wen', তার মানে মস্ত স্ফীতি কিংবা ঢিবি [পেল্লায় ঘিঞ্জি শহর — অনুঃ]। কয়েক শতাব্দী যাবৎ পৃথিবীর বৃহত্তম শহর লণ্ডন একটা পেল্লায় আঁবের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে টেমস

নদীর উপরে, তার থেকে বেরিয়েছে হাজার-হাজার দৃষ্টিগোচর এবং অদৃশ্য সূত্র।

অর্থশাস্ত্রের ইতিহাসে লণ্ডন শহরটির বিশেষত্ব আছে। বাণিজ্য আর ফিন্যান্সের দিক থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্বরূপ এই শহরটি ছিল এই বিজ্ঞানের জন্ম এবং বিকাশের পক্ষে সর্বোপযোগী। পেটির বিভিন্ন পুস্তিকা ছাপা হয়েছিল লণ্ডনে; লণ্ডনের সঙ্গে তাঁর জীবনের সংস্রব খুবই ঘনিষ্ঠ — ঠিক যেমনটা আয়ার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে। এক শতাব্দী পরে সেখানে প্রকাশিত হয় অ্যাডাম স্মিথের 'জাতিসমূহের সম্পদ'। লণ্ডনের, লণ্ডনের উত্তেজনাপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বৈজ্ঞানিক আর রাজনীতিক জীবনের সাচ্চা সন্তান ডেভিড রিকার্ডো। আর কার্ল মার্কসের জীবনের অর্ধেকের বেশিটা কেটেছিল লণ্ডনে, — তিনি 'পুঁজি' লিখেছিলেন লণ্ডনে।

বৃটিশ বণিকতন্ত্রের একজন নমুনাসই প্রবক্তা হলেন টমাস মান (১৫৭১-১৬৪১)। হস্তশিল্পী আর ব্যাপারীদের একটা প্রাচীন পরিবারের মানুষ তিনি। তাঁর ঠাকুরদা ছিলেন লণ্ডনের টাঁকশালে একজন খোদাইকার, আর বাবা ছিলেন দামী কাপড়ের ব্যবসায়ী। ফ্রান্সের সমসাময়িক মঁৎক্রেতিয়েনের মতো নয় — মান কোন বিয়োগান্ত নাটক লেখেন নি, দ্বন্দ্বযুদ্ধ লড়েন নি, কোন অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেন নি। তাঁর ছিল সাধু ব্যবসায়ী বিচক্ষণ মানুষের নিরুপদ্রব জীবন।

টমাস মান-এর অল্প বয়সে বাবা মারা যান। তিনি মানুষ হন সৎবাপের পরিবারে। ইনি ছিলেন ধনী বণিক এবং ঈস্ট ইণ্ডিয়া বাণিজ্য কম্পানির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য করত প্রাচীন লিভ্যাণ্ট কম্পানি, তার একটা শাখা হিসেবে ১৬০০ সালে দেখা দিয়েছিল এই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি। সৎবাপের দোকানে এবং দপ্তরে কিছুটা শিক্ষানবীসি করে তিনি আঠার কিংবা বিশ বছর বয়সে লিভ্যাণ্ট কম্পানিতে কাজ আরম্ভ করেন, কয়েক বছর ছিলেন ইতালিতে, গিয়েছিলেন তুরস্কে এবং পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলিতে।

মান অচিরেই ধনী এবং সম্ভ্রান্ত হন। প্রথম বার ১৬১৫ সালে তিনি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডে সদস্য নির্বাচিত হন, আর পার্লামেণ্টে এবং সংবাদপত্রজগতে কম্পানির সুনিপুণ এবং সক্রিয় পতাকী হয়ে ওঠেন অচিরাৎ। কিন্তু মান ছিলেন সাবধানী, তিনি বড় বেশি উচ্চাভিলাষী ছিলেন না: তাঁকে কম্পানির সহ-সভাপতি করার প্রস্তাব করা

হয়েছিল, তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করেন; কম্পানির বাণিজ্যিক দপ্তরগুলির পরিদর্শক হয়ে ভারতে যেতে তিনি অস্বীকার করেন। তখনকার দিনে ভারতে যেতে লাগত তিন-চার মাস, আর যাত্রাপথ ছিল বিপদে ঠাসা: ঝড়, অসুখবিসুখ, জলদস্যু...

অন্য দিকে, 'সিটি'-তে এবং ওয়েস্টমিন্‌স্টার-এ সবচেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন ছিলেন মান। এডোয়ার্ড মিসেলডেন নামে একজন রাজনীতিক প্রবন্ধকার এবং অর্থনীতি বিষয়ে লেখক ১৬২৩ সালে মান সম্বন্ধে এই বর্ণনা দিয়েছিলেন: '...ঈস্ট ইণ্ডিয়া বাণিজ্য সম্বন্ধে তাঁর পর্যবেক্ষণ, যাবতীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে তাঁর বিচার-সিদ্ধান্ত, দেশে তাঁর অধ্যবসায়, বিদেশে তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁকে এমনসব গুণে সমৃদ্ধ করেছে যা একালের বহু বণিকের মধ্যে থাকা যতটা কাম্য তত সহজ নয় সেটা পাওয়া।'

অতিশয়োক্তি এবং স্তাবকতা বাদ দিয়েও মান-যে মোটেই মামুলি বণিক ছিলেন না, তাতে সংশয় থাকতে পারে না। হালের একজন গবেষক বলেছেন, মান ছিলেন বাণিজ্যের মূলকৌলজ্ঞ। (প্রসঙ্গত বলি, সতর এবং আঠার শতকের ইংলণ্ডে 'বাণিজ্য' আর 'অর্থনীতি' শব্দ দুটো ছিল মূলত সমার্থক।)

মান পরিণতবয়স্ক ছিলেন স্টুয়ার্ট রাজবংশের প্রথম দুই রাজার রাজত্বকালে। প্রায় পঞ্চাশ বছর সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা থাকার পরে নিঃসন্তান রানী এলিজাবেথ মারা যান ১৬০৩ সালে। তিনি রানী হবার সময়ে ইংলণ্ড ছিল ধর্মীয় এবং রাজনীতিক ভেদ-বিভেদে জর্জরিত বিচ্ছিন্ন দ্বীপ-রাষ্ট্র। আর তিনি মারা যাবার সময়ে ইংলণ্ড একটি বিশ্ব-শক্তি, তার নৌশক্তি পরাক্রমশালী, বহুবিস্তৃত বাণিজ্য। বিপুল সাংস্কৃতিক স্ফুরণ ঘটেছিল এলিজাবেথীয় যুগে। স্কট্‌ল্যাণ্ডের রানী মেরি-র শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল, তাঁর ছেলে ১ম জেমস ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তিনি 'সিটি'-কে ভয়ও করতেন, আর 'সিটি'-কে দিয়ে তাঁর প্রয়োজনও ছিল। তিনি রাজত্ব করতে চেয়েছিলেন নিরঙ্কুশ-ক্ষমতাশালী সম্রাট হিসেবে, কিন্তু টাকার থলে ছিল পার্লামেণ্ট আর লণ্ডনের বণিকদের হাতে। তৃতীয় দশকের গোড়ার দিকে অর্থ এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রে কঠিন অবস্থা দেখা দিয়েছিল, তার দরুন রাজা এবং তাঁর মন্ত্রীরা 'সিটি'-র বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ চাইতে বাধ্য হন; একটা বিশেষ রাষ্ট্রীয় কমিশন বসান হয় বাণিজ্য সম্বন্ধে। টমাস মান তাতে যোগ দেন ১৬২২ সালে। এই উপদেষ্টা সংস্থাটায় তিনি ছিলেন একজন প্রতিপত্তিশালী এবং সক্রিয় সদস্য।

পুস্তিকা আর আবেদন-নিবেদনের স্রোতে, বাণিজ্য কমিশনে আলোচনাদির মধ্যে বৃটিশ বণিকতন্ত্রের মূলসূত্রগুলো গড়ে উঠেছিল সতর শতকের তৃতীয় দশকে, আর সেগুলো প্রযুক্ত হয়ে চলেছিল ঐ শতকের একেবারে শেষ অবধি। কাঁচামাল (বিশেষত পশম) রপ্তানি নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু কর্মশালাজাত জিনিসপত্র রপ্তানিতে উৎসাহ যোগান হত এমনকি রাষ্ট্রীয় ভরতুকি দিয়েও। আরও-আরও নতুন উপনিবেশ গ্রাস করেছিল ইংলন্ড, তাতে কর্মশালা মালিকেরা পেয়েছিল সস্তা কাঁচামাল, আর চিনি রেশম মশলা এবং তামাকের চালান আর দালালি বাণিজ্য থেকে লাভ তুলেছিল বণিকেরা। বিদেশের কর্মশালাজাত পণ্যদ্রব্য ইংলন্ডে ঢোকান গণ্ডিবদ্ধ করা হয়েছিল চড়া আমদানি-শুল্ক ধার্য করে, তাতে প্রতিযোগিতা খর্ব হয়েছিল, আর দেশীয় কর্মশালাগুলির প্রসারে প্রোৎসাহন জুটেছিল (**সংরক্ষণ কর্মনীতি**)। পৃথিবীর সর্বত্র মাল বয়ে নিয়ে যেত এবং বৃটিশ বাণিজ্য রক্ষা করত নৌবহর, সেটার দিকে মনোযোগ দেওয়া হত বিস্তর। বিভিন্ন বহুমূল্য ধাতু বেশি-বেশি পরিমাণে দেশে এনে ফেলাই ছিল এইসব ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। তবে স্পেন সোনা আর রুপো পেত সরাসরি মার্কিন খনিগুলো থেকে, তেমনটা ছিল না ইংলন্ডে, এখানে অর্থ টেনে আনার কর্মনীতিটা হিতকর হল, কেননা এর সঙ্গে জড়িত ছিল শিল্প নৌবহর আর বাণিজ্যের উন্নয়ন।

ইতোমধ্যে ঝড় ঘনিয়ে উঠছিল স্টুয়ার্ট রাজবংশের উপর। ১ম জেম্‌স-এর ছেলে অদূরদর্শী এবং একগুঁয়ে ১ম চার্লস বুর্জোয়াদের শত্রু করে ফেলেন, তারা কাজে লাগায় ব্যাপক জনসাধারণের অসন্তোষটাকে। মান মারা যাবার এক বছর আগে, ১৬৪০ সালে পার্লামেন্টের অধিবেশন বসে, রাজার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সমালোচনা-হামলা চালায় পার্লামেন্ট। গৃহযুদ্ধ বেধে যায়, শুরু হয় ইংলন্ডের বুর্জোয়া বিপ্লব। চার্লস-এর শিরশ্ছেদ করা হয় ন' বছর পরে।

প্রৌঢ় মান-এর রাজনীতিক মত আমাদের জানা নেই; বৈপ্লবিক ঘটনাবলির পরিণতি তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তবে রাজার কর্তৃত্ব, বিশেষত করাধানের ক্ষেত্রে গণ্ডিবদ্ধ করার সপক্ষে এবং রাজার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তিনি এক সময়ে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। কিন্তু রাজাকে বধ করাটা তিনি সমর্থন করতেন বলে মনে হয় না। জীবনের শেষের দিকে মান ছিলেন খুবই ধনী। তিনি প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ড কিনেছিলেন।

লন্ডনে সবাই জানত তিনি রোকথোক ধার দিতে পারতেন মোটা-মোটা টাকা।

মানের রচনা রয়েছে ছোট-দুখানা; একটু অলঙ্কারপূর্ণ উক্তিতে বলা যায় সেটা চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে আর্থনীতিক সাহিত্যের সম্পদ ভাণ্ডারে। রচনা-দুটোর নিয়তি মোটেই মামুলি নয়। প্রথমটার নাম 'ইংলন্ড থেকে ঈস্ট ইন্ডিয়ায় বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা, এই বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সাধারণত যে-বিবিধ আপত্তি তোলা হয় সেগুলির উত্তর', ১৬২১ সালে প্রকাশিত এই রচনায় লেখকের নাম ছিল আদ্যক্ষরে — টি. এম.। এটা হল ঈস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির সমালোচকদের বিরুদ্ধে বিতর্কমূলক রচনা। সাবেকী, আদিম ধরনের বণিকতন্ত্রের এই সমর্থকেরা বলত কম্পানির কাজ-কারবারের দরুন ইংলন্ডের ক্ষতি হচ্ছিল, কেননা ভারতীয় মাল কেনার জন্যে কম্পানি রুপো রপ্তানি করছিল — ইংলন্ডের এই রুপো একেবারেই খোয়া যাচ্ছিল। আঙুলের ডগায় তথ্য আর অংক তুলে ধরে মান এই বক্তব্য খণ্ডন করেছিলেন দক্ষতার সঙ্গে, তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন এই রুপো মিলিয়ে যায় না, সেটা ইংলন্ডে ফেরে অনেকটা বেশি পরিমাণে: এই ব্যবস্থা না থাকলে কম্পানির জাহাজগুলিতে করে আনা মাল তুর্কী এবং লিভ্যান্টবাসীদের কাছ থেকে কিনতে হত তিনগুণ চড়া দামে; অধিকন্তু ঐসব মালের বেশ একটা অংশ ইউরোপীয় দেশগুলিতে বেচা হত রুপো আর সোনা নিয়ে। এতে ঈস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির স্বার্থের সপক্ষে দাঁড়ান হয়েছিল, এটা নিশ্চয়ই নয় অর্থনীতি চিন্তনের ইতিহাসে পুস্তিকাখানার গুরুত্বের দিকটা, সেটা হল এই যে, সর্বপ্রথমে এতে দেওয়া হল পরিণত বণিকতন্ত্রের যুক্তিগুলির ব্যাখ্যান।*

মানের খ্যাতি আরও বেশি পরিমাণে আসে তাঁর দ্বিতীয় বইখানা থেকে।

---

* দীর্ঘকাল যাবৎ ইংরেজ পণ্ডিতেরা ভেবেছিলেন এই 'আলোচনা'-র একটা প্রথম সংস্করণ বেরিয়েছিল ১৬০৯ সালে, সেটা খুঁজে বের করতে তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন। রাজনৈতিক-অর্থনীতিবিদ এবং প্রাচীন ইংরেজী অর্থনীতি সাহিত্যের সংগ্রাহক জন র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌কুলোখ গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে এমন একটা সংস্করণের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন। আজকাল বিশেষজ্ঞরা মনে করেন অমন কোন সংস্করণ নেই। তাহলে মানের রচনার আগেই প্রকাশিত হয়েছিল ইতালির সেরুরার (১৬১৩ সাল) এবং ফ্রান্সের মঁৎক্রেতিয়েনের (১৬১৫ সাল) বণিকতান্ত্রিক রচনা। কিন্তু মানের কৃতিত্ব তাতে খাটো হয়ে পড়ে না কোনক্রমে।

আডাম স্মিথ লিখেছেন, বইখানার মূলভাবটা প্রকাশ পেয়েছে সেটার নামেই: 'বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমেই ইংলণ্ডের সম্পদ, বা আমাদের বহির্বাণিজ্য-উদ্বৃত্তই আমাদের সম্পদের নিয়ামক'। এটা প্রকাশিত হয় মাত্র ১৬৬৪ সালে, তিনি মারা যাবার প্রায় পঁচিশ বছর পরে। বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ এবং প্রজাতন্ত্রের দীর্ঘ বছরগুলিতে সেটার পাণ্ডুলিপি একটা বাক্সের মধ্যে পড়ে ছিল অন্যান্য দলিলপত্রের মধ্যে, এগুলি মানের ছেলে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন তাঁর বাবার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে। ইংলণ্ডের সিংহাসনে স্টুয়ার্ট রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় ১৬৬০ সালে, আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে আর্থনীতিক আলোচনা, এই অবস্থায় এই পঞ্চাশ-বছরবয়স্ক ধনী বণিক এবং ভূস্বামীর মনে আসে বইখানা প্রকাশ করার কথা, যাতে জনসাধারণকে এবং কর্তৃপক্ষকে মনে করিয়ে দেওয়া যায় টমাস মানের কথা, সে-নাম তখন প্রায়-বিস্মৃত।

মার্কস বলেছেন, 'এটা বণিকতান্ত্রিক সুসমাচার হয়ে ছিল আরও এক-শ' বছর ধরে। বণিকতন্ত্রের যদি... 'প্রবেশপথে খোদিত লিপি গোছের'* কোন যুগান্তকারী রচনা থেকে থাকে সেটা এই বইখানা...'**।

কিছুটা বিবিধ বিভিন্ন পরিচ্ছেদ নিয়ে এই বইখানা লেখা হয়েছিল মনে হয় ১৬২৫-১৬৩০ সালে, এতে রয়েছে বণিকতন্ত্রের একেবারে সারমর্মটারই বাহুল্যবর্জিত এবং যথাযথ ব্যাখ্যান। মানের রচনাশৈলী সুশোভিত নয়। প্রাচীন পণ্ডিতদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি না দিয়ে তিনি ব্যবহার করেছেন সাধারণ্যে প্রচলিত নানা বচন এবং কারবারী হিসাব-বিচার। ইতিহাস-বিশ্রুত কোন ব্যক্তির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন শুধু একবার, ম্যাসিডনিয়ার রাজা ফিলিপের নাম, সেটা এই কারণে যে, ইনি পরামর্শ দিয়েছিলেন কোন জায়গা জোর করে দখল করা না গেলে সেখানে টাকা ছেড়ে কাজ হাসিল করাতে হয়।

সাচ্চা বণিকতন্ত্রী হিসেবে মানের বিবেচনায় ধনসম্পদ হল প্রধানত অর্থ, সোনা আর রুপো। তাঁর চিন্তনে বাণিজ্যিক পুঁজির দৃষ্টিভঙ্গিটাই প্রধান। কোন বণিক পুঁজিপতি যেমন অর্থ ছাড়ে সেটাকে বাড়িয়ে তোলার জন্যে, ঠিক তেমনি দেশের ধনী হয়ে ওঠা চাই বাণিজ্যের সাহায্যে, যাতে

---

* উদ্ধৃত কথা-কটা হল ও. ড্যুরিঙের রচনাশৈলীর প্যারডি, তাঁকে মার্কস এখানে সমালোচনা করেছেন।

** ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, 'অ্যান্টি-ড্যুরিং', মস্কো, ১৯৬৯, ২৭৪ পৃঃ।

আমদানির চেয়ে রপ্তানির আধিক্য নিশ্চিত হয়। উৎপাদন উন্নয়ন তাঁর বিবেচনায় স্বীকৃত শুধু বাণিজ্য প্রসারের একটা উপায় হিসেবে।

আর্থনীতিক রচনা সবসময়েই করা হয় কমবেশি নির্দিষ্ট কোন ব্যবহারিক লক্ষ্য অনুসারে: অমুক কিংবা তমুক আর্থনীতিক ব্যবস্থা, প্রণালী কিংবা কর্মনীতির যাথার্থ্য প্রতিপাদন। কিন্তু বণিকতন্ত্রীদের বেলায় এইসব ব্যবহারিক কাজই বিশেষভাবে প্রধান। অন্যান্য বণিকতন্ত্রী লেখকদের মতো মানও কোন আর্থনীতিক অভিমতের কোন 'তন্ত্র' গড়ে তোলার চিন্তার ধারে-কাছেও যান নি। তবে অর্থনীতি চিন্তনের আছে নিজস্ব গতি-পরিণতি, তাই যাতে বাস্তবতা প্রকাশ পায় এমনসব তত্ত্বীয় ধারণা-মৌল তিনি ব্যবহার না করে পারেন নি: পণ্য, অর্থ, লাভ, পুঁজি... যা-ই হোক, সেগুলোর মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ খুঁজে পেতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন।

পথিকৃতেরা

নতুনটা সবসময়েই কঠিন। সতর শতকের চিন্তাবীরদের সাধনসাফল্যগুলির মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমাদের মনে রাখা দরকার কী বিপুল বাধা-বিঘ্ন ছিল তাঁদের সামনে। মস্ত-মস্ত ইংরেজ বস্তুবাদী দার্শনিক— ফ্র্যান্সিস বেকন এবং টমাস হব্স — তখন প্রকৃতি আর সমাজ নিয়ে গবেষণার একটা নতুন ধারা গড়ে তুলছিলেন তখন সবে, তাতে প্রকৃতি আর সমাজের বিষয়গত নিয়মাবলির ব্যাখ্যা দেওয়াটাকেই করা হয়েছিল দর্শনের প্রধান কৃতি। বহু শতাব্দীর ধর্মীয় এবং নৈতিক নিয়ম অতিক্রম করতে হয়েছিল অর্থনীতি চিন্তনে। হুবহু বাইবেলের কথা আর মূলভাব অনুসারে কী **থাকা বিধেয়** আর্থনীতিক জীবনে সেটাই আগে ছিল প্রধান প্রশ্নটা। আর কী **বস্তুত রয়েছে** এবং 'সমাজের সম্পদে'র স্বার্থে কী করতে হবে এই বাস্তবতা নিয়ে সেটাই হল তখনকার ব্যাপারটা।

মস্ত-মস্ত ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং বাণিজ্য প্রসারের ফলে মানুষের মানসদিগন্তের বিস্তার ঘটলেও তখনও তারা জগৎ সম্বন্ধে জানত খুবই কম। পরদেশগুলির কথা তো ছেড়েই দিলাম — এমনকি ইংলণ্ড সম্বন্ধে ভৌগোলিক এবং আর্থনীতিক বিবরণও ছিল বেঠিক, এবং ভুল আর বাজে কথায় ভরা। অর্থনীতি চিন্তনক্ষেত্রে পথিকৃৎদের হাতে তথ্যাদি ছিল যৎসামান্যই, আর পরিসংখ্যান বড় একটা নয়। কিন্তু বাস্তব জীবনের যা

অর্থনীতি চিন্তনক্ষেত্রে এইসব পথিকৃৎদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে প্রতিভাশালী তাঁদের স্থান হল দর্শন গণিত এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানক্ষেত্রে সতর শতকের সবচেয়ে বড়-বড় চিন্তাবীরদের কাতারে।

একটা তত্ত্বব্যবস্থা হিসেবে এবং কর্মনীতি হিসেবে বণিকতন্ত্রের জাতিগত প্রকৃতি দেখা দেবার নিজস্ব কারণ ছিল। পুঁজিতন্ত্রের ত্বরিত উন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল শুধু জাতিগত কাঠামেই, আর পুঁজি সঞ্চয়নে, তাই আর্থনীতিক উন্নয়নে আনুকূল্য করেছিল যে-রাষ্ট্র তার উপর সেটা নির্ভর করেছিল বহুলাংশে। বণিকতন্ত্রীদের অভিমতে প্রকাশ পেয়েছিল আর্থনীতিক উন্নয়নের আদত নিয়মানুযায়িতা এবং চাহিদা।

'সম্পদ', অর্থাৎ পয়দা-করা, ব্যবহৃত এবং সঞ্চিত মালপত্রের — উপযোগ-মূল্যবস্তুসমূহের — সাকল্য বাড়ার পরিমাত্রা একদেশের চেয়ে অন্য এক দেশে বেশি হয় কেন? সম্পদবৃদ্ধি যাতে অপেক্ষাকৃত দ্রুত করা যায় সেজন্যে কী করা যায় এবং করা চাই উৎপাদনস্থলে এবং বিশেষত রাষ্ট্র পর্যায়ে? এই প্রশ্নের উত্তর যোগাতে পারলে একটা বিজ্ঞান হিসেবে অর্থশাস্ত্রের অস্তিত্বের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় সেটা বোঝা যায় সহজেই। বণিকতন্ত্রীরা ঐ উত্তর পাবার চেষ্টায় খোঁজ করেছিলেন তাঁদের কালের আর্থনীতিক পরিবেশের মাঝে। বলা যেতে পারে, অর্থনীতিবিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে 'যুক্তিসম্মত অর্থনীতি' সংক্রান্ত কাজটাকে সর্বপ্রথমে তুলে ধরেন তাঁরাই। তাঁদের বিভিন্ন প্রায়োগিক সিদ্ধান্ত এবং পরামর্শের অনেকগুলিই বিষয়গত বিচারে সার্থক প্রতিপন্ন হয়েছে, আর এই অর্থে সেগুলি বিজ্ঞানসম্মত।

তার সঙ্গে সঙ্গে, পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির অগ্রগতির নিয়মাবলি এবং অভ্যন্তরীণ কার্য-বন্দোবস্ত সম্বন্ধে উপলব্ধির দিকে প্রথম-প্রথম পদক্ষেপও করেন তাঁরাই। এই উপলব্ধি ছিল খুবই ভাসাভাসা এবং একপেশে, কেননা অর্থনীতির রহস্যগুলোর মীমাংসাটাকে তাঁরা খুঁজেছিলেন পরিচলনক্ষেত্রে। একজন সমালোচক বলেছেন, তাঁদের বিবেচনায় উৎপাদন হল স্রেফ একটা 'অপরিহার্য বালাই', দেশের ভিতরে, বরং বলা ঠিক বণিক পুঁজিপতিদের হাতে অর্থ এসে পড়ার একটা উপায়। যদিও প্রকৃতপক্ষে বৈষয়িক সম্পদের উৎপাদনই যেকোন সমাজের বনিয়াদ, আর পরিচলন সেটার কাছে গৌণ।

এই বণিকতান্ত্রিক বিবেচনাধারাটার কারণ আবার বোঝা যায় এই ব্যাপারটা থেকে: সাধারণভাবে পুঁজির প্রধান আকার ঐসময়ে ছিল বাণিজ্যিক

পুঁজি। তখনও অবধি উৎপাদন চলত প্রধানত প্রাক্-পুঁজিতান্ত্রিক প্রণালীতে, তবে পরিচলনক্ষেত্রটাকে, বিশেষত বহির্বাণিজ্য ইতোমধ্যে হাতে নিয়ে নিয়েছিল তখনকার দিনের বৃহৎ পুঁজি। গোটা সতর শতক এবং আঠার শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে ইংলণ্ডে আর্থনীতিক আলোচনার কেন্দ্র ছিল ঈস্ট ইণ্ডিয়া, আফ্রিকা এবং অন্যান্য কম্পানির মতো কারবারগুলো সেটা আপতিক নয়।

'জাতিসমূহের সম্পদ'টাকেই বণিকতন্ত্রীরা দেখত মূলত বাণিজ্যিক পুঁজির স্বার্থের কথা বিবেচনায় রেখে। কাজেই **বিনিময়-মূল্যের** মতো গুরুত্বপূর্ণ একটা আর্থনীতিক ধারণা-মৌল নিয়ে তাঁরা মাথা না ঘামিয়ে পারতেন না। প্রকৃতপক্ষে তত্ত্ববিদ হিসেবে তাঁরা আগ্রহান্বিত ছিলেন এটাতেই, কেননা বিনিময়-মূল্য অর্থের চেয়ে, সোনার চেয়ে স্পষ্ট মূর্ত হতে পারে আর কিসে? অথচ বিনিময়ে সমস্ত রকমের সম্পদ আর সমস্ত রকমের শ্রমের সমীকরণ সম্বন্ধে আরিস্টটলের প্রারম্ভিক ধারণাটাও তাঁদের কাছে ছিল বিজাতীয়। উলটে তাঁরা মনে করতেন বিনিময় সেটার স্বধর্ম অনুসারেই অসম, অসমতুল। (এই বিবেচনাধারার ইতিহাসনির্দিষ্ট কারণ বোঝা যায় এই ব্যাপারটা থেকে: তাঁরা ভাবতেন মুখ্যত বহির্বাণিজ্য বিনিময় নিয়ে, সেটা প্রায়ই ছিল পুরোদস্তুর অসমতুল, বিশেষত অনগ্রসর এবং 'বর্বর' জাতিগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে।) শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বের কিছু-কিছু প্রাথমিক উপাদান দেখা যায় আরিস্টটলের এবং কোন-কোন মধ্যযুগীয় লেখকের রচনায় — সেটাকে বণিকতন্ত্রীরা বিকশিত করেন নি।

মজুরি-শ্রমিকের শ্রমের যে-অংশটাকে পুঁজিপতি পারিশ্রমিক না দিয়ে আত্মসাৎ করে, প্রকৃতপক্ষে তারই ফল হল উদ্বৃত্ত মূল্য — সেটা বণিকতন্ত্রীদের কাছে প্রতীয়মান হত বাণিজ্যিক লাভের আকারে। পুঁজির বৃদ্ধি এবং সঞ্চয়নটাকে তারা শ্রম শোষণের ফল হিসেবে দেখত না, সেটাকে তারা দেখত বিনিময়ের, বিশেষত বহির্বাণিজ্যের ফল হিসেবে।

কিন্তু এইসব বিভ্রম আর ভুল সত্ত্বেও বহু সমস্যাকে বণিকতন্ত্রীরা বিবেচনা করেছিলেন উপযুক্ত ধরনে — সেটা আটকায় নি। যেমন, জনসমষ্টির যথাসম্ভব বড় অংশটাকে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের মধ্যে এনে ফেলা চাই — এটা ছিল তাঁদের খুবই গরজের বিষয়। অতি নিচু হারের আসল মজুরির সঙ্গে মিলে এটা লাভ বাড়াত এবং ত্বরিত করত পুঁজি সঞ্চয়ন। আর্থনীতিক উন্নয়নের জন্যে নমনীয় আর্থ ব্যবস্থার ভূমিকাটাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন বণিকতন্ত্রীরা। অর্থনীতিতে বিভিন্ন আর্থ উপাদানের ভূমিকা

সম্পর্কে তাঁদের ব্যাখ্যা কোন-কোন দিক থেকে অ্যাডাম স্মিথের ব্যাখ্যার চেয়ে প্রগাঢ়। নিজেদের আর্থনীতিক প্রকল্পগুলিতে শক্তিশালী রাষ্ট্রক্ষমতাটাকে ধরে নিলেও পরবর্তীকালের বণিকতন্ত্রীরা অর্থনীতিতে অতিমাত্রায় এবং খুচরো রাষ্ট্রীয় নিয়মনে আপত্তিও তুলতেন প্রায়ই। এটা বিশেষত সঠিক ইংরেজদের বেলায়, যারা ছিল প্রবল, স্বাধীন এবং অভিজ্ঞ বুর্জোয়াদের স্বার্থবাহ, তাদের রাষ্ট্র দরকার ছিল শুধু তাদের স্বার্থের সাধারণ রক্ষণের জন্যে।

বহুমূল্য ধাতু রপ্তানির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে জোরদার লড়াই চালিয়েছিলেন টমাস মান। তিনি লেখেন, কৃষক যেমন মাটিতে বীজ বোনে ফসল তোলার জন্যে, ঠিক তেমনি বণিকের অর্থ রপ্তানি করা চাই এবং বিদেশের মাল কেনা চাই নিজের মাল আরও বেশি পরিমাণে বিক্রি করে বাড়তি পরিমাণ অর্থের আকারে জাতির মুনাফা আগমের জন্যে।

বণিকতন্ত্র এবং একাল

অর্থনীতি তত্ত্বক্ষেত্রে একটা ধারা হিসেবে বণিকতন্ত্র লুপ্ত হয়ে যায় আঠার শতকের শেষাশেষি। শিল্পবিপ্লব এবং কারখানা-শিল্পের পরিবেশের অপেক্ষাকৃত বেশি অনুযায়ী হল ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রের মূলনীতিগুলি। এইসব নীতি বিশেষত প্রাধান্যশালী হয়ে উঠল সবচেয়ে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশে — ইংলণ্ডে এবং ফ্রান্সে। অর্থনীতিতে এবং বহির্বাণিজ্যে রাষ্ট্রের সরাসর হস্তক্ষেপ কমজোর হয়ে পড়ল — এইভাবে সেটা প্রকাশ পায় আর্থনীতিক কর্মনীতিক্ষেত্রে।

যেসব দেশ পুঁজিতান্ত্রিক উন্নয়নের পথ ধরেছিল পরে সেগুলিতে কিন্তু ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারণা পুরোপুরি বদ্ধমূল হতে পারল না। অর্থনীতিক্ষেত্রে সবকিছু ছেড়ে দিতে হবে বিভিন্ন শক্তির পূর্ণ অবাধ প্রসারের উপর, এটা মানতে চাইল না এইসব দেশের বুর্জোয়ারা। এরা ধরে নিয়েছিল যে, এই অবাধ ক্রিয়াকলাপে জিতে যাবার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা ছিল ইংরেজ আর ফরাসী বুর্জোয়াদের — এটার পক্ষে কোন যুক্তি ছিল না তা নয়। কাজেই বণিকতন্ত্রীদের কোন-কোন মূর্ত-নির্দিষ্ট ভাব-ধারণা কখনও লুপ্ত হল না; অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় নিয়মন, সংরক্ষণ নীতি, দেশে প্রচুর অর্থাগম — বণিকতন্ত্রের এইসব প্রধান দফা বিভিন্ন সরকার জোরসে কাজে লাগাল বহু ক্ষেত্রে।

এল বিংশ শতাব্দী, শিল্পসমৃদ্ধ বুর্জোয়া দেশগুলিতে গড়ে উঠল রাষ্ট্রীয়-একচেটে পুঁজিতন্ত্র। যেসব ভাব-ধারণা এই পরিবেশের অনুযায়ী, যেগুলিতে প্রকাশ পেল অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় প্রভাবের কাজটা, সেগুলিকে সবচেয়ে পূর্ণ আকারে তুলে ধরলেন ইংরেজ তত্ত্ববিদ মেনার্ড কেইন্স, সেটা এই বিশ শতকের চতুর্থ দশকে। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বুর্জোয়া অর্থনীতি চিন্তন বিকশিত হয়েছে বহুলাংশে তাঁর ভাব-ধারণার প্রভাবে। আজকাল একচেটেগুলো এবং রাষ্ট্র চলে আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের যে-আর্থনীতিক কর্মনীতি অনুসারে সেটা অনেক দিক দিয়ে নির্ধারিত হয় ঐসব ভাব-ধারণা দিয়ে।

কেইন্স বললেন, পুঁজিতন্ত্র আর টিকতে পারে না আত্মনিয়মনের ভিত্তিতে। অর্থনীতি নিয়মনের কাজটা নিতে হবে রাষ্ট্রের হাতে। ক্রয়ক্ষম চাহিদা উৎপাদনের পিছনে পড়ে যায় সমানে — এই চাহিদাটাকে বজায় রাখা এবং চাগান চাই, প্রধানত তাই হল ঐকাজটা। এইভাবে বেকারি এবং কল-কারখানায় ঊন-ক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই চালান দরকার। পুঁজি বিনিয়োগ করতে, অর্থাৎ নতুন-নতুন কল-কারখানা গড়তে এবং উৎপাদন সম্প্রসারিত করতে পৃথক-পৃথক পুঁজিপতিদের অবিরাম তাগিদ দিতে হবে।

বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র দেড় শতাব্দী ধরে জাহির করেছিল অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের না-হস্তক্ষেপের কথা — সেটা ভুয়ো এবং বিপজ্জনক ধারণা। দেশে যাতে প্রচুর অর্থ থাকে, আর অর্থটা যাতে 'সস্তা' হয়, অর্থাৎ ঋণ বাবত সুদের হার যাতে কম হয় সেটা রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে সর্বাগ্রে। এমন পরিস্থিতি থাকলে পুঁজিপতিরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে, বিনিয়োগ করতে, কাজেই শ্রমিক নিয়োগ করতে এবং তাদের মজুরি দিতে আগ্রহান্বিত হবে। অবাধ বাণিজ্য একটা বদ্ধধারণা। ষোল-আনা কর্মনিয়োগের জন্যে প্রয়োজন হলে বিদেশের মাল আমদানির উপর বাধা-নিষেধ চাপান চলতে পারে, আর তেমনি চলতে পারে ডাম্পিং (বাজার হস্তগত করার জন্যে কম দামে মাল রপ্তানি) এবং মুদ্রামূল্যহ্রাস।

এইসব পরামর্শ-ব্যবস্থার অদ্ভুত মিল আছে বণিকতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে, তাতে স্বভাবতই ধরে নিতে হবে আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং পশ্চিম ইউরোপের ২৫০-৩০০ বছর আগেকার অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্যটাকে। বণিকতন্ত্র সম্বন্ধে একজন স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ সুইডেনের অর্থনীতিবিদ এলি হেক্‌শের (১৮৭৯-১৯৫২) লিখেছেন: '...কেইন্সের

সমাজ-দর্শন ছিল একেবারেই পৃথক, তা সত্ত্বেও আর্থনীতিক ব্যাপারগুলো প্রসঙ্গে তাঁর বিবেচনাধারার অনেকাংশে লক্ষণীয় সাদৃশ্য আছে বণিকতন্ত্রীদের সেই বিবেচনাধারার সঙ্গে...'* সেটা নিশ্চয়ই ছিল পৃথক! কেইন্স হলেন আধুনিক রাষ্ট্রীয়-একচেটে পুঁজিতন্ত্রের ভাবাদর্শবিদ, আর পুঁজিতন্ত্রের গোড়ার দিককার কালপর্যায়ে বাণিজ্য-শিল্পক্ষেত্রের উদীয়মান বুর্জোয়াদের স্বার্থবহ ছিলেন বণিকতন্ত্রীরা।

কেইন্স নিজের মত প্রকাশ করেছেন চাঁচাছোলা ভাষায়। 'ক্ল্যাসিকাল মতবাদ'কে ভুয়ো প্রতিপন্ন করার ব্রত নিয়ে তিনি সেটা জাহির করেছেন একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায়ই ('ক্ল্যাসিকাল মতবাদ' বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, মোটামুটি, অর্থনীতিতে আত্মনিয়মন এবং রাষ্ট্রের না-হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত ধারণা)। বণিকতন্ত্রীদের সঙ্গে তিনি সেইভাবে ব্যবহার করতেন, আর তাঁদের মেনে নেন নিজের পূর্বসূরি বলে। ঠিক বটে, সমালোচকেরা, বিশেষত প্রফেসর হেক্‌শের পরে প্রমাণ করেন যে, কেইন্স কিছু পরিমাণে নিজের অভিমত স্রেফ আরোপ করেন সতর এবং আঠার শতকের লেখকদের উপর, এতে তিনি ঐ লেখকদের চিত্রিত করেন — নরম করে বললে — খুবই অদ্ভুত এবং সুবিধেমতো কায়দায়। যা-ই হোক, কেইন্স এবং বণিকতন্ত্রীদের মধ্যে জ্ঞাতিত্বটা তাৎপর্যসম্পন্ন। কেইন্স নিজেই চারটে দফা তুলে ধরে তাঁদের সঙ্গে নিজের আত্মীয়তাসূত্রটা দেখিয়েছেন।

এক, তাঁর মতে, ঋণ বাবত সুদের হার কমিয়ে এবং বিনিয়োগে উৎসাহ যুগিয়ে দেশে অর্থের পরিমাণ বাড়াতে চেষ্টা করেছিলেন বণিকতন্ত্রীরা। আমরা এখনই দেখলাম, এটা হল কেইন্সের একটা মূলভাব। দুই, তাঁরা দাম চড়ায় ভয় পেতেন না এবং মনে করতেন বাণিজ্য আর উৎপাদন প্রসারে আনুকূল্য করে চড়া দাম। আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখার একটা উপায় হিসেবে 'পরিমিত মুদ্রাস্ফীতি' সংক্রান্ত ধারণার অন্যতম প্রবর্তক হলেন কেইন্স। তিন, 'বেকারির কারণ হিসেবে অর্থ-ঘাটতি সংক্রান্ত ধারণার সূত্রপাত করেন বণিকতন্ত্রীরা'।** কেইন্স এই ধারণাটা তুলে ধরেন যে ব্যাঙ্ক

---

* Eli F. Heckscher, 'Mercantilism', New York, 1955, Vol. 2, p. 340.

** J. M. Keynes, 'The General Theory of Employment, Interest and Money', London, 1946, p. 346.

ক্রেডিটের প্রসার এবং রাষ্ট্রীয় বাজেটের ঘাটতির উপায় অবলম্বন করে অর্থের পরিমাণ বাড়ালে সেটা হতে পারে বেকারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একখানা অস্ত্র। চার, 'বণিকতন্ত্রীদের কর্মনীতির প্রকৃতিটা জাতীয়তাবাদী, আর তাতে লড়াই বাধিয়ে দেবার প্রবণতা, এতে তাঁদের কোন বিভ্রান্তি ছিল না।'* কেইন্স মনে করতেন, কোন একটা দেশে যোল-আনা কর্মনিয়োগ-সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসায় সংরক্ষণ কর্মনীতি সহায়ক হতে পারে; আর তিনি ছিলেন আর্থনীতিক জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা।

এর সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে পঞ্চম দফা, যেটাকে কেইন্স ধরেই নিয়েছিলেন তা স্পষ্টই: অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দেওয়া।

আগেই যা বলা হয়েছে, উনিশ শতকের শেষের দিকে বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র প্রত্যাখ্যান করে শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্ব এবং ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের অন্যান্য তত্ত্বীয় উপাদান। ক্ল্যাসিকাল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীদের তত্ত্ব থেকে আসে যে-আর্থনীতিক কর্মনীতি সেটাকেও এবার বর্জন করল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র। পুঁজিতন্ত্রের দ্বন্দ্ব-অসংগতিগুলোর প্রকোপনই তার প্রধান কারণ। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বাড়িয়ে এইসব দ্বন্দ্ব-অসংগতি লাঘব করতে চান বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা। অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের সর্বশক্তিমত্তা-সংক্রান্ত ধারণাটাকে অতীতে একেবারে পুরোপুরি ব্যক্ত করেছিলেন বণিকতন্ত্রীরা। এগুলোই আত্মীয়তাসূত্র।

সমস্ত আধুনিক বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র কেইন্সীয় পথ ধরে নি। এমন গোটা-গোটা সম্প্রদায় রয়েছে যারা অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বাড়াবার প্রয়োজন প্রত্যাখ্যান করে। কেইন্সপন্থীদের মুদ্রাস্ফীতিবাজির বিরুদ্ধে তারা দাঁড় করায় 'ব্যক্তিগত উদ্যমের স্বাধীনতা'। অর্থনীতি, উৎপাদন এবং কর্মনিয়োগের উপর রাষ্ট্রীয় প্রভাব খাটাবার চেষ্টাগুলোকে এইসব লেখক কখনও-কখনও 'নব্য-বণিকতন্ত্র' বলে উল্লেখ করেন, সেটা তাঁদের দিক থেকে অবজ্ঞাসূচক। তাঁদের মতে, এমন যেকোন প্রভাবের ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হয়, ঐ প্রভাব 'পশ্চিমী আদর্শে'র অনুযায়ী নয়। 'নব্য-বণিকতন্ত্রে'র এই সমালোচকেরা লক্ষ্য করেন না কেইন্সপন্থীরা (সম্ভবত অজানতে) কী বলতে চাইছেন তাঁদের ঐসব তত্ত্ব দিয়ে: অর্থনীতিক্ষেত্রে আধুনিক বুর্জোয়া

---

* ঐ, ৩৪৮ পৃঃ।

রাষ্ট্রের ভূমিকাবৃদ্ধি একটা বিষয়গত নিয়ম। নইলে, পুঁজিতন্ত্র যেসব শক্তির উদ্ভব ঘটিয়েছে সেগুলিকে সেটা আর দমিয়ে রাখতে পারে না।

অন্য দিকে, 'নব্য-বণিকতন্ত্র' কথাটা প্রয়োগ করে নবীন উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির আর্থনীতিক কর্মনীতির দুর্নাম করা হয়। অর্থনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে, আর্থনীতিক পরিকল্পনা আর কর্মসূচিকে বলা হচ্ছে নব্য-বণিকতন্ত্র। বহিঃশুল্ক এবং অন্যান্য ব্যবস্থার সাহায্যে জাতীয় শিল্পের সংরক্ষণও নব্য-বণিকতন্ত্র। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যচুক্তি, রাষ্ট্রীয় ঋণ দিয়ে শিল্পে অর্থযোগান, দাম নিয়ন্ত্রণ, একচেটেগুলোর লাভ গণ্ডিবদ্ধ করা — এই সবই নব্য-বণিকতন্ত্র।

কিন্তু এইসব দেশের উন্নয়নের উপায়টা তাহলে কী? বাণিজ্যের স্বাধীনতা, অর্থাৎ রাষ্ট্রের সদয় না-হস্তক্ষেপে বৈদেশিক একচেটেগুলোর স্বাধীনতা। তাহলে কোন নব্য-বণিকতন্ত্র আর থাকে না বটে। তবে স্বাধীন আর্থনীতিক উন্নয়নও আর থাকে না, কেননা ঠিক এই পরিবেশেই বজায় থাকে অনগ্রসরতা এবং পরনির্ভরতা!

শিল্পোন্নয়নে আনুকূল্যের একখানা হাতিয়ার হিসেবে সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে বহু উন্নয়নশীল দেশে। এই ক্ষেত্রে সেটা প্রগতিশীল এবং বড়-বড় উন্নত দেশের মারমুখো সংরক্ষণনীতি থেকে খুবই পৃথক (বাজারের জন্যে সাম্রাজ্যবাদী কাড়াকাড়িতে এইসব দেশ সেটা প্রয়োগ করে)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রশংসাভাজন সার উইলিয়ম পেটি

টমাস মানের সমসাময়িকদের মধ্যে ছিলেন শেক্সপিয়র এবং বেকন — কলাশিল্প আর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মস্ত-মস্ত নবপ্রবর্তক। অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে অনুরূপ নবপ্রবর্তক উইলিয়ম পেটি আসেন এক-পুরুষ পরে। ষোল-সতর শতাব্দীর বাঁকে যাঁদের জন্ম, যাঁরা ঐ মাঝের পুরুষ-পর্যায়ের মানুষ, তাঁরা ছিলেন যোদ্ধা এবং ধর্মপ্রচারক। নরমপন্থী বুর্জোয়াদের নেতা এবং আদর্শ পুরুষ অলিভার ক্রমওয়েল, আর তাঁর অপেক্ষাকৃত বাম-তরফের রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বী জন লিলবার্ন লড়েছিলেন ডান হাতে তরোয়াল এবং বাঁ হাতে বাইবেল নিয়ে। সতর শতকে বিদ্যমান ঐতিহাসিক পরিবেশের কারণে তখনকার রাজনীতিক এবং সামাজিক বিপ্লবের আকারটা হয়েছিল ধর্মীয়। পিউরিট্যানিজমের ভেখ ধারণ করেছিল বিপ্লব।

বুর্জোয়াদের বৈপ্লবিক উদ্দীপনা নিঃশেষ হয়ে গেল ক্রমওয়েলীয় প্রটেক্টরেটে। নব্য অভিজাতকুলের সঙ্গে জোট বেঁধে বুর্জোয়ারা স্টুয়ার্ট রাজবংশটাকে সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত করল ১৬৬০ সালে — রাজা হলেন বধ-করা রাজার ছেলে ২য় চার্লস। কিন্তু আগে যা ছিল তেমনটা আর রইল না এই রাজতন্ত্র: বিপ্লব বৃথা যায় নি। সাবেকী সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতকুলের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে নিজেদের অবস্থান মজবুত করে নিল বুর্জোয়ারা।

বিপ্লবের বিশ বছরে (১৬৪১-১৬৬০) গড়ে ওঠে নতুন পর্যায়ের মানুষ, তাদের চিন্তাধারার উপর প্রবল প্রভাব পড়ে বিপ্লবের, যদিও সে প্রভাব খুবই পৃথক-পৃথক ধরনের। অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত ছিল রাজনীতি আর ধর্ম — সেটা অচলিত হয়ে পড়ল কিছু পরিমাণে। পঞ্চম আর ষষ্ঠ দশকে যারা

ছিল তরুণ তাদের কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠল বাইবেলই প্রজ্ঞার মূল উৎস এই মর্মে পাণ্ডিতী কচকচি। বিপ্লব থেকে তাদের কাছে বর্তালো ভিন্নকিছু: বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্য, যুক্তি-বিচার, প্রগতির ভাবধারা। বিজ্ঞানক্ষেত্রে উদিত হল প্রতিভা-তারামণ্ডল। সবচেয়ে দীপ্তিমান তারাবর্গ হলেন পদার্থবিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল, দার্শনিক জন লক, আর শেষে মহান আইজাক নিউটন।

উইলিয়ম পেটি ছিলেন এই পুরুষ-পর্যায়ের, এই মহলের মানুষ। নিজ আমলের মহাপাণ্ডিতদের মধ্যে একটি সম্মানিত স্থানে ছিলেন তিনি। মার্কস বলেছেন, এই ইংরেজ অভিজাতটি ছিলেন অর্থশাস্ত্রের জনক এবং এক অর্থে পরিসংখ্যানের উদ্ভাবক।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ডিঙিয়ে পেটি-র পদক্ষেপ

কাউকে সবাই ভুলে গেল, কিন্তু পরে তাঁকে আবার তুলে আনা হল বিস্মৃতির গর্ভ থেকে — এমনসব ঘটনা রয়েছে বিজ্ঞানের ইতিহাসে। এমন একজন হলেন আঠার শতকের গোড়ার দিককার অসাধারণ অর্থনীতিবিদ রিচার্ড ক্যান্টিলন, যাঁকে ঘিরে ছিল কিছুটা রহস্য, যাঁর কাছ থেকে অনেককিছু নিয়েছিলেন — যা মার্কস বলেছেন — ফ্রাঁসোয়া কেনে, জেমস স্টুয়ার্ট এবং অ্যাডাম স্মিথের মতো বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদেরা: তাঁকে প্রায় সম্পূর্ণতই ভুলে যাওয়া হয়েছিল। বলতে গেলে, তাঁকে নতুন করে আবিষ্কার করা হয়েছিল উনিশ শতকের শেষাশেষি।

হের্মান হাইনরিখ গোস্‌সেন-এর একখানা বই প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ সালে। বইখানা লোকের মনোযোগ পেয়েছিল এতই সামান্য যাতে হতাশ হয়ে তিনি চার বছর পরে বইগুলি দোকান থেকে তুলে নিয়ে প্রায় গোটা সংস্করণটাকেই নষ্ট করে ফেলেছিলেন। কুড়ি বছর পরে বইখানা দৈবাৎ জেভন্সের হাতে পড়ে — তিনি লেখককে 'নতুন অর্থশাস্ত্রের আবিষ্কর্তা' বলে ঘোষণা করেন: গোস্‌সেন এই মর-লোক ছেড়ে গিয়েছিলেন তার অনেক আগেই। অর্থশাস্ত্র এবং তার ইতিহাস সম্বন্ধে যেকোন বুর্জোয়া পাঠ্যপুস্তকে যেটাকে বলা হয় 'গোস্‌সেন নিয়ম' সেটা এখন অর্থশাস্ত্র বিষয়ে থাকে বেশকিছুটা জায়গা জুড়ে (বিষয়ীগত-মনোগত দৃষ্টিকোণ থেকে

অর্থনীতিঘটিত দ্রব্যসামগ্রীর উপযোগ-সংক্রান্ত ধারণা-মৌলটা এই 'নিয়মে'র বিষয়বস্তু)।

পেটিকে পুনরাবিষ্কার করার দরকার ছিল না। জীবনকালেই তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন অ্যাডাম স্মিথ। ১৮৪৫ সালে ম্যাক্‌কুলোখ লিখেছেন, 'সার উইলিয়ম পেটি ছিলেন সতর শতকের সবচেয়ে অসাধারণ ব্যক্তিদের একজন'। পেটিকে সোজাসুজি শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা বলে অভিহিত করে তিনি তাঁর থেকে রিকার্ডো পর্যন্ত একটা সরল রেখা টেনে দিয়েছেন।

তবু বিজ্ঞানের জন্যে উইলিয়ম পেটিকে সম্পূর্ণত আবিষ্কার করেন মার্কস। মার্কস গড়ে তোলেন নতুন অর্থশাস্ত্র, তিনি নতুন আলোকপাত করেন এই বিজ্ঞানে — এইভাবে শুধু তিনিই দেখিয়ে দেন অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে এই দেদীপ্যমান ইংরেজ বিজ্ঞানীর স্থানটা ঠিক কোথায়। পেটি যে-ক্ল্যাসিকাল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের জনক সেটা দৃষ্টিগোচর আর্থনীতিক ব্যাপারগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করা এবং বিবরণ দেওয়ায় গণ্ডিবদ্ধ না থেকে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর অভ্যন্তরীণ নিয়মাবলি বিশ্লেষণ করতে, সেটার গতিবিধির নিয়মাবলির সন্ধানে এগিয়ে গেছে। পেটি এবং তাঁর অনুগামীদের হাতে এই বিজ্ঞান হয়ে ওঠে বাস্তবতা সম্বন্ধে উপলব্ধি এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্যে প্রচেষ্টার একখানা জোরদার হাতিয়ার।

পেটির ব্যক্তিত্ব ছিল লক্ষণীয়, তেমনটা দেখা যায় না সচরাচর, সেটা খুবই আকর্ষণ করেছিল মার্কস এবং এঙ্গেলসকে। 'পেটি মনে করেন তিনি একটা নতুন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা...', 'তাঁর অসমসাহসিক প্রতিভা...', 'উঁচু-মাত্রার নিজস্ব রসবোধ পরিব্যাপ্ত তাঁর সমস্ত রচনায়...'*, 'এমনকি এই ভ্রান্তিটার মধ্যেও রয়েছে প্রতিভা...'**, 'মর্মবস্তু এবং আকারের দিক থেকে এটা একটা ছোটখাটো মাস্টারপিস...' — মার্কসের বিভিন্ন রচনায় এইসব মন্তব্য থেকে 'আর্থনীতিক গবেষকদের মধ্যে সবচেয়ে দেদীপ্যমান এবং সৃজনীশক্তিসম্পন্ন'*** যিনি তাঁর প্রতি মার্কসের মনোভাব সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়।

---

* কার্ল মার্কস, 'অর্থশাস্ত্রের পর্যালোচনা নিবন্ধ', মস্কো, ১৯৭০, ৫২, ৫৩ পৃঃ।

** ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, অ্যান্টি-ড্যুরিং', মস্কো, ১৯৬৯, ২৭৫ পৃঃ।

*** ঐ।

পেটি যেসব রচনা রেখে গেলেন সেগুলির নিয়তি অসাধারণ ধরনের। কিছুটা অদ্ভুত ব্যাপারটার কথা বলেছেন ম্যাক্‌কুলোখ: পেটির ভূমিকার মস্ত গুরুত্ব রয়েছে, অথচ তাঁর রচনাবলি কখনও পুরোপুরি প্রকাশিত হয় নি, সেগুলি ছিল শুধু বিভিন্ন পুরন অসম্পূর্ণ সংস্করণে, যা বিরল গ্রন্থ হয়ে পড়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ। পেটি সম্বন্ধে টীকার শেষে ম্যাক্‌কুলোখ এই বিনীত আশা প্রকাশ করেছিলেন: 'পেটির অভিজাত উত্তরাধিকারীদের কাজে বর্তেছে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি ছাড়াও তাঁর প্রতিভারও অনেকটা, তাঁরা তাঁর রচনাবলির একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশ করলে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে সেটার চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্মরণিকা আর হয় না।'

তবে পেটির 'অভিজাত উত্তরাধিকারীরা' — শেলবার্নের আর্ল-রা এবং ল্যান্সডাউনের মার্কুইস-রা — তাঁদের পূর্বপুরুষকে সাধারণ্যে তুলে ধরতে খুব-যে ব্যগ্র ছিলেন তা নয়, — ইনি ছিলেন একজন মামুলি কারিগরের ছেলে, ধন-দৌলত আর আভিজাত্যের খেতাব তিনি আয়ত্ত করেছিলেন খুব একটা সাধু উপায়ে নয়, তাছাড়া, একজন সাম্প্রতিক জীবনীকারের ভাষায়, তাঁর সম্বন্ধে 'সন্দিগ্ধ লোকের ঢিঢি পড়ে গিয়েছিল চারদিকে'।

পেটির রচনাবলির বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক মূল্যের চেয়ে বিষয়টার এই দিকটাই যেন তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল দুই শতাব্দীর বেশি কাল ধরে। পেটির সংগৃহীত আর্থনীতিক রচনাবলি প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশ শতকের একেবারে শেষে। তার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর একজন বংশধর প্রকাশ করেন তাঁর জীবনী।

পেটির রাজনীতিক অভিমত, সামাজিক আর বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ এবং নিজ আমলের মস্ত-মস্ত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে এখন অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেছে। তাঁর জীবনের বহু বিস্তারিত তথ্য জানা গেছে। কোন মহামানবের চরিত্র চিত্রণে কোন ঘষা-মাজা করা কিংবা দোষ-ত্রুটি ঢাকাঢাকি করার দরকার হয় না। উইলিয়ম পেটি সম্বন্ধে এটা ষোল-আনা প্রযোজ্য। মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁর নামটি অমর হয়ে থাকবে আয়ার্ল্যান্ডের একজন মস্ত ভূস্বামী এবং চতুর (যদিও কৃতকার্য সবসময়ে নয় মোটেই) রাজসভাসদ হিসেবে নয় — চিন্তাবীর হিসেবে, যিনি নতুন-নতুন পথ খুলে ধরেছেন সমাজ-সংক্রান্ত বিজ্ঞানক্ষেত্রে। মার্কসবাদীদের বিবেচনায় পেটি হলেন প্রথমত ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা পেটিকে মহাবিজ্ঞানী এবং লক্ষণীয় মানুষ বলে মেনে

নিলেও তাঁরা অনেকে তাঁকে স্মিথ, রিকার্ডো এবং মার্কসের পূর্বসূরি বলে বিবেচনা করতে অরাজি। এই বিজ্ঞানে পেটির স্থান স্থির করতে গিয়ে অনেক সময়ে দেখান হয় তিনি যেন গবেষণার শুদ্ধ আর্থনীতিক-পরিসংখ্যান প্রণালীর ভিত্তি স্থাপন করেন।

শুম্পিটার গোঁ ধরে বলেন, পেটির রচনায় শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্ব (কিংবা সাধারণভাবে মূল্য-সংক্রান্ত ধারণা) নেই, বিশেষ কোন তত্ত্ব নেই মজুরি সম্বন্ধে, কাজেই উদ্বৃত্ত মূল্য তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এমন কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। 'পেটি অর্থনীতিবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা এই মর্মে মার্কসের আজ্ঞপ্তি*, আর যাঁরা বোঝেন না তাঁরা কার সুবিধে করে দিচ্ছেন — শুম্পিটার ঠারে-ঠোরে বলেছেন — এমন কিছু-কিছু বুর্জোয়া পন্ডিতের প্রশস্তির কাছেই তিনি নিজ খ্যাতির জন্যে বাধিত।

বুর্জোয়া পন্ডিতদের বহু রচনায় পেটিকে ধরা হয়েছে স্রেফ বণিকতন্ত্রীদের একজন প্রবক্তা হিসেবে — হয়ত সবচেয়ে প্রতিভাশালী এবং পরিণত প্রবক্তাদের একজন, কিন্তু শুধু ঐ পর্যন্ত। পরিসংখ্যান প্রণালী আবিষ্কার করা ছাড়া তাঁকে আর যেজন্যে বাহাদুরি দেওয়া হয় তা হল বড়জোর পৃথক-পৃথক আর্থনীতিক সমস্যা নিয়ে এবং আর্থনীতিক কর্মনীতি-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নে তাঁর বিচার-বিবেচনা — যেমন করাধান, বহিঃশুল্ক। আধুনিক বুর্জোয়া বিজ্ঞানক্ষেত্রে এই বিবেচনাধারাটারই একাধিপত্য এমনটা বলা চলে না। অন্যান্য অভিমতও প্রকাশ পেয়েছে, তাতে অর্থনীতি-বিজ্ঞানে পেটির ভূমিকাটিকে ধরা হয়েছে অপেক্ষাকৃত সঠিক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে। তবে শুম্পিটারের মতাবস্থানটারই প্রাধান্য, এবং এটা আপতিক নয়।

ক্যাবিন্ বয় থেকে ভূস্বামী

ড্যানিয়েল ডিফোর উপন্যাসের নায়ক রবিনসন ক্রুসো বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে নাবিক হয়েছিল। এইভাবে শুরু হয় যে-অ্যাডভেঞ্চার সেটা পাঠকদের রোমাঞ্চিত করে আসছে আড়াই শতাব্দী ধরে। দক্ষিণ ইংলন্ডে হ্যাম্পশায়ারের রোম্‌জে-তে পশম-তাঁতি অ্যান্টনি পেটির পরিবারেও

* J. A. Schumpeter, 'History of Economic Analysis', New York, 1955, p. 210.

ঘটেছিল তেমনি ঘটনা: তাঁর চোদ্দ বছরের ছেলে উইলিয়ম জাতপেশা ধরতে নারাজ হয়ে সাউথাম্পটনে গিয়ে ক্যাবিন-বয়্-এর কাজ নেন।

জাহাজে কাজ নিয়ে চলে যাওয়াটা ছিল সতর আর আঠার শতকের ইংলন্ডে নীরস একঘেয়ে জীবনে বহু বালকের বিতৃষ্ণাজ্ঞাপনের প্রচলিত ধরন — অ্যাডভেঞ্চার আর স্বাধীনতার জন্যে নওজোয়ানের যুগযুগান্তরের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। এটা নয় জীবনযাত্রার বুর্জোয়া প্রণালীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ: উলটে, এইসব তরুণের অ্যাডভেঞ্চার-তৃষ্ণাটা কমবেশি সজ্ঞানে জড়িত থাকত বড়লোক হওয়া এবং নতুন বুর্জোয়া জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা কামনার সঙ্গে। এই উপাদানটা পেটির বেলায়ও বিশেষক ছিল সর্বাংশে।

এক বছর পরে পেটির পা ভাঙে জাহাজে। তখনকার কঠোর রেওয়াজ অনুসারে তাঁকে সবচেয়ে কাছের পাড়ে ডাঙ্গায় নামিয়ে দেওয়া হয়। এটা ছিল উত্তর ফ্রান্সের নর্ম্যান্ডির কূল। কবিতকর্মা বলে এবং কর্মক্ষমতা আর বরাতের জোরে পেটি রক্ষা পান। আত্মজীবনীতে তিনি বলেছেন ডাঙ্গায় নামিয়ে দেবার সময়ে তাঁকে কত সামান্য টাকা-পয়সা দেওয়া হয়েছিল, কিভাবে তিনি সেটা কাজে লাগান, এবং হরেক রকমের এটা-ওটা কিনে এবং লাভ রেখে সেগুলো আবার বেচে দিয়ে নিজের 'ধন' বাড়িয়ে তুলেছিলেন কিভাবে, এই বিবরণ যা সাবধানে নিখুঁত সেটাও আবার কোন রবিনসন ক্রুসো-র পক্ষেই উপযুক্ত। একজোড়া ক্রাচ্-ও তাঁকে কিনতে হয়েছিল, সেটা অবশ্য তিনি ছাড়তে পেরেছিলেন শিগগিরই।

পেটি ছিলেন 'তাজ্জব ব্যাপার' গোছের। রোম্‌জে-র টাউন স্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন বিশেষকিছু নয়, তবু তিনি ল্যাটিন জানতেন এতই খাসা যাতে তিনি ল্যাটিন কাব্যচর্চায় ভরতি হবার জন্যে 'দরখাস্ত' করেছিলেন জেসুইটদের কাছে, তাদের একটা কলেজ ছিল কান্-এ। তরুণের ক্ষমতা দেখে তারা স্তম্ভিত হয়েছিল, কিংবা মূল্যবান কিছু সংগ্রহ করতে চেয়েছিল ক্যাথলিক চার্চের জন্যে, যা-ই হোক, জেসুইটরা তাঁকে কলেজে ভরতি করেছিল এবং তাঁর খোরপোশের খরচ দিত। পেটি সেখানে ছিলেন দু'বছর, তার ফলে, তিনি নিজেই যা লিখেছেন, 'আমি আয়ত্ত করেছিলাম ল্যাটিন গ্রীক আর ফরাসী ভাষা, সমগ্র সাধারণ গণিত, নৌবাহে সহায়ক ফলিত জ্যামিতি আর জ্যোতিষ...'* গণিতে পেটির ব্যুৎপত্তি ছিল বিশিষ্ট;

* E. Strauss, 'Sir William Petty. Portrait of a Genius', London, 1954, p. 24.

এক্ষেত্রে তাঁর আমলের সাধনসাফল্যগুলির সঙ্গে তিনি তাল রেখে চলেছিলেন আজীবন।

১৬৪০ সালে পেটি লন্ডনে রুজি রোজগার করতেন সমুদ্রের মানচিত্র এঁকে। তারপর তিনি তিন বছর কাজ করেন নৌবাহিনীতে; নৌবাহ এবং মানচিত্রবিদ্যায় তাঁর দক্ষতা সেখানে খুবই কাজে লেগেছিল।

এই বছরগুলিতে চরমে উঠেছিল বিপ্লব, প্রচন্ড রাজনীতিক এবং ভাবাদর্শগত সংগ্রাম, বেধেছিল গৃহযুদ্ধ। বিশ-বৎসরবয়স্ক পেটি মূলত ছিলেন বুর্জোয়া বিপ্লব আর পিউরিট্যানিজমের পক্ষে, কিন্তু এই সংগ্রামে নিজে জড়িয়ে পড়ার কোন ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তাঁকে মুগ্ধ করেছিল বিজ্ঞান। হল্যান্ডে আর ফ্রান্সে গিয়ে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন চিকিৎসাবিদ্যা। এই বহুধা জ্ঞান শুধু পেটির নিজস্ব ধীশক্তির পরিচায়ক নয়: পৃথক-পৃথক বিজ্ঞানে বিভাগ সবে শুরু হচ্ছিল সতর শতকে; জ্ঞান-বিজ্ঞানক্ষেত্রে বহুমুখী ব্যুৎপত্তি তখন বিরল বস্তু ছিল না।

তারপর এসেছিল ভ্রমণ, প্রবল কর্মকান্ড আর একাগ্রচিত্তে জ্ঞান আত্মভূত করার তিনটে খুশির বছর। আম্‌স্টার্ডামে পেটি জীবিকার্জন করতেন অলঙ্কার চশমা ইত্যাদির একজন ব্যবসায়ীর কর্মশালায়। দার্শনিক হব্‌স প্যারিসে প্রবাসিত ছিলেন, সেখানে তাঁর সেক্রেটারির কাজ করতেন পেটি। চব্বিশ বছর বয়সে পেটি সুপরিণত মানুষ, যাঁর জ্ঞান বহুবিস্তৃত, বিপুল কর্মশক্তি, যিনি আনন্দে বাঁচতে জানেন, যাঁর অমায়িকতা সবাইকে আকর্ষণ করে।

ইংলন্ডে ফিরে পেটি শিগগিরই অক্সফোর্ডে আর লন্ডনে একটি তরুণ বিজ্ঞানিদলের বিশিষ্ট সদস্য হয়ে ওঠেন; অক্সফোর্ডে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন চালিয়ে যাচ্ছিলেন, আর লন্ডনে তিনি কাজ করতেন রুজি রোজগারের জন্যে। এই বিজ্ঞানীরা রসিকতার মেজাজে নিজেদের বলতেন 'অদৃশ্য বোর্ড', তবে স্টুয়ার্ট রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটু পরেই তাঁরা গড়েন রয়্যাল সোসাইটি — নবযুগে প্রথম বিজ্ঞান আকাদমি। ১৬৫০ সালে পেটি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়ে কলেজগুলির একটিতে শারীরস্থানের প্রফেসর এবং ভাইস-প্রিন্সিপাল হবার পরে 'অদৃশ্য বোর্ড'টির বৈঠক চলতে থাকে অবিবাহিত পেটির ফ্ল্যাটে, সেটা তিনি ভাড়া নিয়েছিলেন একজন ঔষধ-ব্যবসায়ীর বাড়িতে।

পেটি সমেত এইসব বিজ্ঞানীর রাজনীতিক অভিমত খুব একটা

র‍্যাডিকাল ছিল না। তবে বিপ্লবের ফলে ইতোমধ্যে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়েছিল (মে, ১৬৪৯), সেই বিপ্লবের মেজাজের ছাপ থেকে গিয়েছিল তাঁদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের উপর। বিজ্ঞানক্ষেত্রে তাঁরা লড়েছিলেন পণ্ডিতী কচকচির বিরুদ্ধে পরীক্ষামূলক প্রণালীর সপক্ষে। বিপ্লবের এই মেজাজ এবং গণতান্ত্রিকতা আত্মভূত ক'রে পেটি সেটা বজায় রেখেছিলেন জীবনভর, যা পরবর্তী বছরগুলিতে এই ধনী ভূস্বামী এবং অভিজাতের মাঝে আত্মপ্রকাশ করে কখনও-কখনও, যাতে তাঁর সাফল্য ব্যাহত হয়েছিল রাজসভায়।

স্পষ্টতই পেটি ছিলেন ভাল চিকিৎসক এবং শারীরস্থানবিদ। অক্সফোর্ডে তাঁর সাফল্য, চিকিৎসা বিষয়ে এই তরুণ প্রফেসরের বিভিন্ন রচনা এবং পরে উঁচু পদে তাঁর নিয়োগ থেকে সেটা দেখা যায়। এই সময়কারই একটা ঘটনার ফলে তিনি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক সাধারণ্যে বিদিত হন সেই প্রথম।

তখনকার দিনের বর্বর আইনকানুন আর রীত-রেওয়াজ অনুসারে ১৬৫০ সালে ডিসেম্বর মাসে অক্সফোর্ডে এন্ গ্রীন নামে একটি মেয়ের ফাঁসি হয়। এই গরিব কৃষক মেয়েটিকে ফুসলে নিয়েছিল এক তরুণ স্কয়্যার; নিজ সন্তানকে মেরে ফেলার অভিযোগ ছিল মেয়েটির বিরুদ্ধে। (পরে প্রকাশ পায় সে ছিল নির্দোষ: অকালজাত শিশুটি মারা গিয়েছিল স্বাভাবিক কারণেই।) মেয়েটি মারা গেছে বলে সাব্যস্ত হলে লাশ কফিনে রাখা হয়েছিল। এমন সময়ে সেখানে এসে পড়লেন ডক্টর পেটি এবং তাঁর সহকারী: শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্যে লাশটাকে তাঁরা নিতে চেয়েছিলেন। ডাক্তার দু'জন আশ্চর্য হয়ে গেলেন: ফাঁসি-দেওয়া মেয়েটির দেহে তখনও প্রাণের স্পন্দন। চটপট ব্যবস্থা করে তাঁরা 'পুনর্জীবিত' করলেন তাকে! পরবর্তী ঘটনাচক্র এবং পেটির স্বভাবের বহু দিকের পক্ষে বিশেষক তাঁর ক্রিয়াকলাপ আগ্রহজনক। এক, খুবই অদ্ভুত রকমের এই রোগীটির শারীরিক ছাড়াও মানসিক অবস্থা সম্বন্ধেও কতকগুলি পর্যবেক্ষণ চালিয়ে পাওয়া উপাত্তগুলোকে তিনি নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করেন। দুই, তিনি চিকিৎসায় দক্ষতার পরিচয় দেন শুধু তাই নয়, প্রদর্শন করেন মানবধর্মও: এন্‌কে তিনি আদালত থেকে বেকসুর খালাস করান, তার জন্যে চাঁদা তোলার ব্যবস্থা করেন। তিন, স্বাভাবিক ব্যবসাদারি বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে তিনি ঘটনাটাকে কাজে লাগান নিজের সম্বন্ধে প্রচারের জন্যে।

১৬৫১ সালে ডাঃ পেটি হঠাৎ প্রফেসরের পদ ছেড়ে দেন; আয়ার্ল্যান্ডে ইংলন্ডের ফৌজের প্রধান সেনাপতির চিকিৎসকের পদ তিনি পান। আয়ার্ল্যান্ডের মাটিতে তিনি প্রথম পা ফেলেন ১৬৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এমন আকস্মিক পরিবর্তন তিনি ঘটালেন কেন? অ্যাড্‌ভেঞ্চারপ্রবণ এই উদ্যমশীল এই তরুণের পক্ষে অক্সফোর্ডে প্রফেসরের জীবনটা ছিল বড়ই মন্দাক্রান্তা, তার থেকে তিনি বিশেষকিছু আশা করতে পারেন নি সেটা স্পষ্টই।

আয়ার্ল্যান্ডে একটা ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরে ইংরেজরা দেশটাকে পুনর্জয় করে নিয়েছে সবে, সেই সময়ে পেটি দেখেন দশ বছরের যুদ্ধ ভুখা আর রোগে জর্জরিত সেই ভূমি। ইংরেজবিরোধী অভ্যুত্থানে অংশগ্রাহী আইরিশ ক্যাথলিকদের ভূমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। ঐ যুদ্ধে অর্থ যুগিয়েছিল লন্ডনের যে-ধনীরা তাদের এবং বিজয়ী বাহিনীর অফিসার আর সৈন্যদের পাওনা মেটাতে এই ভূমি কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন ক্রমওয়েল। মোট লক্ষ লক্ষ একর পরিমাণের সেইসব ভূমি আবণ্টনের জন্যে আগে জরিপ করে সেগুলোর পরচা তৈরি করার দরকার ছিল। (আর সেটা তখন করা চাই দ্রুত, কেননা ফৌজ অস্থির হয়ে উঠেছিল, পারিতোষিক দাবি করছিল সৈনিকেরা।) সতর শতকের মাঝামাঝি সময়ে কাজটার দুষ্করতা ছিল পেল্লায়: কোন মানচিত্র ছিল না, মাপনযন্ত্র ছিল না, না-ছিল উপযুক্ত লোকজন কিংবা পরিবহন ব্যবস্থা। কৃষকরা আমিনদের উপর হামলা চালাতে থাকে।

চটপট বড়লোক হয়ে উপরে ওঠার বিরল সুযোগ হিসেবে এটাকে বিবেচনা করে পেটি কাজটা হাতে নিলেন। মানচিত্রবিদ্যা আর ধরাকৃতিবিদ্যায় জ্ঞান তাঁর খুব কাজে লেগে গেল। তবে দরকার ছিল আরও কিছু: কর্মশক্তি, তেজী উদ্যম, চাতুর্য। ফৌজের ভূমিগুলো জরিপ করে দেবার জন্যে পেটি সরকার আর ফৌজের কাছ থেকে কণ্ট্র্যাক্ট নিলেন। যেসব সৈনিক ভূমি পাবে, প্রধানত তাদের কাছ থেকে পাওয়া টাকা থেকে পেটিকে পারিশ্রমিক দেবার ব্যবস্থা হয়। নতুন-নতুন যন্ত্র আনাবার জন্যে পেটি লন্ডনে ফরমাশ দিলেন; হাজার-খানেক লোক নিয়ে তিনি গড়লেন একটা গোটা আমিন-বাহিনী; আয়ার্ল্যান্ডের যেসব মানচিত্র তিনি প্রস্তুত করলেন সেগুলো জমির মামলা নিষ্পত্তির জন্যে আদালতে ব্যবহৃত হয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি অবধি। আর এই কাজ সমাধা করতে তাঁর লেগেছিল এক বছরের সামান্য বেশি। এই মানুষটি হাত লাগাতে পারতেন যেকোন কাজে!

‘ফৌজের ভূমি জরিপ’ একটা সত্যিকার সোনার খনি হয়ে দাঁড়িয়েছিল পেটির পক্ষে; তখন তাঁর বয়স তিরিশ বছরের একটু বেশি। আয়ার্ল্যান্ডে যাবার সময়ে তিনি একজন মধ্যম গোছের চিকিৎসক, আর অল্প কয়েক বছর পরেই তিনি সেদেশে সবচেয়ে ধনী, সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী একজন।

এই চাঞ্চল্যকর শ্রীবৃদ্ধিতে কী ছিল বৈধ, আর কী ছিল বেআইনী? এটা নিয়ে প্রচন্ড বাদ-বিসংবাদ চলেছিল পেটির জীবনকালেই: এর উত্তরটা কতকাংশে নির্ভর করে কারও দৃষ্টিকোণের উপর। আয়ার্ল্যান্ড দেশটাকে লুটে নেওয়াই ছিল অবৈধ। পেটি কাজ চালান সেই ভিত্তিতে, কিন্তু নিজে সর্বদা থাকেন আনুষ্ঠানিক বৈধতার কাঠামের ভিতরে: অপহরণ করেন নি — নিয়েছেন বিদ্যমান কর্তৃপক্ষের হাত থেকে; চুরি করেন নি — কিনেছেন; লোককে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করেছেন অস্ত্রের বলে নয় — আদালতের রায় অনুসারে। ঘুস কিংবা দুর্নীতি ছিল না, তা সম্ভবপর নয়, কিন্তু সেটা তো স্বাভাবিক রেওয়াজ বলেই গণ্য ছিল।

পেটির প্রচন্ড কর্মশক্তি, আত্মপ্রতিষ্ঠা আর অ্যাড্‌ভেঞ্চারের জন্যে উগ্র কামনা — এই সবকিছু কিছুকালের জন্যে প্রকাশ পেয়েছিল বড়লোক হবার বাতিক হিসেবে। কণ্ট্র্যাক্ট পূরণ করে তাঁর ছাঁকা লাভ হয়েছিল — তিনি নিজেই বলেছেন — ৯,০০০ পাউন্ড; যেসব অফিসার আর সৈনিক জমি-বন্দ পেয়ে দখলে নেবার জন্যে অপেক্ষা করতে পারে নি কিংবা চায় নি তাদের ভূমি তিনি কিনে নিয়েছিলেন ঐ টাকাটা দিয়ে। তাছাড়া, পারিশ্রমিকের একাংশ তিনি সরকারের কাছ থেকে পেয়েছিলেন ভূমি আকারে। এই ধূর্ত চিকিৎসক বিষয়-সম্পত্তি বাড়িয়ে তুলেছিলেন ঠিক কী উপায়ে সেটা আমাদের জানা নেই, তবে একেবারেই আশাতীত হয়েছিল তাঁর সাফল্য। ফলে তিনি দ্বীপটির বিভিন্ন এলাকায় হাজার-হাজার একর ভূমির মালিক হয়ে দাঁড়ান। তাঁর জমিদারি আরও সম্প্রসারিত হয়েছিল পরে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হয়েছিলেন প্রটেক্টর ক্রমওয়েলের ছোট ছেলে আয়ার্ল্যান্ডের লর্ড লেফ্‌টেন্যান্ট হেনরি ক্রমওয়েলের বিশ্বস্ত সহকারী এবং সচিব।

শত্রু আর অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের সড়-ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও পেটির শ্রীবৃদ্ধি চলেছিল দু’-তিন বছর ধরে। কিন্তু অলিভার ক্রমওয়েল মারা যান ১৬৫৮ সালে, তখন তাঁর ছেলের অবস্থান ক্রমেই বেশি অনিশ্চিত হয়ে উঠতে থাকে।

ডাক্তারের কাণ্ডকারখানা তদন্ত করতে একটা বিশেষ কমিশন বসাতে বাধ্য হন লর্ড লেফ্‌টেন্যাণ্ট নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কমিশনে অনেকে ছিলেন পেটির বন্ধু তা ঠিক। তাছাড়া, নিজ ধ্যান-ধারণার জন্যে যেমনটা তেমনি উদ্যম প্রতিভা আর দক্ষতার সঙ্গেই তিনি লড়েছিলেন নিজ ধন-দৌলত আর সুনামের জন্যে। নিজেকে তিনি নির্দোষ সাব্যস্ত করতে পেরেছিলেন — সেটা কমিশনের সামনেই শুধু নয়, লণ্ডনে পার্লামেণ্টেও (তাতে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন সবে)। এই লড়াইয়ের পরিণতিতে তাঁর জয়জয়কার হয় নি, কিন্তু কোন ক্ষতি হয় নি অন্তত। ১৬৬০ সালে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আগেকার কয়েক মাসে তালগোল পাকান রাজনীতিক পরিস্থিতিতে পেটির ব্যাপারটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, সেটা খাসা সুবিধাজনক হল তাঁর পক্ষে।

২য় চার্লস নির্বাসন থেকে ফিরলে যেসব রাজতন্ত্রী ক্ষমতাবান হয়েছিল তাদের বেশকিছু খিদমত হেনরি ক্রমওয়েল এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুটি করেছিলেন রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঠিক আগে। তার ফলে প্রটেক্টর-নন্দন সসম্মানে ব্যক্তিগত জীবনের মাঝে সরে যেতে পেরেছিলেন, আর পেটি প্রবেশলাভ করেছিলেন রাজসভায়। পশম-তাঁতির ছেলেটিকে 'নাইট' করা হয় ১৬৬১ সালে, তখন তাঁর নাম হয় সার উইলিয়ম পেটি। এটা তাঁর সাফল্যের শিখর। তিনি রাজা চার্লসের অনুগ্রহভাজন হলেন, অপদস্থ করলেন শত্রুদের, তখন তিনি ধনী স্বাধীন প্রতিপত্তিশালী।

কোন-কোন দলিল এবং পেটির চিঠিপত্র থেকে সঠিক জানা আছে 'ক্রাউন্' থেকে তাঁকে 'পিয়ার' করতে চাওয়া হয়েছিল দু'বার। তবে তাঁর বিবেচনায় — এটা ভিত্তিহীন নয় — ঐসব প্রস্তাব ছিল তাঁর একটা অনুরোধ তুচ্ছ করার ছুতো: তাঁর কিছু-কিছু সাহসী আর্থনীতিক পরিকল্প যাতে কার্যে পরিণত করা যায় এমন একটা কার্যগত সরকারী পদ তাঁকে দেবার অনুরোধ জানিয়ে তিনি জ্বালাতন করছিলেন রাজা এবং রাজসভাকে। এই রাজ-অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করার কারণ বোঝাবার জন্যে একখানা চিঠিতে তিনি যা লিখেছিলেন সেটা খুবই তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং স্টাইলের বিশেষক: 'একটা পিতলে আধা-ক্রাউন যতই জাঁকিয়ে ছাপানো আর গিল্টি-করা হোক সেটা হবার আগে নিজস্ব মূল্যসম্পন্ন তামার ফার্দিং হওয়াই শ্রেয়।'*

---

* 'Dictionary of National Biography', ed. by L. Stephen and S. Lee, Vol. 45, p. 116.

রাজসভার বহু-স্তরের সোপানতন্ত্রে পেটির খেতাব ছিল একেবারে নিচেরটা।

সার উইলিয়ম পেটি মারা যাবার মাত্র এক বছর পরেই তাঁর বড় ছেলে চার্লসকে করা হয়েছিল ব্যারন শেলবার্ন। তবে এটা ছিল নিম্নশ্রেণীর আইরিশ ব্যারন-খেতাব, — লণ্ডনে লর্ডসভায় আসনগ্রহণের অধিকার তাতে দেওয়া হয় নি। অবশেষে এই স্থান লাভ করেছিলেন পেটির প্রপৌত্র; ইংরেজদের ইতিহাসে তাঁর নাম লিপিবদ্ধ আছে গুরুত্বপূর্ণ একজন রাজনীতিক এবং হুইগ্ পার্টির নেতা হিসেবে, তাতে শিরনামটা হল — ল্যান্সডাউনের মার্কুইস।

প্রসঙ্গত বলি, বিংশ শতাব্দীর বৃটেনে যেসব বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকে শাসক শ্রেণীগুলির খিদমতে তাঁদের বৈজ্ঞানিক কাজের জন্যে 'পিয়ারের' খেতাব দেওয়া হয়। এমন প্রথম 'অর্থশাস্ত্রের অভিজাত' হলেন কেইন্স।

অর্থশাস্ত্রের কলাম্বাস

জানাই আছে, জীবনের একেবারে শেষ অবধিও কলাম্বাস জানতেন না তিনি আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকা, কেননা নতুন মহাদেশ নয়, তিনি যাত্রা করেছিলেন ভারতে যাবার সমুদ্রপথ বের করার জন্যে।

পেটি বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন বিশেষ-বিশেষ উদ্দেশ্যে, কখনও-সখনও স্রেফ পয়সার জন্যেই, যা রেওয়াজ ছিল তখনকার দিনের অর্থনীতিবিদের পক্ষে। নিজের কৃতিত্ব হিসেবে তিনি নিজে যা আরোপ করেছেন সেটা হল বড়জোর রাজনীতিক পাটিগণিত (পরিসংখ্যান)। এটাকে তাঁর প্রধান সাধনসাফল্য বলে গণ্য করেছেন তাঁর সমসাময়িকেরাও। প্রকৃতপক্ষে তিনি করেছিলেন আরও কিছু: মূল্য, খাজনা, মজুরি, শ্রমবিভাগ এবং অর্থ সম্বন্ধে যেন প্রসঙ্গতই তিনি যেসব ভাব-ধারণা ব্যক্ত করেন সেগুলো হয়ে উঠল বিজ্ঞানসম্মত অর্থশাস্ত্রের ভিত্তি। এই আসল 'আর্থনীতিক আমেরিকা'ই আবিষ্কার করলেন এই নতুন কলাম্বাস।

পেটির প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আর্থনীতিক রচনার নাম হল 'A Treatise of Taxes and Contributions' ('বিভিন্ন কর এবং দেওন সম্বন্ধে নিবন্ধ') — এটা বেরয় ১৬৬২ সালে। এটা বোধহয় তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনাও বটে। নতুন সরকার কিভাবে (নিশ্চয়ই তাঁর ব্যক্তিগত অংশগ্রহণে, এমনকি তাঁর তত্ত্বাবধানেই) করাধান থেকে রাজস্ব বাড়াতে পারে সেটা ঐ সরকারকে

দেখাতে গিয়ে তিনি নিজের আর্থনীতিক অভিমতটাকেও তুলে ধরেন অপেক্ষাকৃত পূর্ণ আকারে।

পেটি ডাক্তার, সেটা তিনি ততদিনে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। গণিত বলবিদ্যা কিংবা জাহাজনির্মাণ বিষয়ে তিনি মন দিতেন শুধু বিরল অবসরকালে কিংবা কোন-কোন বিজ্ঞানী বন্ধুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের সময়ে। তাঁর উদ্ভাবনতৎপর বহুমুখী মানস তখন ক্রমেই আরও বেশি-বেশি ঘুরে যাচ্ছিল অর্থনীতিবিদ্যা আর রাজনীতির দিকে। তাঁর মাথায় তখন ভরা ছিল নানা পরিকল্পনা, প্রকল্প আর প্রস্তাব: কর-সংস্কার, পরিসংখ্যান কৃত্যক স্থাপন, বাণিজ্যের উন্নতিবিধান, ইত্যাদি। এই সবকিছু প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর ঐ 'নিবন্ধ'-এ। আরও কিছু তাছাড়াও। পেটির 'নিবন্ধ' সম্ভবত সতর শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর্থনীতিক রচনা, ঠিক যেমন জাতিসমূহের সম্পদ সম্বন্ধে অ্যাডাম স্মিথের বইখানা ছিল আঠার শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আর্থনীতিক রচনা।

ঐ 'নিবন্ধ' সম্বন্ধে কার্ল মার্কস দু'-শ' বছর পরে লেখেন: 'এই নিবন্ধে তিনি প্রকৃতপক্ষে **পণ্যের মূল্য** নির্ধারণ করেন তাতে নিহিত **শ্রমের পরিমাণ** দিয়ে।'* আবার, 'উদ্বৃত্ত মূল্য নির্ধারণ **নির্ভর করে মূল্য নির্ধারণের উপর**'।** ঐ ইংরেজ চিন্তাবীরের বৈজ্ঞানিক সাধনসাফল্যের সারমর্মটা চুম্বকে প্রকাশ পেয়েছে এই কথাগুলিতে।

তাঁর যুক্তিধারাটা ধরে এগিয়ে দেখা যাক — সেটা আগ্রহজনক।

নতুন, বুর্জোয়া যুগের মানুষের প্রখর বোধশক্তি থেকে তিনি যা মূলত উদ্বৃত্ত মূল্য-সংক্রান্ত প্রশ্ন সেটাকে তুলেছেন সঙ্গে সঙ্গেই: '...সেগুলোর রহস্যাচ্ছন্ন স্বধর্মের ব্যাখ্যা দিতে আমাদের চেষ্টা করতে হবে অর্থ প্রসঙ্গেও — যে-অর্থ থেকে আগমকে আমরা বলি সুদ — তেমনি ভূমি আর ঘর-বাড়ি প্রসঙ্গেও, যা উল্লিখিত।'*** প্রধান যে-বস্তুটাতে মানুষের শ্রম প্রয়োগ করা হত সেটা সতর শতকেও ছিল ভূমি। কাজেই পেটির দৃষ্টিতে উদ্বৃত্ত মূল্য শুধু ভূমি-খাজনা আকারেই দেখা দেয়, যাতে প্রচ্ছন্ন থাকে

* কার্ল মার্কস, 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব', ১ম ভাগ, মস্কো, ১৯৬৯, ৩৫৫ পৃঃ।

** ঐ।

*** W. Petty, 'The Economic Writings', Vol. I, Cambridge, 1899, p. 42.

শিল্পক্ষেত্রের লাভও। সুদও তিনি বের করেন খাজনা থেকে। বাণিজ্যের লাভ সম্পর্কে পেটি বিশেষ কোন আগ্রহ দেখান নি, এটা হল সমসাময়িক অন্যান্য বণিকতন্ত্রীদের থেকে তাঁর একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য। খাজনার রহস্যাচ্ছন্ন স্বধর্ম-সংক্রান্ত তাঁর উক্তিটাও আগ্রহজনক। পেটি টের পান তাঁর সামনে একটা মস্ত বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন — তাতে কোন ব্যাপারের সারমর্ম থেকে সেটার চেহারার পার্থক্য আছে।

তারপর আসছে প্রায়ই উদ্ধৃত একটা রচনাংশ। ধরা যাক একজন (এই জন হবে নায়ক পাটিগণিতের পাঠ্যপুস্তকেই শুধু নয়, আবার বিভিন্ন আর্থনীতিক প্রবন্ধেও বটে!) শস্য ফলাবার কাজ করে। সে যা পয়দা করে তার একাংশ নতুন বীজ হিসেবে কাজে লাগে, একাংশ খরচ হয় নিজের প্রয়োজন (তার মধ্যে বিনিময়ও) মেটাতে, আর 'শস্যের বাদবাকিটা হল সেই বছরের জন্যে ভূমি থেকে স্বাভাবিক এবং আসল আগম'। এখানে পাওয়া গেল তিনটে প্রধান অংশে উৎপাদের বিভাগ — উৎপাদের, কাজেই সেটার মূল্যের এবং সেটা যাতে পয়দা হয়েছে সেই শ্রমের: ১) নিঃশেষিত উৎপাদনের উপকরণ প্রতিস্থাপনের অংশটা, এক্ষেত্রে বীজ*; ২) কর্মী এবং তার পরিবারের জীবনধারণের জন্যে যা অত্যাবশ্যক সেই অংশটা, আর ৩) উদ্বৃত্ত, বা নীট আয়। মার্কসের চালু-করা উদ্বৃত্ত উৎপাদ এবং উদ্বৃত্ত মূল্য-সংক্রান্ত ধারণার সঙ্গে মেলে এই শেষের অংশটা।

তারপর পেটি তুলেছেন এই প্রশ্নটা — '...এই শস্য বা আগম কতটা ইংলণ্ডের অর্থের সমমূল্য? আমার উত্তর হল, ততটা অর্থ, যতটা আর একজন শুধু সেটা পয়দা করে পাবার জন্যেই কাজে লাগলে একই সময়ের মধ্যে বাঁচাতে পারে তার খরচ-খরচার উপরি, যথা আর একজন যেন গেল একটা দেশে যেখানে আছে রুপো, খুঁড়ে তুলল সেটা, শোধন করল, সেটাকে নিয়ে এল সেই একই জায়গায় যেখান অন্য জন রুয়েছিল শস্য; একই লোক রুপোর জন্যে কাজের সবটা সময়ে, তার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনযাত্রার জন্যে

* উৎপাদনের উপকরণের অন্যান্য ব্যয় বাদ দিয়েছেন — যেমন সার, তাছাড়া ঘোড়া লাঙল কাস্তে ইত্যাদির ব্যবহারজনিত ক্ষয়। এইসব খরচ-খরচা শস্য হিসেবে বস্তু-পুনর্ভরণ না হতে পারে (হয়ত এই কারণে পেটি সেটা হিসাবে ধরেন নি), কিন্তু সেটা পুনর্ভরণ হওয়া চাই মূল্যের দিক থেকে। ধরা যাক দশ বছরে কর্ষকের দরকার হবে একটা নতুন ঘোড়া। পরে ঘোড়া কেনার খরচের একটা অংশ তার সরিয়ে রাখা চাই প্রত্যেক বছরের ফসল থেকে।

আবশ্যক খাদ্য যোগাড় করে, আশ্রয় জোটায়, ইত্যাদি। আমি বলি, একজনের রুপোকে অন্য জনের শস্যের সমমূল্য বলে গণ্য করতে হবে: প্রথমটা ধরা যাক কুড়ি আউন্স, আর পরেরটা কুড়ি বুশেল। এর থেকে এটা দাঁড়াচ্ছে যে, এই শস্যের এক বুশেলের দাম হল এক আউন্স রুপো'।*

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, শস্য আর রুপোর যে-যে অংশ উদ্বৃত্ত উৎপাদ সেই দুটোকে মূল্য হিসেবে সমীকরণটা থোক উৎপাদ সমীকরণেরই শামিল। দেখাই যাচ্ছে, অন্য ৩০ বুশেল শস্য যা থেকে বীজ আসে এবং খামারীর জীবনধারণের সংস্থান হয় সেটা থেকে কোনক্রমেই পৃথক নয় শেষোক্ত ২০ বুশেল শস্য। উল্লিখিত ২০ আউন্স রুপো সম্পর্কেও ঐ একই কথা। আর একটা জায়গায় পেটি শ্রমঘটিত মূল্য-সংক্রান্ত ধারণাটা ব্যক্ত করেছেন স্পষ্ট আকারে: 'কেউ যে-সময়ের মধ্যে এক বুশেল শস্য পয়দা করতে পারে সেই একই সময়ের মধ্যে সে পেরুর মাটি থেকে এক আউন্স রুপো তুলে লণ্ডনে আনতে পারলে তার একটা হল অন্যটার স্বাভাবিক দাম...'**

পেটি এইভাবে সূত্রবদ্ধ করলেন মূলত **মূল্য নিয়ম**। তিনি বোঝেন নিয়মটা সক্রিয় থাকে খুবই জটিল ধরনে — শুধু একটা সাধারণ ধারা হিসেবে। সেটা প্রকাশ পেয়েছে নিম্নলিখিত যথার্থ আশ্চর্য কথাটায়: 'আমি বলি, এটা হল বিভিন্ন মূল্যের সমতাবিধান এবং প্রতিমান করার ভিত্তি; যদিও আমি কবুল করছি এই ভিত্তিতে উপরকাঠাম এবং চলিতকর্মগুলিতে রয়েছে বহুবৈচিত্র্য এবং জটিলতা...'***

যেটার পরিমাণ নির্ধারিত হয় শ্রমব্যয় দিয়ে সেই বিনিময়-মূল্য এবং আসল বাজার দরের মধ্যে থাকে অনেক মধ্যবর্তী পর্ব, যার দরুন দাম গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটা চূড়ান্ত মাত্রায় জটিল হয়ে দাঁড়ায়। অসাধারণ উপলব্ধি থেকে পেটি দাম-গড়ার কয়েকটা কারক উপাদানের নাম করেছেন, যেগুলিকে এখনকার অর্থনীতিবিদ এবং পরিকল্পনা-রচয়িতাদের বিবেচনায় রাখতে হয়: বদলি পণ্য, অভিনব পণ্য, কেতা, নকল, ভোগ-ব্যবহারের অভ্যাসের প্রভাব।

যে-বিমূর্ত শ্রম মূল্য পয়দা করে সেটার বিশ্লেষণের দিকে প্রথম-প্রথম

* W. Petty, 'The Economic Writings', Vol. I, Cambridge, 1899, p. 43.

** ঐ, ৫০ পৃঃ।

*** ঐ, ৪৪ পৃঃ

পদক্ষেপ করেন পেটি। এটা জানা কথা যে, প্রত্যেকটা মূর্ত ধরনের শ্রম পয়দা করে এক-একটা নির্দিষ্ট পণ্য, এক-একটা উপযোগ-মূল্য: খামারীর শ্রম থেকে শস্য, তাঁতির শ্রম থেকে কাপড়, ইত্যাদি। কিন্তু প্রত্যেকটা ধরনের শ্রমের মধ্যে থাকে একটাকিছু অভিন্ন উপাদান, যার ফলে সমস্ত ধরনের শ্রম হয়ে ওঠে তুলনীয়, আর সমস্ত জিনিস হয়ে দাঁড়ায় পণ্য, বিনিময়-মূল্য: নির্দিষ্ট শ্রম-কালব্যয়, সাধারণভাবে কর্মীর উৎপাদী-কর্মশক্তিব্যয়।

অর্থনীতি বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিমূর্ত শ্রম-সংক্রান্ত ধারণাটার সূত্রপাত করলেন সর্বপ্রথমে পেটি; পরে সেটা হয় মার্কসীয় মূল্য তত্ত্বের ভিত্তি।

এই প্রতিষ্ঠাতা এবং পথিকৃতের কাছ থেকে সুষম এবং পূর্ণাঙ্গ আর্থনীতিক তত্ত্ব আশা করা যায় না। বণিকতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা দিয়ে তিনি জড়ানো ছিলেন, তাই তিনি এই বিভ্রমটা ছাড়তে পারেন নি যে, বহুমূল্য ধাতু নিষ্কাশনের শ্রম হল একটা বিশেষ ধরনের শ্রম, যা মূল্য পয়দা করে খুবই সরাসরি। এইসব ধাতুতে খুবই স্পষ্ট মূর্ত বিনিময়-মূল্যটাকে পেটি পৃথক করে নিতে পারেন নি মূল্যের একেবারে সারমর্মটা থেকে — সেটা হল সাধারণভাবে মানুষের বিমূর্ত শ্রমব্যয়। আর্থনীতিক উন্নয়নের কোন নির্দিষ্ট স্তরে যা নমুনাসই এবং গড় পরিমাণ সেই সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রমব্যয় দিয়ে নির্ধারিত হয় মূল্য-মান, তার কোন ধারণাই তাঁর ছিল না। যা সামাজিকভাবে আবশ্যক তদতিরিক্ত শ্রমব্যয় হলে সেটা অপচায়িত শ্রম, সেটা দিয়ে মূল্য পয়দা হয় না। এই বিজ্ঞানের পরবর্তী বিকাশের দিক থেকে দেখলে বলা যেতে পারে পেটি যা লিখেছেন তার অনেকটাই কাঁচা কিংবা ডাহা ভুল। সেটাই কি বড় কথা? আসল কথাটা হল এই যে, শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্ব সংক্রান্ত অভিমতটিকে তিনি আঁকড়ে ধরে থেকেছেন এবং অনেক মূর্ত-নির্দিষ্ট সমস্যায় সেটা প্রয়োগ করে কৃতকার্য হন।

উদ্বৃত্ত উৎপাদের স্বধর্মটার ব্যাখ্যা তিনি কিভাবে দিয়েছেন সেটা আগেই দেখা গেছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ছিল সাদাসিধে পণ্য-উৎপাদক, যার পয়দা-করা উদ্বৃত্ত উৎপাদ আত্মসাৎ করে সে নিজেই। পেটি নিশ্চয়ই লক্ষ্য না করে পারেন নি যে, তাঁর আমলে উৎপাদনের একটা মোটা অংশ ইতোমধ্যে পাওয়া যাচ্ছিল মজুরি-শ্রম খাটিয়ে।

তিনি নিশ্চয়ই ধারণা করতে পেরেছিলেন যে, উদ্বৃত্ত উৎপাদ পয়দা হয় শুধু কর্মীর নিজের জন্যে নয়, ততটা তার নিজের জন্যে নয়, যতটা কিনা

ভূমি আর পুঁজির মালিকের জন্যে। তিনি সে ধারণা করেছিলেন তা দেখা যায় মজুরি সম্পর্কে তাঁর বিচার-বিবেচনা থেকে। তাঁর মতে, জীবনধারণের জন্যে ন্যূনকল্পে যা আবশ্যক শুধু সেটা দিয়েই নির্ধারিত হয় এবং নির্ধারিত হওয়া চাই শ্রমিকের মজুরি। 'বেঁচে থাকা, খাটা এবং বংশবৃদ্ধির জন্যে' যা দরকার তার বেশি নয় তার প্রাপ্য। তার সঙ্গে সঙ্গে পেটি বোঝেন যে, এই শ্রমিকটির শ্রম দিয়ে পয়দা-করা মূল্য একেবারেই অন্য ব্যাপার এবং সাধারণত সেটা অনেক বেশি। এই বিয়োগফলটাই উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপত্তিস্থল, আর পেটির লেখায় এই উদ্বৃত্ত মূল্য দেখা দেয় আগমের আকারে।

অপরিণত আকারে হলেও ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রের মূল বৈজ্ঞানিক নীতিটাকে পেটি প্রকাশ করেছেন — সেটা হল এই যে, মজুরি এবং উদ্বৃত্ত মূল্য (আগম, লাভ, সুদ) পণ্যের মধ্যে বিপরীতক্রমে সংশ্লিষ্ট, যে-দাম আখেরী হিসাবে নির্ধারিত হয় শ্রমব্যয় দিয়ে। উৎপাদনের মাত্রা একই থাকলে মজুরিবৃদ্ধি ঘটতে পারে শুধু উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে কেটে নিয়ে, আর তেমনি তার উলটোটা। এখান থেকে মাত্র এক-পা এগলেই লক্ষ্য করা যায় একদিকে যে খাটে এবং অন্য দিকে ভূস্বামী আর পুঁজিপতির শ্রেণী-স্বার্থের বুনিয়াদী প্রতিযোগ। ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা করেন রিকার্ডো। পেটি এই বিবেচনাধারার সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছিলেন বোধহয় 'নিবন্ধ'-তে নয়, কিন্তু সতর শতকের অষ্টম দশকে লেখা তাঁর বিখ্যাত 'Discourse on Political Arithmetick' ('রাজনীতিক পাটিগণিত প্রসঙ্গে আলোচনা')-তে, যদিও সেখানেও ধারণাটা জায়মান অবস্থায় মাত্র।

তবে মোটের উপর দেখলে, পেটির আর্থনীতিক তত্ত্ব পরিণত করে তোলা এবং পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল নিয়মাবলি বোঝার পথে বাধা হল রাজনীতিক পাটিগণিতে তাঁর গভীর অনুরাগ। 'নিবন্ধ'-র বহু চমৎকার অনুমান থেকে গেল অপরিণত অবস্থায়। তখন তাঁর উপর অঙ্কের দুর্বার টান। অঙ্কই যেন সবকিছুর চাবিকাঠি। 'প্রথমে যা করা চাই সেটা হল পরিগণনা', এই বিশেষক কথাটা ছিল তাঁর 'নিবন্ধ'-তেই। এটা হয়ে উঠেছিল পেটির নীতিবাক্য, জাদুমন্ত্র গোছের: পরিগণন করলেই সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যায়। পরিসংখ্যানের জনকেরা সেটার ক্ষমতা সম্বন্ধে মাত্রাতিরিক্ত সরলবিশ্বাসী ছিলেন।

যা বলা হল তাতে অবশ্য পেটির কর্মকাণ্ডের একেবারে সবটাই বিবৃত হয় নি। সেটা ঢের বেশি সমৃদ্ধ। বুর্জোয়ারা তখন ছিল প্রগতিশীল — তাদের বিশ্ববীক্ষা প্রকাশ পায় তাঁর ধ্যান-ধারণার মধ্যে। সর্বপ্রথমে পেটিই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন বিচার-বিশ্লেষণ করেন এবং বিভিন্ন আর্থনীতিক ব্যাপারের মূল্যায়ন করেন উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে। এটাই বণিকতন্ত্রীদের উপর তাঁর মস্ত শ্রেষ্ঠত্ব। জনসমষ্টির অনুৎপাদী অংশগুলির প্রতি তাঁর সমালোচনামূলক মনোভাব আসে তারই থেকে, ঐসব অংশ থেকে তিনি পৃথক করে তুলে ধরেন বিশেষত যাজক, ব্যবহারজীবী এবং আমলা-ফয়লাদের। তিনি ধরে নেন যে, বণিক আর দোকানদারদের সংখ্যা অনেক কমান সম্ভব ছিল — তারাও 'কোন ফল ফলায় না'। জনসমষ্টির অনুৎপাদী বর্গগুলো সম্বন্ধে সমালোচনামূলক মনোভাবের ঐতিহ্যটা হয়ে উঠল ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রের প্রাণরক্ত।

একটা প্রাচীন ফরাসী বচনে আছে — রচনাশৈলীতেই মানুষটি। পেটির রচনাশৈলী যা তাজা আর স্বকীয় তেমনটা সচরাচর দেখা যায় না। সাহিত্যিক সূক্ষ্মতা-দক্ষতায় পারদর্শিতার জন্যে নয়। তার উলটোটা: পেটির রচনা বাহুল্যবর্জিত, সরাসর, কিছুটা রুক্ষ। তাঁর লেখায় স্পষ্ট জোরাল অকপট আকারে স্পষ্ট জোরাল ধ্যান-ধারণার প্রকাশ। সহজ-সরল কথায় তিনি সর্বদাই প্রসঙ্গমাফিক যথাযথ। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে মোটাটা আশি পৃষ্ঠাও নয়।

পেটি যে-রয়্যাল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সেটার সনদে কড়ার ছিল — 'পরীক্ষার সমস্ত বিবরণে... ঠিক আদত বিষয়টুকুই বিবৃত হওয়া চাই, কোন গৌরচন্দ্রিকা, কৈফিয়ত এবং বাগাড়ম্বর ছাড়াই'। পেটির বিবেচনায় এই চমৎকার নিয়মটি প্রকৃতি-বিজ্ঞানক্ষেত্রেই শুধু নয়, সমাজ-বিজ্ঞানক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, আর সেটা মেনে চলতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর বহু রচনা পড়ে মনে আসে 'পরীক্ষা সম্বন্ধে বিবরণের' কথা। (এই নিয়ম অনুসারে চললে আধুনিক অর্থনীতিবিদদের এবং অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের নিশ্চয়ই কোন ক্ষতি হতে পারে না।)

সহজ-সরল প্রকাশভঙ্গি হলেও পেটির রচনার পিছনে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাঁর অদম্য মেজাজ আর রাজনীতিক আবেগ চোখে পড়ে, তা আটকায় না। পাউডারখচিত প্রকাণ্ড পরচুলো আর ব্যয়বহুল জমকাল রেশমী পোশাক পরিহিত (তাঁর শেষের দিককার একখানা প্রতিকৃতিতে সার

উইলিয়মকে এইরকমটায় দেখায়) এই ধনী জমিদার বহু পরিমাণে থেকেই গিয়েছিলেন সেই সাদামাঠা সাধারণ মানুষটি এবং কিছুটা কৌতুকী ডাক্তার। অত ধন-দৌলত আর পদ-পদবি থাকলেও পেটি কাজ করতেন অবিরাম — সেটা শুধু মানসিক নয়, শারীরিক কাজও বটে। তাঁর প্রচণ্ড আসক্তি ছিল জাহাজনির্মাণে; অদ্ভুত-অদ্ভুত ধরনের জাহাজের প্রকল্প প্রস্তুত করা এবং সেই জাহাজনির্মাণের কাজে তাঁর শেষ ছিল না। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য থেকে অংশত বোঝা যায় তাঁর বিরাগগুলোর কারণ: কর্মকুণ্ঠ এবং পরজীবী লোককে তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। এমনকি রাজতন্ত্র সম্পর্কেও কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন পেটি। রাজসভায় অনুগ্রহভাজন হতে তিনি চেষ্টা করতেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে এমনসব কথা লিখতেন যা রাজাকে কিংবা সরকারকে খুশি করত না কোনক্রমেই: আগ্রাসী যুদ্ধের প্রতি রাজাদের আসক্তি থাকে; যুদ্ধ চালাবার জন্যে টাকা না দেওয়াই তাদের থামাবার সেরা উপায়।

রাজনীতিক পাটিগণিত

মহিমান্বিত আত্মীয় ফ্রান্সের ১৪শ লুই-কে কোন-না-কোনভাবে ছাড়িয়ে যাবার চেয়ে কাম্য আর কিছুই ছিল না ইংরেজ রাজা ২য় চার্লস-এর জীবনে। তিনি বল্-নাচ আর আতসবাজির অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন ভার্সাইয়ের কথা মনে রেখে। কিন্তু তাঁর টাকা ছিল ফরাসী রাজাটির চেয়ে অনেক কম। নিজের কোন-কোন জারজ সন্তানকে তিনি ডিউক খেতাব দিয়েছিলেন, কিন্তু লুই তাঁর বেজন্মা ছেলেদের করেছিলেন ফ্রান্সের মার্শাল, যা পারেন নি স্টুয়ার্ট রাজাটি: তাঁর নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ততটা নিরঙ্কুশ ছিল না।

বাকি ছিল শুধু বিজ্ঞান। রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বল্পকাল পরেই তাঁর ইচ্ছা অনুসারে এবং গোটা রাজ-পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হয় রয়্যাল সোসাইটি (বৃটেনের বিজ্ঞান আকাদমি), যেটা চার্লস-এর সংগত গর্বের বিষয়। লুই-এর ছিল না অমন কিছুই! রাজা নিজে বিভিন্ন রাসায়নিক পরীক্ষা চালাতেন, অধ্যয়ন করতেন নৌবাহ। এটা ছিল যুগধর্মের অনুযায়ী। এটা ছিল 'আমুদে রাজার' একটা চিত্তবিনোদন, তেমনি রয়্যাল সোসাইটিও।

রয়্যাল সোসাইটির সবচেয়ে আগ্রহভাজন এবং রসিক সদস্য ছিলেন

সার উইলিয়ম পেটি। রাজা এবং উঁচুদরের অভিজাতেরা তাঁদের অন্তরঙ্গ মহলে ছিলেন ধর্মে-স্বচ্ছন্দমনা, আর সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের বকধার্মিকদের নিয়ে মজা করতে পারতেন না পেটির মতো আর কেউ। একদিন একটা আমুদে আড্ডা জমেছিল, সেটা হয়ত সম্পূর্ণ অপ্রমত্ত ছিল না, সেখানে আয়ার্ল্যাণ্ডের লর্ড লেফ্‌টেন্যাণ্ট অর্মোণ্ডের ডিউক সার উইলিয়মকে তাঁর আর্ট প্রদর্শন করতে বলেন। পাশাপাশি রাখা দুখানা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে পেটি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় আর গোষ্ঠীর প্রচারকদের প্যারডি করতে থাকেন, হাসির ফোয়ারা ছোটে। তাতে মেতে গিয়ে তিনি যাজক হবার ভান করে 'কোন-কোন প্রিন্স এবং গভর্নর'কে তিরস্কার করতে থাকেন — একজন প্রত্যক্ষদর্শীই বলেছেন — তাদের অব্যবস্থা, পক্ষপাতিত্ব আর লালসার জন্যে। হাসি থেমে গেল। ডিউকটি যে-মেজাজ চাগিয়ে তুলেছিলেন সেটাকে কী করে সংযত করা যায় তা তিনি ভেবে পেলেন না।

পেটি রাজনীতি আর বাণিজ্য নিয়ে বলতে শুরু করা অবধি তাঁর কথা শুনে মজা পেতেন রাজা আর আয়ার্ল্যাণ্ডের লর্ড লেফটেন্যাণ্টরা। আর রাজনীতি এবং বাণিজ্য প্রসঙ্গে না বলে তিনি পারতেন না! অন্যান্য সমস্ত কথাবার্তা তাঁর পক্ষে ছিল নিজের সর্বসাম্প্রতিক আর্থনীতিক প্রকল্প বিবৃত করার একটা অজুহাত মাত্র। তাঁর প্রত্যেকটা প্রকল্প হত আগেরটার চেয়ে সাহসী, র‍্যাডিকাল। এটা ছিল ওদের পক্ষে বিপজ্জনক, বিরক্তিকর, অপ্রয়োজনীয়। আর একজন আইরিশ লর্ড লেফটেন্যাণ্ট লর্ড এসেক্স বলেছিলেন, তিন রাজত্বে (অর্থাৎ ইংলণ্ড স্কটল্যাণ্ড আর আয়ার্ল্যাণ্ডে) সবচেয়ে 'বিরক্তিকর লোক' হলেন সার উইলিয়ম। অর্মোণ্ডের ডিউক তাঁকে স্পষ্টাস্পষ্টি বলেছিলেন, কেউ-কেউ মনে করে তিনি 'ভোজবাজিকর, অন্যান্যেরা মনে করে তিনি প্রায় উন্মাদের মতো খেয়ালী এবং কল্পনাবিলাসী, আর উন্মাদনাগ্রস্তও বটেন'।

তাঁর জীবন স্বস্তিতে কাটে নি। সবকিছুর মঙ্গলের দিকটা দেখাই ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ, সেটার জায়গায় তিনি কখনও-কখনও হয়ে পড়তেন খিটখিটে, মনমরা, কিংবা ফুঁসতেন ব্যর্থ রোষে।

পেটির প্রকল্পগুলি বড় একটা কখনও রাজসভার মুনাসিব হয় নি কেন? কোন-কোনটা দুর্দাম নির্ভীক হলেও ছিল স্রেফ আকাশকুসুম। তবু অনেকগুলিই ছিল তখনকার দিনের পক্ষে সম্পূর্ণতই যুক্তিযুক্ত। আদত কথাটা হল এই যে, ইংলণ্ডে আর আয়ার্ল্যাণ্ডে পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির

বিকাশ, সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত নিষ্পত্তিমূলক কাটান-ছিঁড়েনই ছিল এইসব প্রকল্পের লক্ষ্য। কিন্তু ২য় চার্লস এবং তাঁর ভাই ২য় জেমসের রাজতন্ত্র ঐসব অবশেষ আঁকড়ে ছিল, কিংবা বড়জোর কোন-কোন আপসমূলক ব্যবস্থায় রাজি হত বুর্জোয়াদের চাপে। সেই কারণেই ওটা ভেঙে পড়েছিল (পেটি মারা যাবার এক বছর পরে)।

ইংলন্ডে সম্পদ এবং সমৃদ্ধিকে পেটি সবসময়ে লক্ষ্য করতেন প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সেটাকে তুলনা ক'রে। হল্যান্ড তাঁর পক্ষে ছিল মাপকাঠি গোছের; এই দেশটির সার্থক উন্নয়নের কারণ-সংক্রান্ত প্রশ্নটায় তিনি ফিরে-ফিরে আসতেন প্রায়ই। বছরের পর বছর তাঁর এই প্রত্যয়টা দৃঢ়তর হয়ে উঠেছিল যে, হল্যান্ড নয়, কিন্তু আরও বড় এবং আরও বেশি সক্রিয় শক্তি ফ্রান্স সরাসরি বিপন্ন করছিল ইংলন্ডের অবস্থানটাকে। তাঁর আর্থনীতিক ভাব-ধারণাগুলির রাজনীতিক স্বধর্ম হয়ে উঠেছিল ক্রমাগত আরও স্পষ্ট ফরাসীবিরোধী।

পেটির দ্বিতীয় প্রধান আর্থনীতিক রচনা 'Political Arithmetick' ('রাজনীতিক পাটিগণিত') লেখা শেষ হয় ১৬৭৬ সালে, কিন্তু সেটা বের করার সাহস হয় নি। ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী ছিল ২য় চার্লসের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি। এই ইংরেজ রাজাটি গোপন অর্থ সাহায্য পেতেন ১৪শ লুই-এর কাছ থেকে: পার্লামেণ্ট ছিল ব্যয়কুণ্ঠ, কর থেকে ওঠা রাজস্ব রাজার হাতে পৌঁছত না, কাজেই তাঁর খরচ চালাতে হত অন্য উপায়ে। সার উইলিয়ম ভীরু ছিলেন না, কিন্তু তিনি রাজসভার বিরাগভাজন হতে চান নি।

'রাজনীতিক পাটিগণিত'-এর পাণ্ডুলিপি হাতে-হাতে ঘুরেছিল। ১৬৮৩ সালে পেটির এই রচনাটি প্রকাশিত হয় তাঁর অজ্ঞাতসারে, অন্য নামে এবং লেখকের নাম ছাড়াই। ১৬৮৮-১৬৮৯ সালের 'গৌরবময় বিপ্লব' এবং ইংলন্ডের কর্মনীতিতে সংশ্লিষ্ট আমূল পরিবর্তনের পরেই শুধু পেটির ছেলে (আর্ল শেলবার্ন) সেটা লেখকের নামে পুরোপুরি প্রকাশ করেন। উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'এই রচনাটির মতবাদ ফ্রান্সকে অসন্তুষ্ট করে' বলে তাঁর প্রয়াত পিতার বইখানা আগে প্রকাশ করা অসম্ভব ছিল।

পেটির ফরাসীবিরোধী মতটা এসেছিল ইংরেজ বুর্জোয়াদের স্বার্থের তাগিদে। পরবর্তী গোটা শতাব্দী ধরে, একেবারে উনিশ শতকের শুরু অবধি ফ্রান্সের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে তবেই ইংলন্ড পৃথিবীর প্রথম শিল্প-শক্তি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। তবে পেটি তাঁর যুক্তি

প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে-প্রণালীতে সেটাই 'রাজনীতিক পাটিগণিত'-এ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এই রচনাটির ভিত্তি হল গবেষণার পরিসাংখ্যিক-আর্থনীতিক প্রণালী — এমনটা সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে হল এই প্রথম।

পরিসংখ্যান ছাড়া কোন আধুনিক রাষ্ট্রের কথা কল্পনা করা যায় কি? তা যায় না, সেটা স্পষ্টই। আধুনিক আর্থনীতিক গবেষণার কথা কল্পনা করা যায় কি পরিসংখ্যান ছাড়া? তা করা যেতে পারে — কিন্তু কোনমতে। কোন লেখক যদি 'বিশুদ্ধ তত্ত্ব' ব্যবহার করেন সাহিত্যিক কিংবা গাণিতিক আকারে, আর তিনি যদি কোন পরিসাংখ্যিক উপাত্ত না তোলেন, সেক্ষেত্রেও তিনি ধরেই নেন যে সেগুলো মূল নিয়মের দিক থেকে রয়েছে, আর পাঠক সে-সম্বন্ধে কমবেশি ওয়াকিবহাল।

এমনটা ছিল না সতর শতকে। পরিসংখ্যান স্রেফ ছিল না (ছিল না কথাটাও: কথাটা দেখা দিয়েছিল শুধু আঠার শতকের শেষের দিকে, তার আগে নয়)। জনসমষ্টির আকার, (ভৌগোলিক) সংবিভাগ, লোকের বয়স এবং পেশা সম্বন্ধে বিশেষকিছু জানা ছিল না। মূল পণ্যগুলোর উৎপাদন আর পরিভোগ, আয়, সম্পদের বণ্টন, এইসব মূল আর্থনীতিক সূচক সম্পর্কে জানা ছিল আরও কম। কিছু-কিছু তথ্য আর উপাত্ত ছিল শুধু কর আর বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে।

রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান কৃত্যক স্থাপনের কথা তুলেছিলেন পেটি, তথ্য সংগ্রহ করার প্রধান-প্রধান প্রণালীগুলি তিনি তুলে ধরেছিলেন — এটা তাঁর মস্ত অবদান। নিজ রচনাগুলিতে তিনি প্রায়ই ফিরে-ফিরে আসেন পরিসংখ্যান কৃত্যক স্থাপনের কথায়, আর যেন প্রসঙ্গক্রমে তিনি সবসময়েই নিজেকে ধরেন সেটার প্রধান হিসেবে। তাঁর উদ্ভাবিত এই পদটার নানা নাম দিয়েছিলেন তিনি, নামগুলো কমবেশি গুরুগম্ভীর, সেটা নির্ভর করত তাঁর মেজাজ এবং নিজ সম্ভাবনা সম্বন্ধে মূল্যায়নের উপর। তাছাড়া, শুধু পরিগণনা নয়, তিনি কিছু পরিমাণে 'পরিকল্পনা' করারও আশা করতেন। যেমন — তাঁর আমলের পক্ষে যা অসাধারণ — 'শ্রম-বল তহবিল' সম্বন্ধে কিছু-কিছু প্রাক্‌কলন তিনি করেছিলেন: দেশে কত ডাক্তার আর আইনজীবী দরকার (সতর শতকে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ অন্য কিছু প্রকৃতপক্ষে ছিল না), কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রতি বছর কত ছাত্র ভরতি করা চাই।

পরিসংখ্যানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে পেটি অক্লান্তভাবে প্রচার করতেন শুধু তাই নয়, অধিকন্তু নিজ আর্থনীতিক অভিমত প্রতিপন্ন করতে চমৎকার কাজে লাগাতেন হাতে যা তথ্যাদি থাকত, সেগুলো ছিল সামান্যই এবং তত নির্ভরযোগ্য নয়। ইংলন্ড ফ্রান্সের চেয়ে গরিব কিংবা দুর্বল নয়, এটাকে বিষয়গত সংখ্যা-উপাত্ত দিয়ে প্রমাণ করার মূর্ত-নির্দিষ্ট কাজটা তিনি হাতে নিয়েছিলেন। তখনকার দিনের ইংলন্ডের আর্থনীতিক অবস্থানের মাত্রিক মূল্যায়নের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত কাজটা দেখা দেয় তার থেকে।

নিজ রচনার ভূমিকায় রাজনীতিক পাটিগণিত প্রণালী সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন: 'এটা করতে যে-প্রণালীটা আমি ধরছি সেটা এখন অবধি তত প্রচলিত নয়। কেননা শুধু সুন্দর-সুন্দর আর পরম সুন্দর শব্দ এবং বুদ্ধিবাগীশ তর্কজাল প্রয়োগের বদলে আমি (আমার দীর্ঘকালের লক্ষ্য 'রাজনীতিক পাটিগণিত'-এর একটা নমুনা হিসেবে) যে-পথ ধরেছি তাতে আমার বক্তব্য প্রকাশ করেছি সংখ্যা ওজন আর মাপজোখ হিসেবে, ব্যবহার করেছি শুধু অবধারণীয় যুক্তি, শুধু এমনসব কারণ নিয়ে বিচার-বিবেচনা করেছি যেগুলির প্রত্যক্ষ ভিত্তি আছে প্রকৃতির রাজ্যে, আর বিশেষ-বিশেষ লোকের অস্থির মনন, মত, প্রবৃত্তি এবং আবেগের উপর যা নির্ভর করে সেগুলোকে ছেড়ে দিয়েছি অন্যান্যের বিচার-বিবেচনার জন্যে।'*

পেটির সবচেয়ে বিশিষ্ট অনুগামীদের একজন হলেন চার্লস ড্যাভেনেণ্ট, তিনি দিয়েছেন এই সহজ-সরল সংজ্ঞার্থ: 'রাজনীতিক পাটিগণিত বলতে আমরা বোঝাই শাসনকার্য-সংক্রান্ত বিষয়াবলি সম্বন্ধে অংক দিয়ে বিচার-বিবেচনার বিদ্যা...' তিনি আরও বলেন, আপনাতে এই বিদ্যাটা সুপ্রাচীন, কিন্তু পেটি 'তাতে দিলেন ঐ নাম, আর সেটাকে এনে ফেললেন বিভিন্ন নিয়ম এবং প্রণালীর মধ্যে'।

পেটির রাজনীতিক পাটিগণিত হল পরিসংখ্যানের আদিরূপ। অর্থনীতিবিজ্ঞানের গোটা একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ ধারার পূর্বসূচনা হয় তাঁর প্রণালীটাতে। যেকোন দেশের জাতীয় আয় এবং জাতীয় সম্পদ-সংক্রান্ত বিভিন্ন সূচকের বিরাট ভূমিকা রয়েছে আধুনিক পরিসংখ্যানে এবং অর্থনীতিবিদ্যায় — সেগুলি হিসাব করার গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন বোধগম্য ধরনে। ইংলন্ডের জাতীয় সম্পদের প্রাক্কলনের চেষ্টা করেন

---

* W. Petty, 'Political Arithmetick', London, 1690, p. 244.

সর্বপ্রথমে তিনিই। পেটির গণতান্ত্রিকতা এবং অসাধারণ নির্ভীকতা এই কথাগুলিতে স্পষ্ট: '...জনসাধারণের সম্পদ, এবং যিনি জনসাধারণের কাছ থেকে নিয়ে নেন যেখানে যখন খুশিমতো যেকোন পরিমাণে সেই নিরঙ্কুশ-ক্ষমতাধারী রাজার সম্পদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা চাই অতি সযত্নে।'* এখানে তিনি বলেছেন ১৪শ লুই সম্বন্ধে, তবে কথাটাকে কঠোর তিরস্কার হিসেবে দেখতে পারতেন ২য় চার্লসও।

পেটির হিসাবে ইংলন্ডের বৈষয়িক সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৫ কোটি পাউন্ড, কিন্তু তিনি বলেছিলেন তাতে যোগ করা চাই আরও ৪১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউন্ড, এটাকে তিনি ধরেছিলেন দেশের জনসমষ্টির অর্থের পরিমাণ হিসেবে। এই আপাত-আত্মবিরোধী কথাটা একবার দেখেই যা মনে হতে পারে তার চেয়ে প্রগাঢ়: উৎপাদন-শক্তিগুলোর ব্যক্তিগত উপাদানটার পরিমাপ নির্ধারণের উপায় তিনি খুঁজছিলেন: কাজের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সম্ভাব্যতা।

জনসমষ্টির আয়তন আর গঠন-সংক্রান্ত প্রশ্নটা দিয়েই পেটির গোটা আর্থনীতিক তত্ত্বের সূচনা। পেটি সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্কস লিখেছেন: 'আমাদের বন্ধু পেটির 'জনসংখ্যা তত্ত্ব' ম্যালথাস-এর থেকে একেবারেই পৃথক... **জনসংখ্যা — সম্পদ**...'** জনসংখ্যাবৃদ্ধি সম্পর্কে এই মঙ্গলবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রের গোড়ার দিককার প্রবক্তাদের বেলায় নমুনাসই। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ম্যালথাস বলেন, মেহনতী শ্রেণীগুলির গরিবির প্রধান কারণটা স্বাভাবিক, সেটা হল অতিপ্রজাত — এইভাবে তিনি বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রে একটা সাফাইদারী মতধারার ভিত্তিস্থাপন করেন (এই বিষয়ে আরও বলা হয়েছে ১৪ পরিচ্ছেদে)।

পেটি ইংলন্ডের জাতীয় আয়ের হিসাব কষেছিলেন। সেটা থেকে গড়ে ওঠে জাতীয় হিসাবরক্ষণের আধুনিক প্রণালী, — কোন দেশে উৎপাদনের পরিমাণ, ভোগ-ব্যবহার সঞ্চয়ন আর রপ্তানির জন্যে উৎপাদের বিলিব্যবস্থা, প্রধান-প্রধান সামাজিক শ্রেণী আর বর্গগুলির আয়, ইত্যাদির মোটামুটি প্রাক্কলন তার ফলে সম্ভব হয়। পেটির পরিগণনে গুরুতর দোষ-ত্রুটি

---

* W. Petty, 'The Economic Writings', Cambridge, 1899, Vol. I, p. 272.

** কার্ল মার্কস, 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব', ১ম ভাগ, ৩৫৪, ৩৫৫ পৃঃ।

ছিল তা ঠিক। জনসমষ্টির মোট পরিভোগ-ব্যয়টাকে তিনি ধরতেন জাতীয় আয় হিসেবে, অর্থাৎ কিনা, তিনি মনে করতেন, ঘর-বাড়ি তৈরি করা, যন্ত্রপাতি, ভূমি উন্নয়ন, ইত্যাদি বাবত পুঁজি বিনিয়োগের জন্যে যায় আয়ের যে-সঞ্চিত অংশটা সেটাকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। এমনটা ধরে নেওয়া বাস্তবতাসম্মত ছিল সতর শতকের পক্ষে, কেননা সঞ্চয়নের হার ছিল খুবই কম, আর ধীরে বাড়ছিল দেশের বৈষয়িক সম্পদ। তাছাড়া, পেটির ভুলটা অচিরে সংশোধন করেছিলেন রাজনীতিক পাটিগণিত ক্ষেত্রে তাঁর অনুগামীরা, বিশেষত গ্রেগরি কিং, ইনি সতর শতকের শেষের দিকে ইংলন্ডের জাতীয় আয় সম্বন্ধে কিছু-কিছু হিসাবাদি করেছিলেন, সেগুলি আদ্যন্ত সম্পূর্ণতার জন্যে লক্ষণীয়।

পেটি এবং গ্রাউন্ট, বা পরিসংখ্যানের উদ্ভাবক কে?

পেটির শেষের দিককার রচনাগুলির প্রধান বিষয়বস্তু হল জনসংখ্যা, সেটার বৃদ্ধি, সংবিভাগ এবং কর্মনিয়োগ। ডিমগ্রাফিক* পরিসংখ্যানের যুগ্ম-প্রতিষ্ঠাতা হবার সম্মান পেয়েছেন তিনি এবং তাঁর বন্ধু জন গ্রাউন্ট। ডিমগ্রাফিক পরিসংখ্যানের সমস্ত আধুনিক টেকনিক গড়ে উঠেছে এই দু'জন পথিকৃতের অনাড়ম্বর কাজ থেকে।

কার কৃতিত্ব এবং পূর্বিতা, তা নিয়ে মতদ্বৈধ আছে প্রত্যেকটি বিজ্ঞানক্ষেত্রে। এইসব বিসংবাদ কখনও-কখনও নিষ্ফল, এমনকি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট শাখাটির পক্ষে হানিকর। কখনও-কখনও সেটা শাখাটির ইতিহাস স্পষ্ট করে তুলতে সহায়ক, কাজেই হিতকর। পরিসংখ্যানের ইতিহাসে এইরকমের একটা আলোচনা চলেছিল 'পেটি-গ্রাউন্ট সমস্যা'টাকে কেন্দ্র করে। সেটাকে এখানে দেওয়া হল চুম্বকে।

'স্বাভাবিক এবং রাজনীতিক মন্তব্যালিপি... মৃত্যুহার-সংক্রান্ত বিবরণ সম্বন্ধে'** এই নামে একখানা ছোটখাটো বই লন্ডনে প্রকাশিত হয়েছিল ১৬৬২ সালে, সেটার লেখক জন গ্রাউন্ট। অদ্ভুত, এমনকি মনমরা ধরনের

* ডিমগ্রাফি — জীবন-জন্ম-মৃত্য সংক্রান্ত বিজ্ঞান। — অনুঃ

** জায়গা বাঁচাবার জন্যে সুদীর্ঘ নামটা সংক্ষেপে দেওয়া হল।

নামটা সত্ত্বেও বইখানা বেশকিছুটা আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল; পাঁচটা সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল অল্প কয়েক বছরের মধ্যে, তার দ্বিতীয় সংস্করণটা একই বছরে। আগ্রহ দেখিয়েছিলেন রাজা নিজে, তাঁর ব্যক্তিগত অনুরোধক্রমে জন গ্রাউন্টকে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত রয়্যাল সোসাইটির সদস্য করা হয়। তখন যা অল্পস্বল্প পরিসাংখ্যিক উপাত্ত পাওয়া যেত তারই ভিত্তিতে সর্বসাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক গরজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বুদ্ধি-বিবেচনা সহকারে বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রথম চেষ্টা হল এটাই, ঐসব প্রশ্ন হল — মৃত্যু-হার আর জন্ম-হার, নারী আর পুরুষের মধ্যে সংখ্যানুপাত, গড় আয়ু, প্রব্রজন, মৃত্যুর প্রধান-প্রধান কারণ।

পরিসংখ্যানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল উপাদানটাতে পৌঁছবার প্রথম-প্রথম অনিশ্চিত চেষ্টা করেন এই 'মন্তব্যালিপি'র লেখক। যেগুলোর প্রত্যেকটা আপতিক এমনসব পৃথক-পৃথক ব্যাপার সম্বন্ধে বেশ বহুসংখ্যক পরিসংখ্যান-উপাত্ত বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সাধারণভাবে সেগুলো খুবই কড়াকড়ি এবং সমরূপ নিয়মাধীন — এই হল সেই মূল উপাদানটা। প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্ম আর মৃত্যু আপতিক, কিন্তু কোন একটা দেশে (এমনকি কোন বড় শহরে কিংবা অঞ্চলেও) মৃত্যু-হার কিংবা জন্ম-হার আশ্চর্যরকম নির্দিষ্ট, আর সেটা বদলায় ধীরে। সাধারণত পরিবর্তনটার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে, সেটার পূর্বাভাস পর্যন্ত দেওয়া যায় কখনও-কখনও। এর পরের শতাব্দীতে — আঠার শতাব্দীতে সম্ভাব্যতাবাদের (Theory of probability) প্রতিষ্ঠাতা মস্ত-মস্ত গণিতবেত্তাদের কাজ থেকে স্থাপিত হয় পরিসংখ্যানের যথাযথ গাণিতিক ভিত্তি। কিন্তু তখন অজ্ঞাত জন গ্রাউন্টের ছোট বইখানাতে ছিল কিছু-কিছু প্রারম্ভিক ভাব-ধারণা।

১৬২০ সালে তাঁর জন্ম, তিনি মারা যান ১৬৭৪ সালে। 'সিটি'-তে তাঁর একটা ক্ষুদ্র-সজ্জার দোকান ছিল, তিনি ছিলেন স্বয়ংশিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানাদি চালাতেন 'তাঁর অবসরকালে'। পেটি তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন সতর শতকের পঞ্চম দশকের শেষের দিকে, তখন তিনি পেটির পৃষ্ঠপোষকের মতোই ছিলেন। সপ্তম দশকে পরস্পরের ভূমিকা বদলে যায়, কিন্তু তাতে তাঁদের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ন হয় না। ততদিনে গ্রাউন্ট হলেন পেটির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, লন্ডনে তাঁর প্রতিনিধি এবং তাঁর আর রয়্যাল সোসাইটির মধ্যে যোগাযোগরক্ষক।

গ্রাউন্টের বইখানা যখন অত আগ্রহ সৃষ্টি করল তখন লন্ডনের বৈজ্ঞানিক

মহলগুলিতে গুজব রটেছিল আসল লেখক হলেন সার উইলিয়ম পেটি — তিনি ঐ অজ্ঞাত নামটির পিছনে লুকনই শ্রেয় মনে করেন। গ্রাউণ্ট মারা যাবার পরে গুজবটা হয়ে ওঠে আরও জোরদার। পেটির বিভিন্ন রচনা এবং চিঠিপত্রের কোন-কোন অংশ থেকে মনে হয় যেন গুজবটা সত্যিই। অন্য দিকে, 'আমার বন্ধু গ্রাউণ্টের বইখানা' সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন বেশ স্পষ্টই।

'মন্তব্যলিপি'র লেখক কে, এই প্রশ্নটা নিয়ে উনিশ শতকে ইংরেজী সাহিত্যে বিস্তর আলোচনা চলেছিল। এখন 'পেটি — গ্রাউণ্ট সমস্যাটা'র মীমাংসা হয়ে গেছে বলেই ধরা যেতে পারে। বইখানার প্রধান লেখক জন গ্রাউণ্ট; তার মূল **পরিসাংখ্যিক** ভাব-ধারণা এবং প্রণালী তাঁরই। তবে নিজ **সামাজিক-আর্থনীতিক** বিবেচনাধারার ব্যাপারে তিনি স্পষ্টতই ছিলেন পেটির প্রভাবাধীন; ঐসব বিবেচনাধারা প্রকাশ পেয়েছে বইখানার ভূমিকায় এবং উপসংহারে — এই দুটো সম্ভবত পেটির লেখা। বইখানার সাধারণ ভাব-ধারণা খুব সম্ভব পেটির, কিন্তু সেটাকে রূপায়িত করেন নিঃসন্দেহে গ্রাউণ্ট।*

১৬৬৬ সালে লণ্ডনের মহা অগ্নিকাণ্ডে গ্রাউণ্টের সর্বনাশ হয়ে যায়। তার স্বল্পকাল পরেই তিনি ক্যাথলিক হয়ে যান, তার ফলেও খর্ব হয় তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা। হয়ত এই সবকিছুর দরুন তাঁর মৃত্যু আরও কাছিয়ে এসেছিল। পেটির বন্ধু এবং প্রথম জীবনীকার জন অব্রি লিখেছেন, গ্রাউণ্টের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় 'সাশ্রু ছিলেন সেই উদ্ভাবনপটু মহা বিদ্বান সার উইলিয়ম পেটি — তাঁর [গ্রাউণ্টের] পুরন এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু'।**

যে মহা অগ্নিকাণ্ডের ফলে মধ্যযুগীয় লণ্ডনের অর্ধেকটা ধ্বংস হয়েছিল এবং জমিন প্রস্তুত হয়েছিল নতুন শহর গড়ার জন্যে সেটা পেটির সবচেয়ে দুর্দান্ত একটা ধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অগ্নিকাণ্ডটার পরে এই অক্লান্ত পরিকল্প-রচয়িতাটি শহরটাকে সাফ করা এবং নতুন করে গড়ার পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন সরকারের কাছে। সেটার শিরনামে বলা

---

* ম. ভ. প্তুখা, 'সতর-আঠার শতাব্দীর পরিসংখ্যানবিদ্যার ইতিহাস প্রসঙ্গে প্রবন্ধমালা', মস্কো, ১৯৪৫, ৪৫ পৃঃ (রুশ ভাষায়)।

** E. Strauss, 'Sir William Petty, Portrait of a Genius', London, 1954, p. 160.

হয়েছিল পরিকল্পনাটা রচনা করতে গিয়ে ধরে নেওয়া হয় যে, 'সমস্ত জমি আর রাবিশ এমন কোন একজনের জিনিস যার কাজটা সমাধা করার মতো যথেষ্ট নগদ টাকা আছে, আর তার সঙ্গে আছে সমস্ত জট খোলার বিধানিক ক্ষমতা'।* অর্থাৎ কিনা, শহর উন্নয়ন ইতোমধ্যে ব্যাহত করছিল যে-ব্যক্তিগত মালিকানা সেটার বিপরীতে জমিতে আর ঘর-বাড়িতে রাষ্ট্রীয় কিংবা পৌর মালিকানা তাতে ধরে নেওয়া হয়েছিল সেটা স্পষ্টই।

লণ্ডন এবং প্যারিস নিউ ইয়র্ক আর টোকিও-র উন্নয়নের পথে ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানা কত সব সমস্যা আর বাধা-বিঘ্ন খাড়া করে সেটা একবার মনে করলেই তিন-শ' বছরের বেশি কাল আগে ব্যক্ত এই ধারণার মর্মটাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করা যায়।

যুগ এবং মানুষ

আর্থনীতিক প্রক্রিয়াগুলোতে বিষয়গত নিয়মাবলি লক্ষ্য করে নি বণিকতন্ত্রীরা। তারা ধরে নিয়েছিল আর্থনীতিক প্রক্রিয়া নিয়মন নির্ভর করে একমাত্র রাষ্ট্রপুরুষদের ইচ্ছার উপর। যাকে এখন আমরা বলি অর্থনীতিক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসর্বস্বতা সেটা ছিল বণিকতন্ত্রীদের বিশেষক।

অর্থনীতিক্ষেত্রে বিষয়গত, জ্ঞেয় নিয়মাবলির অস্তিত্ব-সংক্রান্ত ধারণা সর্বপ্রথমে যাঁরা ব্যক্ত করেছিলেন তাঁদের একজন হলেন পেটি, তিনি সেগুলিকে তুলনা করেছিলেন প্রকৃতির নিয়মাবলির সঙ্গে, তাই সেগুলির নাম দিয়েছিলেন স্বাভাবিক নিয়মাবলি। বিজ্ঞান হিসেবে অর্থশাস্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে এটা হল একটা মস্ত অগ্রপদক্ষেপ।

উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময়, পরিচলন, এইসব মূল আর্থনীতিক প্রক্রিয়া যখন নিয়মিত, ব্যাপক আকার ধারণ করে, মানুষে-মানুষে সম্পর্ক প্রধানত পণ্য-অর্থ প্রকৃতি লাভ করে, কেবল তখনই দেখা দিতে পেরেছিল আর্থনীতিক নিয়ম-সংক্রান্ত ধারণা। পণ্য কেনা-বেচা, শ্রমশক্তি মজুরি খাটান, জমি খাজনাবিলি করা, অর্থ পরিচলন — এইসব সম্পর্ক কমবেশি

---

* The Petty Papers. 'Some Unpublished Writings of Sir William Petty, ed. by the Marquis of Landsdowne,' London, 1927, Vol. I, p. 28.

পূর্ণবিকশিত হলে কেবল তখনই লোকে ধারণা করতে পেরেছিল যে, এই সবকিছুতে প্রকাশ পায় বিষয়গত নিয়মাবলির ক্রিয়া।

বণিকতন্ত্রীরা ব্যাপৃত থাকত আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের প্রধানত একটা ক্ষেত্র নিয়ে — বহির্বাণিজ্য। তার বিপরীতে এটা সম্বন্ধে পেটির গরজ ছিল সবচেয়ে কম। যেসব পৌনঃপুনিক, নিয়মানুগ প্রক্রিয়া স্বভাবতই নির্ধারণ করে মজুরি আর মাইনের গতি, খাজনা, এমনকি ধরা যাক করাধান, সেগুলোতেই ছিল তাঁর আগ্রহ।

সতর শতকের শেষাশেষি, ইতোমধ্যে ইংলন্ড হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে উন্নত বুর্জোয়া দেশ। এটা মূলত ছিল পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের ম্যানুফ্যাকচারিং পর্ব, যখন ঐ উৎপাদনের প্রসার ঘটত ততটা নয় যন্ত্রপাতি আর উৎপাদনের নতুন-নতুন প্রণালী চালু করার সাহায্যে যতটা কিনা পুরন প্রযুক্তির ভিত্তিতে পুঁজিতান্ত্রিক শ্রমবিভাগ প্রসারিত করার উপায়ে: কোন শ্রমিক যেকোন একটামাত্র ক্রিয়াপ্রণালীতে বিশেষকৃতী হয়ে তাতে সুদক্ষ হয়ে উঠলে তার ফলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ে। অর্থশাস্ত্রে শ্রমবিভাগের গুণগান শুরু হয় পেটির কোন-কোন মন্তব্য দিয়ে, তিনি ঘড়ি তৈরি করার দৃষ্টান্ত দিয়ে শ্রমবিভাগের ফলপ্রদতা প্রদর্শন করেন, আর সেটা বিশেষ সজোরে প্রকাশ পায় অ্যাডাম স্মিথের রচনায়, তিনি এটাকে করেছিলেন নিজ তত্ত্বের ভিত্তি।

পেটির আমলে শিল্পোৎপাদন এবং কৃষি উৎপাদন ইতোমধ্যে অনেকাংশে চালান হচ্ছিল পুঁজিতান্ত্রিক নীতি অনুসারে। হস্তশিল্প আর ক্ষুদ্রায়তনের কৃষিকাজকে পুঁজিতান্ত্রিক কারবারের অধীন করার ব্যাপারটা ঘটেছিল ধীরে, আর বিভিন্ন শাখায় এবং এলাকায় বিভিন্ন ধরনে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তখনও ছিল প্রাক্-পুঁজিতান্ত্রিক আকারে উৎপাদনের মস্ত-মস্ত অঞ্চল। তবে উন্নয়নের ধারাটা দেখা দিয়েছিল, সেটাকে সর্বপ্রথমে যাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন তাঁদের একজন হলেন পেটি।

তখনও ইংলন্ডের অর্থনীতি আর বাণিজ্যের ভিত্তি ছিল পশম শিল্প, কিন্তু সেটার পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল কয়লা-তোলা এবং লোহা-ইস্পাত উৎপাদনের মতো শাখা। সতর শতকের নবম দশকে কয়লা তোলা হচ্ছিল বছরে প্রায় ৩০ লক্ষ টন, যেখানে আগের শতকে মাঝামাঝি সময়ে পরিমাণটা ছিল ২ লক্ষ টন। (তবে কয়লা তখনও ব্যবহৃত হচ্ছিল প্রায় সম্পূর্ণতই শুদ্ধ জালানি হিসেবে: কোকিং প্রক্রিয়া তখনও আবিষ্কৃত হয় নি, তাই

ধাতু বিগলনের কাজ চালান হত কাঠ-কয়লা দিয়ে, তার মানে বন উজাড় হত।) এইসব শাখা একেবারে শুরু থেকেই গড়ে উঠেছিল পুঁজিতান্ত্রিক ধারায়।

বদলে যাচ্ছিল গ্রামাঞ্চলও। খুদে ভূস্বামীদের যে-শ্রেণীটা আপকে-ওয়াস্তে এবং গৌণপণ্য অর্থনীতি চালাত সেটা ক্রমে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। তাদের জমি-বন্দগুলো এবং সাধারণের ভূমি ক্রমেই বেশি-বেশি পরিমাণে জড়ো হচ্ছিল বড় জমিদারদের হাতে, তারা জমি খাজনাবিলি করত খামারীদের কাছে। এইসব খামারীর মধ্যে যারা সবচেয়ে ধনী তারা ইতোমধ্যে মজুরি-শ্রমশক্তি খাটিয়ে কৃষিকাজ চালাচ্ছিল পুঁজিতান্ত্রিক ধারায়।

স্মরণ করা যেতে পারে পেটি নিজে ছিলেন বড় ভূস্বামী। তবে বিরল ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে ছাড়া তিনি নিজ রচনাগুলিতে ভূস্বামী অভিজাতকুলের স্বার্থ প্রকাশ করেন নি।

লেভ তলস্তয় সম্বন্ধে লেনিন বলেছেন, সাহিত্যে কোন সাচ্চা কৃষক ছিল না এই কাউন্টটির আগে। কথাটাকে শব্দান্তরিত করে বলা যায়, এই জমিদারটির আগে অর্থশাস্ত্রে ছিল না কোন সাচ্চা বুর্জোয়া। পেটি স্পষ্ট বুঝেছিলেন শুধু পুঁজিতন্ত্র বিকাশের সাহায্যেই 'জাতির সম্পদ'বৃদ্ধি সম্ভব। এইসব ভাব-ধারণা তিনি কিছু পরিমাণে প্রয়োগ করেছিলেন নিজ ভূমিসম্পত্তিতে। খামারীরা যাতে জমি এবং চাষআবাদের উপায়-উপকরণের উন্নয়ন ঘটায় সেটা তিনি নিশ্চিত করতেন জমি খাজনাবিলি করার সময়ে। দেশান্তরী ইংরেজ কারিগরদের একটা কলোনি তিনি বসিয়েছিলেন নিজ ভূমিতে।

ব্যক্তি হিসেবে পেটি ছিলেন একগুচ্ছ অসংগতি। কোন পক্ষপাতশূন্য জীবনীকারের দৃষ্টিতে এই চিন্তাবীর কখনও চপল অ্যাড্‌ভেঞ্চারার, কখনও অতৃপ্ত মুনাফাসন্ধানী আর ঝানু মামলাবাজ, কখনও-বা ধূর্ত রাজসভাসদ, আবার কখনও কিছুটা অতি-সরল বড়াইকারী। অদম্য জীবনতৃষ্ণাই বোধহয় ছিল তাঁর সর্বপ্রধান বিশেষক উপাদান। তবে সেটা কোন্ আকার ধারণ করবে তা নির্ভর করত তিনি যখন যে সামাজিক পরিবেশ আর পরিস্থিতিতে থাকতেন সেটার উপর। একদিক থেকে দেখলে, ধন-দৌলত আর মান-সম্মান তাঁর পক্ষে আপনাতেই একটা লক্ষ্য ছিল না, সেগুলোতে তাঁর আগ্রহটা ছিল যেন খেলোয়াড়ী মেজাজ থেকে। তাঁর কালে এবং পরিবেশে যেমনটা স্বাভাবিক

সেইভাবে কর্মোদ্যম, কৌশল এবং কেজো চাতুরীর পরিচয় দিয়ে তিনি বোধহয় আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। তাঁর জীবন আর চিন্তার ধারার উপর ধনদৌলত এবং পদ-পদবির প্রভাব ছিল থোড়াই।

লন্ডনে পেটির পরিচয় হয়েছিল জন এভেলিন-এর সঙ্গে, ইনি নিজের ১৬৭৫ সালের রোজনামচায় পিকাডিলি-তে পেটির বাড়িতে একটা ভূরিভোজের এই বর্ণনা দেন: 'আমি তাঁকে চিনতাম অপেক্ষাকৃত অনাড়ম্বর পরিস্থিতিতে, আমি তাঁর জাঁকাল প্রাসাদে যখন গিয়েছি তখন তিনি নিজেই তারিফ করে বলতেন কিভাবে তিনি পেঁছিন সেখানে: সেটা কিন্তু তখনকার দিনের জমকাল আসবাবপত্র এবং দুর্লভ বস্তুগুলো সম্বন্ধে তাঁর মূল্যবোধ (কিংবা) ঝোঁকের ব্যাপার নয়: সেটা তাঁর চারুশীলা লেডির* জন্যে, যিনি নিকৃষ্ট কিছু বরদাস্ত করতে পারতেন না, যেটা নয় চমৎকার। আর তিনি নিজে ছিলেন অত্যন্ত অমনোযোগী, দার্শনিক ধাতের মানুষ: তিনি বলতেন, হা ভগবান, এখানে কত-কে কী; আমি তো খড়ের মধ্যে শুয়েও সমানই তৃপ্ত পাব: বাস্তবিকই নিজের সম্বন্ধে তিনি অমনোযোগীই ছিলেন।'**

জীবনভর তাঁর নানা শত্রু ছিল — কেউ প্রকাশ্য, কেউ প্রচ্ছন্ন। যারা তাঁকে ঈর্ষা করত, তাঁর রাজনীতিক প্রতিপক্ষীয় ছিল যারা, আর যাতে তিনি ছিলেন মহা ওস্তাদ সেই মর্মভেদী নিষ্করুণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জন্যে যারা তাঁকে ঘৃণা করত তারা ছিল তাঁর শত্রুদের মধ্যে। তারা কেউ-কেউ তাঁর উপর হামলার প্ররোচনা দিত, অন্য কেউ-কেউ বুনত চক্রান্তজাল। একদিন ডাব্‌লিন-এর একটা রাস্তায় তাঁকে আক্রমণ করেছিল জনৈক কর্নেল এবং তার সঙ্গে দু'জন 'সহকারী'। সার উইলিয়ম তাদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন; কর্নেলটির ধারাল ছড়ির ঘায়ে তাঁর বাঁ চোখটি নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল। একটা দুর্বল জায়গায় পড়েছিল ছড়ির বাড়িটা, — ছেলেবেলা থেকেই পেটির দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ ছিল।

যারা তাঁর বিরুদ্ধে সড়-ষড়যন্ত্র করত আইরিশ লর্ড লেফটেন্যান্টদের বাড়িতে, রাজসভায় আর আদালতে, সেইসব শত্রুই তাঁকে হয়রান করত আরও বেশি। পেটির জীবনের শেষ কুড়ি বছরে বন্ধুবান্ধবের কাছে লেখা

---

* পেটির স্ত্রীর কথা বলা হচ্ছে, তিনি ছিলেন একজন ধনী ভূস্বামীর সুন্দরী কর্মতৎপরা বিধবা। পেটির ছেলে-মেয়ে ছিল পাঁচটি।

** 'The Diary of John Evelyn', London, 1959, p. 610.

বিভিন্ন চিঠিতে তিনি বিস্তর ব্যথিত নালিশ জানান এবং রুক্ষ কথায় হতাশা প্রকাশ করেন। এক-এক সময়ে ক্ষুদ্রমনা হয়ে তিনি তুচ্ছ এটা-ওটা নিয়ে গালিগালাজ করেন, নালিশ তোলেন। কিন্তু সর্বদাই প্রধান হয়ে ওঠে তাঁর স্বকীয় মঙ্গলবাদ এবং রসিকতা। তিনি নতুন-নতুন পরিকল্পনা রচনা করেন, দাখিল করেন নতুন-নতুন বিবরণী... আর অকৃতকার্য হন বারবার — এটা চলতেই থাকে।

১৬৬০ সাল থেকে পেটির জীবন কেটেছিল কিছুকাল আয়ার্ল্যান্ডে, আর লন্ডনে কিছুকাল। শেষে তিনি সপরিবারে রাজধানীতে উঠে গিয়েছিলেন ১৬৮৫ সালে, সঙ্গে ছিল তাঁর সমস্ত জিনিসপত্র, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তিপ্পান্ন বাক্স কাগজপত্র। ২য় চার্লস মারা যান ঐ বছরই, সিংহাসনে তাঁর উত্তরাধিকারী হন ২য় জেমস। মনে হয়েছিল পেটির উপর প্রসন্নই ছিলেন নতুন রাজা; প্রৌঢ় পেটি নতুন একদফা উদ্যমে যেসব প্রকল্প রচনা করেন সেগুলির প্রতি রাজার সদয় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল এটাও ছিল মরীচিকা।

১৬৮৭ সালের গ্রীষ্মকালে পেটি পায়ের যন্ত্রণায় ভীষণ কষ্ট পেতে থাকলেন। দেখা গেল এটা ছিল গ্যাংগ্রিন, তাতে তিনি মারা যান ঐ বছরই ডিসেম্বর মাসে। তাঁর নিজ শহর রোম্‌জেতে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল।

পেটির অন্তরঙ্গ বন্ধু সার রবার্ট সাউথওয়েলের কাছে লেখা তাঁর শেষ চিঠিগুলি খুবই আগ্রহজনক। এইসব চিঠি তিনি লিখেছিলেন মারা যাবার দু'-তিন মাস আগে। তিনি যাতে বিশ্বাস করতেন তার প্রতীকস্বরূপ এইসব চিঠি; সেগুলি কোন সংকীর্ণ স্বার্থ, তুচ্ছ ব্যাপার কিংবা স্বার্থপরতা দিয়ে ঝাপসা নয়। এতে তিনি সাউথওয়েলের নরম করে বলা তিরস্কারের উত্তর দেন; নিজ পারিবারিক কাজকর্মের দিকে নজর না দিয়ে পেটি বাস্তব জীবন থেকে দূরবর্তী নানা ব্যাপার নিয়ে ব্যাপৃত থাকেন বলে সাউথওয়েল ঐ তিরস্কার করেছিলেন (প্রায় অন্ধ অসুস্থ পেটিকে তখন নিউটনের সদ্যপ্রকাশিত 'Mathematical Principles of Natural Philosophy' ['প্রকৃতিবিজ্ঞানের গাণিতিক মূল-নিয়মাবলি'] জোরে-জোরে পড়ে শোনান হচ্ছিল)।

এক্ষেত্রেও সার উইলিয়ম স্বধর্মনিষ্ঠ থেকেছেন। তাঁর বড় ছেলে চার্লস যাতে বইখানা বুঝতে পারে সেজন্যে তিনি ২০০ পাউন্ড দিতে রাজি ছিলেন। ছেলে-মেয়েদের পেটি ভালবাসতেন, তাদের মানুষ করার জন্যে তিনি উৎকণ্ঠা দেখিয়েছিলেন বিস্তর, তাদের সম্বন্ধে তিনি লেখেন: 'মেয়ের

বিয়ের যৌতুক জমাবার জন্যে কিংবা নিষ্কর্মাদের আদর করার জন্যে আমি খাটব না, আর আমি চাই আমার ছেলে যাকে এত ভালবাসে সেই স্ত্রীর আনা যৌতুকের চৌহদ্দির ভিতরে সে জীবনযাপন করবে।' আর তারপর নিজের জীবনের তাৎপর্য সম্বন্ধে: '...জিজ্ঞাসা করবেন কেন আমি নাছোড় হয়ে লেগে থাকি এইসব নিষ্ফলা কাজে... আমি বলি এগুলি হল আনন্দের কাজ, তার মধ্যে মহত্তম এবং পরম সুখের কাজ হল পরিচিন্তন।'*

সমসাময়িকদের মধ্যে সার উইলিয়ম পেটির খ্যাতি ছিল ত্রিবিধ: এক, তিনি দেদীপ্যমান প্রতিভাশালী, লেখক, পণ্ডিতব্যক্তি; দুই, তিনি অক্লান্ত পরিকল্পরচয়িতা, কল্পনাপ্রবণ; আর তিন, তিনি ধূর্ত চক্রী, ধনলোভী, আর কোন্ উপায় অবলম্বন করবেন তাতে বড় একটা বাছবিচার করেন না। এই তৃতীয় খ্যাতিটা পেটির পিছু-পিছু লেগে ছিল আয়ার্ল্যান্ডে জমি-বিলিব্যবস্থার 'কৃতি' থেকে শুরু করে তাঁর একেবারে মৃত্যু অবধি। এটা ভিত্তিহীনও নয়।

সম্পত্তি-বিত্তবান ব্যক্তি এবং করিতকর্মা কারবারির জীবনী হিসেবে পেটির জীবনের শেষার্ধটার দিকে একবার মনোযোগ দেওয়া যাক। তাঁর জীবনের সন্ধিক্ষণটা এসেছিল ১৬৫৬-১৬৫৭ সালে, যখন তিনি নিম্নবর্গের বুদ্ধিজীবী থেকে বদলে হয়ে দাঁড়ান মুনাফাখোর এবং ভাগ্যান্বেষী, আর তারপর ধনী ভূস্বামী। লণ্ডনে আর অক্সফোর্ডে বিজ্ঞানী বন্ধুদের কাছে এই পরিবর্তনটা ছিল অপ্রীতিকর-অপ্রত্যাশিত। তাঁদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে পেটি বিচলিত এবং ব্যথিত হয়েছিলেন। বয়েল-এর মতামত সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে সশ্রদ্ধ ছিলেন, তাঁর কাছে চিঠি লিখে পেটি মিনতি করে বলেছিলেন তিনি যেন ঝটিতি কোন সিদ্ধান্ত না করেন, কী ঘটল সেটা (পেটি) নিজে বুঝিয়ে বলার সুযোগ তিনি যেন দেন। মনকষাকষিটা কালক্রমে ঘুচে গিয়েছিল অংশত, কিন্তু রয়ে গিয়েছিল তার অবশেষ।

রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার ঠিক পরেই নিজ ভূমিসম্পত্তি বজায় রাখার জন্যে পেটিকে জোর লড়তে হয়েছিল: আগেকার মালিকদের কেউ-কেউ নতুন সরকারের সমর্থনপুষ্ট ছিল, তারা ভূমি ফেরত চাইছিল। পুরোপুরি সতেজে এবং সোৎসাহে তিনি নেমে পড়েছিলেন এই লড়াইয়ে,

---

* E. Strauss, 'Sir William Petty', London, 1954, pp. 168, 169-70.

এতে তিনি ঢেলেছিলেন প্রচুর পরিমাণ মানসিক শক্তি আর সময়। চারদিকে ছড়ানো ভূমিসম্পত্তি তিনি হাতে রাখতে পেরেছিলেন মোটের উপর, তাঁর জয় হয়েছিল। কিন্তু ভূমি-সংক্রান্ত অন্তহীন মামলা মকদ্দমায় তিনি হয়রান হন।

আর শুধু কি তাই! নিজ নীতির বিরুদ্ধে, বন্ধুবান্ধবের পরামর্শের বিরুদ্ধে তিনি ভাগ্যান্বেষণে নেমে পড়লেন একটা নতুন ক্ষেত্রে: তিনি পড়লেন গিয়ে কর-ইজারাদারদের দলে — এরা ছিল ধনিক, যারা কর সংগ্রহ করার কর্তৃত্ব সরকারের কাছ থেকে কিনে নিয়ে দেশে লুটতরাজ চালাত। পেটি তাঁর বিভিন্ন রচনায় এই কর-ইজারাদারী ব্যবস্থাটার সমালোচনা করেন, এতে উদ্যোগ আর উৎপাদন ব্যাহত হত; এই সহযোগীদের তিনি প্রায় প্রকাশ্যেই বলতেন জোচ্চোর, রক্তচোষা। তবু নিজ অংশের টাকা তিনি দিয়েছিলেন! 'রক্তচোষাদের' সঙ্গে তাঁর বিবাদ হয়েছিল অচিরে, কিন্তু টাকা ফেরত পেতে পারেন না। এইভাবে তিনি জড়িয়ে পড়েন আরও একটা মামলায়, যেটা ছিল অন্যান্য সমস্ত মামলা-মকদ্দমার চেয়ে জঘন্য এবং নিরর্থক। এতে ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়ে পেটি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, তাতে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের করুণা হয়, আর বিদ্বেষপরায়ণ আনন্দলাভ করে শত্রুরা। ১৬৭৭ সালে স্বল্পকালের জন্যে তাঁকে জেলে পর্যন্ত থাকতে হয়েছিল 'আদালত অবমাননার দায়ে'। তিনি অবিরাম চেষ্টা করে চলছিলেন রাজনীতিক বৃত্তির জন্যে, কিন্তু ঐসব কেলেঙ্কারি তাঁর সমস্ত সম্ভাবনা মাটি করে দেয়। নিজের বিভিন্ন পরিকল্প কার্যে পরিণত করার জন্যে যেসব পদে নিযুক্ত হওয়া দরকার ছিল তা তাঁকে দিতে অস্বীকার করা হয়।

সম্পত্তিওয়ালা মানুষটি হয়ে পড়েছিলেন সম্পত্তির দাস। একখানা চিঠিতে পেটি নিজেই নিজেকে তুলনা করেন উজানে দাঁড় টেনে অবসন্ন দাস-দাঁড়ীর সঙ্গে। যাঁর কর্মশক্তি আর ক্ষমতা-সামর্থ্য উজাড় করে দেওয়া হয়েছিল অর্থ, খাজনা আর কর-ইজারাদারির হিংস্র জগতে এমন একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির হল এমনই মর্মান্তিক পরিণতি — **বুর্জোয়া ট্র্যাজিডি।**

তাঁর সমকালীন অন্যান্যেরা ট্র্যাজিডিটা টের পেয়েছিলেন, তবে স্বভাবতই সে-সম্বন্ধে তাঁদের বিবেচনাধারা ছিল আমাদের একালের থেকে ভিন্ন। পেটির অসাধারণ সাধ্য-সামর্থ্য এবং রাজনীতিতে আর শাসনকার্যে তাঁর নগণ্য সাফল্যের মধ্যকার অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করে তাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন। রাজকার্য সম্বন্ধে তাঁর চেয়ে উন্নত উপলব্ধি কারও থাকতে পারত এমনটা কল্পনা করা কঠিন — লিখেছেন এভেলিন। তিনি আরও লিখেছেন:

'ম্যানুফ্যাকচারের জন্যে এবং বাণিজ্য উন্নয়নের পরিদর্শক হিসেবে তাঁর জুড়ি কেউ ছিল না দুনিয়ায়; ...আমি যদি কোন প্রিন্স হতাম তাহলে তাঁকে করতাম অন্তত আমার দ্বিতীয় অমাত্য।'

তবু অ্যাডমিরাল্‌টিতে একটা গৌণ পদের বেশি কিছুই পান নি পেটি। যেসব দৈনন্দিন ব্যাপার পেটির চিন্তা আর কর্মশক্তি নিঃশেষ করে ফেলত সেগুলোর তুচ্ছতা বুঝতে তিনি সর্বদাই অপারক হতেন, তা মোটেই নয়। নিজেকে পরিহাস করে তিনি হাসতেন কখনও-কখনও। কিন্তু তিনি বেরিয়ে পড়তে পারেন নি ঐ দুষ্টচক্রটা থেকে। তাঁর রচনাবলির চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ততা সেগুলির কৃতিত্ব, আর তাতে প্রকাশ পায় তাঁর চরিত্র। অথচ সেটা ছিল অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যে তাঁর ডুবে থাকারই ফল।

ইংলন্ডের মুদ্রা নতুন করে তৈরি করার ব্যাপার নিয়ে একটা বিতর্ক প্রসঙ্গে, বিশেষভাবে সেই সম্পর্কেই পেটি ১৬৮২ সালে একখানা ছোট্ট বই লিখেছিলেন — 'Quantulumcunque Concerning Money' ('অর্থ সম্পর্কে কথামালা')। বত্রিশটা প্রশ্ন এবং সেগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তরের আকারে লেখা হয়েছিল বইখানা। এই রচনাটা ছিল যেন অর্থ-সংক্রান্ত বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের ইস্পাতের কাঠামখানা, অবলম্বনস্বরূপ গঠন, যেটাকে ভরিয়ে তোলা বাকি ছিল অন্যান্য মালমশলা দিয়ে — যথা বিস্তারিত বিবরণ, বিশদীকরণ, উদাহরণ-ব্যাখ্যা, বিভিন্ন অংশ আর সমস্যার মধ্যে বিভাগ।

লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের উদ্দেশে লেখা এবং লেখকের জীবনকালে অপ্রকাশিত এই অনাড়ম্বর মন্তব্যগুচ্ছটাকে মার্কস বলেছেন, 'স্বচ্ছন্দে পরিসমাপ্ত রচনা... যেন একক খন্ড আকারে ঢালা... তাঁর অন্যান্য রচনায় যা দেখা যায় সেই বণিকতান্ত্রিক বিবেচনাধারার শেষ চিহ্নগুলো একেবারেই লোপ পেয়ে গেছে এই বইখানায়। আধার আর আধেয়র দিক থেকে এটা একটা ছোটখাটো মাস্টারপিস...'*

শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বের বিবেচনাধারা অবলম্বন করে পেটি অর্থকে ধরেছেন একটা বিশেষ ধরনের পণ্য হিসেবে, যেটা একটা সর্বগত তুল্যাঙ্কের কাজ করে। সমস্ত পণ্যের মতো এটারও মূল্য পয়দা হয় শ্রম দিয়ে, কিন্তু

* ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, 'অ্যান্টি-ড্যুরিং', মস্কো, ১৯৬৯, ২৭৬ পৃঃ (অ্যান্টি-ড্যুরিং-এর ২য় ভাগের ১০ম পরিচ্ছেদ মার্কসের লেখা)।

বহুমূল্য ধাতু নিষ্কাশনে ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণ দিয়ে নির্ধারিত হয় সেটার বিনিময়-মূল্যের পরিমাণ। পরিচলনের জন্যে আবশ্যক অর্থের পরিমাণ নির্ধারিত হয় বাণিজ্যিক লেনদেনে অর্থের পরিমাণ দিয়ে, অর্থাৎ শেষে গিয়ে এইসব উপাদান দিয়ে: অর্থে পরিণত-করা পণ্যের পরিমাণ, সেগুলোর দাম, মুদ্রাগুলো পরিচলনের পৌনঃপুন্য (পরিচলনের বেগ)। পূর্ণ-মূল্যের অর্থের জায়গায় আসতে পারে ব্যাঙ্ক থেকে ছাড়া কাগজী মুদ্রা — একটাকিছু চৌহদ্দির ভিতরে।

এই বইয়ে (এবং আরও কোন-কোন রচনায়) পেটির ব্যক্ত ভাব-ধারণার কাঠামের ভিতরে কিংবা এইসব ভাব-ধারণা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের মধ্যে, অনেকাংশে এইভাবে পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরে বিকশিত হয়েছিল অর্থ আর ক্রেডিট-সংক্রান্ত তত্ত্ব।

এই অনাড়ম্বর প্রবন্ধটিতে বহু ভাব-ধারণা সংক্ষেপিত, সেগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে শুধু মোটা দাগে — এতে দেখা যাচ্ছে তাত্ত্বিক চিন্তনের কতখানি ক্ষমতা ছিল এই মানুষটির। যা তিনি করতে পারতেন তার একটা ক্ষুদ্রাংশ মাত্র তিনি করে গেছেন। যদিও এই কথাটা হয়ত বলা যেতে পারে যেকোন ব্যক্তি প্রসঙ্গেই, তবু পেটির বেলায় এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বুয়াগিইবের — তাঁর যুগ, তাঁর ভূমিকা

এঙ্গেলস বলেছেন, 'মার্কস অর্থনীতি অধ্যয়ন শুরু করেছিলেন প্যারিসে ১৮৪৩ সালে, তিনি আরম্ভ করেছিলেন মহান ইংরেজ আর ফরাসীদের থেকে।'* আঠার শতকের গোড়ার দিককার অর্থনীতিবিদ বুয়াগিইবেরকে ততদিনে সবাই ভুলেই গিয়েছিল — তাঁর রচনাবলি মার্কস পড়েছিলেন কিসের তাগিদে সেটা বলা কঠিন। ব্যাপারটা হয়ত আপতিক: আঠার শতকের প্রথমার্ধের ফরাসী অর্থনীতিবিদদের রচনাবলির একটা সংকলন প্যারিসে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৩ সালে; আর তার মধ্যে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল বুয়াগিইবেরের বিভিন্ন প্রবন্ধ — ১৩০ বছরের ফাঁক যাবার পরে সেই প্রথম। বুয়াগিইবেরের ফরাসী আর জার্মান মেশান রচনাগুলির সারসংগ্রহ থেকে এগিয়ে মার্কস বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা করেছিলেন, আর তারপর শুরু হয় তাঁর পরিচিন্তন। ১৪শ লুইর রাজত্বকালে রুয়ে'র একজন জজের এইসব ভাব-ধারণা ছিল তখনকার কাল থেকে বেশকিছুটা আগুয়ান — সেটাই মার্কসকে চালিত করেছিল এই পরিচিন্তনে।

বছর-দশেক পরে মার্কস তাঁর 'অর্থশাস্ত্রের পর্যালোচনা নিবন্ধ' বইখানা নিয়ে কাজ করার সময়ে সম্ভবত ঐ সারসংগ্রহ ব্যবহার করেছিলেন; 'বৃটেনের উইলিয়ম পেটি এবং ফ্রান্সের বুয়াগিইবের থেকে শুরু করে বৃটেনের রিকার্ডো এবং ফ্রান্সের সিস্মন্দি অবধি দেড় শতাব্দীর বেশি কালের ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রের'** প্রগাঢ় মূল্যায়ন করেন প্রথম এই বইখানায়।

---

* কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ২ খণ্ড, মস্কো, ১৯৬৭, ৭ পৃঃ।

** কার্ল মার্কস, 'অর্থশাস্ত্রের পর্যালোচনা নিবন্ধ', মস্কো, ১৯৭০, ৫২ পৃঃ।

বুয়াগিইবের মার্কসকে আকৃষ্ট করেন বিদ্বানব্যক্তি এবং লেখক হিসেবেই শুধু নয়। নিজে নিরঙ্কুশ-ক্ষমতাশালী রাজতন্ত্রের রাষ্ট্রযন্ত্রে একটি 'ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ' এই বিচক্ষণ সৎ মানুষটি ফরাসীদের মধ্যে উৎপীড়িত সংখ্যাগুরু অংশের সমর্থনে বলেছিলেন, সেজন্যে তিনি ক্ষতিগ্রস্তও হন।

গরিব ফ্রান্স

১৪শ লুইর রাজত্বের প্রথম দুই দশকে ফ্রান্সে অর্থনীতির ভার ছিল কল্‌বেরের উপর। শিল্পের গুরুত্ব তিনি বুঝতেন; শিল্পোন্নয়নের জন্যে তিনি করেছিলেন অনেককিছু। তবে শিল্পের কোন-কোন শাখার প্রসারের ফলে কৃষির ক্ষতি হয়েছিল; কৃষিটাকে কল্‌বের দেখতেন রাষ্ট্রের অর্থ-রাজস্বের একটা উৎপত্তিস্থল হিসেবেই শুধু। কল্‌বেরের কর্মনীতিতে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কতন্ত্রটাকে একেবারেই অক্ষত রেখে দেওয়া হয়েছিল; দেশের আর্থনীতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত করছিল ঐ সম্পর্ক — এটা ছিল তাঁর কর্মনীতির প্রধান ত্রুটি। উচ্চাকাঙ্ক্ষী লুই অবিরাম যুদ্ধ চালাতেন, তাঁর রাজসভা ছিল অভূতপূর্ব জাঁকজমকে ব্যয়বহুল — এই দুই প্রয়োজনে যেমন করে হোক জোর করে টাকা আদায় করার একই প্রধান কাজটা তাঁকে না দিলে কল্‌বেরের প্রচেষ্টা হয়ত আরও সার্থক হত।

কল্‌বের মারা যাবার পরে তাঁর কর্মনীতির কোন-কোন সাধনসাফল্য মাটি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ঐ কর্মনীতির ত্রুটিগুলোর ক্রিয়াফল হয়েছিল দ্বিগুণ প্রবল। ১৭০১ সালে শুরু হয়েছিল ফ্রান্সের সবচেয়ে অকৃতকার্য এবং সর্বনাশা যুদ্ধ, যেটাকে বলা হয় 'স্পেনীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ', যাতে ইংলণ্ড হল্যাণ্ড অস্ট্রিয়া এবং কোন-কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জোট দাঁড়িয়েছিল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে।

১৪শ লুই বুড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজকার্য চালাবার মতো উপযুক্ত লোক খুঁজে বের করার ক্ষমতাটা তিনি খুইয়ে বসেন। উদ্যমশীল এবং অধ্যবসায়ী কল্‌বেরের জায়গায় এসেছিলেন বিভিন্ন মাঝারি ধরনের লোক। ১৪শ লুই এবং তাঁর পরবর্তী দুই বুরবোঁ রাজার আমলে মন্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন ছিলেন অর্থ বিভাগের মহানিয়ামক, তাঁর হাতে একত্রিত করা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থার পরিচালনা, দেশের অর্থনীতি, স্বরাষ্ট্র বিভাগ, বিচার বিভাগ, আর কখনও-কখনও সামরিক বিষয়াবলিও।

এটা ছিল আসলে প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপার, কিন্তু কাজটা ছিল রাজার বাসনা চরিতার্থ করাই শুধু।

যেকোন আর্থনীতিক সংস্কার চালু করাটা নির্ভর করত মহানিয়ামকের উপর। বুয়াগিইবের এটা জানতেন; তাই সতর শতকের শেষ দশকে এবং আঠার শতকের প্রথম দশকে ঐ পদে অধিষ্ঠিত পন্ত্‌শার্ৎরেন এবং শামিলারকে নিজ বিভিন্ন পরিকল্পের প্রয়োজনীয়তা তাঁদের বোঝাবার জন্যে অবিরাম চেষ্টা করতেন। কিন্তু ঐ দুজন তাঁর কথা ভাল করে শুনতেও চান নি। একবার পন্ত্‌শার্ৎরেনের সাক্ষাৎলাভ ক'রে বুয়াগিইবের নিজ বিবরণ শুরু করতে গিয়ে বলেন, মন্ত্রীমহাশয় প্রথমে তাঁকে উন্মাদ মনে করতে পারেন, কিন্তু ভাব-ধারণাটা সব শুনলে মন্ত্রী মত বদলাবেন অচিরেই। অল্প কয়েক মিনিট বুয়াগিইবেরের কথা শুনে পন্ত্‌শার্ৎরেন হো-হো করে হাসতে-হাসতে বলেন, তিনি নিজের গোড়ার মতটাই বজায় রাখলেন, আর কোন কথার কাজ নেই।

বিশেষ-অধিকারভোগী অভিজাত আর যাজক বর্গ-দুটো কিংবা কর-ইজারাদার ধনিকদের স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন কোন সংস্কারের কথা শুনতেও সরকার নারাজি ছিল। অথচ দীর্ঘ-লাগাতর সংকট থেকে দেশের অর্থনীতিকে উদ্ধার করতে পারত শুধু এমন সংস্কারই, আর নাছোড়বান্দা আবেদক রুয়ে'র জর্জটির পরিকল্পগুলির লক্ষ্যস্থল ছিল সেটাই।

তখনকার ফরাসী অর্থনীতির নিদারুণ হাল সম্বন্ধে, যাদের ৭৫ শতাংশ কৃষক সেই জনসাধারণের কঠোর দুর্দশা সম্বন্ধে তথ্যাদির খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আকর হল বুয়াগিইবেরের রচনাগুলি। তবে এ সম্পর্কে লিখেছিলেন অনেকেই। রাজনীতি এবং অর্থনীতি বিষয়ে বিশিষ্ট লেখক মার্শাল ভবাঁ ১৭০৭ সালে মোটামুটি হিসাব করে দেখিয়েছিলেন মোট জনসমষ্টির ১০ শতাংশ ছিল নিঃস্ব, নিঃস্বতার কিনারে ছিল ৫০ শতাংশ, অত্যন্ত টানাটানির অবস্থায় ৩০ শতাংশ, আর ভালভাবে চলত মাত্র ১০ শতাংশের, তারা উপর মহলের মানুষ, তাদের মধ্যে কয়েক হাজারের ছিল বিলাসব্যসনের জীবন।

এই দশার মূল কারণগুলো তিনি জানতেন কিছু পরিমাণে — এই ছিল অন্যান্য সমালোচক থেকে বুয়াগিইবেরের পার্থক্যটা। তাই অর্থনীতি প্রসঙ্গে চিন্তন বিকাশের জন্যে তিনি করতে পেরেছিলেন অনেককিছু। তিনি

গ্রামাঞ্চলের ব্যাপারে মনোনিবেশ করেছিলেন সেটা আপতিক নয়। ফ্রান্সে বুর্জোয়া অর্থনীতি উন্নয়নের চাবিকাঠিখানা ছিল এখানে। কিন্তু রাজা, অভিজাতকুল আর যাজকমণ্ডলী গোঁ ধরে সেটাকে তালা-চাবি বন্ধ করে রেখেছিল — শতাব্দীর শেষাশেষি বিপ্লব এসে সমস্ত তালা ভেঙে ফেলা অবধি। ফরাসী কৃষক নিজস্ব মুক্তি লাভ করেছিল কয়েক শতাব্দী আগে। কিন্তু যে-জমিতে সে বাস করত, চাষআবাদ করত, সেটার অবাধ মালিক সে ছিল না। পরিবর্তিত আকারে হলেও তখনও পুরোপুরি চালু ছিল 'সেনিয়ার* ছাড়া জমি হয় না' এই মধ্যযুগীয় নীতি। তার সঙ্গে সঙ্গে, ইংলণ্ডে গড়ে উঠছিল পুঁজিতান্ত্রিক প্রজা-খামারীদের যে-শক্তিশালী শ্রেণী সেটা ছিল না ফ্রান্সে। ত্রিবিধ বোঝায় জর্জরিত হচ্ছিল কৃষককুল: তারা খাজনা দিত, আবার সামন্ততান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা অনুসারে হরেক রকম কাজ করতে হত ভূস্বামীর জন্যে; পাদরি আর মঠের সন্ন্যাসীদের বিরাট বাহিনীটাকে পোষার জন্যে চার্চে দিতে হত আয়ের দশমাংশ; রাজার জন্যে করদাতা ছিল বস্তুত একমাত্র তারাই।

বুয়াগিইবের তাঁর বিভিন্ন রচনায় এবং রিপোর্ট-মন্তব্যে বহু বার বলেছেন, এই আর্থনীতিক ব্যবস্থার ফলে চাষআবাদে উন্নতি ঘটাবার এবং উৎপাদন বাড়াবার চাড় থাকত না কৃষকদের।

কর-রাজস্ব আদায়ের জন্যেই গোটা আর্থনীতিক কর্মনীতি লাগাতে গিয়ে রাষ্ট্র সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলোকে কাজে লাগাত, সেগুলো নষ্ট করায় বিলম্ব ঘটাত। কাস্টম্‌স-এর বেড়া খাড়া করে সারা ফ্রান্সকে বিভক্ত করা হয়েছিল পৃথক-পৃথক প্রদেশে; চালান-করা সমস্ত পণ্যের জন্যে তোলা আদায় করা হত ঐসব চৌকিতে। দেশের ভিতরকার বাজারের প্রসার এবং পুঁজিতান্ত্রিক কাজ-কারবারের বিকাশ ব্যাহত হত তার ফলে। আর-একটা বাধা ছিল শহরে-শহরে বৃত্তিগত গিল্ডগুলো, এদের ছিল বিভিন্ন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, কড়াকড় নিয়ম-কানুন, গণ্ডিবদ্ধ উৎপাদন — এগুলিকে বজায় রাখা হত। এটাও সরকারের পক্ষে লাভজনক ছিল, কেননা সেটা গিল্ডগুলোর কাছে বরাবর বিক্রি করত একই সাবেকী সুযোগ-সুবিধাগুলো। কল্‌বের যে অল্প কয়েকটা ম্যানুফ্যাক্টরি স্থাপন করেছিলেন সেগুলিও নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল আঠার শতকের গোড়ার দিকে। কিছু পরিমাণ

* সামন্ত-মনিব। — সম্পাঃ

পরধর্ম-সহিষ্ণুতা চলতে দেওয়া হয়েছিল নান্ত অনুশাসনে — সেটাকে ১৪শ লুই বাতিল করে দেন ১৬৮৫ সালে। বহু হাজার হিউগেনট পরিবার — কারিগর আর ব্যাপারী ফ্রান্স ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল তাদের অর্থ, দক্ষতা এবং কাজ-কারবারের মেজাজ।

রুয়ের জজ

আর্থনীতিক প্রকল্প-রচয়িতারা বিশেষ ধরনের মানুষ, যাঁদের দেখা যেতে পারে বোধহয় যেকোন সময়ে, যেকোন দেশে। উদ্ভাবকেরা হলেন আর-একটা অদ্ভুত গোষ্ঠী, আর ঐ প্রকল্প-রচয়িতারা এদেরই অনুরূপ এবং একই বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হন: এই দুনিয়ায় যারা প্রবল তাদের সংকীর্ণ স্বার্থ, রক্ষণশীলতা, নিছক নির্বুদ্ধিতা।

বুয়াগিইবের ছিলেন একজন খুবই উৎসাহী সৎ এবং নিরাসক্ত আর্থনীতিক প্রকল্প-রচয়িতা। ১৪শ লুইর ফ্রান্সে তাঁর ব্যর্থতা ছিল অবধারিত, আর তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ব্যর্থতা ছিল পেটির পক্ষে যেমনটা তার চেয়ে মর্মান্তিক। বুয়াগিইবের হয়ত সার উইলিয়মের মতো অত বহুমুখী এবং বৈচিত্র্যময় নন, কিন্তু তিনি বেশি শ্রদ্ধাভাজন। রুয়ের এই নির্ভীক মানুষের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর সমসাময়িকেরা অনুরূপ সদগুণের দৃষ্টান্ত বের করেছেন সুপ্রাচীন কাল থেকে। এই দু'জন অর্থনীতিবিদ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মার্কস লিখেছেন, 'যখন পেটি ছিলেন স্রেফ চপলমতি, আত্মসাৎ করতে উদ্‌গ্রীব, নীতিবিবর্জিত ভাগ্যান্বেষী, বুয়াগিইবের... বিপুল বুদ্ধিবল নিয়ে সাহস করে দাঁড়িয়েছিলেন উৎপীড়িত শ্রেণীগুলির স্বার্থের সপক্ষে।'* এখানে বলা দরকার, মার্কস বুয়াগিইবেরকে জানতেন শুধু তাঁর প্রকাশিত রচনাগুলি থেকে, আর এই বর্ণনায় তিনি খোদ মানুষটি সম্বন্ধে উপলব্ধি ব্যক্ত করেন, যাঁর সম্বন্ধে আরও পুরোপুরি জানা গিয়েছিল উনিশ শতকের সপ্তম দশকে তাঁর চিঠিপত্র আবিষ্কৃত হবার পরে।

পিয়ের লেপেজাঁ** দ্য বুয়াগিইবেরের জন্ম হয় রুয়েঁতে ১৬৪৬ সালে।

---

* কার্ল মার্কস, 'অর্থশাস্ত্রের পর্যালোচনা নিবন্ধ', মস্কো, ১৯৭০, পৃঃ ৫৫।

** এটা ছিল এই অর্থনীতিবিদের আসল বংশনাম। বুয়াগিইবের ছিল তাঁর পূর্বপুরুষের গড়ে তোলা জমিদারির নাম। বংশনামের সঙ্গে এমনকিছু সাধারণত যোগ করা হত কোন বুর্জোয়া খেতাব পাবার সময়ে। তবে পিয়ের লেপেজাঁ বরাবর দ্য বুয়াগিইবের নামে পরিচিত ছিলেন।

তাঁর পরিবার ছিল নর্ম্যাণ্ডির noblesse de robe-র অন্তর্গত (প্রাচীন ফ্রান্সে যেসব অভিজাত বংশানুক্রমে বিচার-বিভাগীয় এবং প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত থাকত তাদের বেলায় প্রয়োগ করা হত ঐ অভিধাটা); তাছাড়াও ছিল noblesse d'épée, যারা রাজার খিদমত করত তরোয়াল দিয়ে। সতর এবং আঠার শতকে নব্য ধনী বুর্জোয়াদের কাতার থেকে লোক গিয়ে দ্রুত বাড়িয়ে তুলেছিল noblesse de robe-টাকে। এই হল বুয়াগিইবেরের পারিবারিক পরিবেশ।

তখনকার দিনের মতো চমৎকার শিক্ষাই লাভ করেছিলেন তরুণ পিয়ের লেপেজাঁ; তারপর প্যারিসে গিয়ে তিনি সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন। শিগগিরই তিনি রেওয়াজী পারিবারিক পেশা (আইন) ধরেন, নিজ মহলের একটি তরুণীকে বিয়ে করেন ১৬৭৭ সালে, বিচার-বিভাগীয় প্রশাসনিক পদ পান নর্ম্যাণ্ডিতে। কোন কারণে বাবার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়, তাঁর উত্তরাধিকার খোয়া যায়, সেটা পান তাঁর ছোট ভাই, নিজেই 'সংসারক্ষেত্রে নেমে পড়তে' বাধ্য হন। এতে তিনি খুবই কৃতকার্য হন, ফলে ১৬৮৯ সালে মোটা টাকা দিয়ে রুয়েঁ বিচার-বিভাগীয় এলাকার লেফটেন্যান্ট-জেনারেলের মোটা-মাইনের প্রতিপত্তিশালী পদ পান। তখনকার অদ্ভুত শাসনব্যবস্থায় এটা ছিল শহরের প্রধান বিচারপতির পদ, আর তার সঙ্গে পুলিস এবং সাধারণ পৌর বিষয়াবলিও পরিচালনার কাজ। বুয়াগিইবের এই পদে ছিলেন সারা জীবন ধরে; মারা যাবার দু'মাস আগে তিনি পদটা দেন তাঁর বড় ছেলেকে।

পদ বিক্রি করাটা ছিল বুরবোঁ রাজতন্ত্রের অতি ঘোর সামাজিক অমঙ্গলগুলোর একটা। এইভাবে রাজকোষের জন্যে অর্থ আদায় হত বুর্জোয়াদের কাছ থেকে; উৎপাদনে এবং বাণিজ্যে তাদের অর্থ বিনিয়োগ নিবারিত হত। প্রায়ই পয়দা করা হত নতুন-নতুন পদ, কিংবা আগেকার পদগুলোকে বিভক্ত করে নতুন করে বিক্রি করা হত। ১৪শ লুইর একজন মন্ত্রী রসিকতা করে বলতেন, হিজ ম্যাজেস্টি নতুন পদ পয়দা করলেই অমনি তার বোকারাম ক্রেতা পাওয়া যায়।

অর্থনীতি-সংক্রান্ত প্রশ্নাবলি নিয়ে বুয়াগিইবের বিচার-বিশ্লেষণ শুরু করেছিলেন মনে হয় অষ্টম দশকের শেষের দিকে। নর্ম্যাণ্ডির গ্রামীণ মানুষের মধ্যে থেকে-থেকে এবং অন্যান্য প্রদেশে সফর করে কৃষকদের নিদারুণ অবস্থা দেখে তিনি অচিরেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, সেটাই

দেশের সর্বাত্মক আর্থনীতিক অধোগতির কারণ। কৃষক যাতে না খেয়ে মরে না যায় সেজন্যে যেটুকু আবশ্যক শুধু তাইই তাদের হাতে থাকতে দিত অভিজাতকুল আর রাজা — কখনও-কখনও সেটুকুও নয়। এমন পরিস্থিতিতে কৃষক উৎপাদন বাড়াবে বলে আশা করা যেত না বড় একটা। তেমনি আবার, কৃষকদের ভয়াবহ গরিবিই ছিল শিল্পের অবনতির প্রধান কারণ, কেননা শিল্পের জন্যে বড়রকমের কোন বাজার ছিল না।

এইসব ধ্যান-ধারণা ক্রমে পরিণত হয়ে উঠেছিল এই বিচারপতির মাথায়। ১৬৯১ সাল নাগাদই তিনি বলতে শুরু করেছিলেন নিজ 'ব্যবস্থা'টার কথা, সেটাকে হয়ত লিখেও ফেলছিলেন। এই 'ব্যবস্থাটা' ছিল একগুচ্ছ সংস্কার, যেগুলোকে এখন আমরা বলতে পারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ধরনের। বুয়াগিইবের দাঁড়িয়েছিলেন শহুরে বুর্জোয়াদের স্বার্থের পতাকী হিসেবে যতখানি তার চেয়ে বেশি কৃষকদের সমর্থক হিসেবে। ফ্রান্সের সঙ্গে এমন আচরণ করা হয় যেন সেটা বিজিত দেশ — ধুয়োর মতো এই কথাটা বারবার উঠেছে তাঁর সমস্ত রচনায়।

আদি আকারে বুয়াগিইবেরের 'ব্যবস্থাটা', আর ১৭০৭ সাল নাগাত সেটা যে-চূড়ান্ত আকার পায়, এই দুইই বলা যেতে পারে তিনটে প্রধান উপাদান নিয়ে গঠিত।

এক, বিস্তৃত কর-সংস্কার চালু করাটাকে তিনি অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করেছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ ছাড়াই বলা যেতে পারে, সাবেকী, স্পষ্টতই উলটোমুখো ব্যবস্থাটার জায়গায় আনুপাতিক কিংবা সামান্য বর্ধিষ্ণু করাধানের কথা তিনি তুলেছিলেন। করাধানের এই নীতি অদ্যাবধি বিতর্কের বিষয়, কাজেই সেটার ব্যাখ্যা চাই। উলটোমুখো ব্যবস্থায় কারও আয় যত বেশি সেটা থেকে কর কেটে নেওয়া হয় ততই কম শতাংশ; আনুপাতিক ব্যবস্থায় — কর হিসেবে কেটে নেবার পরিমাণ সবসময়ে থেকে যায় একই; বর্ধিষ্ণু ব্যবস্থায় সেটা বাড়ে আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। তখনকার দিনের পক্ষে অসাধারণ সাহসের পরিচয় ছিল বুয়াগিইবেরের প্রস্তাবটায়, কেননা অভিজাতকুল আর চার্চ কার্যত কোন করই দিত না, আর গরিবদের মতো অন্তত সমান শতাংশ কর তাদের উপর ধার্য করাতে চেয়েছিলেন তিনি।

দুই, অন্তর্বাণিজ্যের উপর থেকে সমস্ত বাধা-নিষেধ তুলে নিতে বলেছিলেন তিনি। তাঁর আশা ছিল, এর ফলে দেশীয় বাজারের প্রসার ঘটবে, বাড়বে শ্রমবিভাগ, পণ্য আর অর্থ পরিচলন প্রবলতর হবে।

তিন, শস্যের অবাধ বাজার চালু করা এবং শস্যের স্বাভাবিক দাম দাবিয়ে না রাখার দাবি করেছিলেন বুয়াগিইবের। শস্যের দাম কৃত্রিম উপায়ে কমিয়ে রাখার কর্মনীতিটাকে তিনি অত্যন্ত হানিকর মনে করতেন, কেননা সেই দামে উৎপাদন-পরিব্যয় পোষাত না, কৃষির বৃদ্ধি ব্যাহত হত। বুয়াগিইবের মনে করতেন, অর্থনীতির উন্নয়ন সবচেয়ে ভাল হয় অবাধ প্রতিযোগিতার অবস্থায়, তাতে পণ্যের 'সাচ্চা দাম' গড়ে ওঠে বাজারে।

বুয়াগিইবেরের বিবেচনায়, অর্থনীতিটাকে চাঙ্গা করা এবং দেশ আর দেশের মানুষের কল্যাণবৃদ্ধির জন্যে অপরিহার্য শর্ত ছিল এইসব সংস্কার। রাষ্ট্রের রাজস্ব বাড়তে পারে শুধু এই উপায়েই — এই বিশ্বাস তিনি জন্মাতে চেয়েছিলেন শাসকদের মনে। নিজ ভাব-ধারণা সম্বন্ধে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করার চেষ্টায় তিনি ১৬৯৫-১৬৯৬ সালে নিজের প্রথম বই প্রকাশ করেন, তাতে লেখকের নাম ছিল না, বইখানার ছিল এই বিশেষক নাম: 'ফ্রান্সের অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা, দেশটির অবনতির কারণ, এবং সেটার একটি সহজ-সরল প্রতিবিধান, যার ফলে রাজা একমাসেই পাবেন তাঁর প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থ, আর সমৃদ্ধি ঘটবে সমগ্র জনসমষ্টির'।

সহজ-সরল প্রতিবিধান এবং ঐ সবকিছু একমাসে হাসিল হবার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিল কিছু পরিমাণে নজর টানার উদ্দেশ্যে। তবে বুয়াগিইবের বাস্তবিকই বিশ্বাস করতেন কতকগুলো আইন পাস করানোই শুধু দরকার, তাহলেই অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠবে একনিমেষে, সেটাও এতে ফুটে উঠেছে।

তবে সেটা হল নৈরাশ্যগুচ্ছের সবে প্রথমটা। বইখানা প্রায় কারও নজরে পড়ল না বললেই হয়। ১৬৯৯ সালে পন্‌শার্‌ৎরেনের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন শামিলার, এঁর সঙ্গে বুয়াগিইবেরের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল; মনে হয়েছিল তাঁর অভিমতের প্রতি মন্ত্রীটির সহানুভূতি ছিল। আবার আশায় ভরে উঠলেন রুয়েঁর জজটি, তিনি নবোদ্যমে কাজ করতে থাকলেন, লিখলেন নতুন-নতুন রচনা। তবে এর পরের পাঁচ বছরে তাঁর প্রধান সৃষ্টি হল একগুচ্ছ দীর্ঘ পত্র — মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি। এইসব অসাধারণ দলিল রিপোর্ট-মন্তব্যই শুধু নয়, এগুলি আরও হল ব্যক্তিগত পত্র — অন্তরের আহ্বান।

বুয়াগিইবের যুক্তি-তর্ক তুলেছেন, মিষ্টি কথায় মন গলাতে চেয়েছেন, আর্থনীতিক বিপর্যয়ের ভয় দেখিয়েছেন, কাকুতি-মিনতি করেছেন। বুঝ-সমঝ পান নি একটুও, কখনও-কখনও পেয়েছেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পর্যন্ত, তখন

আত্মমর্যাদার কথা মনে করে চুপ করে গেছেন। তারপরে স্বদেশভূমির স্বার্থ বিবেচনায় রেখে সজ্ঞানে অভিমান ছেড়ে আবার আবেদন জানিয়েছেন যাঁরা ক্ষমতাসীন তাঁদের উদ্দেশে: ত্বরা করুন, ব্যবস্থা অবলম্বন করুন, উদ্ধার করুন!

অপরাধ এবং শাস্তি

বছরের পর বছর কাটতে থাকল। বুয়াগিইবেরের নতুন রচনাগুলি প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন মন্ত্রী, আর নিজ ভাব-ধারণাগুলি কার্যে পরিণত হবার আশায় সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকলেন বুয়াগিইবের। নিজ 'আর্থনীতিক পরীক্ষা'র জন্যে অর্লিয়েন্স প্রদেশে একটা এলাকা বুয়াগিইবের অবশেষে পেলেন ১৭০৫ সালে। কিভাবে এবং কোন্ পরিবেশে এই পরীক্ষা চালান হয়েছিল সেটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়। যা-ই হোক, তার পরের বছরই সেটা ব্যর্থ হয়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল। প্রতিপত্তিশালী ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের বিরোধিতার মুখে একটা ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন এলাকায় সেটার পরিসমাপ্তি অন্য রকম হতে পারতই না।

তখন আর কিছুই ঠেকাতে পারে না বুয়াগিইবেরকে। নিজ রচনার দুটো খণ্ড তিনি প্রকাশ করেন ১৭০৭ সালের গোড়ার দিকে। বিভিন্ন তাত্ত্বিক আলোচনা ছাড়াও তাতে ছিল সরকারের উপর তীব্র রাজনীতিক আক্রমণ, বিভিন্ন গুরুতর অভিযোগ এবং কঠোর হুঁশিয়ারি। উত্তরের জন্যে তাঁকে বেশি দেরি করতে হয় নি: বই নিষিদ্ধ হল, লেখককে নির্বাসনে পাঠান হল প্রদেশে।

বুয়াগিইবেরের বয়স তখন একষট্টি। তাঁর সমস্ত ব্যাপার তখন তালগোল পাকান অবস্থায়, তায় তাঁর পরিবারটি ছিল প্রকাণ্ড — পাঁচটি ছেলেমেয়ে। তাঁকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা। তাঁর ছোট ভাই ছিলেন রুয়েঁর পার্লেমেণ্ট (প্রাদেশিক আদালত)-এ একজন সম্ভ্রান্ত উপদেষ্টা — ইনি দাদার সপক্ষে আবেদন-নিবেদন করলেন। তাঁর হয়ে মধ্যস্থতা করার লোকের অভাব ছিল না, আর শামিলার নিজেই বুঝেছিলেন তাঁর শাস্তিটা হয়েছিল অসম্ভব-আজগবি। তবে এই খেপা পরিকল্প-উদ্ভাবককে বশে আনা চাই! দাঁতে দাঁত চেপে বুয়াগিইবের মেনে নিলেন: ইঁটের দেয়ালে মাথা ঠুকতে থাকাটা নিরর্থক। তাঁকে রুয়েঁতে ফিরতে দেওয়া হল।

এই কাহিনীর বহু তথ্যের জন্যে আমরা সমসাময়িক জীবনীকার ডিউক দ্য সাঁ-সিমোঁর* কাছে ঋণী, তিনি জানিয়েছেন নাগরিকেরা বুয়াগিইবেরকে অভ্যর্থনা করেছিল সসম্মানে এবং সানন্দে।

বুয়াগিইবেরের উপর সরাসর দমন-পীড়ন হয় না আর কখনও। নিজ রচনাগুলির আরও তিনটে সংস্করণ তিনি প্রকাশ করেছিলেন, তার থেকে সবচেয়ে বিতর্কমূলক অংশগুলোকে অবশ্য বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু মন-মেজাজের দিক থেকে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন। ১৭০৮ সালে শামিলারের জায়গায় মহানিয়ামক হয়েছিলেন কল্‌বেরের ভাইপো চতুর এবং সুযোগ্য ব্যক্তি দেমারে। ইনি প্রসন্ন ছিলেন অপদস্থ বুয়াগিইবেরের প্রতি; বুয়াগিইবেরকে আর্থিক বিষয় পরিচালনার কাজে নিতে পর্যন্ত তিনি চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার আর সময় ছিল না: বুয়াগিইবের তখন পরিবর্তিত মানুষ, আর আর্থিক বিষয়াবলির অবনতি ঘটছিল দ্রুত — প্রস্তুত হচ্ছিল জন লোর পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের জমিন। বুয়াগিইবের রুয়েঁতে মারা যান ১৭১৪ সালের অক্টোবর মাসে।

বুয়াগিইবেরের সমস্ত রচনা, চিঠিপত্র এবং সমসাময়িকদের দেওয়া যৎসামান্য তথ্যাদি থেকে ফুটে ওঠে তাঁর পূর্ণাঙ্গ এবং প্রবল ব্যক্তিত্ব। কাজেকর্মে আর ব্যক্তিগত জীবনে, উভয়ত মানুষটি এমন ছিলেন যাতে তাঁকে নিয়ে এঁটে ওঠা সহজ ছিল না: জেদ, অধ্যবসায় এবং একগুঁয়েমি ছিল তাঁর প্রকৃতির বিশেষত্ব। সাঁ-সিমোঁ সংক্ষেপে বলেছেন, 'তাঁর প্রাণবন্ত প্রকৃতিটা ছিল অনন্যসাধারণ'। বুয়াগিইবেরকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, আর এই শ্রদ্ধা ছিল প্রায় বিস্ময়ের মতো, সেটা স্পষ্টই।

তিনি লোকের সঙ্গে বনিবনাও করে চলতে পারতেন না, এই স্বভাবটা ছিল তাঁর প্রবল নীতিনিষ্ঠার ফল। বড়রকমের কিংবা ছোটখাটো সমস্ত ব্যাপারে তিনি নিজ নীতির সপক্ষে দাঁড়াতেন সোৎসাহে। আর যেহেতু এইসব নীতি — নরম ভাষায় বললে — তখনকার দিনে সচরাচর দেখা যেত না, তাই দ্বন্দ্ব-বিরোধ ছিল অনিবার্য। রুয়েঁর এই অনাড়ম্বর জজ কুড়ি বছর ধরে চালিয়েছিলেন তাঁর কঠোর লড়াই, তাতে তাঁকে ছাড়তে হয়েছিল মনের শান্তি সমৃদ্ধি এবং বৈষয়িক স্বার্থ (অদ্ভুত-অদ্ভুত জরিমানা ক'রে, তাঁর

---

* মহান ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রী কাউণ্ট ক্লদ্ আঁরি দ্য সাঁ-সিমোঁর একজন পূর্বপুরুষ।

আগেই কেনা পদের জন্যে আবার টাকা দিতে বাধ্য ক'রে শামিলার তাঁর একগঁুয়েমির জন্যে শাস্তি দিতেন)। মন্ত্রীরা তাঁকে পছন্দ করতেন না, তাঁকে সামান্য (হয়ত সামান্যর চেয়ে বেশিই) ভয়ও করতেন তাঁরা: বুয়াগিইবের নিজ ভাব-ধারণা আর বিশ্বাসগুলির সপক্ষে দাঁড়াতেন নিঃশঙ্ক অকপটতা এবং দৃঢ়সংকল্প নিয়ে, এতেই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

তত্ত্ববিদ

আগেকার সমস্ত তত্ত্ববিদদের মতো বুয়াগিইবের নিজ তাত্ত্বিক উপস্থাপনাগুলিকে চলিতকর্মের সাপেক্ষ করতেন, নিজের তুলে-ধরা কর্মনীতিকে তিনি প্রতিপন্ন করার জন্যে পেশ করতেন। তখনকার পক্ষে খুবই প্রগাঢ় এবং পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক অভিমততন্ত্রকে তিনি দাঁড় করিয়েছিলেন নিজ সংস্কারগুলির ভিত্তিতে, এরই থেকে অবধারিত হয়ে যায় অর্থনীতিবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর ভূমিকাটা। বুয়াগিইবেরের যুক্তিধারা ছিল বোধহয় পেটির অনুরূপ। দেশের আর্থনীতিক উন্নয়ন কী দিয়ে নির্ধারিত হয়, এই প্রশ্নটা তিনি তুলেছিলেন; ফ্রান্সের অর্থনীতির বদ্ধতা এবং অধঃপতনের কারণগুলো সম্বন্ধে তিনি উৎকণ্ঠিত ছিলেন বিশেষত। এর থেকে এগিয়ে তিনি পেঁছিছিলেন আরও ব্যাপক একটা তাত্ত্বিক প্রশ্নে: জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে সক্রিয় কোন্-কোন্ নিয়ম অর্থনীতির উন্নয়ন নির্ধারণ করে?

আরিস্টটল থেকে আরম্ভ করে সমগ্র আর্থনীতিক তত্ত্বক্ষেত্রে রয়েছে দাম গড়ে ওঠা এবং পরিবর্তিত হবার নিয়ম আবিষ্কারের প্রচেষ্টা — লেনিনের এই ধারণাটার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই দীর্ঘ অন্বেষণের ক্ষেত্রে একটা মৌলিক অবদান রয়েছে বুয়াগিইবেরের। আজ যেটাকে বলা হবে 'সর্বোপযোগী দাম গঠন' সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ধরেছিলেন প্রশ্নটাকে। তিনি লিখেছেন, আনুপাতিক বা সর্বোপযোগী দামই আর্থনীতিক স্থিতি এবং অগ্রগতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

এইসব দাম কী রকমের? এগুলি হল সর্বাগ্রে এমন দাম যাতে প্রত্যেকটা শাখায় উৎপাদন-পরিব্যয় এবং একটাকিছু পরিমাণ লাভ, নীট আয় উঠে আসতে পারে গড় হিসাবে। তাছাড়া, সেগুলো হল এমন দাম যাতে পণ্য বিপণন প্রক্রিয়া চলতে পারে নিরবচ্ছিন্নভাবে, আর ব্যবহারকের চাহিদা সমানে

বজায় থাকে। শেষে, সেগুলো হল এমন দাম যে-অবস্থায় অর্থের 'স্থান নির্দিষ্ট হয়ে যায়', লেনদেনের মোট পরিমাণে আনুকূল্য হয়, আর মানুষকে সেটা বজ্রমুঠিতে চেপে ধরে না।

দামের নিয়মটাকে, অর্থাৎ মূলত মূল্য নিয়মটাকে অর্থনীতির সমানুপাতিকতার অভিব্যক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা দেওয়া হল — এটা একেবারেই নতুন এবং মহা সাহসিক ধারণা। বুয়াগিইবেরের অন্যান্য মূল তাত্ত্বিক ধারণা এটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দাম সম্পর্কে এই বিবেচনাধারা ধরে নিলে স্বাভাবতই প্রশ্ন উঠেছিল অর্থনীতিতে 'সর্বোপযোগী দাম' নিশ্চিত করা যায় কিভাবে? বুয়াগিইবেরের মত ছিল, দামের এই কাঠাম স্বভাবতই গড়ে উঠবে অবাধ প্রতিযোগিতার অবস্থায়।

তাঁর বিবেচনায় শস্যের সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দেওয়াটা ছিল প্রতিযোগিতার স্বাধীনতা লঙ্ঘনের প্রধান দৃষ্টান্ত। বুয়াগিইবের মনে করতেন, নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ দাম তুলে দেওয়া হলে শস্যের বাজার-দর চড়ে, তার ফলে বাড়ে কৃষকের আয় এবং শিল্পজাত দ্রব্যের জন্যে তাদের চাহিদা, শিল্পোৎপাদন বাড়ে, ইত্যাদি। সর্বব্যাপী 'সমানুপাতিক দাম' প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধিও নিশ্চিত হয় এই ধারাবাহিক বিক্রিয়ার ফলে।

'Laissez faire, laissez passer'* এই বিখ্যাত কথাটা কার সেটা এখনও বিতর্কের ব্যাপার; কথাটা পরে হয়ে দাঁড়িয়েছিল অবাধ বাণিজ্য এবং অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের না-হস্তক্ষেপের মূলমন্ত্র, আর কাজেই অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের পথনির্দেশক নীতি। এটা পুরোপুরি কিংবা অংশত নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কারও কথা বলে বিভিন্ন মত অনুসারে আরোপ করা হয়: ১৪শ লুইর আমলের একজন ধনী ব্যাপারী ফ্রাঁসোয়া লেজান্দ্র, মার্কুইস দ্য'আর্জান্সন (আঠার শতকের চতুর্থ দশক), জনৈক বাণিজ্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং তিউর্গোর বন্ধু ভেন্সান গুর্নে। তবে কথাটা যদি বুয়াগিইবেরের সৃষ্টি না-ও হয়, তবু এতে নিহিত ধারণাটাকে সবচেয়ে স্পষ্ট বিবৃত করেছিলেন তিনিই। 'প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ চলতে দিতে হবে...' লিখেছেন তিনি।

---

* উনিশ শতকের শেষের দিকে জার্মান মনীষী অগাস্ট ওঙ্কেন এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, কথাটার প্রথমাংশে উৎপাদনের স্বাধীনতা এবং দ্বিতীয়াংশে বাণিজ্যের স্বাধীনতার ধারণা ব্যক্ত হয়।

মার্কস বলেছেন, বুয়াগিইবের কিন্তু 'laissez faire, laissez passer' ধারণাটায় পুঁজিতান্ত্রিক কারবারির সংকীর্ণ স্বার্থপরতা আরোপ করেন নি; কথাটায় ঐ অর্থ জড়িত হয়েছিল পরে। তাঁর বিবেচনায় 'এই শিক্ষাটাতে **মানবিক** এবং **তাৎপর্যসম্পন্ন** কিছুও আছে। সাবেকী রাষ্ট্র সেটার আয় বাড়াবার চেষ্টায় ছিল অস্বাভাবিক উপায়ে, সেটার অর্থনীতি থেকে বিসদৃশ হয়ে **মানবিক,** আর **তাৎপর্যসম্পন্ন,** কেননা এটা ছিল বুর্জোয়া জীবনকে মুক্ত করার প্রথম প্রচেষ্টা। **এটা কী রকমের বস্তু** সেটা দেখাবার জন্যে এটাকে মুক্ত করা আবশ্যক ছিল'।*

তার সঙ্গে সঙ্গে বুয়াগিইবের রাষ্ট্রের আর্থনীতিক কৃত্য বাতিল করে দেন নি; এমন বাস্তববাদী এবং কেজো মানুষের পক্ষে সেটা ছিল কল্পনাতীত। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, রাষ্ট্র — বিশেষত যুক্তিসম্মত কর-কর্মনীতির সাহায্যে — দেশে ভোগ-ব্যবহার এবং চাহিদা তুলতে পারে উঁচু মাত্রায়। ব্যবহারকের ব্যয় করার ধারাটা কমে গেলে পণ্যের বিক্রি এবং উৎপাদন কমে যায়, অন্যথা হয় না, এটা বুঝেছিলেন বুয়াগিইবের। গরিবদের রোজগার আরও বেশি হলে এবং কর অপেক্ষাকৃত কম দিতে হলে সেটা কমে না, কেননা আয়টা চটপট খরচ করে ফেলার ঝোঁক আছে তাদের। অন্য দিকে, ধনীদের ঝোঁক আয়টাকে জমানোর দিকে, তাতে উৎপাদ বিক্রি করার দুষ্করতা বাড়ে।

তার পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে অর্থনীতি চিন্তন বিকাশের জন্যে এই যুক্তিধারাটা গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন এবং সম্পদ বৃদ্ধির প্রধান-প্রধান কারক উপাদান-সংক্রান্ত প্রশ্নে আমূল পৃথক দুটো প্রধান মতাবস্থান দেখা দিয়েছিল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের ইতিহাসে। প্রথমটা হল — সংক্ষেপে: উৎপাদনবৃদ্ধি নির্ধারিত হয় একমাত্র সঞ্চয়নের (অর্থাৎ জমানো এবং পুঁজি বিনিয়োগের) পরিমাণ দিয়ে। তাতে, ক্রয়ক্ষম চাহিদা, বলা যেতে পারে, 'আসে আপনিই'। এই ধারণার ফলে স্বভাবতই সাধারণ অত্যুৎপাদনের আর্থনীতিক সংকটের সম্ভাবনা বাতিল করে দেওয়া হয়। উৎপাদনবৃদ্ধির চড়া হার বজায় রাখার কারক উপাদান হিসেবে ব্যবহারকের চাহিদার উপর জোর দেওয়া হয় অন্য মতাবস্থানটায়। বুয়াগিইবের ছিলেন

* K. Marx, F. Engels, 'Historisch-kritische Gesamtausgabe'. Werke, Schriften, Briefe, Moskau u. a., Abt. 1, Bd. 3. S. 575.

কিছু পরিমাণে এটার অগ্রদূত। এই মতাবস্থান থেকে কিন্তু উলটে স্বভাবতই আসে আর্থনীতিক সংকট-সংক্রান্ত প্রশ্ন।

'সংকট'কে (বরং বলা ভাল সংকটের অনুরূপ ব্যাপার, কেননা সেটা হল পুঁজিতান্ত্রিক উন্নয়নের শুধু পরবর্তী পর্বের বিশেষক) বুয়াগিইবের সংশ্লিষ্ট করেছিলেন ততটা নয় অর্থনীতির অন্তর্বর্তী নিয়মাবলির সঙ্গে, যতটা কিনা সরকারের খারাপ কর্মনীতির সঙ্গে, তা বটে। এমনটাও ধরে নেওয়া যেতে পারে তিনি মনে করতেন, ভাল কর্মনীতি থাকলে অপ্রতুল চাহিদা এবং সংকট এড়ান যায়।* সেটা যা-ই হোক, বুয়াগিইবের তাঁর প্রধান তাত্ত্বিক রচনা 'Dissertation sur la nature des richesses, de l'argent et des tributes' ('সম্পদ, অর্থ এবং করের স্বধর্ম সম্পর্কে তত্ত্বালোচনা')-তে স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল বর্ণনায় বলেছেন কী ঘটে আর্থনীতিক সংকটের সময়ে। জিনিসপত্রের কমতি হলে যেমন তেমনি বাড়তি হলেও মানুষ মরতে পারে! তিনি বলেছেন, ধরুন যেন পরস্পর থেকে দূরে-দূরে শিকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে দশ-বার জন লোক। একজনের আছে বিস্তর খাদ্য, কিন্তু আর কিছুই না; আর একজনের আছে বাড়তি কাপড়-চোপড়; পানীয় প্রচুর আছে অন্য একজনের, ইত্যাদি; কিন্তু তারা পরস্পর বিনিময় করতে পারে না: তাদের শিকল হল বিভিন্ন বহিস্থ আর্থনীতিক শক্তি, যা মানুষের বোধাতীত, সেগুলো ঘটায় আর্থনীতিক সংকট। অঢেল প্রাচুর্যের মধ্যে বিপর্যয়ের এই চিত্রটা মনে ফুটিয়ে তোলে বিংশ শতাব্দীর ছবি:

* এই প্রশ্নে বুয়াগিইবেরের অভিমত ছিল অসম্পূর্ণ এবং আত্মবিরোধী, তাই অর্থনীতি চিন্তনের ইতিহাসকারেরা তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিলেন। ফরাসী অর্থনীতিবিদ আঁরি দেনি লিখেছেন, চূড়ান্ত বিবেচনায় বুয়াগিইবেরের ধারণায় বোঝায় যে, অবাধ প্রতিযোগিতার অবস্থায় সংকট অসম্ভব, আর কাজেকাজেই সেটা 'জাঁ বাতিস্ত সে'-র বলে কথিত বিখ্যাত 'বাজারী নিয়ম'টাকে প্রস্তুত করে (যদি ইতোমধ্যে ধারণ না করে থাকে), যে-নিয়মে বলে অবাধ উৎপাদ-বিনিময়ের ভিত্তিতে স্থাপিত ব্যবস্থায় উৎপাদের অত্যুৎপাদন হতে পারে না কখনও'। (H. Denis, 'Histoire de la pensée économique', Paris, 1967, p. 151.) পক্ষান্তরে, শুম্পিটার জোর দিয়ে বলেন, বুয়াগিইবেরের বিবেচনায় ব্যবহারকের চাহিদার ঘাটতি এবং মাত্রাধিক সঞ্চয়ের ফলে পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির সুস্থিতি বিপন্ন হয়, সেটাই সংকটের কারণ; তাই তিনি 'সে'-র নিয়মে'র সমালোচকদের, বিশেষত কেইন্সের একজন পূর্বসূরি। (J. A. Schumpeter, 'History of Economic Analysis', pp. 285-87.)

দুধ ঢেলে ফেলা হল সমুদ্রে, রেল ইঞ্জিনের আগুন-কুঠরিতে শস্য পোড়ান হল — এই সবকিছু হল বেকারি আর গরিবির মধ্যে।

যেমন তত্ত্বে, তেমনি রাজনীতিতে বুয়াগিইবেরের মতাবস্থান বণিকতন্ত্রীদের বিবেচনাধারা থেকে পৃথক এবং অনেকাংশে সেটার বিরুদ্ধে চালিত। পরিচলনক্ষেত্রে নয়, উৎপাদনক্ষেত্রে তিনি খুঁজেছেন আর্থনীতিক নিয়মাবলি, তাতে তিনি কৃষিকে ধরেছেন অর্থনীতির ভিত্তি হিসেবে। অর্থকে তিনি দেশের সম্পদ বলে গণ্য করতে চান নি, সেটাকে তিনি সিংহাসনচ্যুত করতে চেটা করেছেন, তাতে তিনি অর্থ এবং পণ্য আকারের আসল সম্পদের মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন। শেষে, বুয়াগিইবের দাঁড়িয়েছিলেন আর্থনীতিক স্বাধীনতার সপক্ষে — তাতেও বোঝায় বণিকতন্ত্রের সঙ্গে সরাসর কাটান-ছিঁড়েন।

বুয়াগিইবের এবং ফরাসী অর্থশাস্ত্র

মানবিকতাই বুয়াগিইবেরের বিবেচনাধারার সুন্দর এবং আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তবে আর্থনীতিক তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, তাঁর 'কৃষক-বাতিকে'র একটা উলটো দিকও ছিল। তিনি শিল্প আর বাণিজ্যের ভূমিকাটাকে খাটো করে দেখেন এবং কৃষক অর্থনীতিটাকে করে তোলেন আদর্শস্বরূপ — এইভাবে তিনি তাকাচ্ছিলেন অনেকাংশে পিছনদিকে, সমুখপানে নয়। বিভিন্ন বুনিয়াদী আর্থনীতিক প্রশ্নে তাঁর বিবেচনাধারাকে সেটা প্রভাবিত করেছিল।

বুয়াগিইবেরের দৃষ্টিভঙ্গি, যা অনেকটা পৃথক ছিল পেটির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, সেটার কারণ খুঁজতে হবে ফরাসী পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিশেষত্বের মাঝে। শিল্প আর বাণিজ্য ক্ষেত্রের বুর্জোয়ারা ফ্রান্সে ছিল ইংলণ্ডে যা ছিল তার চেয়ে ঢের-ঢের দুর্বল, আর ফ্রান্সে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কতন্ত্র গড়ে উঠছিল অপেক্ষাকৃত ধীরে। ইংলণ্ডে বুর্জোয়া সম্পর্কতন্ত্র তখনই কৃষিক্ষেত্রেও ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। অনেকাংশে ইংলণ্ডের অর্থনীতির বিশেষক ছিল শ্রমবিভাগ, প্রতিযোগিতা, পুঁজি আর শ্রমশক্তির বিচলন। ইংলণ্ডে অর্থশাস্ত্রের বিকাশ ঘটছিল স্রেফ বুর্জোয়া অভিমততন্ত্র হিসেবে, আর ফ্রান্সে সেটার স্বধর্ম ছিল প্রধানত পেটি-বুর্জোয়া।

ইংলণ্ডের ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রের উৎসমুখে রয়েছেন পেটি — এই

অর্থশাস্ত্র বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কেন্দ্রস্থলে তুলে ধরেছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং পরস্পর-সংশ্লিষ্ট দুটো প্রশ্ন: পণ্যের দাম গড়ে ওঠে শেষ পর্যন্ত কিসের ভিত্তিতে, আর কোথা থেকে আসে পুঁজিপতির লাভটা? প্রশ্ন-দুটোর উত্তর দিতে হলে মূল্যের স্বধর্ম বিচার-বিশ্লেষণ করা আবশ্যক ছিল। শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্ব ছিল ইংরেজ অর্থনীতিবিদদের চিন্তাধারার স্বাভাবিক ভিত্তি। মূর্ত শ্রম, যা সৃষ্টি করে বিভিন্ন উপযোগ-মূল্য, আর বিমূর্ত শ্রম, যাতে গুণীয় বিশেষত্ব থাকে না, থাকে শুধু একটা স্থিতিমাপ — স্থিতিকাল, পরিমাণ। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে উপলব্ধির দিকে তাঁরা ক্রমে কাছাচ্ছিলেন ঐ তত্ত্বটাকে বিকশিত করতে গিয়ে। তবে এই পার্থক্যটাকে কখনও প্রকটিত এবং নির্দিষ্ট আকারে তুলে ধরা হয় নি মার্কসের আগে। কিন্তু সেদিকে কাছানোটা হল কিছু পরিমাণে পেটি থেকে রিকার্ডো অবধি ইংরেজী অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস।

মূল্য নিয়ম ছিল ঐ অর্থশাস্ত্রের বিচার-বিবেচনার আদত বিষয়বস্তু। তবে মার্কস বলেছেন, 'মূল্য নিয়মের পূর্ণ বিকাশ বলতে বোঝায় এমন সমাজের অস্তিত্ব যেখানে বৃহদায়তনের শিল্পোৎপাদন এবং অবাধ প্রতিযোগিতার প্রাধান্য, অর্থাৎ কিনা আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ।'* ফ্রান্সে এই সমাজ গড়ে উঠছিল ইংলণ্ডের চেয়ে অনেক পরে, তার ফলে মূল্য নিয়মের ক্রিয়াপ্রণালীটাকে লক্ষ্য করা এবং বোঝা কঠিন হয়েছিল তত্ত্ববিদদের পক্ষে।

এটা ঠিক যে, 'সমানুপাতিক দাম' সংক্রান্ত ধারণা দিয়ে বুয়াগিইবের 'যদিও তিনি হয়ত এ বিষয়ে অবহিত না থেকে... পণ্যের বিনিময়-মূল্যটাকে শ্রম-কালে'** পর্যবসিত করেছিলেন। কিন্তু শ্রমের দ্বিবিধ স্বধর্ম বোঝার ধারে-কাছেও তিনি পৌঁছন নি, কাজেই পুরোপুরি উপেক্ষা করেছেন সম্পদের মূল্য-সংক্রান্ত দিকটাকে, যাতে প্রকৃতপক্ষে অঙ্গীভূত থাকে সাধারণ বিমূর্ত শ্রম। সম্পদের শুধু ভৌত দিকটাকেই তিনি দেখেছেন — সেটাকে গণ্য করেছেন স্রেফ একগাদা কেজো জিনিস হিসেবে, উপযোগ-মূল্য হিসেবে।

বুয়াগিইবেরের চিন্তাধারায় এই ত্রুটিটা বিশেষত স্পষ্ট দেখা যায় অর্থ সম্পর্কে তাঁর অভিমতে। যে-সমাজে মূল্য নিয়ম চালু থাকে সেখানে পণ্য এবং অর্থ মিলে একটা অবিভাজ্য সমগ্র সত্তা, তা তিনি বোঝেন না।

---

* কার্ল মার্কস, 'অর্থশাস্ত্রের পর্যালোচনা নিবন্ধ', মস্কো, ১৯৭০, ৬০ পৃঃ।

** ঐ, ৫৪ পৃঃ।

বিনিময়-মূল্যের পরম ধারক হল অর্থ — তাতেই তো ঘটে বিমূর্ত শ্রমের পূর্ণ অভিব্যক্তি। বুয়াগিইবের পণ্যকে স্রেফ কেজো জিনিস হিসেবে ধরে সেটা থেকে অর্থকে পৃথক করে নিয়ে এটার বিরুদ্ধে লড়েছেন প্রচণ্ডভাবে। অর্থ আপনিই ব্যবহার্য বস্তু নয় বলে এটাকে তাঁর মনে হয়েছে বহিস্থ এবং কৃত্রিম। অর্থে দেখা দেয় একটা অস্বাভাবিক অত্যাচারী ক্ষমতা, আর এটাই আর্থনীতিক বিপর্যয়ের কারণ। অর্থের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ দিয়ে শুরু হয়েছে তাঁর 'সম্পদ... স্বধর্ম সম্পর্কে তত্ত্বালোচনা': '...সোনা আর রুপো, যাকে ভক্তিবস্তু হিসেবে দাঁড় করিয়েছে অন্তরের বিকৃতি। ...সেগুলোকে দেবতায় পরিণত করা হয়েছে; যেসব ভুয়ো স্বর্গীয় সত্তা সুদীর্ঘকাল যাবৎ ছিল বেশির ভাগ জাতির উপাস্য এবং ধর্ম তাদের উদ্দেশে সুপ্রাচীনকালের বিচারবুদ্ধিহীন মানুষ কখনও যত বলি দিয়েছে তার চেয়ে বেশি জিনিসপত্র, মূল্যবান বস্তু, এমনকি মানুষ পর্যন্ত এখনও বলি দেওয়া হচ্ছে ঐ দেবতাদের [সোনা আর রুপো] উদ্দেশে।'*

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিটাকে পরিবর্তিত না করেই সেটাকে অর্থের কবল থেকে মুক্ত করার অলীক আকাঙ্ক্ষাটাকে মার্কস বলেছেন বুয়াগিইবের থেকে প্রুধোঁ পর্যন্ত ফরাসী অর্থশাস্ত্রের 'জাতীয় ঊনতা'।

বুয়াগিইবেরের আমলে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার গর্ভে সবে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল বুর্জোয়া সমাজ, সেটার শ্রেণীগত, শোষণকর স্বধর্মটাকে তিনি খুলে ধরতে পারেন নি। কিন্তু আর্থনীতিক এবং সামাজিক অসমতার, উৎপীড়ন আর জবরদস্তির তীব্র সমালোচনা তিনি করেছিলেন: সর্বপ্রথম যাঁদের রচনা 'সাবেকী ব্যবস্থা'র পতনের প্রস্তুতি করেছিল এবং প্রস্তুত করেছিল বিপ্লবের পথ তাঁদের একজন হলেন বুয়াগিইবের। অত আগে, সেই আঠার শতকেই নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা সেটা উপলব্ধি করেছিল। বুয়াগিইবের মারা যাবার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে অমন একজন ধ্বজাধারী লিখেছিলেন, তাঁর [বুয়াগিইবেরের] 'জঘন্য রচনাগুলো' দস্যুতা আর বিদ্রোহে উৎসাহ যুগিয়ে সরকারের প্রতি ঘৃণা জাগায়, আর ঐসব রচনা বিশেষত বিপজ্জনক নবীন পুরুষ-পর্যায়ের হাতে। তবে বুয়াগিইবেরের রচনাগুলি এবং ব্যক্তিত্বকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ এবং আগ্রহজনক মনে করার একটা কারণ সেটাই।

* Économistes financiers du XVIII-e Siécle, Paris, 1843, pp. 394, 395.

জন লো — ভাগ্যান্বেষী এবং পয়গম্বর

লো-র নাম সুবিদিত। স্কটল্যান্ডের এই বিখ্যাত মানুষটির প্রথম জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর জীবনকালেই। ফ্রান্সে 'লোর প্রণালী' কুপোকাত হবার পরে তাঁর সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল ইউরোপের সমস্ত ভাষায়। আঠার শতকের ফ্রান্সের কোন রাজনীতিক ভাষ্যকার তাঁর কথা বাদ দিয়ে যেতে পারেন নি।

উনিশ শতকে স্থাপিত হয় আধুনিক ব্যাঙ্কগুলো, ক্রেডিটের এবং স্টক-এক্সচেঞ্জ ফটকার বিপুল উন্নয়ন ঘটে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেডিটের এই সোৎসাহ বাণী-প্রচারকের ক্রিয়াকলাপ এবং ভাব-ধারণা সম্পর্কে আগ্রহের বান ডাকে নতুন করে। তখন তিনি গণ্য হন দেদীপ্যমান ভাগ্যান্বেষী হিসেবেই শুধু আর নয়, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হিসেবেও বটে।

এই অদ্ভুত লোকটির একটা নতুন দিক আবিষ্কার করেছে বিংশ শতাব্দী — 'মুদ্রাস্ফীতির শতাব্দী'। ক্রেডিট এবং কাগজী মুদ্রার প্রাচুর্যের সাহায্যে অর্থনীতির অবিরাম শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবার আশা করেছিলেন জন লো। আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সংকট-নিরোধী কর্মনীতির ভিত্তিমূলেও রয়েছে সেই একই ধারণা (স্বভাবতই নতুন আকারে)। লো এবং কেইন্সের মধ্যে বাস্তবিকই রহস্যময় একটা সাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন বুর্জোয়া গবেষকেরা: 'ফ্রান্সের অর্থ মহানিয়ামক লরিস্টনের জন লো (১৬৭১-১৭২৯)... এবং জন মেনার্ড কেইন্সের মধ্যে সাদৃশ্যটা এমনকি তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের কোন-কোন দিক পর্যন্ত নিয়ে এতই প্রগাঢ় এবং এত বিস্তৃত ক্ষেত্রে জুড়ে যাতে কোন

প্রেতাত্মাবাদী বলতে পারেন কেইন্স হলেন দুই শতাব্দী পরে লোর পুনরবতার।'*

লো সম্পর্কে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের নামগুলি পর্যন্ত বিশেষক: 'John Law. Père de l'Inflation', 'Der Magier des Kredits', 'La strana vita del banchiere Law' ('মুদ্রাস্ফীতির জনক', 'ক্রেডিটের যাদুকর', 'ব্যাঙ্কার লো-র অসাধারণ জীবন')। তার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি চিন্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে মোটা-মোটা বইয়ে তিনি রয়েছেন একটা সম্মানিত স্থানে।

বিপজ্জনক জীবনধারা এবং সাহসিক ধ্যান-ধারণা

১৬৭১ সালে স্কটল্যান্ডের রাজধানী এডিনবারো-তে জন লোর জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন সেকরা; তখনকার রেওয়াজ অনুসারে তিনি সুদে টাকা ধারও দিতেন।

১৬৮৩ সালে লরিস্টনের ছোটখাটো জমিদারিটা কিনে তিনি হয়ে দাঁড়ান অভিজাতকুলের একজন। জন লো-র ছিল টাকা, সুন্দর চেহারা আর আকর্ষণশক্তি — তাই নিয়ে তিনি জুয়াড়ী এবং মারকুটের জীবনে নেমে যান বেশ আগে-আগেই। তাঁর একজন সহযোগী বলেন, কুড়ি বছর বয়সে লো ছিলেন 'হরেক রকমের অসচ্চরিত্রতায় খাসা ওস্তাদ', সেই বয়সে এডিনবারোকে খুবই গেঁয়ো মনে হওয়ায় তিনি চলে যান লণ্ডনে। স্কটল্যান্ড এবং ইংলণ্ডের রাজা ছিল একই, তবু অন্যান্য ব্যাপারে স্কট্‌ল্যান্ড তখনও ছিল স্বাধীন রাষ্ট্র।

লণ্ডনে অচিরেই এই তরুণ স্কট্-এর ডাকনাম হয়েছিল ফুলবাবু লো। ১৬৯৪ সালে এপ্রিল মাসে একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীকে বধ করেন। এটাকে হত্যা বলে রায় দিয়ে আদালত জন লোকে প্রাণদণ্ডাদেশ দেয়। কিছু-কিছু প্রতিপত্তিশালী লোকের মধ্যস্থতার কল্যাণে রাজা ৩য় উইলিয়ম এই স্কট্‌টির দণ্ড মকুব করেন, কিন্তু নিহত লোকটির আত্মীয়স্বজন তাঁর

* Ferdinand Zweig, 'Economic Ideas. A Study of Historical Perspectives', New York, 1950, p. 87.

বিরুদ্ধে নতুন মামলা রুজু করে। মামলার ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা না করে লো বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যে জেল থেকে পালিয়ে যান, তাতে তিরিশ ফুট লাফ মারতে গিয়ে তাঁর পায়ের গাঁট মচকে যায়। তখন দেশান্তরী হওয়াই ছিল একমাত্র উপায় — তিনি যান হল্যাণ্ডে।

লণ্ডনে তিন বছর কাটাবার সময়ে তিনি শুধু মাতাল-লম্পট আর মেয়েমানুষদের সঙ্গেই ছিলেন তা নয়। তিনি খাসা কেজো শিক্ষালাভ করেছিলেন, পরিগণনা আর হরেক রকমের আর্থিক কাজ-কারবারে তাঁর ছিল স্বাভাবিক প্রতিভা — সেই সূত্রে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয় অর্থের কারবারিদের সঙ্গে; ১৬৮৮-১৬৮৯ সালের বিপ্লবের পরে এইসব কারবারি গিজগিজ করত লণ্ডনে। তার অল্প কয়েক বছর পরে স্থাপিত হয়েছিল ব্যাঙ্ক অভ্ ইংলণ্ড, যেটা হল ইংলণ্ডে পুঁজিতন্ত্রের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ব্যাঙ্কিংয়ের ব্যাপারে লো ছিলেন কল্পনাবিলাসী। আজকের দিনে শুনতে অদ্ভুত লাগে: কল্পনাবিলাস আর ব্যাঙ্কিং! কিন্তু তখনকার দিনে, পুঁজিতান্ত্রিক ক্রেডিটের সেই সূচনাকালে অনেকের মনে হত ব্যাঙ্কিংয়ের সম্ভাবনা অপার এবং আশ্চর্য। লো তাঁর বিভিন্ন রচনায় ব্যাঙ্ক স্থাপনের ঘটনা এবং ক্রেডিটের উদ্ভবকে প্রায়ই তুলনা করেন 'ভারত আবিষ্কারের' সঙ্গে, অর্থাৎ ভারতে এবং আমেরিকায় যাবার সমুদ্রপথের সঙ্গে, যে-পথে বিভিন্ন বহুমূল্য ধাতু এবং বিরল দ্রব্যসামগ্রী যেত ইউরোপে, এই তুলনাটা অকারণ নয়। জীবনভর তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন নিজ ব্যাঙ্ক দিয়ে তিনি করবেন ভাস্কো ডা গামা, কলাম্বাস কিংবা পিজারো যা করে গেছেন তার চেয়ে বেশিকিছু! তখনও যা পরীক্ষিত হয় নি, ক্রেডিটের সেই ক্ষমতার ভক্ত, কবি এবং পয়গম্বর হলেন জন লো।

ইংলণ্ডে শুরু হয়ে এটা চলতে থেকেছিল হল্যাণ্ডে, সেখানে তিনি অধ্যয়ন করেন ইউরোপের তখনকার দিনের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্কটাকে: আম্‌স্টার্ডামের ব্যাঙ্ক। ১৬৯৯ সালে তিনি প্যারিসে। সেখান থেকে তিনি যান ইতালিতে, সঙ্গে একটি বিবাহিতা যুবতী, জন্মসূত্রে ইংরেজ, নাম ক্যাথারিন সেনিয়ের। তখন থেকে লো-র সমস্ত পর্যটনে সঙ্গিনী ছিলেন এই নারী। তাঁর মাথায় ভর করেছিল নতুন ধরনের ব্যাঙ্ক সৃষ্টি করার চিন্তা, সেটাকে কার্যে পরিণত করে দেখবার জন্যে তিনি স্কট্‌ল্যান্ডে ফিরে যান ১৭০৪ সালে, সঙ্গে ক্যাথারিন এবং তাঁদের একবছরের ছেলে।

দেশটি তখন দুস্তর আর্থনীতিক সমস্যাগ্রস্ত। বাণিজ্যে মন্দা, শহরগুলিতে বেকারি, ঝুঁকি নিয়ে কাজ-কারবারে নামার মেজাজ বিধ্বস্ত। তাই বরং ভাল! এইসব সমস্যা মীমাংসার একটা পরিকল্প লো বিবৃত করলেন ১৭০৫ সালে এডিনবারোয় প্রকাশিত তাঁর বইয়ে, সেটার নাম — 'Money and Trade Considered, With a Proposal for Supplying the Nation With Money' ('জাতিকে অর্থের যোগান দেবার প্রস্তাব প্রসঙ্গে অর্থ এবং বাণিজ্য সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা')।

কোন বিস্তৃত অর্থে তত্ত্ববিদ ছিলেন না লো। আর্থনীতিক ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ অর্থ আর ক্রেডিট-সংক্রান্ত প্রশ্নের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে এগোয় নি বড় একটা। কিন্তু নিজ পরিকল্প নিয়ে সোৎসাহে লড়তে গিয়ে তিনি এই প্রশ্নে যেসব ধ্যান-ধারণা ব্যক্ত করেন সেগুলির মস্ত এবং খুবই আত্মবিরোধী ভূমিকা ছিল অর্থনীতিবিজ্ঞানে। লো-র আর্থনীতিক বিবেচনাধারাটাকে নিশ্চয়ই দেখতে হবে তাঁর বাস্তব ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে মিলিয়ে; এই ক্রিয়াকলাপের পরিণতি হয়েছিল বিপুল। তবে এই ক্রিয়াকলাপে এবং পরবর্তী রচনাগুলিতেও তিনি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন এবং বিকশিত করেন এডিনবারোর বইখানায় বিবৃত মূল ধারণাগুলিকেই শুধু।

'তিনি ছিলেন প্রণালী গড়ার মানুষ' — বারবার বলেছেন ডিউক সাঁ-সিমোঁ, যিনি রেখে গেছেন ব্যক্তি হিসেবে লো সম্পর্কে কিছু-কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি। নিজ প্রণালীর মূল উপস্থাপনাগুলি স্থির করে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে লো অটল অধ্যবসায় সহকারে এবং সামঞ্জস্য বজায় রেখে সেগুলি প্রচার করেন এবং কাজে খাটান।

কোন দেশে অর্থের প্রাচুর্যই লো-র বিবেচনায় আর্থনীতিক শ্রীবৃদ্ধির চাবিকাঠি। অর্থকে আপনাতেই সম্পদ বলে তিনি মনে করতেন তা নয়, কেননা পণ্য কল-কারখানা আর বাণিজ্যই আদত সম্পদ সেটা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন খুব ভালভাবেই। তবে তাঁর মতে, ভূমি শ্রমশক্তি এবং কাজ-কারবারী প্রতিভার পূর্ণ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হয় অর্থের প্রাচুর্য থাকলে।

তিনি লিখেছেন: 'অন্তর্বাণিজ্য হল লোকের কর্মনিয়োগ এবং জিনিসের বিনিময়... অন্তর্বাণিজ্য নির্ভর করে অর্থের উপর। অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ অর্থ যত লোককে কাজ দেয় তার চেয়ে বেশি লোককে কাজ দেয় অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ অর্থ... অর্থ যাতে সক্ষম সেই পূর্ণ পরিমাণে সেটার পরিচলন ঘটাতে পারে এবং যেসব কর্মনিয়োগ দেশের পক্ষে সবচেয়ে লাভজনক

সেগুলোতে যেতে অর্থকে বাধ্য করতে পারে ভাল-ভাল আইন: কিন্তু কোন আইন... অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যায় মানুষকে কাজে লাগাতে পারে না পরিচলনের জন্যে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ অর্থ ছাড়া, যাতে অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যায় লোককে মজুরি দেওয়া যায়।'*

সাবেকী বণিকতন্ত্রীদের সঙ্গে লো-র পার্থক্য ছিল সেটা স্পষ্টই: যদিও তিনিও আর্থনীতিক উন্নয়নের চালকশক্তিটাকে খোঁজেন পরিচলনক্ষেত্রে, তবু ধাতব মুদ্রার গুণকীর্তন না করে বরং সেটাকে অপদস্থ করার জন্যেই তিনি করেছেন যথাসাধ্য। তার দু'-শ' বছর পরে কেইন্স স্বর্ণমুদ্রাকে বলেন একটা 'বর্বর পুরানিদর্শন'। লোও বলতে পারতেন ঠিকই একই কথাটা। অর্থ ধাতব হওয়া বিধেয় নয়, সেটা হওয়া চাই ক্রেডিট — যেটাকে ব্যাঙ্ক পয়দা করে অর্থনীতির প্রয়োজন অনুসারে — অর্থাৎ কিনা কাগজী মুদ্রা: 'অর্থের পরিমাণ বাড়াবার জন্যে এযাবৎ যত প্রণালীতে কাজ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল ব্যাঙ্ক ব্যবহার করা।'**

লো-র প্রণালীতে ছিল আরও দুটো মূল উপাদান, সে-দুটোর গুরুত্ব অতিরঞ্জিত করা কঠিন। এক, ব্যাঙ্কের জন্যে তিনি তুলে ধরেছিলেন ক্রেডিট সম্প্রসারণের কর্মনীতি, অর্থাৎ ব্যাঙ্কের হাতে ধাতব মুদ্রার যোগান যা থাকে তার চেয়ে বহুগুণ অতিরিক্ত পরিমাণ ঋণদান। দুই, তিনি চেয়েছিলেন ব্যাঙ্ক হবে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক — সেটা কার্যে পরিণত করবে রাষ্ট্রের আর্থনীতিক কর্মনীতি।

এটাকে আমাদের কিছুটা বিশদ করে তোলা দরকার, সেটা বিশেষত এই কারণে যে, পৃথক-পৃথক পরিবেশে এবং পৃথক-পৃথক আকারে অনুরূপ প্রশ্নগুলো এখনও সমানই প্রাসঙ্গিক। ধরুন একটা ব্যাঙ্কের মালিকেরা সেটার পুঁজি করল সোনায় ১০ লক্ষ পাউন্ড। তার উপর ব্যাঙ্কটায় সোনা আমানত হল ১০ লক্ষ পাউন্ড দামের। ব্যাঙ্কটা ১০ লক্ষ পাউন্ড দামের নোট্ ছেপে সেগুলো ধার দিল। হিসাবরক্ষণ সম্পর্কে অতি প্রাথমিক ধারণা থাকলেও কেউ দেখতে পায় ব্যাঙ্কটার ব্যালান্সশীট হবে নিম্নলিখিতরূপ:

পরিসম্পৎ		দায়িতা	
সোনা	২০ লক্ষ	পুঁজি	১০ লক্ষ
ঋণ	১০ লক্ষ	আমানত	১০ লক্ষ
		ব্যাঙ্কনোট	১০ লক্ষ
মোট	৩০ লক্ষ	মোট	৩০ লক্ষ

* J. Law, 'Oeuvres complètes', Vol. 1, Paris, 1934, pp. 14-16.

** ঐ, ৪৬ পৃঃ।

স্পষ্টতই এই ব্যাঙ্কটা ষোল-আনা নির্ভরযোগ্য, কেননা এটার যা আমানত আর ব্যাঙ্কনোট, যা যেকোন সময়ে পেশ করা হতে পারে নগদ তুলে নেবার জন্যে, তা পুরোপুরি মেটাবার জন্যে এটার রিজার্ভ সোনা পর্যাপ্ত। কিন্তু লো-র প্রশ্ন (সেটা অকারণ নয়): এই রকমের ব্যাঙ্ক দিয়ে বিশেষ কোন কাজ হয় কি? এমন ব্যাঙ্ক কিছুটা কাজের বইকি: এতে দেওনের সুবিধে হয়, আর সোনা খোয়া যাওয়া এবং খয়ে খয়ে যাওয়া ঠেকে। তবে ব্যাঙ্কটা ধরা যাক ১ কোটি পাউন্ডের ব্যাঙ্কনোট ছেড়ে অর্থনীতিকে সেটার যোগান দিলে ব্যাঙ্কটা ঢের-ঢের বেশি কাজের হত। সেক্ষেত্রে চিত্রটা হত এই রকম:

পরিসম্পৎ		দায়িতা	
সোনা	২০ লক্ষ	পুঁজি	১০ লক্ষ
ঋণ	১ কোটি	আমানত	১০ লক্ষ
		ব্যাঙ্কনোট	১ কোটি
মোট	১ কোটি ২০ লক্ষ	মোট	১ কোটি ২০ লক্ষ

এই ব্যাঙ্কটার কাজে কিছুটা ঝুঁকি থাকবে। যেমন ধরা যাক, ব্যাঙ্কনোট যাদের হাতে আছে তারা ৩০ লক্ষখানা ভাঙাবার জন্যে হাজির করলে কি হবে? ব্যাঙ্কটা দেউলিয়া হয়ে যাবে, বা — লো-র আমলে লোকে যা বলত — টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেবে। কিন্তু লো-র বিবেচনায় এমন ঝুঁকি ন্যায্য এবং আবশ্যক। অধিকন্তু তিনি ধরে নেন, ব্যাঙ্কটা কিছুকালের জন্যে বাধ্য হয়ে দেওন বন্ধ করে দিলে সেটা কিছু ভয়ঙ্কর ব্যাপার নয়।

আমাদের দৃষ্টান্তটায় ব্যাঙ্কটার রিজার্ভ সোনা হল যত ব্যাঙ্কনোট ছাড়া হয়েছিল তার মাত্র ২০%, আর অমানতগুলো যোগ করলে আরও কম। এটা হল যাকে বলা হয় আংশিক রিজার্ভ নীতি, যেটা কিনা সমস্ত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অবলম্বনস্বরূপ। এই নীতিটার কল্যাণে ব্যাঙ্কগুলো নমনীয় ধরনে ঋণের প্রসার এবং পরিচলন বাড়াতে পারে। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন উন্নয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকায় থাকে ক্রেডিট — এটা সর্বপ্রথমে যাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন তাঁদের একজন হলেন লো।

কিন্তু ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সুস্থিতিকে বিপন্ন করে এই একই নীতি। ব্যাঙ্কগুলো 'অত্যুৎসাহে মাতা'র দিকে ঝোঁকে এবং ঋণদান চড়িয়ে দেয় লাভের জন্যে। তার থেকে আসে সেগুলোর ফেল পড়ার সম্ভাবনা, যার গুরুতর পরিণতি ঘটতে পারে অর্থনীতিক্ষেত্রে।

আর-একটা বিপদ, বরং বলা ভাল একই বিপদের আর-একটা দিক হল এই যে, রাষ্ট্র ব্যাঙ্কের সামর্থ্য কাজে লাগিয়ে নিতে পারে। কোন ব্যাঙ্ককে যদি নোট্ ছাড়ার পরিমাণ বাড়াতে বধ্য করা হয় অর্থনীতির সাচ্চা প্রয়োজনে নয়, কিন্তু জাতীয় বাজেটে কোন ঘাটতি চাপা দেবার জন্যেই স্রেফ, তখন কী হয়? 'মুদ্রাস্ফীতি' শব্দটা তখনও গড়া হয় নি, কিন্তু লো-র ব্যাঙ্ক এবং যেখানে সেটা চালু থাকত সেই দেশটিকে বিপন্ন করত ঐ মুদ্রাস্ফীতিই।

ক্রেডিটের সুবিধেগুলো লো বুঝেছিলেন, কিন্তু লক্ষ্য করেন নি কিংবা লক্ষ্য করতে চান নি সেটার বিপদগুলোকে। এটাই ছিল কার্যক্ষেত্রে তাঁর প্রণালীটার প্রধান দুর্বলতা, আর শেষে সেটার পতনের কারণ। লো-র বিবেচনাধারায় তাত্ত্বিক ত্রুটিটা ছিল এই যে, অতি-সরলতার দরুন তিনি ক্রেডিট আর অর্থকে পুঁজির সমতুল বলে ধরেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, ঋণ আর অর্থের প্রচলন বাড়ালে ব্যাঙ্কের পুঁজি পয়দা হয়, আর তার ফলে বেড়ে যায় সম্পদ এবং কর্মনিয়োগ। তবে কিনা, উৎপাদন বাড়াবার জন্যে আবশ্যক আসল শ্রম এবং বৈষয়িক সংগতি-সংস্থানের বদলী হতে পারে না কোন ক্রেডিট।

লো তাঁর প্রথম বইখানায় যে ক্রেডিটের কাজ-কারবারের কথা বিবেচনায় রেখেছিলেন, যেটাকে তিনি দশ-পনর বছর পরে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন জাঁকাল পরিসরে, সেটার দরুন তাঁর প্রণালীটার স্বধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল ডাহা আর্থ-হঠকারিতা। লো-কে 'ক্রেডিটের মুখ্য প্রবক্তা' বলে অভিহিত করে মার্কস তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করেছেন: এমনসব লোকের থাকে 'জোচ্চোর আর পয়গম্বর চরিত্রের মধুর মিশ্রণ।'*

প্যারিস-জয়

ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রকল্প নাকচ করে দিয়েছিল স্কটল্যান্ডের পার্লামেন্ট। লো-র দশ বছর আগেকার অপরাধ মার্জনা করতে ইংলন্ডের সরকার অস্বীকার করেছিল দু'বার। ইংলন্ড আর স্কটল্যান্ডকে যুক্ত করার 'সম্মিলনী

* কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ৩ খণ্ড, মস্কো, ১৯৭১, ৪৪১ পৃঃ।

বিহিতক' প্রস্তুতি প্রসঙ্গে লো-কে আবার চলে যেতে হয়েছিল মহাদেশের মূলভূমিতে, সেখানে তিনি কার্যত পেশাদার জুয়াড়ীর জীবনযাপন করতেন। তিনি বাস করতেন হল্যান্ডে আর ইতালিতে, ফ্ল্যান্ডার্সে আর ফ্রান্সে, কখনও সপরিবারে, কখনও একা, জুয়া খেলতেন সর্বত্র, আর সিকিউরিটি, দামী অলঙ্কার এবং প্রাচীন মহাশিল্পীদের ছবি নিয়ে কালাবাজারী কারবারও করতেন।

একজন পারসিক ইউরোপে পর্যটন করছিলেন, তাঁর মুখের নিম্নলিখিত ব্যঙ্গোক্তি উদ্ধৃত করেছেন মঁতেস্ক্য তাঁর 'Lettres Persanes' ('পারসিক চিঠিপত্র')-তে (১৭২১): 'ইউরোপে জুয়াখেলার চূড়ান্ত হিড়িক: জুয়াড়ী হওয়াটা সামাজিক প্রতিষ্ঠাবিশেষ। ঐ অভিধাটাই আভিজাত্য, ধন-দৌলত এবং সততার নামান্তর: যারা এই অভিধা পায় তাদের সবাইকে এটা স্থান করে দেয় সৎ মানুষের কাতারে...'

লো সামাজিক মর্যাদা এবং ধন-দৌলত অর্জন করেছিলেন ঠিক এই উপায়েই। জুয়াড়ী হিসেবে তাঁর পটুতা নিয়ে গড়ে উঠেছিল নানা কিংবদন্তি। বিপদে-আপদে স্থৈর্য, ধূর্তামি, আশ্চর্য স্মরণশক্তি আর বরাতের জোরে তিনি কিছু-কিছু মস্ত বাজি জিতেছিলেন। শেষে তিনি যখন স্থায়িভাবে প্যারিসে বসবাস করার সিদ্ধান্ত করেন তখন তিনি ফ্রান্সে নিয়ে গিয়েছিলেন ১৬ লক্ষ লিভ্‌র। তবে প্যারিসের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল জুয়াখেলা আর ফটকাবাজির জন্যেই শুধু নয়। আর্থিক সংকট আরও সঙ্গিন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্রমেই আরও বেশি করে মনে হচ্ছিল সেখানে গৃহীত হবে তাঁর প্রকল্প। রাজকোষ তখন শূন্য, বিপুল জাতীয় ঋণ, ক্রেডিট ক্ষীণ, অর্থনীতিতে বদ্ধতা আর মন্দা। লো বললেন, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হলে এই সবকিছুর প্রতিকার হবে, ব্যাঙ্কনোট ছাড়ার ক্ষমতা থাকবে এই ব্যাঙ্কের।

১৪শ লুই মারা যান ১৭১৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে — সেটা হল লো-র সময়। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী সাবালক হওয়া অবধি যাঁর দেশের শাসক হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল তাঁর কাছে লো নিজ ভাব-ভাবনা ক্রমে-ক্রমে উত্থাপন করছিলেন আগে থেকেই। তিনি হলেন বৃদ্ধ রাজার ভাইপো অর্লিয়েন্স-এর ডিউক ফিলিপ। এই স্কট্‌টিকে বিশ্বাস করতে শুধু করেছিলেন ফিলিপ। রাজপ্রতিনিধি হবার অন্যান্য দাবিদারদের হটিয়ে ক্ষমতা হাতে নিয়ে তিনি লো-কে তলব করেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

রাজপ্রতিনিধির অভিজাত উপদেষ্টারা এবং প্যারিস পার্লামেণ্ট কোন আমূল নতুন ব্যবস্থায় ভয় পেত, বিদেশীটিকে তারা বিশ্বাস করত না — তাদের বিরোধিতা কাটিয়ে উঠতে লেগেছিল ছ'মাসের বেশি। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত ধারণাটাকে ছেড়ে বেসরকারী জয়েণ্ট-স্টক ব্যাঙ্ক স্থাপনে লো-কে রাজি হতে হয়েছিল। তবে এটা ছিল একটা স্রেফ কৌশলী চাল: একেবারে শুরু থেকেই ব্যাঙ্কটা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে। ১৭১৬ সালে মে মাসে প্রতিষ্ঠিত এই 'জেনারেল ব্যাঙ্ক' প্রথম দু'বছরের কাজ-কারবারে মস্ত সাফল্য লাভ করেছিল। প্রতিভাশালী পরিচালক, পাকা ব্যবসায়ী, পটু রাজনীতিক, কূটনীতিজ্ঞ লো রাজপ্রতিনিধির সমর্থনপুষ্ট হয়ে দেশের সমগ্র অর্থ এবং ক্রেডিট ব্যবস্থাটাকে চালাচ্ছিলেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। জেনারেল ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কনোট প্রচলনটাকে লো ঐসময়ে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন সাফল্যের সঙ্গে; এইসব ব্যাঙ্কনোট চালু করা হয়েছিল, সেগুলোকে লোকে অনেক সময়ে নিত এমনকি ধাতব মুদ্রার সঙ্গে তুলনায় অধিহারে। এই ব্যাঙ্ক ঋণ দিত প্যারিসের মহাজনদের চেয়ে কম সুদে, আর এই ঋণ ভেবেচিন্তেই চালান করা হত শিল্পে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে। অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল লক্ষণীয়ভাবেই।

মহা পতন

কোন দেশের প্রতি নয়, একটা ভাব-ধারণার প্রতি ছিল লোর আনুগত্য। এই ভাব-ধারণা তিনি প্রথমে উত্থাপন করেছিলেন স্কটল্যান্ড আর ইংলণ্ড, স্যাভয়-এর ডিউক এবং জেনোয়া প্রজাতন্ত্রের কাছে — তখন তিনি কৃতকার্য হন নি। শেষে ফ্রান্স সেটা গ্রহণ করলে তিনি নিজেকে ফরাসী বলে বোধ করেছিলেন মনে-প্রাণে। অবিলম্বে তিনি ফ্রান্সের নাগরিক হয়েছিলেন, আর পরে যখন প্রণালীটার সাফল্যের জন্যে আবশ্যক বিবেচনা করেছিলেন তখন ধর্মান্তরিত হয়ে ক্যাথলিক হন।

লো নিজ ভাব-ধারণায় বাস্তবিকই বিশ্বাস করতেন, ফ্রান্সে সেটাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্যে তিনি ঢেলেছিলেন নিজের সমস্ত অর্থই শুধু নয়, নিজ অন্তরও — তাতে কোন সন্দেহ নেই। যত পারে চুরি করে অন্যায়লব্ধ মুনাফা নিয়ে কেটে পড়ার মতো মামুলি দুর্বৃত্ত নন লো। পরে নিজ 'দায়মোচন স্মারকলিপি'-তে তিনি বারবার বলেন, সেটাই তাঁর

মতলব হলে নিজের সমস্ত ধন-দৌলত তিনি ফ্রান্সে নিয়ে যেতেন না, যখনও অবধি তাঁর ক্ষমতা ছিল তখন সেটার কিছু পরিমাণ নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দিতেন বিদেশে। 'তাঁর স্বভাবে না ছিল অর্থগৃধ্নুতা, না ছিল পেজোমি' — লো সম্পর্কে সাঁ-সিমোঁর এই কথাটা বিশ্বাস করা যেতে পারে। নিজ প্রণালীর অপ্রতিরোধ্য গতি-পরিণতিই তাঁকে দুর্বৃত্ত করে ফেলেছিল!

১৭১৫ সালে ডিসেম্বর মাসে রাজপ্রতিনিধির কাছে লেখা চিঠিতে লো নিজ ভাব-ধারণার ব্যাখ্যা দেন আর একবার, তাতে একটা হেঁয়ালিভরা অংশে ধোঁকাবাজির আভাস পাওয়া যায়: 'তবে ব্যাঙ্কটাই আমার একমাত্র কিংবা সবচেয়ে মস্ত আইডিয়াও নয়; আমি এমনকিছু পয়দা করব যেটা ফ্রান্সের পক্ষে সুবিধাজনক এমনসব পরিবর্তন ঘটবে যাতে স্তম্ভিত হয়ে যাবে ইউরোপ; ইণ্ডিজ আবিষ্কার কিংবা ক্রেডিট চালু হবার ফলে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলোর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে সেগুলো। রাজ্য যে-শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়েছে তার থেকে ইওর হাইনেস সেটাকে টেনে তুলতে সমর্থ হবেন সেই কাজের ফলে, রাজ্য কখনও যা ছিল তার চেয়ে পরাক্রমশালী করতে পারবেন সেটাকে, রাজ্যের আর্থিক অবস্থায় শৃঙ্খলা স্থাপন করতে পারবেন, আর কৃষি, শিল্পোৎপাদন এবং বাণিজ্য চাঙ্গা করতে, বজায় রাখতে এবং সেগুলোর উন্নয়ন ঘটাতে সমর্থ হবেন।'*

প্রকল্প-রচয়িতারা বরাবরই সোনাবাঁধানো সড়কের আশ্বাস দিয়েছে শাসকদের, কিন্তু এখানে হলেন একজন আর্থনীতিক কিমিয়াবিদ, যিনি পরশপাথর গোছের কিছুর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। কী ছিল এইসব ঝাপসা প্রতিশ্রুতির পিছনে সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল দু'বছর পরে। ১৭১৭ সালের শেষের দিকে লো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পেল্লায় কারবার — ইণ্ডিজ কম্পানি। মিসিসিপির অববাহিকা তখন ছিল ফ্রান্সের, সেটা উন্নয়নের জন্যেই গোড়ায় এটাকে গড়া হয়েছিল বলে এটাকে সাধারণত বলা হত মিসিসিপি কম্পানি।

বাহ্যত এতে নতুনত্ব বিশেষকিছু ছিল না। ইংলণ্ডে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির বাড়বাড়ন্ত চলছিল তখন এক শতাব্দী ধরে, অনুরূপ একটা কারবার ছিল হল্যাণ্ডেও। কিন্তু লো-র কম্পানি ছিল এই দুটো থেকে ভিন্ন রকমের। যারা শেয়ারগুলোকে বিলিব্যবস্থা করে নিজেদের মধ্যে এমন

---

* J. Law, 'Oeuvres complètes', Vol. 2, Paris, 1934, p. 266.

একদল বণিকের পরিমেল ছিল না এটা। পুঁজিপতিদের অপেক্ষাকৃত ব্যাপক অংশের মধ্যে বিক্রি করা এবং স্টক-এক্সচেঞ্জে যথার্থই প্রচলিত করা হবে মিসিসিপি কম্পানির শেয়ারগুলো, এমনটাই মনস্থ করা হয়েছিল। কম্পানিটা চূড়ান্ত মাত্রায় সংশ্লিষ্ট ছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে, সেটা শুধু এই অর্থে নয় যে, এটাকে রাষ্ট্র থেকে মস্ত-মস্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং একচেটে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল বহু ক্ষেত্রে। কম্পানিটার পরিচালনকাজে প্রশান্ত স্কট্‌টির পাশাপাশি ছিলেন ফ্রান্সের রাজপ্রতিনিধি অর্লিয়েন্স-এর ফিলিপ স্বয়ং। কম্পানিটাকে মিলিয়ে-মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল জেনারেল ব্যাঙ্কের সঙ্গে, এটা ১৭১৯ সালের গোড়ার দিকে রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে নাম পেয়েছিল রাজকীয় ব্যাঙ্ক। কম্পানিটার শেয়ার কেনার জন্যে এই ব্যাঙ্ক পুঁজিপতিদের ঋণ দিয়েছিল, কম্পানির আর্থিক বিষয়াবলি চালাত এই ব্যাঙ্ক। উভয় প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনের সূত্রগুলো জড়ো হয়েছিল লো-র হাতে।

এইভাবে লোর দ্বিতীয় 'মস্ত আইডিয়াটা' ছিল পুঁজির কেন্দ্রীকরণের ধারণা, পুঁজির পরিমেলের ধারণা। এক্ষেত্রেও স্কচম্যানটি দেখা দিলেন পয়গম্বর রূপে — সময় হবার এক শতাব্দী কিংবা আরও বেশি কাল আগে। পশ্চিম ইউরোপে এবং আমেরিকায় জয়েন্ট-স্টক কম্পানিগুলোর দ্রুত প্রসার উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের আগে শুরু হয় নি। এখন উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে, বিশেষত বৃহদায়তনের উৎপাদন ক্ষেত্রে এগুলো রয়েছে প্রায় সমগ্র অর্থনীতি জুড়ে। তারা যতই ধনী হোক, বড়-বড় প্রতিষ্ঠান একজন কিংবা কয়েক জন পুঁজিপতিরও সাধ্যায়ত্ত নয়। বহু মালিকের সংযুক্ত পুঁজি আবশ্যক সেজন্যে। নিঃসন্দেহে, খুদে শেয়ারহোল্ডাররা অর্থই যোগায় শুধু, ঘটনাধারার উপর তাদের সামান্যতম প্রভাবও থাকে না। কাজ-কারবারের আসল পরিচলনাটা করে উপরকার লোকেরা, তাঁরা মিসিসিপি কম্পানির বেলায় হলেন লো এবং তাঁর কিছু-কিছু সহযোগী। জয়েন্ট-স্টক কম্পানির প্রগতিশীল ভূমিকা সম্পর্কে মার্কস বলেছেন: 'সঞ্চয়নের ফলে কয়েকটা পৃথক-পৃথক পুঁজির পরিমাণ রেলপথ নির্মাণের পক্ষে পর্যাপ্ত হয়ে ওঠা অবধি অপেক্ষা করতে হলে পৃথিবীতে রেলপথ থাকত না অদ্যাবধি। উলটে, কেন্দ্রীকরণের ফলে সেটা হাসিল হল একনিমিষে — জয়েন্ট-স্টক কম্পানিগুলোর সাহায্যে।'*

---

* কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ১ খণ্ড, মস্কো, ১৯৭২, ৫৪৮ পৃঃ।

স্টকের কারবার এবং শেয়ার কেনা-বেচায় ফটকাবাজি হল জয়েণ্ট-স্টক কাজ-কারবারের নিত্যসহচর। লোর প্রণালীর ফলে স্টকের কারবারের পরিধি যা দাঁড়িয়েছিল তেমটা আগে কখনও হয় নি। কম্পানিটার অস্তিত্বের প্রথম বছরে সেটা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পরে লো শেয়ারের দাম চড়ানো এবং বিক্রি বাড়াবার জন্যে প্রবল ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। একটা সূত্রপাত হিসেবে তিনি দু'-শ'টা ৫০০-লিভ্রের শেয়ার কিনেছিলেন, তখন তার প্রত্যেকটার দাম ছিল মাত্র ২৫০ লিভ্র, আর তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ছ' মাস পরে সেগুলোর দাম যা-ই হোক তিনি অভিহিত মূল্য ৫০০ লিভ্রই দেবেন। অনেকের কাছে অসম্ভব-আজগবি মনে হয়েছিল এটাকে, কিন্তু এটার পিছনে ছিল কিছু ধূর্ত বিচার-বিবেচনা, যা যথার্থ প্রতিপন্ন হয়েছিল। ছ' মাসে শেয়ারগুলোর দাম দাঁড়িয়েছিল অভিহিত মূল্যের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি, লো-র পকেটস্থ হয়েছিল প্রচুর লাভ।

তবে এটা ছিল না বড় কথাটা: কয়েক লাখ-টাখ তখন তাঁর কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। শেয়ারগুলোর দিকে নজর টানা, ক্রেতাদের আগ্রহান্বিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। আর তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মহোদ্যমে কম্পানির কাজ-কারবার বাড়িয়ে চলছিলেন ব্যাপক পরিসরে। আসল কাজ-কারবারকে তিনি সংযুক্ত করেছিলেন নিপুণ প্রচারণের সঙ্গে — এতেও তিনি চালু করলেন ভবিষ্যতের চলিতকর্ম।

লো মিসিসিপি নদীর অববাহিকায় উপনিবেশন শুরু করে নিউ অর্লিয়েন্স নামে একটা শহর পত্তন করেন রাজপ্রতিনিধির সম্মানার্থে। স্বেচ্ছায় সেখানকার বাসিন্দা হবার মতো যথেষ্ট লোক পাওয়া যাচ্ছিল না বলে কম্পানির অনুরোধক্রমে সরকার আমেরিকায় নির্বাসিত করতে থাকল চোর, ভবঘুরে আর বেশ্যাদের। তার সঙ্গে সঙ্গে লো লোক ফুসলানোর জন্যে হরেক রকম কাগজপত্র ছেপে বিলি করার ব্যবস্থা করলেন, তাতে বলা হল অঢেল সমৃদ্ধিশালী সেদেশের মানুষ ফরাসীদের তাদের মাঝে পেয়ে পুলকিত হয়, টুকিটাকি জিনিসপত্রের বদলে তারা দেয় সোনা, মণিরত্ন, অন্যান্য দামী জিনিস। সেখানকার আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের ধর্মান্তরিত করে ক্যাথলিক করার জন্যে তিনি এমনকি জেসুইটদের পাঠিয়েছিলেন।

কয়েকটা ফরাসী ঔপনিবেশিক কম্পানির কাজ-কারবার ভাল চলছিল না, সেগুলোকে গ্রাস করে লো-র কম্পানিটা হয়ে উঠল সর্বশক্তিমান

একচেটে কারবার। এটার মালিকানাধীন ছিল অল্প কয়েক ডজন পুরন জাহাজ; লোর কথা এবং তাঁর সহকারীদের কলমের জোরে সেগুলোকে মস্ত-মস্ত পোতবহরে পরিণত করা হল, সেগুলো ফ্রান্সে বয়ে নিতে থাকল রুপো আর রেশম আর রেশমী কাপড়, মশলা আর তামাক। খাস ফ্রান্সে এই কম্পানি কর-ইজারাদারির কাজ হাতে নিল, — ন্যায্য কথা বলতে কি, আগে যারা এটা করত তাদের চেয়ে এরা ঢের বেশি যুক্তিসম্মত এবং ফলপ্রদ হল এই কাজে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই সবকিছু হল প্রচন্ড বেপরোয়া ভাগ্যান্বেষণ আর ডাহা জোচ্চোরির সঙ্গে জমকদার সংগঠন আর সাহসিক উদ্যমের অত্যদ্ভুত সংমিশ্রণ!

কম্পানিটা ডিভিডেন্ড দিত খুবই কম, তবু ১৭১৯ সালের বসন্তকালের পর থেকে সেটার শেয়ারের দাম চড়ে গিয়েছিল বেলুনের মতো। এরই প্রতীক্ষায় ছিলেন লো। বাজারটাকে সুকৌশলে খেলিয়ে তিনি নতুন-নতুন খেপে শেয়ার ছাড়তে থাকলেন, আর সেগুলোকে বেচতে থাকলেন ক্রমেই আরও বেশি চড়া দামে। শেয়ার যা ছাড়া হল সেটাকে ছাড়িয়ে গেল চাহিদা, আর নতুন কিস্তির প্রচলন ঘোষিত হলে হাজার-হাজার মানুষ সারা দিন-রাত লাইন দিয়ে থাকত কম্পানির দপ্তরের সামনে। ১৭১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই কম্পানি ৫০০ লিভ্র দামের শেয়ার বিক্রি করছিল ৫০০০ লিভ্রে — তা সত্ত্বেও ঘটত অমনটা। যারা প্রতিপত্তিশালী এবং অভিজাত তারা লাইন দিত না, কিন্তু টাকা জমা দেবার অনুমতি পাবার অনুরোধ জানিয়ে তারা ছেঁকে ধরত খোদ লো-কে এবং অন্যান্য ডিরেক্টরদের। কেননা ছাড়ার সময়ে যে-শেয়ারটার দাম পড়ত ৫,০০০ লিভ্র সেটা পরদিন স্টক-এক্সচেঞ্জে বিক্রি হতে পারত ৭,০০০-৮,০০০ লিভ্র দামে! কিছু-কিছু অদ্ভুত ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে ইতিহাসে: লো-র আপিসে ঢোকার জন্যে লোকে সেখানে নেমে যেত চিম্‌নি বেয়ে; একটি অভিজাত মহিলা লো-র বাড়ির সামনে গাড়ি উলটে দিতে গাড়োয়ানকে হুকুম দিয়েছিল, যাতে নারী-মনোরঞ্জন জেণ্টলম্যানটিকে ঘরের বার করা যায়, আর তখন তাঁকে শোনানো যায় প্রার্থনাটা; লো-র জন্যে অপেক্ষমাণ দর্শনপ্রার্থীদের কাছ থেকে ঘুস খেয়ে মোটা টাকা করেছিল তাঁর সেক্রেটারি।

রাজপ্রতিনিধি ফিলিপের বৃদ্ধা মায়ের মেজাজটা ছিল খিটখিটে; জার্মানিতে আত্মীয়স্বজনের কাছে লেখা তাঁর চিঠিপত্রে কিছু-কিছু তথ্য রয়েছে সেই উদ্ভট সময়টা সম্পর্কে: 'লোকে ছুটছে লো-র পিছু-পিছু,

ফলে দিনে-রাতে কখনও তার স্বস্তি নেই। একজন ডাচেস্‌ তার হাতে চুমু খেয়েছে সবার সামনে। তার হাতে চুমু খেতে থাকে যদি ডাচেসেরা, তাহলে তার দেহের কোন্‌-কোন্‌ অংশকে পবিত্র জ্ঞান করতে প্রস্তুত অন্যান্য মেয়েরা?' ১৭১৯ সালের ৯ নভেম্বর তারিখ-দেওয়া একখানা চিঠিতে তিনি বলেন: 'হালে কয়েকটি মহিলার সঙ্গ থেকে সে একবার কামরা থেকে বাইরে যেতে চেয়েছিল। তারা তাকে যেতে দিতে চায় না, তখন সে বাধ্য হয়ে কারণটা জানিয়েছিল। তারা বলেছিল, 'ও, তাতে কিছু এসে যায় না। সেটা কিছু না; তুমি এখানেই হিশি করে নাও, আমরা কথাবার্তা বলতে থাকছি।' তার সঙ্গেই থেকে গিয়েছিল তারা।'*

এর চেয়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত ব্যাপারও চলছিল কিঙ্কাম্পো সরণিতে, যেখানে গড়ে উঠে বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল স্টক-এক্সচেঞ্জের। ভোর থেকে সন্ধ্যে অবধি সেটা ভিড়ে ঠাসা থাকত, তারা কেনা-বেচা করত, দর জানাতে বলত, হিসাব কষত। ৫০০ লিভ্‌রের শেয়ারের দাম চড়ে হল ১০,০০০, তার পর ১৫,০০০, শেষে দাঁড়াল ২০,০০০ লিভ্‌র। হঠাৎ নবাব হয়ে উঠল অনেকে; ঐ দিনগুলিতেই 'কোটিপতি' শব্দটা পয়দা হয়, যা আজ খুবই সুপরিচিত। হঠাৎ বড়লোক হবার হিড়িকটা একত্রে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল সমস্ত সামাজিক বর্গকে, যারা আগে কখনও কোথাও মেলামেশা করত না, গির্জায়ও না। অভিজাত মহিলা আর গড়োয়ানের মধ্যে ঠেলাঠেলি, ডিউকে-ফুটম্যানে দরকষাকষি, দোকানদারের সঙ্গে হিসেবনিকেশ করতে গিয়ে নোট্‌ গুণতে থুতু দিয়ে মর্মধারীর আঙুল ভিজে: এই সবকিছুতে একই দেবতা — টাকা!

শেয়ারের দাম হিসেবে সোনা কিংবা রুপো নিতে লোকে তখন অনিচ্ছুক। বাজার যখন সবচেয়ে গরম তখন দশটা শেয়ার এবং ১·৪ কিংবা ১·৫ টন রুপোর দাম ছিল একই! প্রায় সমস্ত দেনা-পাওনাই মেটান হত ব্যাঙ্কনোট দিয়ে। এই সমস্ত কাগজী সম্পদ — শেয়ার আর ব্যাঙ্কনোট — হল সেই আর্থ জাদুকর লো-র সৃষ্টি।

১৭২০ সালে জানুয়ারি মাসে লো অর্থ বিভাগের মহানিয়ামক হয়েছিলেন সরকারীভাবেই। দেশের আর্থ বিষয়াবলির ব্যবস্থাপন তিনি বস্তুত করছিলেন

---

* C. Kunstler, 'La vie quotidienne sous la Régence', Paris, 1960, p. 121.

দীর্ঘকাল যাবৎ। তবে তাঁর প্রণালীটার তলে প্রথম-প্রথম কম্পন অনুভূত হচ্ছিল এই সময়েই।

নতুন-নতুন খেপে শেয়ার ছেড়ে কম্পানিটার রাশীকৃত বিপুল পরিমাণ অর্থ সেটা বিনিয়োগ করত কোথায়? সামান্য পরিমাণ যেত জাহাজে এবং পণ্যে, আর প্রধান অংশটা — রাষ্ট্রীয় ঋণ বণ্ডে। প্রকৃতপক্ষে, মালিকদের কাছ থেকে বণ্ড্‌গুলো কিনে নিয়ে এই কম্পানি ঘাড়ে নিয়েছিল বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ঋণের সবটাই (২০০ কোটি লিভ্‌র অবধি)। এই হল অর্থক্ষেত্রে শৃঙ্খলাস্থাপনা, যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন লো। আরও বেশি-বেশি শেয়ারের প্রচলন সম্ভব হয়েছিল কিভাবে? — কোটি-কোটি নতুন ব্যাঙ্কনোট ছেপে সেগুলো চালু করে চলছিল লো-র ব্যাঙ্ক — শুধু এরই কল্যাণে।

এমন অবস্থা তো দীর্ঘকাল ধরে চলবার নয়। লো সেটা বুঝতে চাইলেন না, কিন্তু সেটা ইতোমধ্যে বুঝতে পেরেছিল স্রেফ ফটকাবাজেরা, যারা এতে দূরদর্শী, তাছাড়া লো-র শত্রু আর অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরাও, যারা সংখ্যায় ছিল বহু। তারা স্বভাবতই ছুটল শেয়ার আর ব্যাঙ্কনোটগুলো থেকে নিস্তার পাবার জন্যে। তার জবাবে লো শেয়ারের দাম সুস্থিত রাখলেন এবং ব্যাঙ্কনোটের বদলে ধাতু দেওয়া গণ্ডিবদ্ধ করে দিলেন। কিন্তু যেহেতু শেয়ারগুলোতে ঠেকনো দিতে হলে অর্থ আবশ্যক ছিল তাই লো আরও বেশি-বেশি করে নোট ছাপতে থাকলেন। ঐ কয়েক মাসে তিনি জারি করেছিলেন বহু নির্দেশ — সেগুলোতে ছিল হতবুদ্ধিতার লক্ষণ। লো পড়েছিলেন কানাগলিতে — ভেঙে পড়ছিল তাঁর প্রণালীটা। ১৭২০ সালের শরৎকাল নাগাদ ব্যাঙ্কনোটগুলো হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্ফীত কাগজী মুদ্রা, সেগুলোর দাম হল রুপো হিসেবে তার নামিক মূল্যের চতুর্থাংশ মাত্র। সমস্ত পণ্যের দাম চড়ে গেল। প্যারিসে খাদ্যের কমতি পড়ল, বেড়ে চলল জনসাধারণের অসন্তোষ। নভেম্বর মাসে ব্যাঙ্কনোটগুলো আর বিহিত অর্থ রইল না। প্রণালীটা দেউলিয়া হয়ে যেতে থাকল।

একেবারে শেষ অবধি কঠোর লড়াই চালাতে থাকলেন লো। জুলাই মাসে একটা ক্রুদ্ধ জনতার হাত থেকে নিস্তার পেয়েছিলেন কোনমতে, বহু কষ্টে তিনি আশ্রয় নিতে পেরেছিলেন রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদে: বাজে কাগজগুলোর বদলে বিহিত অর্থ দাবি করছিল ঐ জনতা। প্রত্যেকেই তখন বলছিল, তাঁকে দেখাত খেপাটে গোছের, তাঁর অভ্যাসগত আত্মবিশ্বাস এবং শিষ্টাচার আর ছিল না। তাঁর ধৈর্য-স্থৈর্য ভেঙে পড়ছিল।

লো-কে এবং রাজপ্রতিনিধিকেও বিদ্রূপ করে সারা প্যারিসে চালু হয়েছিল বহু ছড়া, চুটকি আর ব্যঙ্গোক্তি। গুজব রটেছিল বুরবোঁর ডিউক শেয়ারের ফটকাবাজি করে আড়াই কোটি লিভ্‌র মুনাফা করে সেটাকে বৈষয়িক মূল্যবস্তুতে বিনিয়োগ করে লো-কে আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি তখন বিপন্মুক্ত: প্যারিসবাসিরা যাদের উপহাস করে তাদের তারা বধ করে না। কিন্তু লো-র অন্যভাবে ভাবার কারণ ছিল, জোরদার দেহরক্ষিদল ছাড়া তিনি বেরতেন না কখনও, যদিও মন্ত্রিপদ থেকে তাঁকে ছাড়া দেওয়া হয়েছিল ইতোমধ্যে। প্যারিস পার্লামেণ্ট লো-র বিরোধিতা করে আসছিল বরাবর, সেটা দাবি করল লো-কে বিচার করে ফাঁসি দেওয়া হোক। ডিউকের বিশ্বস্ত উপদেস্টারা বললেন লো-কে বাস্তিলে পুরে রাখা হোক অন্তত। গোলযোগ-বিক্ষোভ উপশম করার জন্যে প্রিয়পাত্রটির হাত থেকে রেহাই পাওয়াই শ্রেয় বলে ফিলিপের মালুম হতে থাকল। লো-কে তিনি ফ্রান্স ছেড়ে চলে যেতে দিলেন — এটা হল তাঁর জন্য ডিউকের শেষ অনুগ্রহ।

১৭২০ সালের ডিসেম্বর মাসে লো গোপনে চলে যান ব্রাসেল্‌সে, সঙ্গে থাকে তাঁর ছেলে, তাঁর স্ত্রী, মেয়ে এবং ভাই থেকে যান প্যারিসে। তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে পাওনাদারদের দাবি মেটাতে লাগান হয়।

লো-র প্রণালী এবং সেটার পতনের তাৎপর্য কী সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে? সেটা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলে আড়াই-শ' বছর ধরে।

আঠার শতকে লোর কঠোর সমালোচনা হয় সাধারণভাবে, কিন্তু তাতে ধীর-স্থির মূল্যায়ন ছিল ততটা নয় যতটা কিনা নৈতিক ধিক্কার। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর 'Histoire de la révolution française' ('ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস')-এ লুই ব্লাঁ এবং অনুরূপ মতের অন্যান্য সমাজতন্ত্রীরা লো-কে 'পুনর্বাসিত' করেন, এমনকি সমাজতন্ত্রের একজন পথিকৃৎ হিসেবে তাঁকে চিত্রিত করতে চেষ্টা করেন। লুই ব্লাঁ বলেছেন, সোনা আর রূপোকে 'ধনীদের অর্থ' বলে লো সমালোচনা করেছেন, আর 'গরিব মানুষের অর্থ' কাগজী মুদ্রা দিয়ে তিনি পরিচলন পূরণ করতে চান। ব্যাঙ্ক আর বাণিজ্যের সর্বাত্মক একচেটের সাহায্যে লো গলাকাটা প্রতিযোগিতার বুর্জোয়া নীতির বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক পরিমেল নীতি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিলেন বলে দেখাতে চাওয়া হয়। লো তাঁর কোন-কোন আর্থনীতিক ব্যবস্থা ভেবেচিন্তেই চালু করেছিলেন মেহনতী মানুষের জীবনে আসান করার জন্যে, এইভাবে সেগুলোকে চিত্রিত করেছেন লুই ব্লাঁ।

এটা সত্যের কাছাকাছিও নয়। পরিমেল-সংক্রান্ত নীতিটাকে লো যে-আকারে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন সেটা নিছক বুর্জোয়া নীতি। সেটা পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে যায় নি, গেছে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে, যেখানে সমাজটা বিভিন্ন জড় সামাজিক বর্গে বিভক্ত, সেখানে নেই সামাজিক সচলতা। লো একত্রিত এবং সমান-সমান করতে চেয়েছিলেন তাঁর কম্পানির সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের এবং তাঁর ব্যাঙ্কে আমানতকারী অভিজাত আর বুর্জোয়াদের, কারিগর আর ব্যবসায়ীদের, কিন্তু তাদের একত্রিত করতে চেয়েছিলেন পুঁজিপতি হিসেবে।

লো তাঁর প্রণালীটা দিয়ে যেটার আয়োজন করেছিলেন সেটাকে পরে পুরোপুরি হাসিল করে পুঁজিতন্ত্র: 'ঐতিহাসিক বিচারে খুবই বৈপ্লবিক ভূমিকায় থেকেছে বুর্জোয়ারা।

'বুর্জোয়ারা যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে খতম করে দিয়েছে সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, প্যাট্রিয়ার্কাল এবং 'রাখালিয়া' সম্পর্ক। মানুষকে তার 'স্বাভাবিক গুরুজনদের' সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল যে হরেক রকমের সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন সেগুলোকে নির্মমভাবে ছিঁড়ে ফেলল বুর্জোয়ারা; নিছক স্বার্থপরতা ছাড়া, নির্বিকার 'কড়ির টান' ছাড়া মানুষে-মানুষে অন্য কোন সম্বন্ধ রেখে দিল না।'*

বুয়াগিইবের যে-সীমাবদ্ধ অর্থে উৎপীড়িত শ্রেণীগুলির পক্ষসমর্থক ছিলেন সেভাবেও তা ছিলেন না লো। জনগণের প্রতি, কৃষকদের প্রতি যে সাচ্চা সহানুভূতি ছিল রুয়ে'র সেই জজের তার কিছুই পাওয়া যায় না লো-র রচনাগুলিতে। তাঁর ভাগ্যান্বেষী, জুয়াড়ী এবং মুনাফাখোর স্বভাবের সঙ্গে সেটা বেখাপ্পাও বটে। লো তুলে ধরেন প্রচুর অর্থশালী বুর্জোয়াদের স্বার্থটাকে। তাঁর সমস্ত আশার অবলম্বন ছিল ঐ বুর্জোয়াদের কারবারী উদ্যম। তেমনি ছিল তাঁর কর্মনীতিও। তাঁর কম্পানির শেয়ারগুলোর মালিক ছিল বড়-বড় পুঁজিপতিরা, সেগুলোকে তিনি ঠেকনো দিয়েছিলেন একেবারে শেষ অবধি, আর ব্যাপকতর জনসাধারণের মধ্যে ছড়ানো ব্যাঙ্কনোটগুলোর গতি তিনি ছেড়ে দেন ভাগ্যের হাতে।

ঐ প্রণালীটা এবং সেটার পতনের ফলে সম্পদ আর আয়ের বিস্তর

---

* কার্ল মার্ক্স এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, তিন-খণ্ডে 'নির্বাচিত রচনাবলি', ১ খণ্ড, মস্কো, ১৯৭৩, ১১১ পৃঃ।

পুনর্বণ্টন ঘটেছিল। জমিদারি-তালুকদারি আর ইমারত বিক্রি করে ফটকাবাজিতে নেমেছিল অভিজাতেরা — তাদের অবস্থা হল আরও খারাপ। রাজতন্ত্র আর অভিজাতদের অবস্থান কমজোর হয়ে পড়েছিল রাজপ্রতিনিধির শাসন আমলের ঘটনাবলির ফলে।

অন্য দিকে, লো-র আর্থ জাদুকরির দরুন ঘা খেয়েছিল শহরের গরিব মানুষ; তাদের মস্ত ক্ষতি হয়েছিল জিনিসপত্রের দাম বাড়ার ফলে। কাগজী মুদ্রা বেআইনী হয়ে গেলে দেখা গিয়েছিল কারিগর, ব্যাপারী, চাকর-চাকর, এমনকি কৃষকদের হাতেও অল্প-অল্প করে সেগুলোর মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল খুবই বিরাট।

লো-র প্রণালীটার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা সামাজিক ফল হল নব্য ধনীদের উদ্ভব; বেপরোয়া ফটকাবাজি চালিয়ে তারা রাশীকৃত সম্পদ বজায় রাখতে পেরেছিল।

প্যারিস থেকে পালিয়ে যাবার পরে লো আরও আট বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি গরিব হয়ে পড়েছিলেন। না-খেয়ে মরণাপন্ন গরিব মানুষের মতো নয় নিশ্চয়ই, তবে এমন একজনের মতো যার সবসময়ে থাকে না গাড়ি-ঘোড়া-অনুচরবৃন্দ; অট্টালিকায় নয়, লো থাকতেন একটা অনাড়ম্বর ভাড়াটে ফ্ল্যাটে। গৃহহীন তিনি নির্বাসিত এবং মুসাফিরের জীবন কাটিয়ে গেলেন বরাবর। স্ত্রী (তাঁকে তাঁর ঠিক বিয়ে করাটা হয়ে ওঠে নি কখনও) কিংবা মেয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হতে পারে নি আর কখনও: তাঁকে ফ্রান্সে ঢুকতে দেওয়া হয় নি, আর তাঁর স্ত্রী এবং মেয়ের ফ্রান্স ছেড়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল।

প্রথম কয়েক বছর তাঁর আশা ছিল ফিরবেন, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন, কাজকর্ম চালিয়ে যাবেন। রাজপ্রতিনিধির উপর পত্রবৃষ্টি করে তিনি সবকিছুর ব্যাখ্যা করেছিলেন, সবকিছু প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছিলেন বারবার। এইসব চিঠিতে তাঁর আর্থনীতিক ধ্যান-ধারণার সারমর্মটা থেকে গিয়েছিল একই, তফাত ছিল শুধু এই তিনি আরও সাবধান হয়ে, আরও ধৈর্য ধরে কাজ করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন।

অর্লিয়েন্স-এর ফিলিপ হঠাৎ মারা যান ১৭২৩ সালে। লো-র পদ আর ধন-দৌলত ফিরে পাবার সব আশা ভেঙে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে; রাজপ্রতিনিধি তাঁকে মাঝারি গোছের পেনশন দিতে শুরু করেছিলেন, তাও গেল। যেসব নতুন লোক ক্ষমতাসীন হল তারা লো সম্বন্ধে কিছু শুনতেও

চাইল না। লো তখন লন্ডনে। ইংলন্ডের সরকার তাঁকে বেশ প্রতিপত্তিশালী এবং চতুর মনে করে একটা আধা-গুপ্ত কমিশনের ভার দিয়ে পাঠাল জার্মানিতে। তাঁর বছরখানেক কেটেছিল আকেনে আর মিউনিকে।

লো তখন সেই মস্ত ধনিক এবং সর্বশক্তিমান মন্ত্রীর ছায়াটি মাত্র। তিনি বাচাল হয়ে পড়েছিলেন, অবিরাম কথা বলতেন নিজের ব্যাপার সম্পর্কে, নিজের সাফাই গাইতেন, দোষারোপ করতেন শত্রুদের উপর। শ্রোতার অভাব ছিল না: লোকে মনে করত কাগজকে সোনা করে ফেলার রহস্যটা জানা ছিল এই স্কট্‌ম্যানটির। অনেকে ধরে নিয়েছিল ধন-দৌলতের একটা অংশ ফ্রান্সের বাইরে না রেখে দেবার মতো নির্বোধ তিনি হতে পারেন না — সেটা থেকে লাভবান হবার আশা রাখত তারা। যারা আরও বেশি কুসংস্কারাচ্ছন্ন তারা ভাবত লো ভোজবাজিকর।

লো-র শেষ কয়েক বছর কাটে ভেনিসে। অবসর সময়ে তিনি জুয়ো খেলতেন (তাঁর এই আসক্তি ছাড়িয়েছিল শুধু কবর), তখনও অনেকে আসত দেখাসাক্ষাৎ করতে — তাদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন, আর ঢাউস বইখানা 'Histoire des Finances pendand la Régence' ('রাজপ্রতিনিধিত্বের আমলে আর্থ ব্যবস্থার ইতিহাস') লিখতেন। বংশধরদের কাছে আত্মদোষ ক্ষালনের চেষ্টায় তিনি লিখেছিলেন এই বইখানা। সেটা প্রথম প্রকাশিত হয় দু'-শ' বছর পরে। ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন বিখ্যাত মঁতেস্ক্য — তিনি লোর সঙ্গে দেখা করেন ১৭২৮ সালে। তিনি লোকে দেখেছিলেন কিছুটা হতবুদ্ধি অবস্থায়, কিন্তু তবু নিজে সঠিক বলে সমানে দৃঢ়প্রত্যয়ী এবং নিজ ধ্যান-ধারণা প্রতিপাদন করতে প্রস্তুত। লো নিউমোনিয়া হয়ে মারা যান ১৭২৯ সালের মার্চ মাসে ভেনিসে।

লো এবং বিংশ শতাব্দী

তাঁর সমসাময়িকেরা মনে করতেন লো-র প্রণালীর বিকট অমিতাচারগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে না আর কখনও। কিন্তু তাঁদের ভুল হয়েছিল। লো-র প্রণালীটা ছিল একটা যুগের সমাপ্তি নয়, বরং সূচনা, কিংবা বলা ভাল অগ্রদূত। তাঁর কাজ-কারবারগুলো তখনকার দিনের মানুষের কল্পনাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল, কিন্তু উনিশ আর বিশ শতকের পুঁজিতন্ত্র যা খাড়া

করেছে সেটার সঙ্গে তুলনায় সেগুলোকে এখন মনে হয় যেন শিশুর খেলনা।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ধূর্ত পেরেইরা ভ্রাতৃদ্বয়ের কাজ-কারবার — প্যারিসের Crédit Mobilier জয়েন্ট-স্টক ব্যাঙ্কের আকারে বলা যেতে পারে যেন আবার জিইয়ে উঠল লো-র ধ্যান-ধারণা, তাঁর জেনারেল ব্যাঙ্ক আর মিসিসিপি কম্পানি। লোর প্রতিষ্ঠানগুলোয় যেমনটা ছিলেন রাজপ্রতিনিধি ফিলিপ সেই একই পৃষ্ঠপোষক এবং আয়োজকের ভূমিকা এই অতিকায় স্পেকুলেশনের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেন ৩য় নেপোলিয়ন। 'কাজ-কারবার বহুলীকরণের' জন্যে এবং ফ্রান্সের সমগ্র আর্থনীতিক উন্নয়নটাকে স্টক-এক্সচেঞ্জের ফটকাবাজির সাপেক্ষ করতে এই ব্যাঙ্ক কোন্ উপায়াদি প্রয়োগ করেছিল, এই প্রশ্ন তুলে তার উত্তরে মার্কস বলেছেন: 'আরে, লো যা প্রয়োগ করেছিলেন সেই একই,'* আর তারপরে তিনি সাদৃশ্যটার ব্যাখ্যা করেছেন আরও সবিস্তারে।

ফরাসী-প্রুশীয় যুদ্ধের ঠিক আগে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল Crédit Mobilier, কিন্তু ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে একটা নতুন যুগের ভিত্তি স্থাপন করল এই ব্যাঙ্কটা — শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট স্পেকুলেশন ব্যাঙ্ক সৃষ্টি করল, এইভাবে সেটা ছিল কিছুটা গুরুত্বসম্পন্ন ঐতিহাসিক ভূমিকায়। উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে গড়ে উঠেছিল প্রকান্ড-প্রকান্ড জয়েন্ট-স্টক কম্পানি, সেগুলো শিল্পের গোটা-গোটা শাখায় নিয়ামক অবস্থানে এসে গিয়েছিল; স্থাপিত হয়েছিল বিশাল-বিশাল ব্যাঙ্ক, আর সেগুলো মিলেমিশে গিয়েছিল শিল্পক্ষেত্রের একচেটেগুলোর সঙ্গে — এই সবকিছু থেকেই গড়ে উঠেছিল ফিনান্স পুঁজি।

তবে বলা যেতে পারে এটা ছিল 'গঠনমূলক' বিকাশ। অমিতাচারগুলো সম্পর্কে কথাটা কী? একদিকে লো-র মিসিসিপি অ্যাড্‌ভেঞ্চার, আর অন্য দিকে ব্যবসায়ীদের যে-জোটটা পানামা খাল কাটার জন্যে আট লক্ষ শেয়ারহোল্ডারের টাকা আদায় করে সেটা নিয়ে সরে পড়েছিল তাদের পেল্লায় স্পেকুলেশন — এই দুয়ের মধ্যে কোন্ তুলনাটা হতে পারে?

---

* Karl Marx, Friedrich Engels, 'Werke', Bd. 12, Berlin, 1969, S. 32.

'পানামা' (মস্ত জোচ্চুরি) শব্দটা লো-র আমলের 'মিসিসিপি' শব্দটার মতোই চালু হয়ে গিয়েছিল।

১৯২৯ সালে কুপোকাত হয়েছিল নিউ ইয়র্কের স্টক-এক্সচেঞ্জ, এটার সঙ্গে লো-র প্রণালী কুপোকাত হবার ব্যাপারটারই-বা কোন তুলনা হতে পারে? তেমনি, বিশ শতকের 'মহামুদ্রাস্ফীতি'তে টাকার দাম কমে গিয়েছিল কয়েক নিযুত গুণ (তৃতীয় দশকে জার্মানিতে, পঞ্চম দশকে গ্রীসে), সেটার সঙ্গে লো-র মুদ্রাস্ফীতির তুলনাই-বা করা যায় কেমন করে? সমসাময়িক পুঁজিতন্ত্রের পক্ষে মুদ্রাস্ফীতি সমস্যাটার গুরুত্ব বাড়িয়ে দেখান কঠিন। মুদ্রাস্ফীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির 'প্যাটার্ন', একটা স্থায়ী প্রলক্ষণ। এর দরুন বাড়ে আর্থনীতিক বাধা-বিঘ্নগুলো, সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয় প্রচন্ডতর, ঘটে কারেন্সির সংকট। জন লো-র কাগজী মুদ্রার অবচয়ের চেয়ে অতুলনীয় মাত্রায় জটিল এবং বহুমুখী ব্যাপার হল সমসাময়িক মুদ্রাস্ফীতি, তা তো বটেই। সমসাময়িক মুদ্রাস্ফীতি একটা সর্বাত্মক আর্থনীতিক প্রক্রিয়া, এটা অনেক সময়ে অতিরিক্ত কাগজী মুদ্রা ছাড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু সেটা ছাড়াও এটা ঘটে কখনও-কখনও। বহু ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির মূল কারক উপাদান হল দামবৃদ্ধি, যেটা 'অর্থ' দিকটার সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট নয়, সেটা পয়দা হয় অন্যান্য কারণে: একচেটের কোন কর্মনীতি, পণ্যদ্রব্যের ঘাটতি কিংবা বহির্বাণিজ্য পরিস্থিতি। কিন্তু সেক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণবৃদ্ধিটা বলা যেতে পারে দামের বেড়ে-চলা মাত্রায় 'ঠেকনো দেয়', সেটাকে পোক্ত করে দেয়, তার ফল আবার মুদ্রাস্ফীতিতে চাগান জোটে। অর্থের পরিমাণ এবং দামের মাত্রা, এই দুয়েতেই আধুনিক পরিবেশে দেখা দিয়েছে একটা একমুখো নমনীয়তা — উভয়েই শুধু চড়ে, পড়ে না কখনও। এই নিয়মটা জায়মান হয়েছিল লোর প্রণালীতেই।

যার আছে উদ্ভাবনশক্তি, কর্মক্ষেত্রের ব্যাপক পরিধি আর কর্মশক্তি এমন একজন আর্থ-পারদর্শী হিসেবে লো-র যে-ব্যক্তিত্ব সেটার 'পুনরাবৃত্তি' পরবর্তী ইতিহাসে ঘটেছে বহু বার। এমনসব মানুষ পুঁজিতন্ত্রের চাই; তাঁদের পয়দা করে পুঁজিতন্ত্র। তাঁরা কখনও-কখনও সত্যিকারের ব্যক্তি, যেমন ইসাক পেরেইরা কিংবা জন পিয়েরপন্ট মর্গান, নইলে তাঁরা কল্পিত চরিত্র, যেমন জোলার 'টাকা' উপন্যাসে স্টক-এক্সচেঞ্জের ধনকুবের সাক্কার, আর ড্রেইজারের আসুরিক এবং নির্বিকার অর্থপতি কাউপারউড্, ইত্যাদি।

অর্থশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠায় এবং বিকাশে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিল

লো-র আর্থনীতিক চালিতকর্ম এবং ধ্যান-ধারণা। এই বিজ্ঞানক্ষেত্রে সরাসর শিষ্য-চেলার জন্যে তাঁকে এক শতাব্দী কিংবা আরও বেশি কাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল বটে। পক্ষান্তরে, আঠার শতকে এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে অর্থশাস্ত্রের দেদীপ্যমান বিকাশ যদিও এগিয়েছিল অনেকাংশে লো-র ধ্যান-ধারণা থেকে, সেটা এগিয়েছিল সেগুলোকে বিপজ্জনক এবং হানিকর বিরুদ্ধবিশ্বাস হিসেবে বাতিল করে দিয়ে। কেনে, তিউর্গো, স্মিথ এবং রিকার্ডোর মত গড়ে ওঠার ব্যাপারে এই বাজে কথার বিরুদ্ধে সংগ্রামটা ছিল বিস্তর গুরুত্বসম্পন্ন। ফরাসী অর্থশাস্ত্রের বিকাশ বিশ্লেষণ করে মার্কস এই মন্তব্য করেন: 'ফিজিওক্র্যাসির উদ্ভবটা সংশ্লিষ্ট ছিল যেমন কল্‌বেরবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে, তেমনি বিশেষত জন লো-র প্রণালী নিয়ে শোরগোলের সঙ্গেও।'*

লো সম্পর্কে পণ্ডিতদের সমালোচনা ছিল প্রগতিশীল, সেটা চালিত হয়েছিল সঠিক অভিমুখে। বণিকতন্ত্রের সঙ্গে লো-র অনেক মিল ছিল, সেটার বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামের একটা উপাদান ছিল ওই সমালোচনা। লো নিশ্চয়ই খুবই পৃথক ছিলেন সাবেকী বণিকতন্ত্রীদের থেকে, যারা সমস্ত আর্থনীতিক প্রশ্নকে অর্থে এবং বাণিজ্য-স্থিতিতে পর্যবসিত করত। অর্থকে তিনি প্রধানত ধরতেন আর্থনীতিক উন্নয়ন প্রভাবিত করার একখানা হাতিয়ার হিসেবে। কিন্তু পরিচলনের বাহ্য ক্ষেত্রটা ছাড়িয়ে তিনি এগন নি, আর পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের জটিল শারীরস্থান আর শারীরবৃত্ত বুঝবার চেষ্টাটাও তিনি করেন নি। ঠিক এটাই করার চেষ্টা করেন বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের পণ্ডিতেরা।

আর্থিক কারক উপাদানগুলোর উপর নির্ভর করে লো স্বভাবতই নিজের সমস্ত আশা জড়িত করেছিলেন রাষ্ট্রের সঙ্গে। একেবারে শুরু থেকেই তিনি চেয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক, কিন্তু শুধু কোন-কোন সাময়িক বাধা-বিঘ্নের দরুনই বাধ্য হয়ে তিনি প্রথমে বেসরকারী ব্যাঙ্কের ব্যাপারে মত দিয়েছিলেন। তাঁর বাণিজ্যে একচেটে ছিল রাষ্ট্রের একটা অদ্ভুত উপাঙ্গ।

আর্থনীতিক কর্মনীতিতে লোর ধারাবাহিকতা ছিল না: যেগুলো অর্থনীতিকে ব্যাহত করছিল এমন কোন-কোন রাষ্ট্রীয় নিয়মন ব্যবস্থা তিনি লোপ করেছিলেন, কিন্তু তেমন অন্যান্য ব্যবস্থা চালু করেছিলেন

---

* কার্ল মার্কস, 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব', ১ম ভাগ, ৫৯ পৃঃ।

অবিলম্বে। পঞ্চাশ বছর পরে মন্ত্রিপদ নেন তিউর্গো — লোর ক্রিয়াকলাপ ছিল তাঁর থেকে একেবারেই পৃথক, সে বিষয়ে পরে বলা হবে। তিনি সামন্ততান্ত্রিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট ছিলেন, কিন্তু অর্থনীতিতে এমন রাষ্ট্রের স্থূল এবং দুর্ভর হস্তক্ষেপেরই বিরুদ্ধে লড়েছিলেন ফিজিওক্র্যাটরা এবং স্মিথ। এই বিষয়েও লোর চেয়ে বুয়াগিইবের ছিলেন তাঁদের অনেক কাছাকাছি।

তবে, ক্রেডিট থেকে পুঁজি পয়দা হয় বলে যে-ধারণাটাকে তুলে ধরে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন লো, সেটাকে বাতিল করে দিতে গিয়ে পণ্ডিতেরা উৎপাদন উন্নয়নে ক্রেডিটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটাকে খাটো করে ধরলেন। এটা হল কিনা সেই যাকে বলে ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন। অন্তত ক্রেডিট সম্পর্কে লো-র বিবেচনাধারা ঐ বিষয়ে রিকার্ডোর অভিমতের চেয়ে আগ্রহজনক, যদিও ক্ল্যাসিকাল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের সবচেয়ে মস্ত এই প্রবক্তার সঙ্গে মোটের উপর লো-র কোন তুলনা চলে না।

'স্বাভাবিক বিন্যাস'-এর পূর্বনির্দিষ্ট সমন্বয়ে, laissez faire-এর সর্বশক্তিমত্তায় লো বিশ্বাস করতেন না। এ বিষয়েও তিনি পুঁজিতন্ত্রের দ্বন্দ্ব-অসংগতিগুলো সম্পর্কে অবগতির পরিচয় দেন। এইসব দ্বন্দ্ব-অসংগতি প্রকোপিত হবার ফলেই বাধ্য হয়ে বুর্জোয়া বিজ্ঞান লো-র প্রতি সেটার মনোভাব পুনর্বিবেচনা করেছিল। লুই ব্লাঁ এবং ইসাক পেরেইরার আমলে লো-কে জাতে তোলা হয়েছিল, — তাঁকে জাতে তোলাটা সেই শেষ বার নয়। রাষ্ট্রীয়-একচেটে পুঁজিতন্ত্রের ভাবাদর্শবাদীরা, কেইন্সের অনুগামীরা লো-কে জাতে তুলছেন নতুন করে, অবশ্য ভিন্ন বিবেচনাধারা অনুসারে।

ক্রেডিট-ফিনান্স ক্ষেত্রের সাহায্যে অর্থনীতিতে প্রভাব খাটান, আর অর্থনীতিক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মস্ত ভূমিকা, — লো-র এই প্রধান দুটো ধারণাই এতে চমৎকার খাপ খেয়ে যায়। লো আর কেইন্সের মধ্যে সাদৃশ্য সম্পর্কে একজন আধুনিক লেখকের কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে এই পরিচ্ছেদের গোড়ার দিকে। এক্ষেত্রে এটাই একমাত্র আপাত-বেখাপ্পা উক্তি নয়। যেমন, 'John Law et naissance du dirigisme' ('জন লো এবং দিরিজিজ্‌ম-এর উৎপত্তি') নামে একখানা বই বেরিয়েছে ফ্রান্সে। 'দিরিজিজ্‌ম' হল রাষ্ট্রীয় আর্থনীতিক নিয়মনের ফরাসী নামান্তর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিতান্ত্রিক কম্পানি কিংবা ব্যক্তির উপর করাধানের হার বদলান চলতে পারে শুধু কংগ্রেসের মঞ্জুরি অনুসারে। এটা একটা

সাবেকী বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যাতে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা গণ্ডিবদ্ধ হয়ে যায়। এমন অবস্থা সম্পর্কে সরকারী আর্থনীতিক উপদেষ্টারা আজকাল খুবই অসন্তুষ্ট: করাধানের সাহায্যে মতলব হাসিল করাটা আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক আর্থনীতিক কর্মনীতিতে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, তাই তারা এটার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব পেতে চায়। এতে মনে পড়ে লো-র কথা; তখন ফ্রান্সে যেভাবে বিভিন্ন প্রশ্নের ফয়সালা করা যেত তাতে তিনি পুলকিত ছিলেন: 'এই দেশটির বরাত ভাল — এখানে কোন ব্যবস্থা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করে, নিষ্পত্তি করে সেটাকে বলবৎ করা যায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে, ইংলন্ডের মতো ২৪ বছর লাগে না।' ফ্রান্স ছিল স্বৈরাচারী নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র,আর শুধু সেই কারণেই সবকিছু করা যেত অত চটপট — এটা নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথা ছিল না।

অর্থের প্রাচুর্য এবং মুদ্রাস্ফীতির কল্যাণকর ভূমিকা সম্পর্কে লো-র ধারণা বারবার জিইয়ে তোলা হয়েছে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের বিভিন্ন ভাষ্যে। আর্থনীতিক সংকট, বেকারি এবং আর্থনীতিক মন্দার প্রতিবিধান তাঁরা করতে চান 'পরিমিত মুদ্রাস্ফীতির' সাহায্যে। তবে এই কর্মনীতি অনুসারে চললে এটার ফলে পয়দা হয় এটার নিজস্ব নানা তীব্র সমস্যা এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত। পশ্চিমে অর্থনীতিবিদের পেশাটা হল শয্যাশায়ী রুগ্ন পুঁজিতন্ত্রের পাশের ডাক্তারের মতো। রোগের উপসর্গগুলোকে মাঝে-মাঝে উপশমই বড়জোর করতে পারেন এইসব বদ্যি।

অ্যাডাম স্মিথ অবধি

পেটি থেকে অ্যাডাম স্মিথ অবধি শতবর্ষে অর্থনীতিবিজ্ঞান পার হল দীর্ঘ পথ: ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায় সেটার প্রথম-প্রথম অঙ্কুরগুলি থেকে একটা তন্ত্র হয়ে গড়ে উঠল; ছিল পৃথক-পৃথক, কখনও-কখনও এলোমেলো পুস্তিকাদি, সেগুলির জায়গায় এল বুনিয়াদী রচনা 'Wealth of Nations' ('জাতিসমূহের সম্পদ')। পরবর্তী শতকে, এমনকি তারও পরে আর্থনীতিক তত্ত্ব সম্পর্কে লেখা বিভিন্ন তত্ত্বালোচনার ধরনটাকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল এই রচনাটির মর্মবস্তু এবং আকার।

মার্কস লিখেছেন, 'বহু মৌলিক চিন্তাশীল মানুষে ভরা সেই কালপর্যায়টা* তাই অর্থশাস্ত্রের বিকাশ নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'** ইংলন্ডে অর্থশাস্ত্র সৌধটিকে ইঁটের উপর ইঁট সাজিয়ে গেঁথে তোলেন যেসব বিশিষ্ট পণ্ডিত আর লেখক তাঁদের শুধু অল্প কয়েক জনের কথাই অবশ্য আমরা সংক্ষেপে বলতে পারব। তাঁদের কিছু-কিছু ধ্যান-ধারণা কোন-কোন সমসাময়িক প্রশ্নের দৃষ্টিকোণ থেকেও আগ্রহজনক।

---

* মার্কস বলছেন ১৬৯১ থেকে ১৭৫২ সাল অবধি কালপর্যায়ের কথা: পেটির ভাব-ধারণা বিকশিত করা হয় লক্ এবং নর্থের রচনাগুলিতে, এইসব রচনা প্রকাশনের সময় থেকে স্মিথের কাছাকাছি পূর্বসূরি হিউমের প্রধান-প্রধান আর্থনীতিক রচনাগুলি বের হবার সময় অবধি।

** ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, 'অ্যান্টি-ড্যুরিং', মস্কো, ১৯৬৯, ২৮০ পৃঃ ('অ্যান্টি-ড্যুরিং'-এর ২য় ভাগের ১০ম পরিচ্ছেদ লিখেছিলেন কার্ল মার্কস)।

বলা যেতে পারে, নতুন যুগের বৃটেন গড়ে উঠেছিল আঠার শতকের প্রথমার্ধে। ভূস্বামী অভিজাতকুল এবং বুর্জোয়াদের মধ্যে শ্রেণীগত আপস মজবুত হয়ে উঠেছিল এই কালপর্যায়ে। উভয় শোষক শ্রেণীর স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে মিলেমিশে যাচ্ছিল। অভিজাতেরা হল বুর্জোয়া, আর বুর্জোয়ারা হল ভূস্বামী।

গড়ে উঠল একটা রাজনীতিক ব্যবস্থা, যেটা মূলত রয়ে গেছে একেবারে আজ অবধি, যেটা দুই শতাব্দী ধরে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতীকস্বরূপ। এই রাজনীতিক ব্যবস্থাটার বিভিন্ন অঙ্গ-উপাদান হল — পার্লামেণ্টারী রাজতন্ত্র, যাতে রাজা রাজত্ব করেন, কিন্তু শাসন করেন না; দুটো রাজনীতিক পার্টি, যা মাঝে-মাঝে একে অপরের জায়গায় ক্ষমতাসীন হয়; ব্যক্তিস্বাধীনতা, প্রকাশনের স্বাধীনতা এবং বাক্‌স্বাধীনতা, যা তখনকার ইউরোপে অভূতপূর্ব, যদিও তা বাস্তবিক কাজে লাগাতে পারত শুধু সমাজের বিশেষ-সুবিধাভোগী এবং ধনী অংশগুলো।

ভূস্বামীদের রক্ষণপন্থী পার্টি টোরি-রা, আর উপরতলার শিক্ষিত অভিজাত এবং শহুরে বুর্জোয়াদের উদারপন্থী পার্টি হুইগ্‌-রা শুরু করল তাদের অন্তহীন পার্লামেণ্টারী এবং নির্বাচনী লড়ালড়ি। শ্রেণীসংগ্রামের আসল কঠোর প্রশ্নগুলি থেকে 'নিম্ন শ্রেণীগুলি'কে ভিন্নমুখো করাই ছিল এইসব লড়ালড়ির একটা মস্ত কর্ম।

আগেকার শতকে রাজনীতিক সংগ্রামে যে-ধর্মীয় ছোপ ছিল সেটা অনেকাংশে কেটে গেল। সরকারী চার্চ অভ ইংলণ্ডের পাশাপাশি স্থাপিত হল কতকগুলি আগেকার পিউরিটান ধর্ম সম্প্রদায়; ইংলণ্ড হয়ে দাঁড়াল 'শতধর্মের দ্বীপ'। তবে বুর্জোয়া জাতিটির সামাজিক-আর্থনীতিক উন্নয়ন তাতে আটকায় নি। ইংরেজ ইতিহাসকার জ. ম. ট্রেভেলিয়ান যা বলেছেন: 'ধর্ম যখন জাতিটাকে বিভক্ত করল, বাণিজ্য সেটাকে করল ঐক্যবদ্ধ, আর বেড়ে চলছিল বাণিজ্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব। তখন বাইবেলের একটা প্রতিদ্বন্দ্বী হল খতিয়ান বহি।'*

---

* G. M. Trevelyan, 'English Social History', London, 1944, p. 295.

সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটল দ্রুত। উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপিত হল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এ আখ আর তামাকের বাগিচাগুলোর বাড়বাড়ন্ত হল। বিজিত হল ভারত আর কানাডা; বহু দ্বীপ আবিষ্কৃত হল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে। ইংলণ্ডের চালান যুদ্ধগুলো মোটের উপর সাফল্যমণ্ডিত হল। নৌ-বলে এবং বাণিজ্যে পৃথিবীর অবিসংবাদিত বৃহত্তম শক্তি হয়ে দাঁড়াল ইংলণ্ড। বিশেষত দাস-ব্যবসায়ে ইংরেজ বণিকদের ছিল একচেটে; প্রতি বছর বহু হাজার নিগ্রোকে তারা আমেরিকায় চালান করত।

এই সমস্ত প্রক্রিয়ার মূলে ছিল ইংলণ্ডের অর্থনীতিতে বিভিন্ন পরিবর্তন, তা তো বটেই। সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য যে, বদলে যাচ্ছিল গ্রামাঞ্চল, বদলে যাচ্ছিল ইংলণ্ডের কৃষি, — ঐ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন হচ্ছিল শিল্পোৎপাদনের চেয়ে তিনগুণ বেশি। জমি খাস করে নেওয়াটা এই সময়ে বিশেষত ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। ছোট কৃষকের জোত-জমা আর এজমালী জমি ক্রমে লোপ পেয়ে যাচ্ছিল, সেগুলো নিয়ে গড়ে উঠছিল বড়-বড় ভূসম্পত্তি, সেগুলো থেকে আলাদা-আলাদা জমি-বন্দ খাজনাবিলি করা হত ধনী খামারীদের কাছে। কৃষিতে আর শিল্পে উভয়ত পুঁজিতন্ত্র বিকাশে আনুকূল্য হয়েছিল তার ফলে।

যাদের ছিল না জমি কিংবা বিষয়-আশয় এমনসব মজুরি-করা মনিষদের শ্রেণীটা বড় হয়ে উঠল দ্রুত; খাটিয়ে হাত ছাড়া আর কিছুই ছিল না এদের। যেসব কৃষকের জমি কিংবা প্রাচীন আধা-সামন্ততান্ত্রিক রায়তিস্বত্ব খোয়া গিয়েছিল তারা, আর প্রতিযোগিতায় সর্বস্বান্ত হস্তশিল্পী এবং কারিগরদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই শ্রেণীটা। তবে আসল কারখানা প্রলেতারিয়েত তখনও ছিল 'নিম্ন শ্রেণীগুলি'র একটা নগণ্য অংশ। পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের মধ্যে ছিল 'বড় সাধের বিগত কালে'র বহু প্যাট্রিয়ার্কাল উপাদান আর জের। শিল্পক্ষেত্রের দাসত্বের বিভীষিকাগুলো তখনও দেখা দেয় নি।

অন্য প্রান্তে বেড়ে উঠছিল শিল্প-পুঁজিপতিদের শ্রেণীটা। তাতে শামিল হয়েছিল গিল্ডের ধনী ওস্তাদ কারিগর-মালিকেরা, বণিকেরা এবং ঔপনিবেশিক প্ল্যাণ্টাররা, যারা ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়েছিল তাদের বিদেশে রাশীকৃত ধন-দৌলত। উৎপাদনকে পুঁজির অধীন করাটা ছিল একটা জটিল প্রক্রিয়া: পুঁজিপতিরা গোড়ায় কুটিরশিল্পে অনুপ্রবেশ করেছিল পাইকার

হিসেবে এবং কাঁচামালের যোগানদার হয়ে, তারপর তারা স্থাপন করেছিল হস্তশিল্প কর্মশালা এবং কল-কারখানা।

এইভাবে শেষ হল ম্যানুফ্যাকচারের যুগ, অর্থাৎ শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে হস্তশিল্পোৎপাদনের যুগ। আগেকার আদিম ধরনের যন্ত্রপাতি দিয়েও শ্রমবিভাগ এবং শ্রমিকদের বিশেষিত বৃত্তির ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়তে পারল। যন্ত্রশিল্পের সবে সূত্রপাত হচ্ছিল তখন। সঙ্গে সঙ্গে কাছিয়ে আসছিল শিল্প বিপ্লব। শুরু হচ্ছিল মস্ত-মস্ত উদ্ভাবনের যুগ। আঠার শতকের চতুর্থ দশকে সুতোকাটা আর তাঁতবোনা যন্ত্রসজ্জিত করার প্রথম-প্রথম পদক্ষেপ করা হয়েছিল, আবিষ্কৃত হয়েছিল কোক্ দিয়ে লোহা বিগলন। ওয়াট স্টীম্ ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেন আঠার শতকের সপ্তম দশকে।

শিল্পোদ্যোগের জন্যে শিল্পপতিদের, বহির্বাণিজ্যের জন্যে বণিকদের, ঔপনিবেশিক যুদ্ধের জন্যে সরকারের পক্ষে ক্রেডিট আবশ্যক ছিল। দেখা দিল ব্যাঙ্ক আর জয়েন্ট-স্টক কম্পানিগুলো, প্রচন্ড প্রসার ঘটল সেগুলোর — তাতে জড়ো হল অর্থ-পুঁজি। জাতীয় ঋণ বেড়ে গেল বিস্তর। চালু হল সিকিউরিটি আর স্টক-এক্সচেঞ্জ। শিল্প আর বাণিজ্য ক্ষেত্রের পুঁজিপতিদের আয় হত প্রধানত লাভের আকারে, তাদের পাশাপাশি দেখা দিল পূর্ণ-ক্ষমতাশালী অর্থপতিরা, তারা উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে নিজেদের হিসসাটা পেত ঋণ থেকে সুদের আকারে।

পণ্য-অর্থ সম্পর্ক ইতোমধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল জাতির সমগ্র জীবনে। বাণিজ্যই শুধু নয়, উৎপাদনও অনেকাংশে হয়ে দাঁড়াল পুঁজিতান্ত্রিক। বুর্জোয়া সমাজের মূল শ্রেণীগুলি আরও স্পষ্ট পৃথক-পৃথক আকার ধারণ করল। বিভিন্ন সামাজিক ব্যাপারের ব্যাপক পরিসরে পুনরাবৃত্তির ফলে পুঁজি, লাভ, সুদ, ভূমি-খাজনা এবং মজুরি, ইত্যাদি বিষয়গত ধারণামৌল স্পষ্ট-নির্দিষ্ট হয়ে উঠল। এই সবকিছু তখন এমন অবস্থায় এল যাতে সেগুলি নিয়ে পর্যবেক্ষণ এবং বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ চালান যায়।

পক্ষান্তরে, তখনও সমাজে সবচেয়ে প্রগতিশীল শ্রেণী ছিল বুর্জোয়ারা। বেড়ে উঠছিল শ্রমিক শ্রেণী, সেটা বুর্জোয়াদের প্রধান প্রতিপক্ষ, তা তখনও লক্ষ্য করে নি বুর্জোয়ারা। এই দুইয়ের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম তখনও ছিল জায়মান অবস্থায়। ইংলন্ডে ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্র গড়ে ওঠার পরিবেশ সৃষ্টি হয় এইভাবে।

ড্যানিয়েল ডিফোর 'রবিনসন ক্রুসো' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৭১৯ সালে লন্ডনে। বইখানার ভাগ্য অসাধারণ। একদিকে সেটা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর মাস্টারপিস হিসেবে স্বীকৃত। অন্য দিকে, 'রবিনসন ক্রুসো' এবং অন্যান্য রবিনসনকান্ড সম্পর্কে বহু ভাষায় যেসব দার্শনিক, শিক্ষামূলক এবং রাজনীতিক-আর্থনীতিক সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি দিয়ে এখন একটা গোটা গ্রন্থাগার ভরিয়ে তোলা যায়।

কোন রবিনসনকান্ড হল কোন চিন্তাগুরু এবং লেখকের উদ্ভাবিত এমন পরিস্থিতি যাতে একটিমাত্র ব্যক্তিকে(কখনও-কখনও একদল লোককে) সমাজ-বহির্ভূত জীবনযাত্রা এবং কাজের পরিস্থিতিতে ফেলে দেওয়া হয়। বলতে পরেন এটা হল এমন একটা আর্থনীতিক প্যাটার্ন যাতে মানুষে-মানুষে সম্পর্ক, অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্ক থাকে না — থাকে শুধু বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সম্পর্ক প্রকৃতির সঙ্গে। মার্কস বলেছেন, রবিনসনকান্ড অর্থশাস্ত্রের মুনাসিব। তার উপর আরও বলা যেতে পারে, প্রাক্-মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রের চেয়ে মার্কসোত্তর বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের বেলায়ই কথাটা বেশি প্রযোজ্য।

ডিফো 'রবিনসন ক্রুসো' লিখেছিলেন প্রায় ষাট বছর বয়সে, অন্যান্য উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন আরও বেশি বয়সে — সেগুলির সাফল্য সত্ত্বেও জীবনের শেষ দিন অবধি ঐসব রচনাকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলেন। ডিফো মনে করতেন, তাঁর কলম দিয়ে পয়দা হয় যেসব বহু রাজনীতিক, আর্থনীতিক এবং ঐতিহাসিক রচনা সেগুলি তাঁকে যশস্বী করবে মৃত্যুর পরে। এমনসব বিভ্রম বিরল নয় সংস্কৃতির ইতিহাসে।

ডিফোর জীবনটাই ছিল অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনীর মতো। তাঁর জন্ম হয় ১৬৬০ সালে লন্ডনে (তারিখটা সম্পর্কে কিছুটা অনিশ্চয়তা আছে), আর সেখানেই তিনি মারা যান ১৭৩১ সালে। একজন খুদে পিউরিটান ব্যাপারীর ছেলে ডিফো জীবনে নিজের পথ করে নিয়েছিলেন তাঁর স্বভাবজ সামর্থ্য, কর্মশক্তি এবং বুদ্ধি-প্রতিভার কল্যাণে। রাজা ২য় জেমসের বিরুদ্ধে ১৬৮৫ সালের মনমেথ বিদ্রোহে অংশগ্রাহী হিসেবে তিনি বধ কিংবা কোন উপনিবেশে নির্বাসিত হবার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন

স্রেফ শুভ আপতিক ঘটনাচক্রে। বছর-তিরিশেক বয়সে ধনী বণিক ডিফো দেউলিয়া হয়ে যান ১৬৯২ সালে, তখন তাঁর দেনার পরিমাণ ১৭ হাজার পাউণ্ড।

এই সময়ে ডিফো রাজনীতিক পুস্তিকা লিখতে আরম্ভ করেন এবং ৩য় উইলিয়ম (প্রিন্স অভ্ অরেঞ্জ) আর তাঁর ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টাদের আস্থাভাজন হন। ১৬৯৮ সালে প্রকাশিত হয় 'Essay on Projects' ('প্রকল্প সম্পর্কে প্রবন্ধমালা') নামে অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর রচনা, এতে তিনি কতকগুলি সাহসিক আর্থনীতিক এবং প্রশাসনিক সংস্কার উপস্থাপন করেন।

বিরুদ্ধবিশ্বাসী পিউরিটানদের সপক্ষে চার্চ অভ্ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে একখানা পিত্তজ্বলানো কড়া পুস্তিকা লেখার জন্যে ডিফোকে প্রকাশ্যে উপহাসাস্পদ করে জেলে দেওয়া হয়েছিল ১৭০৩ সালে তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা মারা যাবার স্বল্পকাল পরেই। তিনি জেলে ছিলেন আঠার মাস, আর সেখানে লিখেছিলেন প্রচুর। জেল থেকে তাঁকে খালাস করেছিলেন টোরি পার্টির নেতা রবার্ট হার্লে। এর বিনিময়ে ডিফো তাঁর কলমটিকে — তাঁর কালের সেরা সাংবাদিকের কলমটিকে — একান্তভাবে নিয়োজিত করেন টোরি পার্টি এবং হার্লের নিজের সেবায়। হার্লের গুপ্ত এজেণ্ট হয়ে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপন কার্যভার নিয়ে গিয়েছিলেন স্কটল্যাণ্ডে এবং ইংলণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে।

রানী আন্-এর মৃত্যু এবং হার্লের পতনের ফলে ডিফোর কর্মজীবন হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। রাজনীতিক মানহানির দায়ে তাঁর আবার জেল হয়েছিল ১৭১৫ সালে। আবারও তিনি অশোভন কাজের ভার নিয়ে খালাস পান; নতুন সরকারের বিরুদ্ধবাদী পত্র-পত্রিকাগুলোকে ভিতর থেকে বানচাল করাই ছিল কাজটা।

'রবিনসন ক্রুসো'র যিনি লেখক সেই মানুষটির ছিল প্রচুর অভিজ্ঞতা। ইয়র্কের নাবিকটির অ্যাড্ভেঞ্চারের কাহিনীগুলিকে অমন প্রগাঢ় করে তোলে সেই অভিজ্ঞতাই। জীবনের শেষ দিনগুলি অবধি ডিফোর জিরেন কিংবা স্বস্তি জোটে নি। এটা বিশ্বাস করাই কঠিন যে, ষাট আর সত্তর বছর বয়সের মধ্যে কেউ লিখলেন কয়েকখানা বড় উপন্যাস, গ্রেট বৃটেনের আর্থনীতিক এবং ভৌগোলিক বর্ণনার একখানা ঢাউস বই, কতকগুলি ইতিহাস-সংক্রান্ত রচনা (তার মধ্যে রুশ সম্রাট ১ম পিটার সম্পর্কে একটা কাহিনী), দৈত্য-দানাতত্ত্ব আর ভোজবাজি (!) সম্পর্কে একগুচ্ছ বই, অতি বিবিধ বিষয়ে

বহুসংখ্যক ছোট প্রবন্ধ আর পুস্তিকা। 'A Plan of the English Commerce' ('ইংলণ্ডের বাণিজ্য সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা') নামে অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর বই প্রকাশিত হয় ১৭২৮ সালে।

রবিনসনকাণ্ড প্রসঙ্গে ফেরা যাক। বুর্জোয়া ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রের ভিত্তিমূলে ছিল স্বাভাবিক মানুষ-সংক্রান্ত ধারণাটা। মানুষ যেখানে হরেক রকমের নিগ্রাহী সম্পর্ক আর বাধা-নিষেধ দিয়ে দমিত-রুদ্ধ সেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের 'কৃত্রিমতা'র বিরুদ্ধে অজানত প্রতিবাদ থেকে দেখা দিয়েছিল এই ধারণাটা। তবে নতুন বুর্জোয়া সমাজের 'স্বাভাবিক' মানুষ, যে ব্যক্তিতাবাদী ঐসব সম্পর্ক থেকে মুক্ত হল, আর মানানসই হল অবাধ প্রতিযোগিতা এবং সম-সুযোগের জগতের পক্ষে, তাকে স্মিথ আর রিকার্ডো এবং তাঁদের পূর্বসূরিরা দেখেন নি দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিকাশের ফল হিসেবে, উলটে তাঁরা দেখছেন সেটার আরম্ভস্থল হিসেবে, সাকার 'মানব প্রকৃতি' হিসেবে।

পুঁজিতন্ত্রের অবস্থায় সামাজিক উৎপাদনক্ষেত্রে এই ব্যক্তিতাবাদীর আচরণের অর্থ করার চেষ্টায় তাঁরা 'স্বাভাবিক নিয়ম' সংক্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে সমাজের যথার্থ বিকাশের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত না করে সেটা করেছেন কল্পিত নিঃসঙ্গ শিকারী আর মেছুয়ার উপর। এটা অবশ্য ঠিক যে, এর অর্থ হল, একটা জনমানবশূন্য দ্বীপে গিয়ে-পড়া একটি মূর্ত রবিনসন ক্রুসোকে রূপক এবং বিমূর্ত একটাকিছুতে, প্রায়ই একেবারে রেওয়াজী একটাকিছুতে পরিণত করেন এইসব লেখক।

এইভাবে, উৎপাদন অনিবার্যভাবে সর্বদাই সামাজিক এবং ঐতিহাসিক বিকাশের কোন একটা নির্দিষ্ট পর্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এই উৎপাদনের নিয়মাবলিকে প্রধান কারক উপাদান সমাজটাকে বাদ দিয়ে কোন বিমূর্ত মডেলের ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণের একটা চেষ্টা হল এই রবিনসনকাণ্ড। ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রের রবিনসনকাণ্ডের খুবই প্রগাঢ় সমালোচনা করেছেন মার্ক্স। তিনি বলেছেন, এই ঝোঁকটা গিয়ে পড়ল মধ্য-উনিশ শতকের 'সর্বসাম্প্রতিক অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে': উন্নীত পুঁজিতন্ত্রের বিশেষক আর্থনীতিক সম্পর্কটাকে সেটা পেয়ে গেল কল্পিত 'স্বাভাবিক মানুষে'র জগতে, এতে সেটার খুবই সুবিধে। মার্ক্সের রচনা থেকে উদ্ধৃত করা যাক একটামাত্র বাক্য: 'সমাজ-বহির্ভূত একটি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির উৎপাদন — একটা বিরল ব্যাপার যা ঘটতে পারে জনশূন্য স্থানে আপতিকভাবে পড়ে

যাওয়া একটি সভ্য মানুষের বেলায়, যার **নিজের মধ্যে আগে থেকেই গতীয় ধরনে রয়েছে সামাজিক শক্তি** (বড় হরফ আমার — আ. আ.) — এটা হল যারা একত্রে বসবাস করে এবং কথাবার্তা বলে এমনসব মানুষ ছাড়াই কোন ভাষা গড়ে ওঠার মতো সমানই অসম্ভব আজগবি।'*

বড় হরফে দেওয়া অংশটা 'রবিনসন ক্রুসো'র আখ্যানবস্তু প্রসঙ্গে আগ্রহজনক। মনে করে দেখুন, রবিনসনের মধ্যে সামাজিক শক্তি এমন পরিমাণে রয়েছে যাতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে 'স্বাভাবিক মানুষ' থেকে দ্রুত বদলে গিয়ে হয়ে দাঁড়াল প্রথমে প্যাট্রিয়ার্কাল দাস-মালিক (ম্যান্ ফ্রাইডে), আর তারপর সামন্ত মনিব (উপনিবেশিত লোকসমষ্টি)। তার 'সমাজটা' বিকশিত হতে থাকলে সে পুঁজিপতি বনে যেতেও পারত।

রবিনসনকাণ্ডটা হল অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে বিষয়ীগত (সাবজেক্টিভ) সম্প্রদায়ের পক্ষে রীতিমতো একটা গুপ্তধনভাণ্ডার — এই সম্প্রদায়টা বিভিন্ন আর্থনীতিক ব্যাপার বিচার-বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করে ব্যক্তি-মানুষের অনুভব আর মানসতা অনুসারে। অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে এই মতধারাটা দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকের অষ্টম দশকে — এতে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হয় 'কণ-ব্যক্তি'র উপর। এতে রবিনসন ক্রুসোর চেয়ে উপযোগী কাউকে কল্পনা করা যায় না।

একটা নমুনাসই দৃষ্টান্ত হল অস্ট্রিয়ার বিষয়ীগত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বেম-বাভের্ক (১৮৫১-১৯১৪)-এর রবিনসনকাণ্ড। মূল্য-তত্ত্বে এবং পুঁজি সঞ্চয়ন তত্ত্বে নিজ যুক্তির আরম্ভস্থল হিসেবে রবিনসন ক্রুসোকে ইনি ব্যবহার করেছেন দু'বার।

সতর আর আঠার শতকের গ্রন্থকারেরা সেই তখনই বুঝতে পেরেছিলেন মূল্য একটা সামাজিক সম্পর্ক, সেটার অস্তিত্ব ঘটে শুধু যখন জিনিস উৎপাদন করা হয় পণ্য হিসেবে, সমাজের ভিতরে বিনিময়ের জন্যে। মূল্য-সংক্রান্ত ধারণাটাকে উদ্‌যাপনের জন্যে বেম-বাভের্কের মোট যা আবশ্যক সেটা হল যা তিনি নিজেই বলেছেন, 'কোন অক্ষত বনভূমিতে সমস্ত রকমের যোগাযোগব্যবস্থা থেকে দূরে অবস্থিত যার কাঠের ঘরখানা এমন একজন

---

* Karl Marx, 'Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie', Moskau, 1939, S. 6.

উপনিবেশিক'। এই রবিনসনের পাঁচ বস্তা শস্য আছে; এই শস্যের মূল্যের পরিমাপ হয় শেষ বস্তাটার উপযোগ দিয়ে।

যাদের হাতে আছে উৎপাদনের উপকরণ, আর সেটা থেকে বঞ্চিত যারা নিজেদের শ্রমশক্তি বেচে, শোষিত হয়: পুঁজি হল এই দুয়ের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক। সমাজ বিকাশের শুধু একটা বিশেষ-নির্দিষ্ট পর্বেই এটা দেখা দেয়। কিন্তু বেম-বাভের্কের বিবেচনায় সেটা হল স্রেফ কাজের যেকোন হাতিয়ার সেটার ভৌত আকারে। কাজেই রবিনসন যতকাল বুনো ফল তুলতে ব্যাপৃত ততকাল তার কোন পুঁজি থাকে না। কিন্তু যেই সে তার শ্রম-কালের একাংশ আলাদা করে নিয়ে সেই সময়ে নিজের জন্যে তৈরি করে তীর-ধনুক অমনি সে হয়ে দাঁড়ায় পুঁজিপতি: এই হল পুঁজি সঞ্চয়নের আদি কৃতি। এখানে দেখা যাচ্ছে, পুঁজি জমে উঠছে সহজ-সরল সঞ্চয়ের উপায়ে — সেটা কোন রকমের শোষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।

বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রে রবিনসনকাণ্ডের ঐতিহ্য এতই প্রবল যাতে রবিনসনের উল্লেখ না করে আর্থনীতিক তত্ত্ব সম্পর্কে কোন বই লেখা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমসাময়িক মার্কিন অর্থনীতিবিদ পল এ. স্যামুয়েলসন তাঁর লেখা পাঠ্যপুস্তক শুরু করেছেন এই সংশয়জনক কথাটা দিয়ে: রবিনসন যেসব আর্থনীতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল সেগুলো কোন প্রকাণ্ড সমাজের সমস্যাগুলো থেকে আমূল পৃথক নয়।

ডাক্তার ম্যাণ্ডেভিলের নানা বিরোধাভাস

লণ্ডনের যেসব কফি হাউসে আর বইয়ের দোকানে প্রায়ই যেতেন ডিফো সেগুলিতেই দেখা যেত আর একটি রংদার মানুষকে: ডাক্তার বার্নার্ড ম্যাণ্ডেভিল। তিনি ছিলেন প্র্যাক্টিস-ছাড়া ডাক্তার, গরিব মহল্লার বাসিন্দা, হুল্লোড়ে পানের আড্ডায় তিনি আনন্দ পেতেন, তাঁর নামডাকটা কারও মনে পরশ্রীকাতরতা জাগাবার মতো কিছু ছিল না। বলা হত, তাঁর চলত প্রধানত মদ-চোলাইকারী আর ভাটিখানার মালিকদের টাকায়, — কোহলঘটিত পানীয় পত্র-পত্রিকাদিতে সমর্থন করার জন্যে তারা তাঁকে টাকা দিত।

বার্নার্ড ম্যাণ্ডেভিলের জন্ম হয় হল্যাণ্ডে, ১৬৭০ সালে। ১৬৯১ সালে লিডেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার স্বল্পকাল পরেই তিনি চলে যান লণ্ডনে।

সেখানে তিনি বিয়ে করেন, স্থায়ী বাসিন্দা হন, তিনি হন একজন ইংরেজ প্রজা। তাঁর জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত বিশেষকিছু জানা নেই — তিনি লণ্ডনে মারা যান ১৭৩৩ সালে।

দার্শনিক এবং গ্রন্থকার হিসেবে ম্যাণ্ডেভিল বিখ্যাত হন একটামাত্র রচনার কল্যাণে। মাঝারি ধরনের ছন্দে তাঁর 'The Grumbling Hive, or Knaves Turn'd Honest' ('গজগজ-করা মউচাক, বা সাধু বনে-যাওয়া পাজি') নামে নাতিদীর্ঘ কবিতা অনামী প্রকাশিত হয় ১৭০৫ সালে। সেটাকে বড় একটা কেউ লক্ষ্য করে না। ১৭১৪ সালে ম্যাণ্ডেভিল একই কবিতা পুনঃপ্রকাশ করেন, সেটার সঙ্গে জুড়ে দেন একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ, সেটা গদ্যে। এবার সেটার নাম হয় 'Fable of the Bees or Private Viace, Public Benefits' ('মউমাছিদের উপাখ্যান, বা একান্তের অনাচার — সাধারণ্যে কল্যাণ')। এই নামে ম্যাণ্ডেভিলের বইখানা বিখ্যাত হয়েছে।

কিন্তু এই সংস্করণটাও মনে হয় কারও নজরে আসে নি। ১৭২৩ সালে প্রকাশিত হয় 'মউমাছিদের উপাখ্যান'-এর একটা নতুন সংস্করণ, তাতে ছিল 'A Search into the Nature of Society' ('সমাজের স্বধর্ম অন্বেষণ') এই জমকাল উপ-শিরনাম — শুধু এটাই পয়দা করে এমন প্রতিক্রিয়া, যা ম্যাণ্ডেভিল হয়ত আশা করেছিলেন। মিড্‌ল্‌সেক্সের গ্র্যাণ্ড জুরি সিদ্ধান্ত করল বইখানা একটা 'উৎপাত', সেটা নিয়ে গরম-গরম বাদবিতণ্ডা চলল পত্র-পত্রিকাগুলিতে, স্পষ্টতই খুশি হয়ে তাতে শামিল হলেন ম্যাণ্ডেভিল। বইখানার আরও পাঁচটা সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল সেটার লেখকের জীবনকালে। 'মউমাছিদের উপাখ্যান'-এর দ্বিতীয় খণ্ড তিনি প্রকাশ করেছিলেন ১৭২৯ সালে।

দুই শতকের সাহিত্যে ম্যাণ্ডেভিল সম্পর্কে উল্লেখের একটা লম্বা ফিরিস্তি আছে অক্সফোর্ডের স্মারক সংস্করণে। তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন মার্কস আর অ্যাডাম স্মিথ, ভল্টেয়র আর মেকলে, ম্যালথাস আর কেইন্স।

ইংলণ্ডে অর্থশাস্ত্র বিকাশের উপর, বিশেষত স্মিথ আর ম্যালথাসের উপর মস্ত প্রভাব পড়েছিল ম্যাণ্ডেভিলের (যদিও মজার কথা বটে, এই দু'জনেই তাঁকে সিনিক্ বলে ত্যাজ্য করেছিলেন!)। প্রধান-প্রধান ধারণামৌল (মূল্য, পুঁজি, লাভ, ইত্যাদি) বিস্তারিত করে তোলার ব্যাপারে ততটা নয়, যতটা কিনা ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের অবলম্বনস্বরূপ মূল দার্শনিক বিবেচনাধারার উপর পড়েছিল এই প্রভাবটা।

'একান্তের অনাচার হয়ে দাঁড়াল সাধারণ্যে কল্যাণ' — এই কথাটার মধ্যে রয়েছে এই কথাটার প্রধান কূটাভাস। 'অনাচার (vices) শব্দটার জায়গায় বিখ্যাত স্মিথীয় 'আত্মসিদ্ধি' (self-interest) শব্দটা বসালে পাওয়া যায় পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কে স্মিথের প্রধান উপস্থাপনাটা: প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে সংগত উপায়ে নিজ লাভের জন্যে চেষ্টা করতে দেওয়া হলে সমগ্র সমাজের সম্পদ এবং শ্রীবৃদ্ধির প্রসার ঘটে। 'The Theory of Moral Sentiments' ('নৈতিক অনুভব তত্ত্ব') বইয়ে স্মিথ ম্যাণ্ডেভিলের সমালোচনা করেন এইভাবে: 'মউমাছিদের উপাখ্যান'-এর লেখক যাবতীয় আত্মপরায়ণ প্রচেষ্টা আর কাজকর্মকে বলেন 'অনাচার' — শুধু এতেই তিনি ভ্রান্ত। আত্মসিদ্ধিকে আদৌ কোন অনাচার বলে ধরব না।

তবে অর্থনীতিবিজ্ঞানের ইতিহাসের পক্ষে ম্যাণ্ডেভিলের গুরুত্ব এতেই শেষ নয়। নিজ ব্যঙ্গ-রচনায় তিনি বুর্জোয়া সমাজের তীব্র সমালোচনা করেন; এই সমাজের মূল অনাচারগুলোকে যাঁরা সর্বপ্রথমে খুলে ধরেছিলেন তাঁদের একজন হলেন তিনি। এটাকেই বলা হয়েছে তাঁর 'অনৈতিকতা'। মার্কস বলেছেন, তিনি 'সৎ মানুষ, তাঁর চিন্তাধারা স্বচ্ছ'।*

মউচাকটা হল মানব-সমাজ, বরং বলা ভাল — ম্যাণ্ডেভিলের কালের বুর্জোয়া ইংলণ্ড। উপাখ্যানটার প্রথমাংশটা এই সমাজের বিদ্রূপাত্মক চিত্র, যা সুইফ্‌টের কলমে সাজে। এমন সমাজ বিদ্যমান থাকে, সেটার বাড়বাড়ন্ত হয়, 'তা শুধু সেটায় ভরা অসংখ্য অনাচার, অসংগতি এবং দুষ্ক্রিয়ার কারণে — এটাই কেন্দ্রী ভাবটা। এই সমাজে 'বাড়বাড়ন্ত' সম্ভব শুধু এই কারণে যে, লক্ষ-লক্ষ মানুষের '...ভাগ্যে শুধু কাস্তে আর কোদাল, আর যতসব হাড়ভাঙা খাটুনির কাজ, আর সেখানে হতভাগারা রোজ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে শরীর পাত করে খেতে পাবার জন্যে...'** কিন্তু তারা এই কাজ পায় শুধু এই কারণে যে ধনীরা আরামপ্রিয়, বিলাসপরায়ণ, তারা প্রচুর পয়সা খরচ করে হরেক রকম জিনিসের জন্যে, সেগুলো তাদের চাই প্রায়ই ফ্যাশন, খেয়ালখুশি, দেমাক, ইত্যাদির তাগিদে। অর্থগৃধ্নু মামলাবাজ

* কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ১ খণ্ড, মস্কো, ১৯৭২, ৫৭ পৃঃ।

** B. Mandeville, 'The Fable of the Bees. Or, Private Vices, Public Benefits. With an Essay on Charity and Charity-Schools. And a Search into the Nature of Society', 5th edition, London, 1728, p. 3.

উকিল-মোক্তার, হাতুড়ে বৈদ্য, কর্মকুণ্ঠ হাঁদারাম পাদরি, মারকুটে জেনারেল, এমনকি অপরাধীরা পর্যন্ত — এরা সবাই এই সমাজের পক্ষে অপরিহার্য, যেটা কাণ্ডজ্ঞানবিরুদ্ধ। কেন? কেননা তাদের কাজকর্ম থেকে হরেক রকম জিনিস আর সার্ভিসের চাহিদা পয়দা হয়, চাড় আসে শিল্পে, উদ্ভাবনে, কাজ-কারবারে।

এইভাবে এই সমাজে '...বিলাসব্যসন কাজ দিল নিযুত গরিবকে, জঘন্য দেমাক দিল আরও নিযুত জনকে। ঈর্ষা আপনিই, আর অহঙ্কার হল শিল্পে উপদেষ্টা, আর খাওয়া-দাওয়া আসবাবপত্র পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে শখের বাড়াবাড়ি আর চপলতা — এই উদ্ভট হাস্যকর অনাচার, যা তাদের বড়ই পেয়ারের সেটাই হল বাণিজ্য চালু রাখার চাকাটাই।'*

(এই প্রসঙ্গে আপনা থেকে মনে আসে দৃষ্টান্তস্বরূপ মার্কিন মোটরগাড়ি কম্পানিগুলোর কথা, তারা ফি বছর মডেল বদলায় কোন টেকনিকাল কারণে নয় একেবারেই, সেটা তারা করে খদ্দেরদের অসার দেমাক কাজে লাগিয়ে যেমন করে হোক বিক্রি বাড়াবার মতলবেই শুধু। ঐসব কম্পানির ডিরেক্টরেরা বলতে চাইলে ম্যান্ডেভিলের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে বলতে পারে যে, 'চপলতা' এবং মানুষের অন্যান্য দুর্বলতাই তাদের শিল্পের বাড়বাড়ন্তর ভিত্তি, আর সুপরিকল্পিতভাবে চাগিয়ে তোলা হয় এইসব দুর্বলতা।)

কিন্তু মউচাকে অনাচারের প্রাদুর্ভাবের দরুন গজগজ করছে মউমাছিরা, আর তাদের নালিশে-নালিশে ত্যক্তবিরক্ত জুপিটার হঠাৎ অনাচার হটিয়ে দিয়ে মউমাছিদের সাধু করে ফেললেন। অপচয়-অপব্যয়ের জায়গায় এল মিতব্যয়িতা। বিলাসব্যসন মিলিয়ে গেল, আর সমস্ত জিনিসের সাদাসিধে স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ-ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেল। পরোপজীবী পেশাগুলো লোপ করা হল। শোভিনিজম আর আগ্রাসী প্রবণতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে 'তারা কোন সৈন্য-সামন্ত রাখল না বিদেশে, অবজ্ঞাভরে হাসল পরদেশীর কাছে পাওয়া সভয়-সম্ভ্রম আর যুদ্ধে-পাওয়া ফাঁকা গৌরবের উদ্দেশে'।**

এককথায়, বিরাজ করতে থাকল মানব-সমাজের স্বাভাবিক সুস্থ

* B. Mandeville, op. cit. p. 10.

** ঐ, ১৮ পৃঃ।

নীতিগুলি। কিন্তু হায়-হায়! এরই ফলে সমাজের সর্বনাশ হল, ভেঙে পড়ল সমাজ — সেই চিত্র ম্যান্ডেভিল ফুটিয়ে তুললেন ছন্দে:

বাহারের মউচাকখানার দিকে মন দাও, দেখো,
সততা আর বাণিজ্যের বনিবনাও কি হয়?
জমজমাট তো গত, সেটার ভাবনা দ্রুত;
সেটার চেহারা দেখতে ষোল-আনা আর-এক,
গত, তা তো তারাই শুধু নয়, যারা খরচ
করত বছর-বছর অঢেল-অঢেল টাকা;
তাদের জন্যে খেটে খেত বহুতর জন,
তারাও নিরুপায় হয়ে গত দৈনন্দিন।
বৃথাই তাদের অন্য কাজে ছোটা,
সেখানেও সেই একই দশা, আর ধরে না...
রাজমিস্ত্রিদের গোটা পেশাই খতম,
ছুতোর কামার কুমোর পায় না কাজ,
পাথর-কাটা মজুর আর খোদাইকারের নামও করে না কেউ।'*

অর্থাৎ কিনা শুরু হল আর্থনীতিক সংকট: বেকারি বাড়ল, মাল জমে উঠল গুদামে-গুদামে, পড়ে গেল দাম আর আয়, বন্ধ হয়ে গেল নির্মাণকাজ। এ কোন্ সমাজ, যেখানে বাড়বাড়ন্ত ঘটায় পরোপজীবী, যুদ্ধবাজ, অমিতব্যয়ী আর পাজি-বদমাশেরা, আর শান্তিপ্রিয়তা, সততা, মিতব্যয়িতা আর সংযমের মতো পরম সদাচারগুলির ফলে ঘটে আর্থনীতিক বিপর্যয়!

নিজ ভাব-ধারণাগুলিকে ম্যান্ডেভিল গড়ে তুলেছিলেন অদ্ভুত, কূটাভাসের আকারে ('উপাখ্যান'-এর পরবর্তী গদ্যাংশে সেগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে অপেক্ষাকৃত যথাযথ ধরনে) — সেগুলি বিশেষত আগ্রহজনক হয়ে ওঠে পরবর্তী শতাব্দীর পর শতাব্দীতে অর্থশাস্ত্র বিকাশের কথাটা বিবেচনায় থাকলে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটো তথ্যের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

সমস্ত শ্রেণী আর বর্গই (ভূস্বামী, যাজক, আমলা, ইত্যাদি) উৎপাদী এবং আর্থনীতিক বিচারে আবশ্যক — এই ধারণাটাকে লুফে নিয়েছিলেন ম্যালথাস

* ঐ, ১৮-১৯ পৃঃ।

এবং তাঁর অনুগামীরা। 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব'তে অন্তর্ভুক্ত একখানা ছোট প্রচার পত্রে মার্কস ঐ অভিমতটাকে খণ্ডন করতে ব্যবহার করেছেন ম্যান্ডেভিলের ভাব-ধারণা, এমনকি তাঁর রচনাশৈলীও। মার্কস লিখেছেন: '...আগেই ম্যান্ডেভিল দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, সম্ভাব্য সমস্ত রকমের পেশাই উৎপাদী... তবে কিনা, বুর্জোয়া সমাজের কূপমণ্ডূক সাফাইদারদের চেয়ে নিশ্চয়ই ঢের-ঢের বেশি সাহসী এবং সৎ ছিলেন ম্যান্ডেভিল।'*

অতিরিক্ত মিতব্যয়িতা হানিকর, আর অনুৎপাদী ব্যয়, যেকোন রকমের অতিব্যয়ের ফলে যদি চাহিদা আর কর্মসংস্থান ঘটে তাহলে সেটা কল্যাণকর, এমনকি অত্যাবশ্যক, এমন ধারণাটাকে জিইয়ে তুলে তাতে মাহাত্ম্যদান করেছেন কেইন্স আমাদের একালে। ম্যান্ডেভিলকে (এবং ম্যালথাসকে) তিনি নিজের পূর্বসূরি বলে গণ্য করেন।

পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন অনাচার লক্ষ্য করতে চায় না বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র — সেটা উনিশ শতকের শেষাশেষি ম্যান্ডেভিলকে অসার বাক্‌চতুর এবং ধূর্ত কূটতার্কিক বলে গণ্য করে। মিতব্যয়িতাকে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে সবচেয়ে বড় সদগুণ হিসেবে তুলে ধরেন অ্যাডাম স্মিথ — সেটাকে সমালোচনা করার কথাটাও কারও মনে আসে নি। শুধু ১৯২৯-১৯৩৩ সালের বিশ্ব আর্থনীতিক সংকটের ফলেই প্রধান-প্রধান বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা ম্যান্ডেভিলের ধরনে ভাবতে শুরু করেন: লোকে সঞ্চয় করতে থাকলে তারা জিনিসপত্র কিনবে না, তার মানে 'ক্রয়ক্ষম চাহিদা' কমে যাবে; যেকোন উপায়ে, যেকোন ব্যাপারে লোককে টাকা খরচ করানো চাই।

ডাক্তার ম্যান্ডেভিলের কূটাভাসগুলো আড়াই-শ' বছরের বেশি কাল আগেকর বস্তু। কিন্তু যে-সমাজটাকে তিনি বৈচারিক দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করেছিলেন সেটার মতোই সেগুলো তাজা রয়েছে এখনও।

ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের গঠন প্রক্রিয়া

স্মিথের অন্যতম শিষ্য এবং বন্ধু ডাগাল্ড স্টুয়ার্ট ১৮০১ সালে এডিনবারো বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্রকে একটা পৃথক বিজ্ঞান হিসেবে অধ্যাপন করতে শুরু করেছিলেন, এটা সাধারণত স্বীকৃত। অর্থবিদ্যার

* কার্ল মার্কস, 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব', ১ম ভাগ, মস্কো, ১৯৬৯, ৩৮৮ পৃঃ।

অধ্যাপক তেমন সুপরিচিত ব্যক্তি হয়ে ওঠেন নি উনিশ শতকের আগে, যদিও যাঁরা আদৌ অধ্যাপক নন এমনসব ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ অবদান হয়ে আসছিল এই বিজ্ঞানক্ষেত্রে। সতর আর আঠার শতকে যেসব প্রতিভাশালী ব্যক্তি গড়ে তুলেছিলেন এই নতুন বিজ্ঞানটিকে তাঁদের ফেলা যায় তিনটে বর্গে।

এক, সংশ্লিষ্ট যুগের পক্ষে যা বিশেষক, প্রকৃতি আর সমাজের সেই সাধারণ ব্যবস্থার কাঠামের ভিতরে অর্থনীতি-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন যেসব দার্শনিক। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট হলেন ইংলণ্ডে টমাস হব্‌স, জন লক্‌, ডেভিড হিউম, এবং কিছু পরিমাণে অ্যাডাম স্মিথ, ফ্রান্সে হেলভেশিয়াস আর কঁদিয়াক, ইতালিতে বেক্‌কারিয়া।

তারপরের স্থানে পড়েন বণিক আর ব্যবসায়ীরা, যাঁরা বাণিজ্যের সংকীর্ণ কর্মক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে সামাজিক ক্ষেত্রে ঢুকে রাষ্ট্রপুরুষ হিসেবে ভাবতে চেষ্টা করেন। টমাস মান, জন লো, ডাড্‌লি নর্থ্‌ এবং রিচার্ড ক্যান্টিলনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে এক্ষেত্রে। ফ্রান্সে সেদেশের বিশেষক বিচারঘটিত এবং প্রশাসনিক শাখার প্রতিনিধি ছিলেন বুয়াগিইবের, তিউর্গো এবং গুর্নে।

শেষে, তৃতীয় বর্গে পড়েন বিভিন্ন পেশার বুদ্ধিজীবী সাধারণ মানুষ, যাঁরা কেউ-কেউ ঊর্ধ্বতন শ্রেণীতে উঠে গেছেন, কেউ-কেউ তা হন নি। মার্কস বলেছেন, উইলিয়ম পেটি, নিকলাস বার্বোন, বার্নার্ড ম্যান্ডেভিল, ফ্রাঁসোয়া কেনে, এইসব চিকিৎসাক্ষেত্রের মানুষ ছিলেন অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে চমৎকার অধ্যয়নকারী। এটা তো বোঝাই যায়, কেননা তখনকার কালে চিকিৎসাশাস্ত্রই ছিল একমাত্র বিশেষিত প্রকৃতি-বিজ্ঞান, সেটা আকৃষ্ট করত কর্মতৎপর চিন্তাশীল মানুষকে। আঠার শতকের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে দেখা যায় বিভিন্ন যাজককে: ফ্রান্সে আর ইতালিতে কোন-কোন মঠাধ্যক্ষ (তাঁদের মধ্যে প্রগাঢ় এবং মৌলিক চিন্তাশীল ইতালীয় অর্থনীতিবিদ ফার্নান্দো গালিয়ানি), আর ইংলণ্ডের কোন-কোন অ্যাংলিকান যাজক (টাকার, ম্যালথাস)।

এখানে বলা দরকার, এইসব বর্গ নিতান্তই রেওয়াজী, এগুলি দিয়ে বিভিন্ন ভাব-ধারণার বিকাশ নির্ধারিত হয় না, কিন্তু এই বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের জটিল প্রক্রিয়াটা বুঝতে সেগুলি সহায়ক।

কোন একটা আর্থনীতিক কর্মনীতিকে প্রতিপাদন কিংবা সমালোচনা করার ব্যবহারিক প্রয়োজনই অর্থনীতি বিষয়ে লেখার প্রধান প্রেরণা হয়ে

রয়েছে। তবু আঠার শতকের সপ্তম দশকে প্রকাশিত তিউর্গো এবং জেমস স্টুয়ার্টের রচনাগুলি সতর শতকে এবং আঠার শতকের গোড়ার দিককার বণিকতান্ত্রিক সাহিত্য থেকে খুবই পৃথক। ঐসব রচনা হল অর্থশাস্ত্রের মূল উপাদানগুলির প্রণালীবদ্ধ এবং তাত্ত্বিক উপস্থাপনার প্রথম-প্রথম চেষ্টা।

তাছাড়া, 'ব্যবহারিক প্রেরণা' দেখা দেয় নানা আকারে। কোন-কোন ক্ষেত্রে লেখকদের শ্রেণীস্বার্থ এবং তাঁদের নিজ-নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থের সপক্ষে সরাসরি যুক্তি তোলা হয় বই-পত্র-পত্রিকায়। অন্য কোন-কোন ক্ষেত্রে সেটা হল বিভিন্ন সামাজিক ব্যাপার নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অপেক্ষাকৃত প্রগাঢ় প্রক্রিয়া, তাতে শ্রেণীস্বার্থের বিষয়টাকে বিবেচনায় ধরা হয় শুধু একটা জটিল এবং মধ্যগ আকারে। বলা বাহুল্য, ক্ল্যাসিকাল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র যাঁরা গড়ে তোলেন তাঁরা শেষোক্ত ধরনের মানুষ। ধরা যাক অ্যাডাম স্মিথের কথা, তিনি বণিকও ছিলেন না, শিল্পপতিও না; 'জাতিসমূহের সম্পদ' বইয়ে তিনি যে অবাধ বাণিজ্য কর্মনীতি প্রতিপন্ন করেন সেটা থেকে নিজের কোন সুবিধে তিনি নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করেন নি। তাছাড়া, তাঁর জীবনে একটা আপাত বিরুদ্ধ ঘটনা এই যে, বইখানা বেরবার পরে তিনি একটা মোটা মাইনের চাকরি পান কাস্টম্‌স বিভাগে, যেটা হল তিনি যার বিরুদ্ধে লড়ছিলেন সেই ব্যবস্থাটার মূর্ত প্রতীক।

ম্যান্ডেভিলের বিরোধাভাসগুলোর জমক যা-ই হোক, ইংলন্ডে ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায় গড়ে ওঠার দিক থেকে তাঁর স্থান কিছুটা বিচ্ছিন্ন। সেটা গড়ে ওঠার ব্যাপারটা সর্বাগ্রে এবং সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট লক্ (১৬৩২-১৭০৪) এবং নর্থের (১৬৪১-১৬৯১) নামের সঙ্গে, এঁরা হলেন সরাসর পেটির উত্তরসূরি।

সতর শতকের সবচেয়ে বিশিষ্ট দার্শনিকদের একজন, সংবেদের বস্তুবাদী তত্ত্বের অন্যতম স্রষ্টা, বুর্জোয়া উদারনীতির জনক লক্ রয়েছেন অর্থনীতি বিজ্ঞানক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে — সেটা হল তাঁর ১৬৯৯ সালে প্রকাশিত 'Some Considerations of the Consequences of the Lowering of Interest and Rising the Value of Money' ('সুদ কমান এবং অর্থের মূল্য বাড়ানোর পরিণতি সম্পর্কে কিছু-কিছু বিচার-বিবেচনা') বইখানার কল্যাণে। তার সঙ্গে সঙ্গে, আঠার শতকের, এমনকি উনিশ শতকের গোড়ার দিককারও ইংলন্ডের অর্থশাস্ত্রের বনিয়াদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল লকের গোটা দার্শনিক ধ্যান-ধারণা। সমাজবিদ্যাক্ষেত্রে স্বাভাবিক

নিয়ম-সংক্রান্ত ভাব-ধারণা গড়ে তোলেন লক্ — এটা হল যেন প্রকৃতি বিজ্ঞানক্ষেত্রে নিউটনের অধিযন্ত্রবাদী বস্তুবাদের সমতুল গোছের। যা আগেই বলা হয়েছে, তখনকার কালের পক্ষে ঐসব ধ্যান-ধারণা ছিল প্রগতিশীল, কেননা সামাজিক ব্যাপারগুলোর ক্ষেত্রে সেগুলো চালু করেছিল বিষয়গত নিয়মের উপাদান। উদ্বৃত্ত মূল্য সম্পর্কে উপলব্ধির দিকে লকের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতিটা পর্যন্ত ঘটেছিল স্বাভাবিক নিয়মের দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি লিখেছেন, কেউ যতটা জমিতে চাষআবাদ করতে পারে নিজ শ্রমে ততটাই স্বভাবত হওয়া উচিত তার জমি, আর ততটাই হওয়া উচিত তার জিনিস (হয়ত অর্থ সমেত) যা তার নিজ ভোগ-ব্যবহারের জন্যে প্রয়োজন। কিন্তু সম্পত্তির বিলিব্যবস্থায় কৃত্রিম অসমতার ফলে কারও-কারও হাতে পড়ে বাড়তি জমি আর বাড়তি অর্থ; তারা ঐ জমি খাজনাবিলি করে, আর ধার দেয় ঐ টাকা। জমি বাবত খাজনা এবং সুদকে দুটো সমরূপ শোষণকর আয় বলে গণ্য করতেন লক্।

মৌলিক চিন্তাশক্তিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন ডাড্‌লি নর্থ্। একটি অভিজাত পরিবারের ছোট ছেলে নর্থ্ ছেলেবেলায় লেখাপড়ায় ক্ষমতার পরিচয় দেন এতই সামান্য যাতে তাঁকে লিভ্যান্ট কম্পানিতে একজন বণিকের শিক্ষানবিস করে দেওয়া হয়েছিল (টমাস মানের মতোই)। তাঁর বহু বছর কেটেছিল তুরস্কে; বছর চল্লিশেক বয়সে তিনি দেশে ফেরেন, তখন তিনি বড়লোক। তবে একজন লেখক বলেছিলেন, 'তাঁকে দেখাত বর্বরের মতো, বর্বরের চেয়ে বড় একটা বেশি সংস্কৃতি তাঁর ছিল না।' ২য় চার্লসের রাজত্বে টোরি প্রতিক্রিয়াশীলতার আমলে ১৬৮৩ সালে সিটি অভ্ লন্ডনের শেরিফ হয়ে নর্থ্ জালিম তুর্কী সৈনিকের আচার-ব্যবহারের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি রাজার খিদমত করেছিলেন বিশ্বস্তভাবে, মস্ত ক্ষতি করেছিলেন হুইগদের, সেজন্যে তাঁকে নাইট্ উপাধি দেওয়া হয়েছিল, তিনি হন সার ডাড্‌লি। এর পরে তিনি আরও কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু তাঁর আরও উন্নতির সম্ভাবনা পয়মাল করে ১৬৮৮-১৬৮৯ সালের বিপ্লব।

লকের পাণ্ডিত্যের ধরা যাক দশ ভাগের একভাগও না থাকলেও সার ডাড্‌লি যথাযথ এবং সাহসিক আর্থনীতিক চিন্তনে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন, তাতে কোন প্রামাণিক সূত্রকে মান্য করা হয় না। তাঁর ছোট্ট রচনা 'Discourse Upon Trade' ('বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা') হল সতর শতকে অর্থনীতি চিন্তনক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানগুলির একটি, সেটা

লেখা হয়েছিল লকের রচনাটি যখন সেই একই সময়ে, আর তাতে বিবেচিত হয়েছিল একই প্রশনগ্নলি।

যৌক্তিক বিমূর্তন হল অর্থশাস্ত্রের মূল বৈজ্ঞানিক প্রণালী — সেটা গড়ে তোলার ব্যাপারে নর্থ্ করেছিলেন অনেককিছ্ন: যেকোন আর্থনীতিক ব্যাপার সবসময়েই যারপরনেই জটিল, তাতে জড়িত থাকে অসংখ্য সম্পর্ক, এমন কোন ব্যাপারের বিশ্লেষণ করতে হলে সেটার সমস্ত গৌণ উপাদান আর সংযোগ উপেক্ষা করে সেটাকে লক্ষ্য করা চাই 'বিশন্দ্ধ আকারে।'

অর্থ-পর্নজি, যার থেকে সন্দ আসে, শন্ধন্ এই আকারেই নর্থ্ পর্নজি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেন, তা ঠিক, তবন্ পর্নজি সম্পর্কে উপলব্ধির দিকে প্রথম-প্রথম পদক্ষেপ করেছিলেন তিনিই। তিনি দেখিয়ে দেন যে, কোন দেশে অর্থের পরিমাণ দিয়ে ঋণ বাবত সন্দ নির্ধারিত হয় না (যা হয় বলে বণিকতন্ত্রীরা, এমনকি লক্ও মনে করতেন), সেটা নির্ধারিত হয় অর্থ-পর্নজির সঞ্চয়ন এবং সেটার জন্যে চাহিদার মধ্যে অনন্পাত দিয়ে। সন্দ সম্পর্কে ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয় এইভাবে, এরই থেকে পরে দেখা দিয়েছিল লাভ-সংক্রান্ত ধারণামৌল সম্পর্কে উপলব্ধি। অর্থ তত্ত্ব গড়ে তুলতেও নর্থ্ করেছিলেন অনেককিছ্ন।

তবে, বণিকতন্ত্রের তীব্র এবং বন্নিয়াদী সমালোচনা করেন নর্থ্, আর তিনি দৃঢ়ভাবে দাঁড়ান 'স্বাভাবিক স্বাধীনতা'র সপক্ষে — এটাই বোধহয় তাঁর সম্পর্কে সর্বপ্রধান কথাটা। সন্দের আবশ্যিক নিয়মনে (তাঁর আগে পেটি আর লকের মতো) তাঁর আপত্তিটাই সেটার কারণ। কিন্তু বণিকতন্ত্রের বিরন্দ্ধে লড়াইয়ে নর্থ্ ঐ দন্জনের চেয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এদিক থেকে তিনি হলেন অ্যাডাম স্মিথের অন্যতম সাক্ষাৎ পর্বসন্রি।

শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্ব ক্ষেত্রে লক্ কিংবা নর্থ্ কেউই পেটির চেয়ে এগিয়ে যান নি। তবে এটা ক্রমবিকশিত এবং প্রতিপন্ন হয়েছিল সতর আর আঠার শতকের বহন রচনার ভিতর দিয়ে — স্মিথের জন্যে জমিন প্রস্তুত হয়েছিল তাতে। শ্রমবিভাগ বাড়ল, দেখা দিল উৎপাদনের নতুন-নতুন শাখা, পণ্য-বিনিময়ের প্রসার ঘটল: লোকে প্রকৃতপক্ষে মানন্ষের চাপ-চাপ শ্রম বিনিময় করে, এই ধারণাটা বদ্ধমূল হয় এই সবকিছ্ন থেকে। কাজেই বিনিময়ের অনন্পাত, পণ্যের বিনিময়-মূল্য স্থির হওয়া চাই পণ্য উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণ দিয়ে। ক্রমেই আরও বেশি করে বোঝা যেতে থাকে যে,

বিভিন্ন উপযোগ-মূল্য হিসেবে সম্পদ সৃষ্টি করতে ভূমি এবং উৎপাদনের হাতিয়ারের নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে। কিন্তু মূল্য পয়দা করার সঙ্গে কোন সংস্রব থাকে না।

নানা ধ্যান-ধারণার তালগোল পাকান অবস্থার ভিতর দিয়ে এইসব ধারণা দানা বেঁধে উঠেছিল ধীরে, সেটা কঠিন হয়েছিল খন্বই। ভাব-ধারণা গড়ে তোলার এই কঠিন সংগ্রামটাকে নিজের মাথায় নতুন করে পরিচালনা করেন অ্যাডাম স্মিথ — নিচে আমরা সেটার বর্ণনা দেবার চেষ্টা করছি। মূল্য-তত্ত্ব ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে প্রধান-প্রধান পর্বসন্রিরা হলেন রিচার্ড ক্যান্টিলন, জোসেফ হ্যারিস, উইলিয়ম টেম্প্‌ল এবং জোসিয়া টাকার — এঁরা লিখেছিলেন আঠার শতকের চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ দশকের মধ্যে।

মূল্য-তত্ত্বটিকে একজন লেখক তুলে ধরেছিলেন অতি চমৎকার যথাযথ আকারে, তিনি স্মিথকে পর্যন্ত ছাপিয়ে যান কোন একটা দিক থেকে, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আমরা কিছ্নই বলতে পারছি নে, কেননা তিনি লিখেছিলেন 'অনামী ১৭৩৮'* নামে। সতর এবং আঠার শতকে অর্থনীতি বিষয়ে বহন রচনা প্রকাশিত হয়েছিল অনামী। সেগন্লির লেখকদের মধ্যে কারও-কারও পরিচয় স্থির করা হয়েছে অনেক আগেই; অন্য কারও-কারও বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না এই বিজ্ঞানক্ষেত্রে। 'অনামী ১৭৩৮' একটি ব্যতিক্রম, — চিত্রকলাক্ষেত্রের 'মেরি-র জীবন' কিংবা 'সেন্ট উর্সন্লার কাহিনী'র অজ্ঞাত শিল্পীদের সঙ্গেই তাঁর তুলনা হতে পারে।

'Some Thoughts on the Interest of Money in General' ('সাধারণভাবে অর্থ বাবত সন্দ সম্পর্কে দন্টো কথা') এই অনাড়ম্বর নামে তাঁর রচনা থেকে একটা বিশেষ গন্রন্ত্বপর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে। বিশ্লেষণে সন্বিধের জন্যে মন্তব্য দেওয়া হল ডানদিকের কলমে।

'জীবনীয় জিনিসগন্লোর যথার্থ এবং আসল মূল্য হল বিশ্বমানবের ভরণপোষণের জন্যে সেগন্লো যে-অংশটা দেয় সেটা সমানন্পাতিক;	লেখক এখানে প্রকৃত পক্ষে উপযোগ-মূল্যের সংজ্ঞার্থ দিচ্ছেন।

* এই ১৭৩৮ সালটা সম্পর্ণত প্রামাণিক নয়।

আর সেগুলোর একটা আর-একটার সঙ্গে বিনিময়ের সময়ে সেগুলোর মূল্য নিয়মিত হয় শ্রমের সেই পরিমাণটা দিয়ে যেটা অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং যেটা সাধারণত লাগে সেগুলো পয়দা করতে; বেচা-কেনার সময়ে সেগুলোর যা মূল্য বা দাম, যা তুলিত হয় একটা সাধারণ মাধ্যমের সঙ্গে, সেটা স্থির হয় প্রযুক্ত শ্রমের পরিমাণ দিয়ে, আর মাধ্যম বা সাধারণ মাপকটা কত বেশি বা কম প্রচুর সেটা দিয়ে। জল তো রুটি কিংবা মদ্যের মতো সমানই জীবনীয়, কিন্তু ঈশ্বরের হস্ত সেটাকে মানবজাতির উপর এতই প্রচুর পরিমাণে ঢেলে দিয়েছে যাতে প্রত্যেকে সেটা যথেষ্ট পেতে পারে অনায়াসে, তাই সাধারণত তার কোন দাম নেই; কিন্তু যখন এবং যেখানে কোন-কোন লোককে জল যোগাবার জন্যে শ্রম প্রযুক্ত হওয়া চাই সেক্ষেত্রে এই যোগানের জন্যেই প্রযুক্ত শ্রম বাবত পারিশ্রমিক দেওয়া চাই, যদিও জলের জন্যে নয়। আর সেই কারণে কখনও-কখনও এবং কোন-কোন জায়গায় এক-টন জল এক-টন মদ্যের সমান দামী হতে পারে।'*

বিনিময়-মূল্যের এমন একটা ধারণা দেওয়া হল যা উপযোগ-মূল্য থেকে একেবারেই পৃথক; এখানে জায়মান অবস্থায় রয়েছে সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রম-কাল সংক্রান্ত ধারণাটা।

দাম আর মূল্যের মধ্যে পার্থক্যটাকে লক্ষ্য করে লেখক বলছেন, অর্থের বাড়তি কিংবা কমতির প্রভাবে দামের তারতম্য হয়।

তথাকথিত 'মূল্যের আপাতবিরোধ' সম্পর্কে এই উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত থেকে বিনিময়-মূল্য ও উপযোগ-মূল্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটা দেখা যায়।

লেখক অতি নিশ্চিতভাবে বলছেন, মূল্য সৃষ্টি করে প্রকৃতি নয় — শুধু শ্রমই।

---

* R. L. Meek, 'Studies in the Labour Theory of Value', London, 1956, pp. 42-43 থেকে নেওয়া হয়েছে উদ্ধৃতিটা।

মূল্য-তত্ত্বের বিকাশ প্রসঙ্গে অগ্রগতি ঘটছিল অন্য কোন-কোন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও। জীবনধারণের জন্যে ন্যূনকল্পে যা আবশ্যক আখেরী বিচারে সেটা দিয়েই নির্ধারিত হয় জন-খাটানো শ্রমিকের মজুরি — পেটির এই ধারণাটাকে বিস্তারিত করতে গিয়ে অর্থনীতিবিদেরা এই ন্যূনকল্প পরিমাণটার ধরন সম্পর্কে উপলব্ধির আরও কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। যে-বন্দোবস্তে লোকবলের জনন ঘটে এমনভাবে যাতে শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে মজুরি কমে দাঁড়ায় কোন মতে জীবনধারণের উপযোগী ন্যূনকল্প মাত্রায় সেটার ব্যাখ্যা তাঁরা কিছু পরিমাণে দিয়েছিলেন জনসমষ্টি-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে।

বাণিজ্য আর শিল্প থেকে লাভ এবং ঋণ বাবত সুদের মধ্যে পার্থক্যনির্দেশ করা হল — এটা হল পুঁজি এবং পুঁজি থেকে আয় সম্পর্কে ব্যাখ্যার ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জোসেফ ম্যাসি এবং ডেভিড হিউম লিখেছিলেন আঠার শতকের ষষ্ঠ দশকে, সেই তখনই তাঁরা স্পষ্ট বুঝেছিলেন সাধারণ-স্বাভাবিক অবস্থায় সুদ হল লাভের একটা অংশ: অর্থপতির সঙ্গে, ঋণদাতা পুঁজিপতির সঙ্গে ভাগাভাগি করতে বাধ্য হয় বণিক আর শিল্পপতি।

এইভাবে স্মিথের আগেকার অর্থশাস্ত্রে উদ্বৃত্ত মূল্যের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে বাস্তবিকই, কিন্তু সেটার স্বধর্ম না বুঝে সেটাকে ধরা হয়েছে শুধু লাভ, সুদ, আর ভূমি-খাজনার বিশেষ-বিশেষ আকারে।

ডেভিড হিউম

হিউম তখন মৃত্যুশয্যায়, সেটা তিনি জানতেন, সেই সময়ে, ১৭৭৬ সালের মার্চ আর এপ্রিল মাসে তিনি তাড়াহুড়ো করে লিখেছিলেন নিজ জীবনকথা। তিনি বেঁচে ছিলেন আরও চার মাস। মৃত্যুর স্বল্পকাল পরেই প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মজীবনী, তাতে ছিল পঁচিশ বছর ধরে তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু অ্যাডাম স্মিথের লেখা সংক্ষিপ্ত ভূমিকা-পত্র। এই দার্শনিকের জীবনের শেষ ক'মাসের বর্ণনা দেন স্মিথ। মৃত্যুকালে হিউমের মনের শান্তি-স্বস্তি এবং অসাধারণ স্থৈর্য যা ছিল সেটা যেকোন জনের কাম্য হতে পারে। তিনি ছিলেন হাসিখুশি মিশুক মানুষ, তাইই তিনি থেকে গিয়েছিলেন শেষ

অবধি, যদিও মোটাসোটা মানুষটি জীবন্ত কঙ্কালে পরিণত হয়েছিলেন অসুস্থতার দরুন।

অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকায় এসেছিল স্মিথের পত্রখানা। হিউম নাস্তিক ছিলেন সেটা আগেই সবার জানা ছিল, আর তিনি মৃত্যুকালে ধর্মভীরু খিস্টান ছিলেন না, তাতে কোন সংশয়ের অবকাশ রাখা হয় নি এই পত্রে। স্মিথও ছিলেন একই মতের মানুষ।

যাজকতন্ত্রের রোষ বর্ষিত হল প্রয়াত হিউম এবং জিন্দা স্মিথের উপর। স্মিথের তখন সম্প্রতি প্রকাশিত 'জাতিসমূহের সম্পদ' প্রথমে লক্ষ্য করেছিল শিক্ষিত মানুষের শুধু একটা সংকীর্ণ মহল। হিউম আর স্মিথের নাম ঘিরে চলল প্রচণ্ড তর্জন-গর্জন, সেটা হল সাতে-পাঁচে-না-থাকা সাবধানী স্মিথের পক্ষে অপ্রত্যাশিত অপ্রীতিকর ব্যাপার, তবে বইখানার দিকে সর্বসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হল তার ফলে। বইখানার একের পর এক সংস্করণ প্রকাশিত হল; বছর দশেকের মধ্যে 'জাতিসমূহের সম্পদ' হয়ে দাঁড়াল ইংলণ্ডের অর্থশাস্ত্রে বাইবেল স্বরূপ।

তবে স্মিথের পথ হিউম সুগম করেন আরও একটা দিক থেকে। হিউমের সংক্ষিপ্ত, অতি সুরচিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল প্রধানত ১৭৫২ সালে। সেগুলিতে যেন বণিকতন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রামে স্মিথপূর্ব ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের সাধনসাফল্যগুলির সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হয়। 'জাতিসমূহের সম্পদ'-এর জন্যে মানুষের মন প্রস্তুত করায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিল এইসব প্রবন্ধ।

একটি গরিব অভিজাত পরিবারের ছোট ছেলে ডেভিড হিউমের জন্ম হয় ১৭১১ সালে এডিনবারোয়। জীবনে তাঁর পথ করে নিতে হয়েছিল নিজেকে, তাতে তিনি নির্ভর করেছিলেন প্রধানত পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার উপর। স্কটল্যাণ্ডের মানুষের চিরাগত সদগুণ কর্মিষ্ঠতা আর মিতব্যয়িতা তাঁর ছিল পূর্ণ মাত্রায়।

আটাশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় হিউমের প্রধান দার্শনিক রচনা 'Treatise of Human Nature' ('মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে নিবন্ধ'), সেটার কল্যাণেই তিনি পরে হয়ে দাঁড়ান আঠার শতকের সবচেয়ে বিশিষ্ট বৃটিশ দার্শনিকদের একজন। হিউমের দর্শন পরে অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism) বলে পরিচিত হয়। লকের মতো হিউমের মতেও ভৌত পদার্থ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের সর্বপ্রধান আকর হল সংবেদন, তবে তিনি মনে করতেন, সমগ্রভাবে

ধরলে এইসব বহিস্থ পদার্থ (বস্তু) শেষপর্যন্ত মূলত অজ্ঞেয়। বস্তুবাদ আর ভাববাদের মাঝামাঝি কোথাও একটা জায়গা বের করতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু জগৎ অজ্ঞেয় বলে যুক্তি তুলে তিনি চালিত হলেন ভাববাদেই, সেটা ছিল অনিবার্য। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর সমালোচনাটা তমসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান, কিন্তু তিনি অটল নাস্তিক ছিলেন না, বিজ্ঞান আর ধর্মের 'মিলজুলের' রন্ধ্রপথ রেখে দিয়েছিল তাঁর দর্শন।

হিউমের বইখানা গোড়ায় প্রতিষ্ঠালাভ করে না। বইখানার জটিলতাকে তার কারণ হিসেবে ধরে তিনি ছোট-ছোট প্রবন্ধ লিখে নিজ ভাব-ধারণাগুলিকে সাধারণ্যে প্রচার করতে লাগেন। তার উপর তিনি সমাজদর্শনে মন দেন। তিনি প্রথম সাফল্য পান রাজনীতিক এবং আর্থনীতিক রচনাগুলি থেকে, আর কয়েক খণ্ডে 'History of England during the Reigns of James I and Charles I' ('১ম জেমস এবং ১ম চার্লসের রাজত্বকালে ইংলণ্ডের ইতিহাস') লিখে তিনি যশস্বী হন সারা ইউরোপে। ইতিহাসকার হিসেবে হিউম সমর্থন করেন ভূস্বামীদের টোরি পার্টিকে; রক্ষণপন্থী বুর্জোয়ারাও ছিল সেটার সপক্ষে। মার্জিত বুদ্ধিজীবী, 'মেজাজে অভিজাত' হিউম 'হুইগ্ ইতরজন'কে অপছন্দ করতেন, দোকানদারদের স্থূলতা এবং পিউরিটানদের হাঁদামিকে তিনি দেখতেন অবজ্ঞার চোখে, আর 'টেমস নদীর পাড়ে অসভ্যরা' বলতেন লণ্ডনের ধনী অর্থপতিদের।

১৭৬৩-১৭৬৫ সালে হিউম ছিলেন প্যারিসে বৃটিশ রাষ্ট্র দূতাবাসের সেক্রেটারি। ভারি-ভারি লোকের বৈঠকখানায় তাঁর সমাদর ছিল; ফরাসী এনলাইটেনমেণ্ট-এর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তারপর তিনি লণ্ডনে চলে যান একটা কূটনৈতিক পদে। তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলি কেটেছিল এডিনবারোয় — ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব পণ্ডিত আর বিদ্বজ্জনদের মধ্যে।

বহু আগ্রহজনক ভাব-ভাবনা আর পর্যবেক্ষণ-উপাত্ত আছে অর্থনীতি বিষয়ে হিউমের রচনাগুলিতে। যেমন, চলতি অর্থের পরিমাণ বাড়ার দরুন দাম বাড়ে যে-প্রক্রিয়ায় সেটাতে আগে-পাছের ব্যাপার থাকে, এটা বর্তমান আর্থনীতিক ভাষায় বলেন মনে হয় সর্বপ্রথমে তিনিই। হিউম বিশেষত লক্ষ্য করেছিলেন যে, সমস্ত পণ্যের দামের মধ্যে 'শ্রমের দাম' অর্থাৎ শ্রমিকের মজুরি বাড়ে সবার শেষে। কাগজী-মুদ্রাস্ফীতির সময়ে ঘটে যেসব সামাজিক

আর আর্থনীতিক প্রক্রিয়া সেগুলো বুঝতে এইসব গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম সহায়ক।

সোনা আর রুপো স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন দেশের মধ্যে বণ্টিত, আর প্রত্যেকটা দেশের বাণিজ্য-স্থিতি শেষপর্যন্ত সুস্থির হতে চায় স্বভাবতই, এই ধারণা আঠার শতকে সবচেয়ে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে তোলেন হিউম। গোটা ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের যা বিশেষক সেই স্বাভাবিক স্থিরতা-সংক্রান্ত ধারণাটা জোরালভাবে প্রকাশ করা হয়েছে হিউমের লেখায়। বহুমূল্য ধাতু কৃত্রিমভাবে টেনে এনে ধরে রাখা যেটার কর্মনীতি সেই বণিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে হিউমের সমালোচনার ভিত্তি হল ঐ ধারণাটা। বাণিজ্য (যথাযথভাবে বললে, লেনদেন)-স্থিতি সুস্থির হবার দিকে চলার স্বাভাবিক প্রবণতা-সংক্রান্ত ধারণাটাকে আরও বিস্তারিত করে তোলেন রিকার্ডো। তাঁর সম্বন্ধে পরিচ্ছেদে কথাটা আবার তোলা হবে।

তবে হিউমের সঠিক পর্যবেক্ষণও অর্থ সম্পর্কে এমন ব্যাখ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল যেটা শ্রমঘটিত মূল্য-তত্ত্বের সঙ্গে মেলে না। ফরাসীদের মতো হিউমও চালিয়ে যান কোন মূল্য-তত্ত্ব ছাড়াই; এটা হতে পারে তাঁর দার্শনিক অজ্ঞেয়বাদ এবং সন্দেহবাদের ফল।

অর্থ সম্পর্কে মাত্রিক তত্ত্বের অন্যতম প্রবর্তক হিসেবেই হিউম প্রথমত পরিচিত অর্থশাস্ত্র ক্ষেত্রে। হিউম এবং অন্যান্য যাঁরা অনুরূপ বিভিন্ন অভিমত তুলে ধরেন তাঁরা যাকে বলা হয় দামের বিপ্লব সেই ঐতিহাসিক ব্যাপারটা ধরে চলেছিলেন। ষোল থেকে আঠার শতকে ইউরোপে সোনা আর রুপো স্রোতের মতো ঢেলে পড়ার পরে সেখানে পণ্যের দামের মাত্রা ক্রমে বেড়ে গিয়েছিল। হিউমের হিসাবে দাম বেড়েছিল গড়ে তিন-চার গুণ। যেটাকে মনে হয়েছিল স্পষ্টপ্রতীয়মান সেই সিদ্ধান্তই হিউম করেছিলেন সেটা থেকে: দাম বেড়েছিল বেশি অর্থ (সত্যিকারের ধাতব মুদ্রা!) ছিল বলে।

তবে কথায় বলে, বাহ্য ভঙ্গি লোক ঠকায়। কেননা এই প্রক্রিয়ার গোটা ধারাটার ভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে, আর তা হওয়াই চাই। প্রচুর পরিমাণ নানা বহুমূল্য ধাতুর বিভিন্ন খনি আবিষ্কৃত হবার ফলে ঐসব ধাতু নিষ্কাশনের শ্রমব্যয় কমে গিয়েছিল, কাজেই কমেছিল সেগুলোর মূল্যও। যেহেতু পণ্যের সঙ্গে তুলনায় অর্থের মূল্য পড়ে গিয়েছিল, তাই বেড়েছিল পণ্যের দাম।

হিউম ভেবেছিলেন, পরিচলনে সত্যিকারের ধাতব অর্থের পরিমাণ যা-ই হোক, যেখানে গাদা-গাদা অর্থের সামনে পড়ছে রাশি-রাশি পণ্য সেই

পরিচলন প্রক্রিয়ার মধ্যে অর্থের 'মূল্য' (আরও সহজ কথায় পণ্যের দাম) নির্দিষ্ট হয়ে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে, অর্থ আর পণ্য দুয়েরই পরিচলনে পড়ার সময়ে একটা মূল্য থাকে যা সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রমব্যয় দিয়ে আগেই ধার্য হয়ে যায়। কাজেই অর্থ লেনদেনের কোন নির্দিষ্ট বেগ যা থাকে তাতে চালু হতে পারে শুধু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ। যাকিছু বাড়তি সেটা চলে যাবে বিদেশে কিংবা চোরাই মজুতে।

কাগজী মুদ্রার ব্যাপারটা আলাদা। সেটা পরিচলনের বাইরে চলে যেতে পারে না কখনও। কাগজী মুদ্রার প্রত্যেকটা ইউনিটের ক্রয়ক্ষমতা বাস্তবিকই নির্ভর করে (অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে সঙ্গে) ঐ মুদ্রার মোট পরিমাণের উপর। সত্যিকারের ধাতব অর্থ পরিচলনের জন্যে যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি কাগজী মুদ্রা ছাড়া হলে সেগুলো অবচিত হয়ে যায়। যা সবার জানা কথা, এটাকে বলে মুদ্রাস্ফীতি। সোনা আর রুপো নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হিউম বস্তুত কাগজী মুদ্রা পরিচলন ব্যাপারটার বর্ণনা দিচ্ছিলেন।

হিউমের অবদানটা হল এই যে, যেসব প্রশ্ন অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে এখনও সেগুলোর প্রতি তিনি মনোযোগ আকর্ষণ করেন: পরিচলনের জন্যে আবশ্যক অর্থের পরিমাণ স্থির করা যায় কিভাবে? দামের উপর অর্থের পরিমাণের প্রভাব পড়ে কিভাবে? কারেন্সির অবচয় ঘটলে দাম গড়ে ওঠার বিশেষত্ব কি?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ফ্র্যাঙ্কলিন এবং সাগরপারের অর্থশাস্ত্র

আঠার শতকের সর্বশেষ মস্ত-মস্ত সর্বতোমুখ চিন্তাবীরদের একজন হলেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে রাশিয়ায় লমনোসভ, ইংলণ্ডে নিউটন এবং ফ্রান্সে দেকার্তের মতো মহা-মহা পথিকৃতের ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে উত্তর আমেরিকায় ফ্র্যাঙ্কলিনের ভূমিকাটিকে। পদার্থবিজ্ঞানী এবং আধুনিক বিদ্যুৎবিজ্ঞানের অন্যতম প্রবর্তক; দার্শনিক এবং লেখক, যিনি নিজ কালের সমাজ সম্পর্কে নতুন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিবেচনাধারা-টাকে ব্যক্ত করেন নিজস্ব মৌলিক ধরনে; রাজনীতিক এবং সামাজিক কর্মী, আর আমেরিকার বিপ্লবে এবং স্বাধীনতার জন্যে এই নতুন রাষ্ট্রের সংগ্রামে সবচেয়ে র‍্যাডিকাল নেতাদের একজন: এই বিখ্যাত আমেরিকান, যিনি পুস্তকমুদ্রণকেই নিজের প্রধান পেশা বলে গণ্য করতেন, তাঁর ক্রিয়াকলাপ আর আগ্রহের ক্ষেত্রগুলির খুবই অসম্পূর্ণ তালিকা এটা।

নিজ দার্শনিক এবং রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপের চৌহদ্দির ভিতরে ফ্র্যাঙ্কলিন লিখেছেন অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কেও। তিনি হলেন নিউ ওয়ার্ল্ডে (পশ্চিম গোলার্ধে) অর্থনীতি চিন্তনের অন্যতম পথিকৃৎ।

জীবন এবং রচনাবলি

ফ্র্যাঙ্কলিনের আত্মজীবনীখানা তাঁর যুগের একখানা অসাধারণ ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক দলিল। উনআশি বছর বয়সে লেখা একটা পরিচ্ছেদে তিনি বলেছেন নিজ জীবনের সুখ-তৃপ্তির কথা। তাঁর জীবনটা দীর্ঘ এবং সুখেরই ছিল বটে। নাগরিক, বিদ্বজ্জন এবং পারিবারিক মানুষ

হিসেবে তিনি সুখী ছিলেন। উত্তর আমেরিকার স্বাধীনতার জন্যে তিনি একান্তভাবে নিয়োগ করেছিলেন জীবনে গোটা দ্বিতীয়ার্ধটাকে — সেই কর্মব্রতের পূর্ণ বিজয় তিনি দেখে গেছেন। বিজ্ঞানে তাঁর অবদানগুলি স্বীকৃত হয় সারা পৃথিবীতে। ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর একমাত্র ছেলে উইলিয়ম সমর্থন করেছিলেন বাবার এবং স্বদেশের শত্রুদের, এই ব্যাপারটা বাদ দিলে তিনি সুখী ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনেও।

গরিব শিক্ষানবিস থেকে শুরু করে ফ্র্যাঙ্কলিন জীবনের শেষাশেষি খুব ধনী না হলেও বেশ সচ্ছল ছিল তাঁর অবস্থা। তাঁর ছিল কয়েকটা বাড়ি এবং কয়েক বন্দ জমি। তখনকার দিনে, বিশেষত আমেরিকায় সেটা ছিল সবচেয়ে দরকারী রকমের সম্পদ।

ফ্র্যাঙ্কলিন ছিলেন পশ্চিম গোলার্ধের মানুষ, যেখানে — মার্কসের ভাষায় — 'উৎপাদনের বুর্জোয়া সম্পর্ক সেটার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমদানি হয়ে দ্রুত অঙ্কুরিত হল এমন মাটিতে যাতে ইতিহাসক্রমিক রেওয়াজের অভাব পূরণ হল হিউমস-এর অঢেল প্রাচুর্য দিয়ে'।*

ইংলণ্ড থেকে গিয়ে প্রথমে যারা বসতি করেছিল তাদের বেশির ভাগ ছিল পিউরিটান, তারা চলে গিয়েছিল ধর্মীয় আর রাজনীতিক নির্যাতন এড়াবার জন্যে — তাদের বংশধরেরা অহল্যাভূমিতে চাষআবাদ করল, আর অচিরে নানা হস্তশিল্প চালু করল শহরে-শহরে। তবে ধনদেবতার পূজারী হিসেবে তারা স্পেনীয় বিজেতাদের চেয়ে কম ছিল না — যদিও ভিন্ন ধরনে।

ব্যক্তিস্বাধীনতা, নির্বাচিত কর্তৃপক্ষ এবং স্বাধীন বিচারব্যবস্থার নীতিগুলির সপক্ষে দাঁড়িয়ে তারা গড়ে তুলল ইতিহাসে সবচেয়ে আগেকার এবং সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ বুর্জোয়া গণতন্ত্র। তবে এটা এমন গণতন্ত্র যাতে আইনের দৃষ্টিতে আনুষ্ঠানিক সমানতা হল আর্থিক এবং রাজনীতিক অসমতার উপর আবরণ, আর যাতে দমন করা হয় বেরেওয়াজী বিশ্বাস।

ইয়াঙ্কিদের ছিল না জরাজীর্ণ সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতসম্প্রদায়; পদবি-খেতাব আর পারিবারিক বিশেষাধিকারে তারা টিটকারি দিত। হার্মান মেল্‌ভিলের 'ইজরাইল পটার' উপন্যাসের নায়ক একজন মার্কিন খামারী, নাবিক, সে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডে যায়, সেখানে রাজা ৩য় জর্জকে সম্বোধন করতে গিয়ে তার মুখে 'ইওর ম্যাজেস্টি' আসে

---

* কার্ল মার্কস, 'অর্থশাস্ত্রের পর্যালোচনা নিবন্ধ', মস্কো, ১৯৭০, ৫৫ পৃঃ।

না, কিংবা সে 'সার' বলতে পারে না রাজার সভাসদদের। তবু পেনসিলভানিয়ার ধনী ভূস্বামীরা এবং ম্যাসেচুসেটসের বণিকেরা কম উদ্ধত ছিল না ইংরেজ লর্ডদের চেয়ে।

পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে তুলনায় আমেরিকা ছিল ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সহিষ্ণুতার দিক থেকে ঈপ্সিত ভূমি। তবু ফ্র্যাঙ্কলিনের জন্মের অল্প কয়েক বছর আগেও তাঁর নিজ শহর বস্টনের খুব কাছেই সালেমে 'ডাইনীদের' বিচার করে বধ করা হত। বিভিন্ন ধর্মের অনুগামীরা জীবনযাপন করত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, বহু ক্ষেত্রেই তারা ছিল যাজকদের এবং যাজকপল্লীর ধনী বাসিন্দাদের নির্মম স্বৈরাচারের অধীন। ধর্মীয় ভণ্ডামিতে ইংরেজদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল ইয়াঙ্কিরা। জাতীয় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে এই সর্বপ্রথম সংগ্রামীরা নিজেরাই আমেরিকার আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের উচ্ছেদ করেছিল, দাসপ্রথা কায়েম করেছিল দক্ষিণ প্রদেশগুলিতে।

খামারী আর হস্তশিল্পীদের এই পরিবেশের মানুষ ফ্র্যাঙ্কলিন; তারা মূলত ছিল স্বাধীনতাপ্রিয়, সাহসী, কর্মিষ্ঠ। উন্নয়নশীল জাতিটির যাকিছু ছিল সবচেয়ে সেরা তা তিনি আরত্ত করেছিলেন। তবে তাঁর জাতির বুর্জোয়া দ্বন্দ্ব-অসংগতিগুলোও প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর ব্যক্তিত্বে। ধন-সম্পদ আর ক্ষমতার প্রতি সম্ভ্রমের সঙ্গে প্রগাঢ় গণতান্ত্রিকতা সংযুক্ত হয়েছিল তাঁর চরিত্রে। তিনি ধর্মীয় আপ্তবাক্য এবং আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু 'দৃষ্টান্তস্বরূপ ঈশ্বর অস্তিমান, তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা, নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তিনি জগৎটাকে চালান, তাতে সংশয় হয় নি কখনও' তাঁর, এটা ফ্র্যাঙ্কলিনের নিজেরই উক্তি। ফ্র্যাঙ্কলিন ছিলেন দাসপ্রথার দুশমন, জাতীয় মুক্তির জন্যে যোদ্ধা, তবু অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির বিশেষ নিয়তিনির্দিষ্ট কর্মে তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি ছিলেন সাদাসিধে মানুষ, লোকে তাঁকে পছন্দ করত, কিন্তু তাঁর কথা যারা শুনত, তাঁর লেখা যারা পড়ত তাদের কখনও-কখনও মনে হত তিনি সংকীর্ণ পণ্ডিতিগিরি করেন, মামুলি নৈতিকতা আওড়ান।

বস্টনে সাবান আর মোমবাতির একটা কারখানার পিউরিটান মালিকের প্রকাণ্ড পরিবারে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের জন্ম হয় ১৭০৬ সালে। তিনি প্রণালীবদ্ধভাবে শিক্ষা পান নি, তিনি স্বয়ংশিক্ষিত মানুষ, সেটা পেটির চেয়েও বেশি পরিমাণে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দু'বছর পড়ার পরে ছেলেটিকে তার বড় সৎভাইয়ের ছাপাখানায় শিক্ষানবিসিতে ভরতি করা হয়। ফ্র্যাঙ্কলিন

লিখেছেন: '...আমার ভাই ছিলেন বদমেজাজী, তিনি আমাকে মারতেন প্রায়ই, তাতে আমি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হতাম। আমার মনে হয়, আমার প্রতি তাঁর কর্কশ এবং জালিমী ব্যবহারের দরুন হয়ত স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা সম্বন্ধে বীতরাগ সৃষ্টি করেছিল আমার মনে, আর সেটা আমার মাঝে এ'টে রয়েছে সারা জীবন ধরে।'*

এই বছরগুলিতে গড়ে উঠেছিল ফ্র্যাঙ্কলিনের চরিত্রের অন্যান্য বিশেষত্ব: কর্মশক্তি আর প্রয়াসপ্রবৃত্তি, অসাধারণ অধ্যবসায় এবং জ্ঞানতৃষ্ণা যা কিছুতেই মেটে না। তিনি পড়তেন বিস্তর, শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতেন। তখন তিনি লেখেন প্রথম-প্রথম রচনা। ধর্মের প্রতি তাঁর মনোভাব হয়ে ওঠে বেশ সমালোচনামূলক। ফ্র্যাঙ্কলিন বাড়ি এবং নিজ শহর ছেড়ে চলে যান সতর বছর বয়সে। পেনসিলভানিয়ায় কোয়েকারদের রাজধানী ফিলাডেলফিয়ায় গিয়ে তিনি একটা ছাপাখানায় কাজ নেন। মুদ্রণ সম্পর্কে জ্ঞান বাড়াবার জন্যে এবং ঐ ছাপাখানার জন্যে সরঞ্জাম কিনতে তিনি ইংলণ্ডে যান এক বছর পরে। বলা হয়েছিল তাঁকে দেওয়া হবে সুপারিশপত্র আর টাকা, কিন্তু তার কোনটাই তিনি পান না।

ফ্র্যাঙ্কলিন ইংলণ্ডে ছিলেন দেড় বছরের বেশি, তখন লণ্ডনের বিভিন্ন ছাপাখানায় কাজ করে তিনি অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান লাভ করেন। তরুণটি ফিলাডেলফিয়ায় ফেরেন ১৭২৬ সালে, তখন তাঁকে বয়সের চেয়ে অনেকটা বেশি পরিণত মনে হত। তখন তাঁর হাতে পয়সা ছিল না, কিন্তু সঙ্গে নিয়ে গিয়েলিলেন বই এবং টাইপ্-ফেস্, আর — যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ — তিনি ছিলেন আইডিয়া আশা-ভরসা এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর।

মালিক-মুদ্রাকর হিসেবে ফ্র্যাঙ্কলিন অচিরে গণ্যমান্য হয়ে ফিলাডেলফিয়ার সবচেয়ে বিশিষ্ট নাগরিকদের একজন হয়ে দাঁড়ান। তাঁকে ঘিরে গড়ে ওঠে একটা নওজোয়ান মহল, তাঁরা বিজ্ঞান আর সাহিত্য চর্চায় আগ্রহান্বিত ছিলেন। প্রত্যেকটা মিনিট হিসাবে রেখে সুব্যবস্থিত ছিল ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবন আর কাজকর্ম। নিজের অদম্য কর্মশক্তি তিনি কত-যে ব্যাপারে প্রয়োগ করেছিলেন তার সবগুলোর শুধু নাম পরপর বলে যাওয়াও অসম্ভব। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকার প্রথম

---

* B. Franklin, 'The Autobiography and Other Writings', New York, 1961, p. 33.

বিজ্ঞান সমিতি, প্রথম সাধারণের গ্রন্থাগার, প্রথম দমকল ব্রিগেড, বড়রকমের একটা জাতীয় সংবাদপত্র চালু করেন সর্বপ্রথমে তিনিই, তিনি ডাকব্যবস্থার উন্নতি ঘটান। ১৭৫৪ সালে অলবানি কংগ্রেসে তিনি পেনসিলভানিয়া প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন; ইংলন্ডের রাজার অধীনে উপনিবেশগুলিকে সম্মিলিত করার পরিকল্পনা তিনি উত্থাপন করেন — কিছু পরিমাণ স্বশাসনের প্রস্তাব তাতে ছিল। আমেরিকানরা যাতে সম্মিলিত হয়ে একটা জাতি হিসেবে গড়ে ওঠে এমন যেকোন প্রস্তাবকে লন্ডনে তারা সাংঘাতিক ভয় করত; ফ্র্যাঙ্কলিনের পরিকল্পনা বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল।

বিভিন্ন প্রকৃতিবিজ্ঞানে ফ্র্যাঙ্কলিনের সবসময়ে প্রবল আগ্রহ ছিল, আর নিপুণ হাত তিনি লাগাতে পারতেন যেকোন কাজে। ভূমিকম্পের প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন; কুশলী ডিজাইনের একটা ফার্নেস উদ্ভাবন করেন। ১৭৪৩ সালে তিনি বিদ্যুৎ নিয়ে চালান কিছু-কিছু পরীক্ষা দেখেন; তখনকার দিনে প্রমোদ-ফেরিওয়ালারা ঐসব পরীক্ষা দেখাত। ফ্র্যাঙ্কলিন তাতে খুবই আগ্রহান্বিত হয়ে স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহ-উদ্যমের সঙ্গে লেগে যান এবং পাঁচ-ছ'বছরে হাজার-হাজার ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক পরীক্ষা চালান, সেগুলি তখনকার দিনের পক্ষে ছিল খুবই সূক্ষ্ম এবং সুদক্ষ। ফ্র্যাঙ্কলিনের কাজে ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক বিদ্যার ভিত্তি স্থাপিত হয়। তিনি বিদ্যুতের ঐকিক তত্ত্ব প্রবর্তিত করেন, তাতে তিনি চালু করেন পজিটিভ এবং নেগেটিভ আধান সংক্রান্ত ধারণা (ভিন্ন-ভিন্ন দু'রকমের বিদ্যুৎ আছে বলে অনেকে মনে করত তখন অবধি)। ফ্র্যাঙ্কলিন বজ্রের বৈদ্যুৎ প্রকৃতি প্রমাণ করলেন, নভোবিদ্যুৎ ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দিলেন, উদ্ভাবন করলেন বজ্রবহ।

পেনসিলভানিয়ার (এবং পরে অন্যান্য প্রদেশের) প্রতিনিধি হিসেবে ফ্র্যাঙ্কলিন ইংলন্ডের সরকারের কাছে গিয়েছিলেন ১৭৫৭ সালে। তার পরেকার তিরিশ বছরের বেশির ভাগ সময় তাঁর কেটেছিল প্রথমে ইংলন্ডে, তারপর ফ্রান্সে; দেশে গিয়েছিলেন শুধু দু'বার। এই সময়ে ফ্র্যাঙ্কলিন ছিলেন রাষ্ট্রপুরুষ, কূটনীতিক, রাজনীতিক প্রবন্ধকার। উপনিবেশগুলি এবং 'জননী-দেশে'র মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত ঠেকাতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন বহু বছর ধরে; বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে স্বশাসন লাভের উপায় তিনি খুঁজেছিলেন। কিন্তু ইংলন্ড কোন সুবিধা দিতে চাইল না। আমেরিকানদের বিদ্রোহ অনিবার্য হয়ে উঠল — যুদ্ধ বেধে গেল ১৭৭৫ সালে। জানাই

আছে, 'স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র' প্রধানত টমাস জেফারসনের লেখা, তাতে ফ্র্যাঙ্কলিনের কলমের আচড়ও ছিল কিছু-কিছু, সেটা গৃহীত হয়েছিল ১৭৭৬ সালে ৪ জুলাই। ঐ বছরই শরৎকালে কংগ্রেস ফ্র্যাঙ্কলিনকে বিদ্রোহী উপনিবেশগুলির প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছিল ফ্রান্সে; নবজাত প্রজাতন্ত্রের জন্যে ফ্রান্সের সামরিক এবং আর্থনীতিক সাহায্য ছিল একেবারেই অপরিহার্য। প্রচন্ড দুষ্করতা সত্ত্বেও ফ্র্যাঙ্কলিন ফ্রান্সের সঙ্গে সামরিক মৈত্রীজোট স্থাপন করেছিলেন। যুদ্ধের গতি ঘুরে গেল ইংলন্ডের বিরুদ্ধে। ১৭৮৩ সালের শান্তি সন্ধিচুক্তিতে ইংলন্ড মেনে নিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা।

ফ্র্যাঙ্কলিন মারা যান ১৭৯০ সালে। দাস-ব্যবসার সম্পর্কে একটা সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠিই তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ রচনা (চিঠিখানা বেরিয়েছিল তিনি মারা যাবার চব্বিশ দিন আগে)। পেনসিলভানিয়ার রাজ্যপাল এবং ১৭৮৭ সালের শাসনতান্ত্রিক কনভেনশনের সদস্য হিসেবে তিনি পরের দিকে সারা জীবন লড়েছিলেন দাসপ্রথার বিরুদ্ধে। ফ্র্যাঙ্কলিনের শেষ রচনার ফর্ম খুবই বিশেষক। জীবনের শেষ কয়েক বছরে প্রায়ই লেখা এইসব ছোট-ছোট ঝাঁজাল বিদ্রূপাত্মক রচনাকে তিনি বলতেন bagatelle*। বৃদ্ধ ফ্র্যাঙ্কলিনের পাকা হাতে শানান এইসব 'ব্যাগাটেল' বিঁধত জোরসে।

অর্থনীতিবিদ ফ্র্যাঙ্কলিন

শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বটাকে অ্যাডাম স্মিথ নির্দিষ্ট আকারে তুলে ধরেন তাঁর 'জাতিসমূহের সম্পদে'। তবে তার আগে গোটা এক শতক ধরে কমবেশি আবছা অনুমানের আকারে সেটার উৎপত্তি লক্ষ্য করা যায় বহু রচনায়। অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে ফ্র্যাঙ্কলিন অনেকাংশে পেটির অনুগামী। পেটির রচনাগুলি সম্পর্কে তিনি জানতে পেরেছিলেন খুব সম্ভব প্রথম বার লন্ডনে গিয়ে। জানতে উৎসুক উনিশ বছরের ছেলেটিকে সেটা পড়তে বলেছিলেন হয়ত ডাক্তার ম্যান্ডেভিল: চিপসাইডে 'হর্ন্স' নামে সরাইখানায়

* যৎকিঞ্চিৎ। — সম্পাঃ

'মউমাছিদের উপাখ্যান'-এর লেখকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বলে ফ্র্যাঙ্কলিন উল্লেখ করেছেন।

কোন-কোন পণ্ডিত বলেন, ফ্র্যাঙ্কলিনের আর-একজন প্রবীণ সমসাময়িক ড্যানিয়েল ডিফোর প্রভাব, বিশেষত এ'র 'প্রকল্প সম্পর্কে প্রবন্ধ'-র প্রভাব ফ্র্যাঙ্কলিনের ধ্যান-ধারণা গড়ে ওঠার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

অর্থনীতি বিষয়ে ফ্র্যাঙ্কলিনের প্রথম প্রবন্ধ 'A Modest Enquiry Into the Nature and Necessity of a Paper Currency' ('কাগজী কারেন্সির স্বধর্ম এবং আবশ্যকতা বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ')-এর সঙ্গে পেটির বিভিন্ন রচনার তুলনা করে বহু গবেষক ফ্র্যাঙ্কলিনের উপর পেটির প্রভাব সম্বন্ধে যুক্তি দেখিয়েছেন। জনসংখ্যা নিয়ে গবেষণা প্রসঙ্গে ফ্র্যাঙ্কলিনের ১৭৫১ সালে লেখা প্রবন্ধটি আর্থনীতিক সাহিত্যে একটা লক্ষণীয় ঘটনা — এতেও রয়েছে পেটির প্রভাবের কিছু-কিছু লক্ষণ। প্রসঙ্গত বলি, ডিমগ্রাফি বিষয়ে রচনায় ফ্র্যাঙ্কলিন মার্কিন প্রদেশগুলিতে বাস্তব পরিস্থিতির বিশ্লেষণ অনুসারে তুলে ধরেন এই আগ্রহজনক ধারণাটা: কোন বহিস্থ ব্যাঘাত না ঘটলে 'স্বাভাবিক অবস্থায়' জনসংখ্যা প্রতি পঁচিশ বছরে দ্বিগুণ হবার ঝোঁক দেখা যায়। এই হিসাবটাকে পরে কাজে লাগিয়েছিলেন ম্যালথাস, তাঁর মতে জীবনীয় উপকরণের উৎপাদন জনসংখ্যাবৃদ্ধির চেয়ে পিছিয়ে পড়ে থাকে, এটা অনিবার্য। এই ম্যালথাসীয় ঐতিহাসিক দুঃখবাদ কিন্তু একেবারেই বিজাতীয় ছিল ফ্র্যাঙ্কলিনের পক্ষে। উলটে তিনি মনে করতেন, যুক্তিসম্মত সামাজিক সংগঠন থাকলে জীবনীয় উপকরণ উৎপাদনের সুযোগ-সম্ভাবনা বিপুল। আমেরিকার জনসংখ্যার বিরাট বৃদ্ধিটাকে তিনি এই নতুন মহাদেশ উন্নয়নের অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত বলে মনে করতেন। আর গ্রেট বৃটেন সম্পর্কে তিনি লেখেন: '...তাদের* কাজে লাগান গেলে এই দ্বীপটি এখনকার জনসংখ্যার দশগুণ মানুষের ভরণপোষণ করতে পারে।'**

অন্য একটা, অপেক্ষাকৃত মূর্ত-নির্দিষ্ট প্রশ্ন নিয়ে বিচার-বিবেচনা প্রসঙ্গে ফ্র্যাঙ্কলিনও পেটির মতো তুলে ধরেছিলেন শ্রমঘটিত মূল্য-তত্ত্ব।

* গ্রেট বৃটেনের মানুষ। — অনুঃ

** B. Franklin, 'The Works of Benjamin Franklin', Vol. 3, London, 1806, p. 115.

সাধারণভাবে এবং বিশেষত যখন বহুমূল্য ধাতুর ঘাটতি থাকে সেক্ষেত্রে কাগজী মুদ্রার উপযোগ-সংক্রান্ত ধারণাটাকে তিনি একগুঁয়ে কোয়েকারদের মাথায় ঢোকাতে চেষ্টা করছিলেন।

সেজন্যে তাঁকে ধাতব মুদ্রাটাকে আগে পূজা-বেদি থেকে টেনে নামাতে হয়; এতে তাঁর যুক্তিধারায় পেটির বিবেচনার ধরনের চেয়ে জন লো-র সোৎসাহ যুক্তির ছাপই বেশি নজরে আসে। অর্থ নয়, শ্রমই মূল্যের যথার্থ মানদণ্ড — এটাই ফ্র্যাঙ্কলিনের মূলভাব। তিনি লিখেছেন: 'যেমন অন্যান্য জিনিসের তেমনি রুপোরও মূল্য মাপা যায় শ্রম দিয়ে। যেমন ধরা যাক, একজনকে কাজে লাগান হয়েছে শস্য ফলাতে, রুপো তুলে শোধন করছে আর-একজন; বৎসরান্তে কিংবা অন্য যেকোন কালপর্যায়ে শস্যের মোট উৎপাদ এবং রুপোর মোট উৎপাদ হল পরস্পরের স্বাভাবিক দাম; প্রথমটা যদি কুড়ি বুশেল, আর অন্যটা কুড়ি আউন্স, তাহলে সেই রুপোর এক আউন্সের দাম হল ঐ শস্যের এক বুশেল ফলাতে লাগান শ্রমের সমতুল; আর যদি আরও কাছাকাছি কোন-কোন খনি আবিষ্কৃত হয় যেখানে কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ কিংবা জিনিসটা প্রচুর, যাতে কেউ আগে কুড়ি আউন্স রুপো সংগ্রহ করেছে যেভাবে তেমনি অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারে চল্লিশ আউন্স, আর কুড়ি বুশেল শস্য ফলাতে যদি তখনও লাগে সেই একই শ্রম, তাহলে দুই আউন্স রুপোর দাম হবে এক বুশেল শস্য ফলাতে লাগান সেই একই শ্রমের চেয়ে বেশি নয়, আর দুই আউন্সে ঐ এক বুশেল শস্য হবে আগে এক আউন্সে যেমনটা ছিল তেমনিই সস্তা, caeteris paribus (বাকি সব সমান শর্তে)।'*

এই অংশটাকে মার্কস উদ্ধৃত করেছেন তাঁর 'অর্থশাস্ত্র পর্যালোচনা নিবন্ধ'-এ; অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে ফ্র্যাঙ্কলিনের অবদানের প্রথম এবং পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তিনি দিয়েছেন এতে। মার্কস বলেছেন, ফ্র্যাঙ্কলিন 'নির্দিষ্ট আকারে তুলে ধরেছেন আধুনিক অর্থশাস্ত্রের বুনিয়াদী নিয়মটাকে',** অর্থাৎ মূল্য নিয়মটাকে।

অর্থশাস্ত্রের বিকাশে এই বিখ্যাত আমেরিকানের উঁচু পর্যায়ের অবদানের গুরুত্বটাকে মার্কস 'পুঁজি'তে আবার তুলে বলেছেন, ফ্র্যাঙ্কলিন হলেন

* B. Franklin, 'The Works', Boston, 1840, Vol. 2, p. 265.

** কার্ল মার্কস, 'অর্থশাস্ত্রের পর্যালোচনা নিবন্ধ', লণ্ডন, ১৯৭১, ৫৫ পৃঃ।

'উইলিয়ম পেটির পরে সর্বপ্রথমে যাঁরা মূল্যের স্বধর্ম লক্ষ্য করেছিলেন তাঁদেরই একজন'।*

সর্বপ্রথমে এবং সর্বোপরি, পেটির দেদীপ্যমান ভাব-ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া, সেগুলির প্রচার এবং বিভিন্ন নির্দিষ্ট আর্থনীতিক প্রশ্নে সেগুলিকে প্রয়োগ করা আবশ্যক ছিল। আর ঠিক তাইই করলেন ফ্র্যাঙ্কলিন। কিন্তু শুধু তাই নয়। পৃথক-পৃথক সমস্ত ধরনের মূর্ত শ্রমের সাধারণ স্বধর্ম, সমতুল প্রকৃতি-সংক্রান্ত ধারণাটার অনেক কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন — পেটির চেয়ে বেশি। পেটির মতো নয় — খনি থেকে বহুমূল্য ধাতু তোলার শ্রমে কোন বিশেষ গুণ আরোপ করেন নি ফ্র্যাঙ্কলিন। উলটে বরং, কার্যক্ষেত্রে নিজ লক্ষ্য অনুসারে চলতে গিয়ে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, মূল্য পয়দা করার দিক থেকে দেখলে অন্য কোন ধরনের শ্রম থেকে কোনক্রমেই পৃথক নয় ঐ শ্রম।

পণ্যে-স্থিত শ্রমের দ্বৈত প্রকৃতির ব্যাখ্যা দেবার দিকে বৈজ্ঞানিক চিন্তন ক্রমে এগিয়ে গেল — সেটা হল শ্রমঘটিত মূল্য-তত্ত্বের বিকাশ, আর সেটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে সমগ্র ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের উদ্ভব। দীর্ঘ দুর্গম পথ সেটা। সেই পথেই একটা পদক্ষেপ করলেন তরুণ ফ্র্যাঙ্কলিন।

কাগজী মুদ্রার সপক্ষে ফ্র্যাঙ্কলিনের প্রবল প্রচেষ্টার রাজনীতিক এবং শ্রেণীগত ভিত্তি ছিল। একদিকে এটা চালিত হয়েছিল ইংলন্ডের বৃহৎ-শক্তিসুলভ কর্মনীতির বিরুদ্ধে: উপনিবেশগুলির উপর ধাতব মুদ্রার কঠোরভাবে নিরোধক ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে ইংলন্ড তাদের আর্থনীতিক উন্নয়ন ব্যাহত করছিল। অন্য দিকে ফ্র্যাঙ্কলিন খামারী এবং সরল শহুরে মানুষের স্বার্থের সপক্ষে দাঁড়াচ্ছিলেন মহাজন আর বণিকদের বিরুদ্ধে, এরা যা ধার দিত সেটা ফেরত পেতে চাইত ধাতব মুদ্রায়। এটাকে তারা বলত 'সাধু' টাকা, সেটার বিপরীতে কাগজী মুদ্রাকে তারা বলত 'অসাধু' টাকা। রুপো হস্তগত করার জন্যে (উপনিবেশগুলিতে সোনা বড় একটা ছিল না) দেনদারদের নতুন ধার নিতে কিংবা কম মজুরিতে রাজি হতে বাধ্য করা হত। ফ্র্যাঙ্কলিনের পরেকার বিভিন্ন রচনায় দেখা যায়, অর্থ নিয়ে বিরোধটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবহিত ছিলেন।

* কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ১খন্ড, মস্কো, ১৯৭২, ৫৭৭ পৃঃ।

ধাতব মুদ্রার সমালোচনায় অত্যুৎসাহী হয়ে ফ্র্যাঙ্কলিন বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন, তার ফলে ঘটেছিল কোন-কোন তাত্ত্বিক দুর্বলতা। মূল্য পয়দা করার দিক থেকে দেখলে রুপো আর শস্যের মধ্যে পার্থক্য নেই, এটা সঠিকভাবেই লক্ষ্য করে তিনি এই সিদ্ধান্ত করে বসলেন যে, বিনিময়ে, পণ্য পরিচলনে রুপো আর শস্যের ভূমিকার দিক থেকেও দুটোর মধ্যে পার্থক্য নেই। অর্থ পণ্যের বিশেষ-নির্দিষ্ট সামাজিক ভূমিকাটাকে তিনি অগ্রাহ্য করলেন। ঐ সময়ে আমেরিকায় রুপো ছিল একটা সর্বগত তুল্যাঙ্ক, অর্থাৎ এমন পণ্য যেটা দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফলে অন্যান্য সমস্ত পণ্য থেকে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। শস্য তো এমন পণ্য ছিল না। অন্যান্য সমস্ত পণ্যের মতো এটারও মূল্য প্রকাশ করতে হত রুপোয়, পুরো দামের মুদ্রায়। পুঁজিতান্ত্রিক পণ্য-অর্থনীতিতে মূল্য প্রকাশ করার অন্য কোন উপায় জানা নেই। এদিক থেকে দেখলে, রুপো ছিল একটা 'বিশেষ' পণ্য। কাগজী মুদ্রা থাকতে পারত রুপোর প্রতিভূ হিসেবে, বদলি হিসেবেই শুধু। এই ভূমিকায় সেগুলোর পরিচলন আর্থনীতিক বিচারে খুবই 'নিয়মমাফিক' হত।

একটা বিশেষ সামাজিক কৃত্য চালায় অর্থ। অন্যান্য পণ্যের মতো নয় — অর্থ হয়ে দাঁড়ায় বিমূর্ত শ্রমের সর্বার্থগত এবং সাক্ষাৎ মূর্তায়ন। এটার মূল্য প্রকাশ করতে অন্য একটা পণ্য দরকার হয় না: এটা সর্বক্ষণ প্রকাশ পায় অন্যান্য পণ্যের মাঝে। অর্থের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ একটা বিষয়গত এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া — এটা মানুষের ইচ্ছার অনপেক্ষ। কিন্তু একটা কৃত্রিম 'উদ্ভাবন' হিসেবে, বিনিময় সহজ করার টেকনিকাল হাতিয়ার হিসেবে অর্থকে ধরার দিকে ঝুঁকলেন ফ্র্যাঙ্কলিন। কাজেই ধাতব মুদ্রাকে তিনি অর্থের বিকাশের একটা স্বাভাবিক আকার হিসেবে না ধরে সেটাকে দেখলেন বহিস্থ শক্তির চাপিয়ে-দেওয়া স্রেফ কৃত্রিম উপাদান হিসেবে।

ফ্র্যাঙ্কলিন সমাজের যে বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্ক নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করছিলেন সেটা ছিল অপরিণত, এটাই শেষে গিয়ে অর্থশাস্ত্র-সংক্রান্ত মূল প্রশ্নগুলি নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণে ত্রুটিবিচ্যুতির কারণ। তবে সুদূর মফস্বল এলাকা পেনসিলভানিয়ায় প্রকাশিত তাঁর পুস্তিকাখানা বেরিয়েছিল অ্যাডাম স্মিথের 'জাতিসমূহের সম্পদ'-এর বছর-পঞ্চাশেক আগে, এই কথাটা মনে রাখলে আমেরিকার এই বিশিষ্ট মানুষটির বৈজ্ঞানিক সাধনসাফল্যের পূর্ণ তাৎপর্য বোঝা যায়।

পুস্তিকাখানায় এই তেইশ বছর বয়সের লেখকের যেসব অসাধারণ ভাবধারণা ব্যক্ত হয় সেগুলি অর্থনীতিবিজ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলতে পারে নি। ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁর পরবর্তী রচনাগুলিতে মূল্যের স্বধর্ম-সংক্রান্ত প্রশ্নটাকে বিশেষভাবে তোলেন নি কখনও, কিন্তু কখনও সেটা প্রসঙ্গত উল্লেখ করলে তিনি সেটা নিয়ে বলেছেন নানা ধরনে। কখনও সেই একই শ্রমঘটিত তত্ত্বের ভিত্তিতে; তাঁর উপর ফিজিওক্র্যাটিক মতের প্রভাব পড়েছিল, তদনুসারে কখনও; আবার কখনও-বা বিষয়ীগত (subjective) ধরনে: বিনিময়ে তুল্যমূল্যতা নেই, কেননা লেনদেনে অংশগ্রাহী প্রত্যেকে পায় অধিকতর বিষয়ীগত উপযোগ-মূল্য, অধিকতর পরিতৃপ্তি।

'আর্থনীতিক উদ্বৃত্ত', না-খেটে-করা আয় মূলত উদ্বৃত্ত মূল্য — এই প্রশ্নটাকেও ফ্র্যাঙ্কলিন বহু রচনায় ধরেছেন বিভিন্ন দিক থেকে। যেখানে কিছু লোক হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে, আর পায়ের উপর পা দিয়ে থেকে কিছু অকর্মা লোক তাদের শ্রমফল অপব্যয় করে, এমন সমাজের 'অন্যায্যতা' লক্ষ্য করেছিলেন মানবতাবাদী যুক্তিবাদী ফ্র্যাঙ্কলিন। অক্লান্ত কঠোরকর্মা ফ্র্যাঙ্কলিন এটাকে মানবিক ন্যায়পরায়ণতার অবমাননা বলে গণ্য করেন। তিনি লিখেছেন: 'এত অভাব-অনটন আর দুর্দশা ঘটে তাহলে কিসের জন্যে? তার কারণ যারা জীবনীয় উপকরণ কিংবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ কোনটাই উৎপাদন করে না এমনসব মেয়ে-পুরুষ* কাজে লাগান হয়, আর যারা কিছুই করে না তাদের সঙ্গে মিলে ঐসব লোক খাটিয়ে মানুষের পয়দা-করা জীবনীয় সামগ্রীগুলো ভোগ-ব্যবহার করে। ...একজন পাটিগণিতজ্ঞ হিসাব কষে দেখিয়েছেন, প্রত্যেকটি নারী আর পুরুষ যদি প্রয়োজনীয় কিছু উৎপাদনের জন্যে প্রতিদিন চার ঘণ্টা করে কাজ করে তাহলে সেই শ্রমে যা পয়দা হতে পারে সেটা জীবনের সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জিনিস পাবার জন্যে যথেষ্ট, জগৎ থেকে বিদেয় হবে অভাব-অনটন আর দুর্দশা, আর বাদবাকি কুড়ি ঘণ্টা হতে পারে আরাম-বিরাম আর সুখ-শান্তির সময়।'**

---

* বাড়িতে পোষ্য লোকজন, সংখ্যাবহু চাকরবাকর, আমলাফয়লা, যাজক, অফিসার, ইত্যাদির কথা বলা হচ্ছে।

** Vernón Louis Parrington, 'Main Currents in American Thought', New York, 1930, Vol, I, part 2, p. 174 থেকে নেওয়া হয়েছে উদ্ধৃতিটা।

এই স্বর্ণযুগ চালু করা যায় কিভাবে সে-সম্পর্কে ফ্র্যাঙ্কলিনের কোন ধারণা ছিল না স্বভাবতই। একদিকে সর্বকালের 'রামরাজ্য', আর অন্য দিকে অ্যাডাম স্মিথ এবং তাঁর অনুগামীদের রচনায় পরোপজীবিতা এবং অনুৎপাদী শ্রমের স্থিরমস্তিষ্ক সমালোচনার কথা মনে আসে ফ্র্যাঙ্কলিনের এই সহৃদয় উদার কথাগুলি থেকে।

ফ্র্যাঙ্কলিনের বিক্ষোভ নিশ্চয়ই চালিত হয় নি পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে। তাঁর সেই কালই তাঁকে গড়ে তুলেছিল — তখনও বুর্জোয়া সম্পর্কতন্ত্র সুপরিণত হয়ে ওঠে নি। পরোপজীবী আর গলগ্রহ মানুষের তীব্র সমালোচনা করলেও পুঁজি থেকে সুদকে খুবই ন্যায্য আয়, মিতব্যয়িতার প্রতিদান বলে বিবেচনা করতে তাঁর আটকায় নি। ভূমি-খাজনাটাকেও তিনি দেখতেন একই দৃষ্টিতে; ভূমি-খাজনার পরিমাণ এবং পুঁজি বাবত সুদের মধ্যে অনুরূপতা প্রতিপন্ন করতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন। তিনি স্রেফ ধরে নিয়েছিলেন সুদের একটা 'ন্যায্য' হার আছে। তাঁর হসাবে এই ন্যায্য বা 'স্বাভাবিক' হার হল বার্ষিক ৪ শতাংশ। তাঁর মতে, হারটা এমন হলে মহাজন আর খাতকের স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে শান্তির আনুকূল্য হয়।

মজুরি দিয়ে জন খাটানোটাকে ফ্র্যাঙ্কলিন নিশ্চয়ই মজুরের উপর পুঁজিপতির শোষণ বলে ধরেন নি। ওদের মধ্যে সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে, তা তিনি টের পান নি, কেননা ভবিষ্য শ্রমিককে তিনি দেখেছিলেন স্রেফ প্যাট্রিয়ার্কাল খেতমজুর কিংবা শিক্ষানবিস হিসেবে, যার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটে খামার কিংবা কর্মশালার মালিক।

ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবনকালে সারা পৃথিবীতে লোকে তাঁকে জানত 'বজ্রদমক' এবং বিদ্রোহী উপনিবেশগুলির প্রতিনিধি হিসেবেই শুধু নয়, তাঁর আর-একটা পরিচয় ছিল: 'Poor Richard's Almanack' ('বেচারা রিচার্ডের বর্ষপঞ্জি')-র রচয়িতা। ১৭৩৩ থেকে ১৭৫৭ সালে তিনি রিচার্ড স্যাণ্ডার্স ছদ্মনামে ফিলাডেলফিয়ায় প্রকাশ করেছিলেন একটা বর্ষপঞ্জি, তাতে জ্যোতির্বিদ্যা এবং অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য ছাড়াও থাকত নানা রূপক কাহিনী আর প্রবচন। এগুলোর কিছু-কিছু তিনি নিজেই লিখতেন, আবার কিছু-কিছু নিতেন লোকাচার এবং অন্যান্য সূত্র থেকে।

১৭৫৭ সালে এই বর্ষপঞ্জির শেষ সংখ্যার মুখবন্ধে ফ্র্যাঙ্কলিন 'বেচারা রিচার্ড'-এর প্রবচনগুলিকে হাজির করেছিলেন চুম্বকে। ছোটখাটো এই

রচনাটির নাম 'Father Abraham's Speech on the Way to Wealth' ('বড়লোক হওয়া সম্বন্ধে ফাদার আব্রাহামের উক্তি'), এটা ঠিক কোন্ বর্গের রচনা তা স্থির করা কঠিন, এটা আঠার শতকে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল আমেরিকায় আর ইংলণ্ডে, তরজমা হয়েছিল বহু ভাষায়, রুশ ভাষায়ও।

একজন সাধারণ গরিব মানুষ, সে 'জীবনে দাঁড়িয়ে যেতে চায়', এমন লোকের বিচক্ষণতা জমাট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে 'বেচারা রিচার্ড'-এর প্রবচনগুলিতে। অধ্যবসায় মিতব্যয়িতা বিচক্ষণতা হল শ্রীবৃদ্ধি আর সাফল্যের তিনটে গ্যারাণ্টি: 'নিজের পায়ে দাঁড়ালে ভগবান সহায়', 'বেড়ালের থাবায় দস্তানা, ইঁদুর ধরা পড়ে না', 'বড়লোক হতে চাও তো রোজগারের সঙ্গে সঞ্চয়ের কথাটাও মনে রেখো', 'রাই কুড়িয়ে বেল'।

এ তো অল্প কয়েকটা দৃষ্টান্ত। অর্থনীতি বিষয়ে এর চেয়ে অদ্ভুত ধরনের রচনা পাওয়া কঠিন। কিন্তু এটা আর্থনীতিক প্রবন্ধই বটে! বুর্জোয়ারা যখন শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠছিল সেই কালের অর্থশাস্ত্রের নীতিগুলিকে সহজ আকারে এতে তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে লোকাচার আর দৈনন্দিন জীবনের বুদ্ধি-বিবেচনার নানা উপাদান। এইসব প্রবচন সম্পর্কেই মার্কস বলেছেন: 'জমাও, জমাও! সেটাই মোজেস এবং পয়গম্বরগণ: 'শ্রমশীলতা যোগায় মালমশলা, যা সঞ্চয়ের ফলে জমে ওঠে।'* অতএব, সঞ্চয় করো, সঞ্চয় করো, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্য বা উদ্বৃত্ত উৎপাদের যথাসম্ভব বড় অংশটাকে পুঁজিতে পরিণত করো!'**

প্রসঙ্গত বলি, সঞ্চয়নের আর্থনীতিক গুরুত্ব-সংক্রান্ত ধারণাটাকে ফ্র্যাঙ্কলিন কিছুটা যথাযথ আকারেও বিবৃত করেছেন। জীবনের শেষের দিকে লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি প্রায় সহজাত পিউরিটান-আচার থেকে সরে গিয়ে লিখেছিলেন সঞ্চয়নের প্রয়োজন অনুসারে বিলাসও নৈতিক বিচারে সমর্থনীয় হতে পারে, কেননা, তাঁর মতে, 'বিলাসদ্রব্য পাবার আশাটা কাজ আর অধ্যবসায়ের জন্যে একটা মস্ত প্রেরণা হতে পারে'। বিলাসের 'উপযোগ' সম্পর্কে ফ্র্যাঙ্কলিনের কোন-কোন ধারণায় ম্যাণ্ডেভিলের ছাপ আছে।

---

* মার্কস এখানে উদ্ধৃত করেছেন অ্যাডাম স্মিথের কথা; এই প্রশ্নে স্মিথের মত ফ্র্যাঙ্কলিনের সঙ্গে অনেকটা মেলে।

** কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ১ খণ্ড, ১৯৭২, ৫৫৮ পৃঃ।

জীবনভর ফ্র্যাঙ্কলিনের মন জুড়ে ছিল আর্থনীতিক কর্মনীতি-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন। প্রয়োগবাদী এবং বাস্তববাদী ফ্র্যাঙ্কলিন প্রায়ই প্রশ্নগুলোর মীমাংসা করতেন বিভিন্ন ধরনে — সেটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে, এমনকি তখনকার রাজনীতিক প্রয়োজন অনুসারেও। অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছিল শুধু তাঁর মূল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক নীতিগুলি।

১৭৬০ সালে প্রকাশিত একখানা পুস্তিকায় ফ্র্যাঙ্কলিন বিশেষত দেখাতে চেয়েছিলেন যে, মার্কিন উপনিবেশগুলিতে ম্যানুফ্যাক্টরির উন্নয়ন অনাবশ্যক— এমনকি সামাজিক বিচারে হানিকর। তিনি লিখলেন, কৃষিই মানুষের একমাত্র যথার্থ সম্মানজনক কাজ — আমেরিকায় কৃষি উন্নয়নে সম্ভাবনার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। এটাকে সাধারণভাবে ধরা হয় তাঁর উপর ফিজিওক্র্যাট মতবাদের প্রভাবের ফল হিসেবে: ইউরোপে থাকার সময়ে এই মতবাদ সম্বন্ধে তাঁর জানাশোনা হয়েছিল। কৃষি সম্পর্কে ঐ ধারণা হয়ত ভিত্তিহীন ছিল না। তবে তার সঙ্গে সঙ্গে — যা বলেছেন ইতিহাসকারেরা — ফ্র্যাঙ্কলিন এই পুস্তিকায় চাতুরী করছিলেন, আর ইংলণ্ডের সরকারের ভয় ভাঙতে চাইছিলেন, — বাদবাকি মার্কিন প্রদেশগুলির সঙ্গে কানাডাকে সংযুক্ত করতে ইংলণ্ডের সরকারকে তিনি প্রবৃত্ত করাতে চেষ্টা করছিলেন (কানাডাকে ফ্রান্সের হাত থেকে জিতে নেওয়া হয়েছিল)।*

বণিকতান্ত্রিক ভাবধারা ফ্র্যাঙ্কলিনের পক্ষে নিশ্চয়ই বিজাতীয় ছিল না, — এটা স্বাভাবিকই। অসংগতির দরুন একটুও বিব্রত বোধ না করে অন্য কোন-কোন লেখায় তিনি আমেরিকায় শিল্প গড়ার প্রয়োজন সম্বন্ধে যুক্তি দেখান, আর সেজন্যে তিনি দেন বণিকতান্ত্রিক ব্যবস্থা: আমদানি-শুল্ক, অর্থনীতিতে অর্থের প্রাচুর্য, কার্যকর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা, নতুন-নতুন উপনিবেশ স্থাপন, ইত্যাদি।

তবে এটা নয় সেই সংকীর্ণ মফস্বলী অদূরদর্শী বণিকতন্ত্র যেটা আঠার আর উনিশ শতকে ছিল তাঁর দেশে অনেকের বিশেষক। বিশ্ব-বাজার নিয়ে ভাবতে গিয়ে তিনি ধরে নিয়েছিলেন উৎপাদনে আন্তর্জাতিক বিশেষকৃতি এবং অবাধ বাণিজ্যের ফলে আমেরিকায় শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হবে না, তেমনি যারা বাণিজ্য করে এমনসব জাতির পক্ষেও সেটা লাভজনক। উল্লিখিত

---

* P. W. Conner, 'Poor Richard's Politics. Benjamin Franklin and His New American Order', London, 1969, p. 73.

মার্কিন লেখকটি ফ্র্যাঙ্কলিনের এই বিবেচনাধারাটাকে আপাতবিরুদ্ধ নাম দিয়েছেন 'অবাধ বাণিজ্যের বণিকতন্ত্র', তাতে তিনি এই মতবাদের বিশেষ-নির্দিষ্ট মার্কিন প্রকৃতিটার কথা উল্লেখ করেছেন।* কিন্তু বলা দরকার, হিউম আর স্মিথের বিবেচনাধারা এটার বেশ কাছাকাছিই ছিল, যদিও আমেরিকায় উপনিবেশগুলির শিল্পোন্নয়ন-সংক্রান্ত প্রশ্নটায় ফ্র্যাঙ্কলিনের যেমনটা তেমন আগ্রহ ছিল না তাঁদের। অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁরা বিষয়টাকে যেভাবে ধরেন তাতে গোঁড়ামি ছিল না, তাঁরা চলেন কাণ্ডজ্ঞান অনুসারে।

'জাতিসমূহের সম্পদ'-এ খুবই স্পষ্টপ্রতীয়মান এই বিশেষ কাণ্ডজ্ঞানটাই বোধহয় ঐ মহান স্কচ্‌ম্যানের সঙ্গে ফ্র্যাঙ্কলিনের সর্বপ্রধান যোগসূত্র। ফ্র্যাঙ্কলিন ছিলেন স্মিথের চেয়ে সতর বছরের বড়, তাঁদের ব্যক্তিগত যোগাযোগের মধ্যে স্মিথের উপর তাঁর কিছুটা প্রভাব পড়েছিল নিশ্চয়ই। ১৭৭৩-১৭৭৫ সালে লণ্ডনে স্মিথ তাঁর বইখানা লেখা শেষ করার সময়ে তাঁর পরামর্শদাতা এবং সম্পাদক ছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন, এই মর্মে একটা কথা চালু আছে। ওঁরা মারা যাবার পরে (দু'জনই মারা যান ১৭৯০ সালে) ফ্র্যাঙ্কলিনের বয়সে ছোট এক বন্ধু — ডাক্তার এবং রাজনীতিক জর্জ লোগান ফ্র্যাঙ্কলিনের কাছে শোনা নিম্নলিখিত কথাটা বলেছিলেন আত্মীয়-স্বজনকে (এ'রা সেটা পরে সবাইকে জানান): '... বিখ্যাত অ্যাডাম স্মিথ 'জাতিসমূহের সম্পদ' লেখার সময়ে এক-একটা পরিচ্ছেদ শেষ হলে নিয়ে যেতেন তাঁর (ফ্র্যাঙ্কলিন — আ. আ.) কাছে আর ডঃ প্রাইস এবং অন্যান্য বিদ্বজ্জনের কাছে; তারপর ধৈর্য ধরে শুনতেন তাঁদের মন্তব্য, উপকৃত হতেন তাঁদের আলোচনা আর সমালোচনা থেকে, কখনও-কখনও গোটা-গোটা পরিচ্ছেদ নতুন করে লিখতেন, এমনকি কোন-কোন উপস্থাপনা বদলাতেও প্রবৃত্ত হতেন।'**

এই অদ্ভুত কথাটার মধ্যে কোন্‌টা ঘটনা, কোন্‌টা বানানো, তা বলা কঠিন। লোগান পরিবারের লোকেরা ফ্র্যাঙ্কলিনের কথা বিকৃত করে থাকতে পারেন, স্মিথের রচনা সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে ফ্র্যাঙ্কলিনের ভূমিকাটাকে অতিরঞ্জিত করা হয়ে থাকতে পারে। তাঁদের পরিচয় আর মেলামেশা অত ঘনিষ্ঠ এবং অত দীর্ঘকালের হলে তার আরও বেশি বিবরণ থাকত।

* ঐ, ৭৪ পৃঃ।

** John Rae, 'Life of Adam Smith', London and New York, 1895, pp. 264, 265.

স্বাধীনতা-যুদ্ধের (১৭৭৫-১৭৮৩) আগে আমেরিকায় অর্থনীতি চিন্তন উপনিবেশগুলি এবং মূল রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক-সংক্রান্ত প্রধান জরুরী প্রশ্নটা ছাড়িয়ে বড় একটা এগয় নি। এটা অনেকাংশে ফ্র্যাঙ্কলিনের বেলায়ও প্রযোজ্য।

স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবার ফলে সমাজ-চিন্তন বিকাশের নতুন-নতুন দিগন্ত দেখা দিল। তবু আঠার শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে মার্কিন অর্থশাস্ত্রের চৌহদ্দি ছিল সংকীর্ণ; ইংলণ্ড আর ফ্রান্স থেকে আমদানি-করা ভাব-ধারণাই বহুলাংশে ছিল সেটার অবলম্বন। আমেরিকায় 'পূর্ণাঙ্গ' বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে উন্নত দেশগুলি থেকে প্রায় এক শতাব্দী পরে — সেখানে ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রের উপযুক্ত, স্মিথ আর রিকার্ডোর মতো সম্প্রদায়ের উপযুক্ত ভিত্তি ছিল না।

ইংরেজ পণ্ডিতদের তত্ত্ব আর চলিতকর্ম দুয়েরই প্রতি বৈচারিক মনোভাবের মধ্যে সেটা প্রকাশ পায়, তাঁদের পক্ষে নমুনাসই ছিল অপক্ষপাতী শ্রেণীগত বিশ্লেষণ এবং যথাযথ বিমূর্ত চিন্তন। আর্থনীতিক কর্মনীতির যে-প্রধান উপাদান তুলে ধরেছিল ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায় — অবাধ বাণিজ্য এবং ন্যূনকল্প রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ — সেটাও আট্‌লাণ্টিকপারের রাষ্ট্রটিতে বেশির ভাগ বুর্জোয়াদের অগ্রহণীয় ছিল। সেখানে মূল ধারাটাকে স্থির করত প্রধানত সংরক্ষণপন্থীরা, তারা চড়া আমদানি-শুল্কের সাহায্যে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা থেকে শিল্পরক্ষার তাগিদ দিত। অর্থশাস্ত্রের এই ব্যবহারিক প্রশ্নটাই ছিল অর্থনীতি-সংক্রান্ত রচনার কেন্দ্রস্থলে। মার্কিন গবেষক টার্নার বলেছেন, 'বাস্তবিকই, ১৮৮০ সালের আগে মার্কিন অর্থবিদ্যা শুল্ক নিয়ে বিচার-বিবেচনার একটা উপজাতের চেয়ে বড় একটা বেশিকিছু ছিল না।'*

শ্রমঘটিত মূল্য-তত্ত্বের একজন পূর্বসূরি, অর্থবিদ্যা আর রাজনীতিতে উদারপন্থী এবং কিছুটা ফিজিওক্র্যাট গোছের ফ্র্যাঙ্কলিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন প্রতিপত্তিশালী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হতে পারলেন না। উনিশ

* J. F. Bell, 'A History of Economic Thought', New York, 1953, p. 484 থেকে উদ্ধৃত।

শতকের প্রথমার্ধের মার্কিন অর্থনীতি চিন্তনক্ষেত্রে বিস্তর প্রভাব খাটিয়েছিলেন রক্ষণপন্থী মতাবলম্বী রাষ্ট্রপুরুষ আলেগজান্ডার হ্যামিল্টন— ইনি ছিলেন অর্থনীতিক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিস্তৃত হস্তক্ষেপের সমর্থক এবং মার্কিন সংরক্ষণবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

হ্যামিল্টনের একজন অনুগামী ছিলেন অর্থশাস্ত্র বিষয়ে আমেরিকার প্রথম প্রণালীবদ্ধ নিবন্ধের লেখক ড্যানিয়েল রেমন্ড। তাঁর লেখা 'Thoughts on Political Economy' ('অর্থশাস্ত্র প্রসঙ্গে বিচার-বিবেচনা') বইখানা প্রকাশিত হয় ১৮২০ সালে। স্মিথ এবং গোটা ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিজ 'আমেরিকান আর্থনীতিক ব্যবস্থা' দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছিলেন রেমন্ড (তিনি ছিলেন মহা-উৎসাহী জাতীয়তাবাদী)। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন শ্রমঘটিত মূল্য-তত্ত্বের বিরুদ্ধে, লাভ সম্পর্কে স্মিথের মতের বিরুদ্ধে (লাভকে তিনি মনে করতেন পুঁজিপতির মাইনে), আর্থনীতিক উদারনীতির বিরুদ্ধে।

আর শেষে হেনরি চার্লস কেরি। মার্কসের বিবেচনায় কেরি ছিলেন ইতর অর্থশাস্ত্রের সবচেয়ে নমুনাসই প্রবক্তাদের একজন। ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের মতো নয়, — সচেতনভাবে বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং পুঁজিতন্ত্রকে প্রাণবন্ত আর ন্যায্য প্রতিপন্ন করাই ইতর অর্থশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই কাজে তিনি বেশ সুযোগ্যই ছিলেন।

ফ্র্যাঙ্কলিনের মতো কেরির ভাব-ধারণাও মূলত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল উত্তর আমেরিকায় পুঁজিতন্ত্র বিকাশের বিশেষত্বগুলোর সঙ্গে। তবে আমেরিকান অর্থনীতিবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতার এক-শ' বছর পরে লেখেন কেরি। ঐ এক শতকে বদলে গিয়েছিল দেশটির চেহারা এবং সামাজিক পরিবেশ। ছিল প্যাট্রিয়ার্কাল খামারী আর কারিগরদের দেশ, আর সেখানে গড়ে উঠেছিল উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক। কেরির দীর্ঘ জীবনের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্র শিল্পোৎপাদনের পরিমাণের দিক থেকে ইংলন্ডের কাছাকাছি গিয়ে পড়ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বৃদ্ধির চড়া হার আর বিপুল সম্ভাবনা থেকে আশাবাদ সৃষ্টি হয়েছিল কেরির অভিমতে। পুঁজিতান্ত্রিক ক্রমবৃদ্ধির কোন সীমা-পরিসীমা নেই বলে উৎসাহ আর বিশ্বাসে ভরপুর ছিলেন তিনি। উত্তর আমেরিকায় পুঁজিতান্ত্রিক উন্নয়নের বিশেষ পরিবেশ দেখে কেরি বুর্জোয়া সমাজের খুঁত আর দ্বন্দ্ব-অসংগতিগুলোকে অস্থায়ী

বলে ধরে মনে করেছিলেন বিশেষ মনোযোগ দেবার মতো কিছু নয় সেগুলো। বলা যেতে পারে, তথাকথিত মার্কিন একক-স্বাতন্ত্র্য নীতির সঙ্গে কেরির নামটি সংশ্লিষ্ট। প্রাচীন মহাদেশে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশে যা অনিবার্য ছিল সেইসব নেতিবাচক দিক (তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম, আর্থনীতিক সংকট) এড়িয়ে চলতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র — এই হল নীতিটা। সেটা একেবারে মিলিয়ে যায় নি আজ অবধি।

কেরির একটা কৃতিত্ব হিসেবে মার্কস বলেছেন, 'কোন-কোন গুরুত্বপূর্ণ আমেরিকান সম্পর্ক তিনি বিবৃত করেন বিমূর্ত ধরনে এবং প্রাচীন জগতের সেগুলোর বিপরীতে...'*

ইংলন্ডে যেমনটা তার বিপরীতে আমেরিকান সামাজিক সম্পর্কতন্ত্রটাকে দাঁড় করানোই ছিল কেরির মুখ্য বিশ্লেষণ-প্রণালী; তাঁর বিবেচনায় ইংলন্ডে সামাজিক সম্পর্ক ছিল অস্বাভাবিক এবং পুঁজিতন্ত্র 'সেটার আদর্শ আকারে যা' (অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় আকারে যা) তার বহিস্থ কোন-কোন হেতু-উপাদান দিয়ে নিরুদ্ধ। ইংলন্ডে সামন্ততন্ত্রের জেরগুলো ছিল বাস্তবিকই প্রবল এবং গুরুভার — সেগুলোর কথা বললে কেরির বক্তব্যটা কিছু পরিমাণে সঠিকই হত। কিন্তু 'স্বাভাবিক পরিবেশটাকে বিকৃত করে' যেসব হেতু-উপাদান তা দিয়ে তিনি বোঝাচ্ছিলেন কর, জাতীয় ঋণ এবং পুঁজিতন্ত্র বিকাশেরই সহজাত অন্যান্য ব্যাপার।

প্রধানত তাঁর স্বার্থ-সমন্বয় তত্ত্ব দিয়েই কেরি পরিচিত। এই তত্ত্বে বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীস্বার্থ বিরোধের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়, আর বলতে চাওয়া হয় যে, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি করে বিভিন্ন শ্রেণীর সত্যিকারের পরিমেল। বাস্তব ঘটনাবলির মধ্যে সেটা খণ্ডিত হয়ে যায় অনেক আগেই — উনিশ শতকে। উনিশ শতকের নবম দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী শ্রমিক ধর্মঘটগুলি হল আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের একটা উৎপত্তিস্থল।

স্মিথকে রেমন্ড যেভাবে আক্রমণ করেছিলেন তার চেয়েও প্রচণ্ড আক্রমণ কেরি চালিয়েছিলেন রিকার্ডোর উপর। কেরি বললেন রিকার্ডোর তত্ত্বটা হল শ্রেণীতে-শ্রেণীতে অমিলের ব্যবস্থা, আর তাঁর অবাধ বাণিজ্য সংক্রান্ত ধ্যান-

---

* K. Marx, 'Fondements de la critique de l'économie politique', V. 2, Paris, 1968, pp. 549-50.

ধারণা যেন মার্কিন পুঁজিপতিদের উপর ব্যক্তিগত হামলা। সৎ মানুষ, মহাপণ্ডিত এই ইংরেজ বুর্জোয়াটি কেরির দৃষ্টিতে ছিলেন সমাজতন্ত্রী, বিদ্রোহী, নাশক।

মার্কস মনে করতেন কেরির রচনা হল মধ্য-উনিশ শতকের বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আকরগুলোর একটা, আর তিনি বলেছেন, ক্রেডিট খাজনা ইত্যাদি প্রশ্নে কেরির আদ্যোপান্ত বিচার-বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থশাস্ত্রের বিকাশ সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণে সোভিয়েত গবেষক ল. ব. আল্‌তের দেখিয়েছেন ফ্রান্সে জার্মানিতে এবং রাশিয়ায় অর্থনীতি পরিচিন্তনের উপর কেরির প্রভাবটা কতখানি এবং কী রকমের।*

ইংলন্ড আর ফ্রান্সের ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের প্রভাবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক শ্রেণীর বেড়ে-চলা আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে অর্থনীতি চিন্তনের প্রথম-প্রথম বুর্জোয়াবিরোধী মতধারাগুলি দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকের তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকে। যেখানে ছিল বিপুল অনধ্যুষিত ভূমি সেই নবীন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি প্রাচীন জগতের বহু স্বপ্নলোকের মানুষ এবং সমাজ সংস্কারকের সামনে হয়ে উঠল 'রামরাজ্য'। যুক্তরাষ্ট্রে কমিউন স্থাপন করেছিলেন রবার্ট ওয়েন। বহু বছর ধরে সেখানে কাজকর্ম এবং প্রচার চালিয়েছিলেন ফরাসী কমিউনিস্ট এতিয়েন কাবে। শার্ল ফুরিয়ের প্রকল্প সেখানে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছিল কয়েকটা কমিউন। এই সবকিছুর ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল বহু রচনা, সেগুলির লেখকেরা আর্থনীতিক প্রশ্ন নিয়ে বিবেচনা করেছিলেন বিভিন্ন ইউটোপীয় সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। সাধারণত তাঁরা ইউরোপে এইসব তত্ত্বের প্রবর্তকদের প্রধান-প্রধান ধ্যান-ধারণা ছাড়িয়ে এগন নি (১৮ এবং ১৯ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয়াংশে পশ্চিমের নতুন ভূমিগুলিতে চলে গিয়েছিল মস্ত-মস্ত জনরাশি, তার ফলে একটা বিশেষ ইউটোপীয় মতধারা দেখা দিয়েছিল আমেরিকার সমাজ-চিন্তনক্ষেত্রে। স্বাধীন খামারী আর কারিগরদের সুখ-শান্তির সমাজ, সেখানে নেই ভারী শিল্প ব্যাঙ্ক কিংবা

---

* দ্রষ্টব্য — ল. ব. আল্‌তের, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র', মস্কো, ১৯৭১, ১০৮-১২৬ পৃঃ (রুশ ভাষায়)।

ফটকাবাজ, নেই রাজনীতিক নিগ্রহযন্ত্র — এই স্বপ্নটা ছিল বিকাশের বাস্তবিক ধারাগুলির একেবারেই বিরুদ্ধ, সেই সুখস্বপ্ন ভেঙে যাওয়াটা ছিল অবধারিত। তবে কৃষি-হস্তশিল্প সংশ্লিষ্ট রামরাজ্য কল্পনাগুলি অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

প্রথম-প্রথম মার্কসবাদী সংগঠনগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে, এইসব সংগঠনের নেতারা ছিলেন মার্কস এবং এঙ্গেলসের বন্ধু এবং একমতাবলম্বী। ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবের পরে তাঁরা দেশান্তরী হয়ে গিয়েছিলেন জার্মানি থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিখ্যাত সোভিয়েত গুপ্ত-সংবাদকর্মীর ঠাকুরদা ফ্রিডরিখ জরগে ছিলেন আমেরিকায় বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের সর্বপ্রথম প্রবক্তাদের একজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মার্কসীয় আর্থনীতিক শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছিলেন এঁরা, এইসব সংগঠন।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, প্রকাশন জগতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানক্ষেত্রে, রাজনীতিতে প্রাধান্য ছিল বুর্জোয়া ভাবাদর্শের, সেটার সঙ্গে তুলনায় পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমালোচকদের শক্তি আর সুযোগ-সম্ভাবনা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা দিয়েছিল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের কয়েকটা প্রতিপত্তিশালী সম্প্রদায়, সেগুলি 'রপ্তানির জন্যে পয়দা' করতে শুরু করেছিল সেই তখনই।

কেনে এবং তাঁর সম্প্রদায়

লোকের বৃত্তি (আর স্বীকৃতি) আসে বিভিন্ন উপায়ে। ফ্রাঁসোয়া কেনে ছিলেন ডাক্তার এবং নিসর্গবেদী। অর্থশাস্ত্র নিয়ে তিনি কাজে লেগেছিলেন প্রায় ষাট বছর বয়সে। তার মধ্যে তিনি চিকিৎসা-সংক্রান্ত প্রবন্ধ লিখেছিলেন কয়েক ডজন। কেনের জীবনের শেষের কয়েক বছর কেটেছিল বন্ধুবান্ধব, শিষ্য আর অনুগামীদের ঘনিষ্ঠ মহলের মধ্যে। এই মানুষটি সম্পর্কে খাটে লারোশ্‌ফুকোর এই কথাটা: 'বুড়িয়ে যাবার বিদ্যাটা আয়ত্ত করেছেন খুব কম জনেই।' তাঁর পরিচিত একজন বলেছেন, তাঁর আশি বছর বয়সের ধড়টার উপরে মাথাটা ছিল তিরিশ-বছরের। আঠার শতকের ফ্রান্সের সবচেয়ে বিশিষ্ট অর্থশাস্ত্রজ্ঞ হলেন কেনে।

জ্ঞানালোকনের যুগ

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস লিখেছেন: 'ফ্রান্সে আগামী বিপ্লবের জন্যে মানুষের মন যাঁরা প্রস্তুত করেছিলেন সেইসব মহামানব নিজেরাই ছিলেন চরম বিপ্লববাদী। একেবারে কোনরকমের বাহিস্থ কর্তৃত্ব তাঁরা মানেন নি। ধর্ম, প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজ, রাজনীতিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদি — সবকিছুরই চূড়ান্ত ক্ষমাহীন সমালোচনা, কোন রেহাই নেই: যুক্তির বিচারাসনের সামনে অস্তিত্বের যৌক্তিকতা দেখাতে হবে সবকিছুকে, নইলে ছাড়তে হবে অস্তিত্ব।'*

আঠার শতকের চিন্তাবীরদের দেদীপ্যমান কাতারে সম্মানিত স্থানে

* ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, 'অ্যান্টি-ড্যুরিং', ২৫ পৃঃ।

রয়েছেন কেনে আর তিউর্গো — ক্ল্যাসিকাল ফরাসী অর্থশাস্ত্রের এই দুজন স্রষ্টা।

জ্ঞানালোকদাতারা আশা করেছিলেন সামন্ততন্ত্রের বরফ গলে যাবে মানুষের মুক্তি-পাওয়া বোধশক্তি সূর্যের প্রখর রশ্মিতে। তা ঘটল না। ভয়ঙ্কর বরফভাঙা বিপ্লব ঘনিয়ে আসতে থাকল; যেসব ফিজিওক্র্যাট অর্থনীতিবিদ তখনও বেঁচে ছিলেন তাঁদের সমেত নবীন পর্যায়ের জ্ঞানালোকদাতারা চমকে পিছিয়ে গেলেন জনসাধারণের ক্রোধ-সাগরটা দেখে।

আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে কেনে অর্থনীতি নিয়ে কাজ শুরু করেন, তখনকার ফরাসী অর্থনীতি ঐ শতকের গোড়ায় যেমনটা ছিল, যখন লিখছিলেন বুয়াগিইবের, তার চেয়ে খুব একটা পৃথক ছিল না। ফ্রান্স তখনও কৃষিপ্রধান দেশ, তার আগেকার পঞ্চাশ বছরে কৃষকদের অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হয় নি। বুয়াগিইবেরের মতো কেনেও অর্থনীতি বিষয়ে কাজের শুরুতে ফ্রান্সের কৃষির নিদারুণ অবস্থার বিবরণ দেন।

তবে ঐ পঞ্চাশ বছরেও কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল বটে। পুঁজিতান্ত্রিক খামারী শ্রেণীটা দেখা দিয়ে উন্নতি করেছিল — বিশেষত উত্তর ফ্রান্সে; তারা ছিল জমির মালিক, কিংবা জমি খাজনা করে নিত ভূস্বামীদের কাছ থেকে। কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্যে কেনে ভরসা করেছিলেন এই শ্রেণীটারই উপর। এমন অগ্রগতিকে তিনি গোটা সমাজের সতেজ আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক বিকাশের ভিত্তি বলে বিবেচনা করেছিলেন, সেটা সঠিকই ছিল।

একের পর এক নিরর্থক বিধ্বংসী যুদ্ধে ফ্রান্স তখন অবসন্ন। এইসব যুদ্ধে খোয়া গিয়েছিল ফ্রান্সের দখল-করা সমস্ত বৈদেশিক রাজ্য, সেগুলোর সঙ্গে লাভজনক বাণিজ্যও। ইউরোপেও ফ্রান্সের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। শিল্প যোগান দিত প্রধানত রাজসভাসদবর্গ এবং উর্ধ্বতন শ্রেণীগুলোর বিলাসব্যসন আর অমিতাচারের জন্যে; কৃষকদের মোটের উপর চলত কুটিরশিল্পের জিনিসপত্র দিয়ে। লোর প্রণালীর চাঞ্চল্যকর ভরাডুবির ফলে ক্রেডিট আর ব্যাঙ্কিংয়ের প্রসার ব্যাহত হয়েছিল। আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ের ফ্রান্সে যাঁরা জনমতের প্রবক্তা ছিলেন তাঁদের অনেকের মতে শিল্প বাণিজ্য আর ফিনান্স কিছুটা অপদস্থ হয়েছিল। কৃষিকেই মনে হয়েছিল শান্তি শ্রীবৃদ্ধি আর স্বাভাবিকতার শেষ অবলম্বন।

লো মেতে গিয়েছিলেন ক্রেডিট নিয়ে, আর কৃষি নিয়ে মেতেছিলেন

কেনে, যদিও তাঁর ব্যক্তিতায় আর চরিত্রে কোন আতিশয্য ছিল না। প্রসঙ্গত বলি, গুরুটিতে সেটার অভাব পূরণ করেছিল তাঁর কোন-কোন শিষ্যের, বিশেষত মার্কুইস মিরাবোর অত্যুৎসাহ।

কৃষি নিয়ে পাগল হয়ে উঠেছিল জাতিটা, তবে সেটা নানা ধরনে। রাজসভায় এটা ছিল কেতামাফিক আলাপের বিষয়; ভার্সাইয়ে চলত খামার-খামার খেলা। প্রদেশে-প্রদেশে স্থাপিত হয়েছিল কতকগুলি কৃষি উন্নয়ন সমিতি, তারা চালু করতে চেয়েছিল কৃষির 'ইংরেজী' প্রণালী, অর্থাৎ অধিকতর উৎপাদনকর প্রণালী। কৃষি বিষয়ে বিবিধ রচনা প্রকাশিত হতে থাকল।

এই পরিস্থিতিতে সাড়া জাগাল কেনের ভাব-ধারণা, যদিও কৃষিতে তাঁর আগ্রহটা ছিল ভিন্ন রকমের। কৃষিকে অর্থনীতির একমাত্র উৎপাদী ক্ষেত্র হিসেবে ধরে নিয়ে কেনে এবং তাঁর সম্প্রদায় সেই ভিত্তিতে রচনা করলেন সামন্ততন্ত্রবিরোধী আর্থনীতিক সংস্কারের কর্মসূচি। পরে এইসব সংস্কার চালু করতে চেষ্টা করেন তিউর্গো। সেগুলোর বেশির ভাগ বলবৎ করেছিল বিপ্লব।

জ্ঞানালোকদাতাদের যে-বাম তরফ থেকে পরে দেখা দিয়েছিল ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র সেটার চেয়ে তো বটেই, জ্ঞানালোকদাতাদের দিদরোর পরিচালিত মূল অংশের চেয়েও মূলত অনেকটা কম বিপ্লবী এবং গণতন্ত্রী ছিলেন কেনে আর তাঁর অনুগামীরা। উনিশ শতকের একজন ফরাসী ইতিহাসকার তকভিল বলেন, তাঁরা ছিলেন 'ধীর-শান্ত মেজাজের মানুষ, নরমপন্থী মানুষ, সৎ সরকারী কর্মকর্তা, সুদক্ষ নির্বাহক...'* মিরাবোর সমসাময়িক একজন রসিক বলেছিলেন শেষে গিয়ে যাতে বাস্তিলে স্থানলাভ করতে না হয় এমন সবকিছু বলাই ফ্রান্সে বাকপটুতাবিদ্যার মর্ম — এমনকি মহা-উৎসাহী মিরাবোও সাধারণ্যে প্রচলিত কথাটায় মনোযোগ দিয়েছিলেন। ঠিক বটে তিনি একবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন অল্প কয়েক দিনের জন্যে, কিন্তু প্রতিপত্তিশালী ডাঃ কেনে তাঁকে জেল থেকে খালাস করিয়েছিলেন অচিরেই; স্বল্পকাল কয়েদ হবার ফলে তাঁর জনপ্রিয়তাই বেড়েছিল শুধু। তারপর তিনি কিছুটা সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন।

---

* Alexis de Tocqueville, 'L'ancien régime et la revolution', Paris, 1856, p. 265.

তবে বিষয়গত দিক থেকে, ফিজিওক্র্যাটদের ক্রিয়াকলাপ ছিল খুবই বৈপ্লবিক, তাতে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল প্রাচীন ব্যবস্থার ভিত্তি। যেমন, 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব'-তে মার্কস লিখেছেন, তিউর্গো ছিলেন 'ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম সাক্ষাৎ প্রবর্তক'।*

মার্কিজ পম্পাদুর-এর ডাক্তার

রাজার রক্ষিতাটির বয়স তখন তিরিশের সামান্য বেশি, তবু তাঁর প্রতি চপল বিলাসপরায়ণ ১৫শ লুইর পিরিতে ভাঁটা পড়ছিল। পরে তিনি রাজামশাইয়ের হারেমের কর্ত্রী হয়ে নিজের ক্ষমতায় অবস্থানটা বজায় রেখেছিলেন শেষ অবধি। ফ্রান্সে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী এই দু'জনের পরেই ছিলেন ডাঃ কেনে — মার্কিজ পম্পাদুরের খাস চিকিৎসক, আবার রাজার ডাক্তারদেরও একজন। একটু ঝুঁকে-পড়া কাঁধওয়ালা অনাড়ম্বর পোশাক-পরা এই মানুষটি ছিলেন সবসময়ে ধীর-স্থির এবং কিছুটা কৌতুকী: বহু রাষ্ট্রীয় এবং অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত গোপন তথ্যাদি তাঁর জানা ছিল। তবে ডাঃ কেনে মুখ বন্ধ রাখতেও জানতেন; এই গুণটির সমাদর তাঁর পেশার দক্ষতার সমাদরের চেয়ে কিছু কম ছিল না।

রাজামশাইয়ের মুনাসিব ছিল বোর্দো মদিরা, কিন্তু কেনে ব্যবস্থা দিলেন সেটা রাজার পেটে সয় না, তাই সেটা তাঁকে ছাড়তে হয়েছিল। কিন্তু ডিনারে তিনি এত বেশি শ্যাম্পেন পান করতেন যাতে তিনি টলতে-টলতে মার্কিজের মহলে যাবার সময়ে কখনও-কখনও পায়ের ওপর থাকা কঠিন হত। কয়েক বার তিনি মূর্ছা যান; কেনে ছিলেন নাগালের মধ্যে — তিনি মামুলি উপায়ে রোগীকে ভাল করে দেন। মাদাম তখন ভয়ে কাঁপেন — তাঁর বিছানায় রাজা মারা গেলে কী হবে ভেবে অস্থির: তিনি পড়বেন খুনের দায়ে! কেনে জোর গলায় আশ্বাস দেন তেমন আশঙ্কা নেই: রাজামশাইয়ের বয়স মাত্র চল্লিশ, ষাট হলে তিনি মৃত্যুর ব্যাপারে অমন জোর দিয়ে বলতে পারতেন না। অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান এই ডাক্তার চিকিৎসা করেছিলেন চাষী, অভিজাত আর দোকানদারদের পরিবারের মেয়েদের এবং রাজকুমারীদের — তিনি মাদামের মনের ভাব টের পেতেন সঙ্গে সঙ্গে।

---

* কার্ল মার্কস, 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব,' ১ম ভাগ, ৩৪৪ পৃঃ।

চিকিৎসার সাদাসিধে, প্রাকৃতিক উপায়ই কেনে বেশি পছন্দ করতেন — অনেকাংশে নির্ভর করতেন প্রকৃতির উপর। তাঁর সামাজিক আর আর্থনীতিক ধ্যান-ধারণাও ছিল পুরোপুরি এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অনুযায়ী। **ফিজিওক্র্যাসি** এই শব্দটার অর্থই হল প্রকৃতির ক্ষমতা (গ্রীক্ 'ফিজিস্' — প্রকৃতি, আর 'ক্রাতোস্' — ক্ষমতা থেকে)।

১৫শ লুই কেনের প্রতি সদয় ছিলেন, তাঁকে বলতেন 'আমার চিন্তক'। তিনি ডাক্তারকে একটা খেতাব দিয়েছিলেন, তাতে প্রতীক নিদর্শনের ডিজাইন বেছে দিয়েছিলেন তিনি নিজে। অঙ্গচালনার জন্যে কেনের দেওয়া ব্যবস্থা অনুসারে রাজা একটা হাতে-চালান প্রেসে নিজ হাতে ১৭৫৮ সালে ছেপেছিলেন কেনের 'Tableau économique' ('আর্থনীতিক সারণী'), এই রচনাটির জন্য কেনে বিখ্যাত হন। কেনে কিন্তু রাজাকে পছন্দ করতেন না, তাঁকে তিনি বিপজ্জনক বাজে লোক বলে মনে করতেন, সেটা তিনি অবশ্য প্রকাশ করতেন না। রাষ্ট্রের আইন-কানুনের বিচক্ষণ জ্ঞানালোকিত অভিভাবক: এমনটা ছিল ফিজিওক্র্যাটদের বিবেচনায় আদর্শ শাসক নৃপতি; কিন্তু মোটেই তেমনটা ছিলেন না এই রাজাটি। রাজসভায় নিজের সর্বক্ষণের উপস্থিতি এবং প্রভাব-পতিপত্তি ক্রমে-ক্রমে খাটিয়ে সিংহাসনে উত্তরাধিকারী ১৫শ লুইর ছেলে, দফিন্‌কে (যুবরাজকে) এবং তাঁর মৃত্যুর পরে এই রাজার নাতি দফিন্, হবু ১৬শ লুইকে তেমনি শাসক হিসেবে গড়ে তুলতে কেনে চেষ্টা করেছিলেন।

১৬৯৪ সালে ভার্সাইয়ের কাছে একটা গ্রামে ফ্রাঁসোয়া কেনের জন্ম হয়; তিনি ছিলেন নিকলাস কেনের তেরটির মধ্যে অষ্টম সন্তান। একসময়ে মনে হত বড় কেনে ছিলেন ব্যারিস্টার কিংবা বিচার বিভাগের কোন কর্মকর্তা, কিন্তু প্রকাশ পায় যে, ডাক্তারের জামাই এভেন নামে চিকিৎসক ওটা রটিয়েছিলেন ডাঃ কেনের পারিবারিক পরিবেশটাকে একটু জাঁকাল করে দেখাবার জন্যে: ডাঃ কেনে মারা যাবার একটু পরেই তাঁর জামাই প্রকাশ করেছিলেন শ্বশুরের প্রথম জীবনী। পরে দলিলপত্র থেকেই প্রমাণিত হয় ডাঃ কেনের বাবা নিকলাস ছিলেন একজন সাধারণ কৃষক, তিনি ছোটখাটো কেনা-বেচার ব্যাপারীও ছিলেন।

এগার বছর বয়স অবধি ফ্রাঁসোয়া নিরক্ষর ছিলেন। তখন একজন সহৃদয় মালী তাঁকে লিখতে-পড়তে শেখান। তারপর পড়াশুনো চলে গ্রামের পুরুতের কাছে এবং কাছাকাছি ছোট্ট শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এভেন

বলেন, ফ্রাঁসোয়াকে ঐ সময়ে খুব খাটতে হত খেতে আর বাড়িতে, বিশেষত তের বছর বয়সে বাবা মারা যাবার পরে। ছেলেটির পড়ার ঝোঁক ছিল প্রবল: কখনও-কখনও সে ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সারা রাস্তা হেঁটে প্যারিসে গিয়ে দরকারমতো বইখানা নিয়ে ডজন-ডজন কিলোমিটার পথ ভেঙে বাড়ি ফিরত রাত্রে। কৃষকের সহ্যশক্তিরও পরিচয় মেলে এতে। কম বয়স থেকেই তিনি গেঁটে বাতে কষ্ট পেতেন — সেটা না ধরলে কেনের স্বাস্থ্য ভাল ছিল একেবারে শেষ অবধি।

সার্জন হতে মনস্থ করে কেনে সতর বছর বয়সে স্থানীয় ডাক্তারের সহকারী হন। রক্তমোক্ষণ করতে পারাই ছিল তাঁর প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়: তখনকার দিনে সেটাই ছিল সর্বরোগহর চিকিৎসা। শিক্ষণ ছিল নিকৃষ্ট ধরনের, তবু কেনে পড়াশোনা করেছিলেন পরিশ্রম করে এবং খুব মন দিয়ে। ১৭১১ থেকে ১৭১৭ সাল অবধি তিনি প্যারিসে থেকে একটা খোদনের কর্মশালায় কাজ করতেন, তার সঙ্গে ডাক্তারিও করতেন একটা হাসপাতালে। তেইশ বছর বয়সে তিনি বেশ দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন এতটা যাতে তিনি মোটা যৌতুক পেয়ে বিয়ে করেছিলেন প্যারিসের এক মুদির মেয়েকে, সার্জনের ডিপ্লোমা পেয়ে প্যারিসের কাছে মান্ত শহরে প্রাকটিস শুরু করেন। কেনে মান্তে ছিলেন সতর বছর; অধ্যবসায় দক্ষতা এবং আস্থাভাজন হতে পারার বিশেষ ক্ষমতার কল্যাণে তিনি হয়ে উঠেছিলেন গোটা তল্লাটের সবচেয়ে জনপ্রিয় ডাক্তার। তিনি প্রসব করাতেন (বিশেষত এজন্যে তাঁর খ্যাতি ছিল), রক্তমোক্ষণ করাতেন, দাঁত তুলতেন, আর তখনকার দিনের পক্ষে বেশ জটিল কোন-কোন অস্ত্রোপচারও করতেন। ক্রমে-ক্রমে তাঁর রোগীদের মধ্যে আসছিল স্থানীয় অভিজাতেরা, তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়েছিল প্যারিসের হোমরাচোমরা লোকেদের সঙ্গে, কতকগুলো রচনা প্রকাশিত হয়েছিল চিকিৎসা বিষয়ে।

১৭৩৪ সালে কেনের স্ত্রী মারা যান, তখন তাঁর দুটি সন্তান, তিনি মান্ত ছেড়ে গিয়ে ভিলেরুয়া ডিউকের পরিবারের চিকিৎসক হন। আঠার শতকের চতুর্থ আর পঞ্চম দশকে অফিশিয়াল কেতাবী চিকিৎসাবিধির বিরুদ্ধে সার্জনদের আন্দোলনে তিনি বিস্তর প্রচেষ্টা নিয়োগ করেন। একটা সেকেলে সংবিধি অনুসারে সার্জনরা ছিল পরামানিকদের যা সেই একই গিল্ডের লোক, তাদের চিকিৎসার কাজ করা নিষেধ ছিল। কেনে হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন 'সার্জন পার্টি'র নেতা; শেষে তাঁদের জয় হয়েছিল। এই

সময়েই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রধান বৈজ্ঞানিক রচনা, সেটা ছিল চিকিৎসাগত-দার্শনিক গোছের নিবন্ধ, তাতে আলোচিত হয়েছিল চিকিৎসাবিদ্যা-সংক্রান্ত বিভিন্ন মূল প্রশ্ন: তত্ত্ব আর চিকিৎসা-ব্যবসায়ের মধ্যে সম্পর্ক, চিকিৎসা-নীতিবিদ্যা, ইত্যাদি।

কেনের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১৭৪৯ সালে তিনি মার্কিজ পম্পাদুরের কাজ নিলেন — তাঁকে মাদাম ডিউকের কাছ থেকে 'মিনতি করে চেয়ে নিয়েছিলেন'। ভার্সাই প্রাসাদের চিলেকোঠা হল তাঁর স্থায়ী বাসস্থান; অর্থনীতিবিজ্ঞানের ইতিহাসে এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল অবধারিত। কেনে ততদিনে মস্ত ধনী ব্যক্তি।

কেনের জীবনে এবং ক্রিয়াকলাপে একটা মস্ত স্থান জুড়ে ছিল চিকিৎসাবিদ্যা। দর্শনের সেতু দিয়ে তিনি যান চিকিৎসাবিদ্যা থেকে অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে। মানুষের দেহযন্ত্র, আর সমাজ। রক্তসংবহন বা মানুষের বিপাক, আর সমাজে উৎপাদগুলোর পরিচলন। কেনের চিন্তাধারাটাকে চালিত করল এই জীবধর্মগত উপমা, আর সেটা মূল্যবান রয়েছে আজ অবধি।

ভার্সাই প্রাসাদের চিলেকোঠার সেই আবাসে কেনের কেটেছিল পঁচিশ বছর। মারা যাবার মাত্র ছ'মাস আগে সেটা তাঁকে ছাড়তে হয়েছিল, যখন ১৫শ লুই মারা যান, আর নতুন রাজা প্রাসাদ থেকে ঝেঁটিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন পুরন আমলের সমস্ত চিহ্ন। কেনের ফ্ল্যাটে ছিল একটা বড় কিন্তু নিচু কামরা, তাতে আলো কম, আর প্রায়-অন্ধকার দুটো ভাঁড়ারঘর। তবে সেটাই হয়ে উঠেছিল 'সাহিত্য প্রজাতন্ত্র'-র, অর্থাৎ 'এনসাইক্লোপেডিয়া' ঘিরে আঠার শতকের ষষ্ঠ দশকের গোড়ার দিকে জড়ো হয়েছিলেন যেসব পণ্ডিত দার্শনিক আর লেখক তাঁদের একত্র হবার পছন্দসই জায়গাগুলির একটা। প্রথমে ডাঃ কেনে তাঁর ধ্যান-ধারণা ছড়াতেন ততটা নয় ছেপে যতটা কিনা তাঁর চিলেকোঠায় সমবেত বন্ধুবান্ধব মহলে। দেখা দিলেন তাঁর শিষ্যরা আর সদৃশমনা ব্যক্তিরা, তেমনি তাঁর থেকে ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিরাও। কেনের আবাসের বৈঠকগুলির ছবির মতো স্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন মার্মোন্তেল: 'কেনের চিলেকোঠার নিচে যখন একের পর এক ঝড় ঘনিয়ে আসত, আবার কেটে যেত, তখন তিনি কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে নিজ উপস্থাপনা আর পরিগণনা নিয়ে অক্লান্তভাবে কাজ চালিয়ে যেতেন; রাজসভার গতিবিধির ব্যাপারে তিনি থাকতেন অবিচলিত নির্বিকার, তিনি যেন সেখান থেকে শত যোজন দূরে। শান্তি, যুদ্ধ, জেনারেল বাছন, মন্ত্রী বরখাস্ত করা নিয়ে

আলোচনা চলত নিচে, আর চিলেকোঠায় আমরা আলোচনা করতাম কৃষি নিয়ে, নীট উৎপাদের হিসাব কষতাম, কিংবা কখনও-কখনও হাসিখুশির খানাপিনা চলত দিদরো, দালাঁবেয়ার, দুক্লো, হেলভেশিয়াস, তিউর্গো আর বিউফোঁর সঙ্গে; আর মাদাম পম্পাদুর দার্শনিকদের এই পলটনটিকে নামিয়ে নিজের বৈঠকখানায় নিতে না পেরে নিজেই চলে আসতেন তাঁদের সঙ্গে খাবার টেবিলে দেখাসাক্ষাৎ করে আড্ডা দেবার জন্যে।'*

পরে, যখন কেনের 'সেক্ট'** তাঁকে ঘিরে জড়ো হত তখন বৈঠকগুলির ধাঁচ-ধরন কিছুটা বদলে গিয়েছিল: টেবিল ঘিরে বসতেন প্রধানত কেনের শিষ্যরা আর অনুগামীরা কিংবা তাঁরা যাঁদের পরিচয় করিয়ে দিতেন গুরুজীর সঙ্গে। অ্যাডাম স্মিথের কয়েকটা সন্ধ্যা সেখানে কেটেছিল ১৭৬৬ সালে।

মানুষটি কেমন ছিলেন কেনে?

সমসাময়িকদের বহু বিবরণ আছে, সেগুলি বেশকিছুটা পরস্পরবিরুদ্ধ, তার থেকে যে-চিত্র ফুটে ওঠে তাতে দেখা যায় তিনি ছিলেন চতুর বিজ্ঞ জন, যিনি সরলতার ভাব দেখিয়ে বিচক্ষণতা প্রচ্ছন্ন রাখতেন কিছুটা; লোকে তাঁকে তুলনা করত সক্রেটিসের সঙ্গে। বলা যায় যার অর্থ গভীর এবং সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট নয় এমন উপাখ্যান শুনতে তিনি ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন খুবই সাদাসিধে, ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ তাঁর ছিল না। অনেক সময়ে তিনি নিজ ভাব-ধারণা প্রকাশ করে সম্মানিত হতে দিতেন শিষ্যদের, তাতে তাঁর একটুও অনুশোচনা হত না। তাঁর মামুলি চেহারাটা নজরে পড়ার মতো ছিল না, — 'চিলেকোঠার ক্লাবে' কোন নবাগত চট করে ঠাহর করে উঠতে পারত না কর্তাটি, অধ্যক্ষটি কে। মার্কুইস মিরাবোর ভাই তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের পরে বলেছিলেন, 'শয়তানের মতো চতুর'। 'বাঁদরের মতো চালাক' — একজন রাজসভাসদ বলেছিলেন তাঁর একটা গল্প শুনে। ১৭৬৭ সালে আঁকা তাঁর প্রতিকৃতিতে দেখা যায় একখানা অতি সাধারণ কুশ্রী

* 'Oeuvres complètes de Marmontel', t. I, Paris, 1818, pp. 291-92.

** ফিজিওক্র্যাট সম্প্রদায়কে এই নাম দেওয়া হয়েছিল। [শব্দটার মানে সাধারণত — ধর্মীয় উপদল। — অনুঃ] কোন অবজ্ঞা কিংবা ব্যঙ্গের অর্থ ছাড়াই শব্দটা প্রায়ই ব্যবহার করা হত কেনের অনুগামীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাবাদর্শগত সংযোগ বোঝাবার জন্যে। কেনেকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন অ্যাডাম স্মিথ, তিনিও 'জাতিসমূহের সম্পদ'-এ 'সেক্ট' সম্বন্ধে লেখেন।

মুখ, তাতে শ্লেষমাখা হাসির আভাস, আর চতুর চোখ-দুটোয় প্রখর চাউনি।

দালাঁবেয়ারের কথায়, কেনে ছিলেন 'রাজসভায় একজন দার্শনিক, যিনি সেখানে থাকতেন নিঃসঙ্গ হয়ে চিন্তামগ্ন, তিনি জানতেন না সে-এলাকার ভাষা*, তা জানতে চেষ্টাও করতেন না একটুও, সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁর বড় একটা কোন সংযোগ ছিল না, তিনি ছিলেন যেমন জ্ঞানালোকিত তেমনি পক্ষপাতশূন্য বিচারক যিনি সেখানে উক্ত যা শুনতেন কিংবা সেখানে কৃত যা দেখতেন সে-সম্পর্কে থাকতেন নির্লিপ্ত।'**

কেনে যে-কর্মব্রতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সেটার স্বার্থে তিনি মাদাম পম্পাদুর এবং রাজার উপর নিজের প্রভাবটাকে কাজে লাগাতেন। তিনি (তিউর্গোর সঙ্গে মিলে) আইনে সামান্য সংশোধন ঘটাতে আনুকূল্য করেছিলেন; সদৃশমনা বন্ধুবান্ধবের লেখা প্রকাশনের ব্যবস্থা করেছিলেন; লেমের্সিয়েকে তিনি একটা উঁচু পদে নিয়োগ করিয়েছিলেন, ইনি প্রথম ফিজিওক্র্যাটিক পরীক্ষা চালিয়েছিলেন এই পদে থেকে। ১৭৬৪ সালে মার্কিজ পম্পাদুর মারা যাবার পরে অর্থনীতিবিদদের অবস্থান কিছুটা কমজোর হয়ে পড়েছিল, তবে কেনে থেকে যান রাজার চিকিৎসা-উপদেষ্টা, রাজা তার প্রতি সদয় ছিলেন।

নতুন বিজ্ঞান

কৃষক তার জমি-বন্দে লাঙল চ'ষে সার দিয়ে বীজ বোনে, তারপর ফসল তোলে। সে কিছু বীজ-শস্য জমিয়ে রাখে, কিছু শস্য সরিয়ে রাখে পরিবারের খাদ্যের জন্যে, অত্যাবশ্যক শহুরে জিনিসপত্র কেনার জন্যে বেচে কিছু শস্য, তার পরেও কিছুটা উদ্বৃত্ত থাকলে সে খুশি। এর চেয়ে সাদাসিধে বৃত্তান্ত আর হতে পারে কী? তবু ডাক্তার কেনের বিভিন্ন ধ্যান-ধারণায় প্রবর্তনা এসেছিল এই রকমের ব্যাপার থেকেই।

উদ্বৃত্তটা দিয়ে কি হত সেটা কেনের ভালভাবেই জানা ছিল। কৃষক সেটা টাকায় কিংবা বস্তুশোধ হিসেবে দিত সামন্তমনিব, রাজা এবং গির্জাকে। ওরা

---

* রাজসভায় কানাকানি আর চক্রান্তের ভাষা।

** 'François Quesnay et la Physiocratie', Paris, 1958, t. 1, p. 240.

তার কতটা কে পাবে তারও হিসাব করেছিলেন তিনি: সাত ভাগের চার ভাগ — সামন্তমনিব, সাত ভাগের দুই ভাগ রাজা, আর গির্জা — সাত ভাগের একভাগ। এর থেকে দুটো প্রশ্ন ওঠে। এক, কৃষকের ফসল বা আয়ের একটা মোটা অংশ ঐ তিনে হস্তগত করে কোন্ অধিকারে? দুই, উদ্বৃত্তটা আসে কোথা থেকে?

প্রথম প্রশ্নে কেনের উত্তরটা মোটামুটি এই: রাজা আর গির্জা সম্পর্কে কিছুই বলার নেই — সেটা তো বলতে গেলে ঈশ্বরের হাতে। সামন্তমনিবদের প্রসঙ্গে তিনি বের করলেন একটা বিশেষ ধরনের আর্থনীতিক ব্যাখ্যা: তারা যে-খাজনা পায় সেটাকে তথাকথিত avances foncières ('ভূমিতে-দেওয়া দাদন') বাবত একরকমের সুদ বলে ধরা যেতে পারে; জমিটাকে চাষআবাদের উপযোগী অবস্থায় আনার জন্যে তারা অনেক-অনেক কাল আগে যে মূলধন বিনিয়োগ করেছিল বলে ধরে নিতে হবে সেটাকে বলা হল 'ভূমিতে-দেওয়া দাদন।' কেনে নিজে এতে বিশ্বাস করতেন কিনা তা বলা কঠিন। তবে যা-ই হোক, ভূস্বামী ছাড়া কৃষির কথা তিনি কল্পনা করতে পারেন নি। দ্বিতীয় প্রশ্নে উত্তরটা তাঁর কাছে আরও স্পষ্টপ্রতীয়মান। উদ্বৃত্তটাকে দিল মাটি, প্রকৃতি! সমানই স্বাভাবিকভাবে সেটা জমির মালিকের হাতে।

কৃষিজাতদ্রব্য উৎপাদনের সমস্ত খরচ-খরচা বাদ দেবার পরে দাঁড়ায় যে-উদ্বৃত্ত কৃষি-উৎপাদ সেটাকে produit net (**নীট উৎপাদ**) নাম দিয়ে কেনে সেটার উৎপাদন, বণ্টন আর পরিচলনের বিশ্লেষণ করলেন। ফিজিওক্র্যাটদের নীট উৎপাদ হল উদ্বৃত্ত উৎপাদ এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের সবচেয়ে কাছাকাছি আদিরূপ, যদিও তাঁরা সেটাকে সীমাবদ্ধ রাখলেন ভূমি-খাজনায়, আর সেটাকে গণ্য করলেন মাটির স্বাভাবিক ফল হিসেবে। তবে তাঁদের মস্ত অবদানটা হল এই যে, তাঁরা 'উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপত্তি সম্পর্কে সন্ধানটাকে পরিচলনক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন সাক্ষাৎ উৎপাদনক্ষেত্রে, আর এইভাবে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন বিশ্লেষণের ভিত্তি স্থাপন করলেন।'*

কেনে এবং অন্যান্য ফিজিওক্র্যাটরা উদ্বৃত্ত মূল্য আবিষ্কার করলেন শুধু কৃষিতেই — কেন? তার কারণ সেখানে এটা পয়দা হওয়া এবং এটার ভোগ-দখলের প্রক্রিয়াটা সবচেয়ে স্পষ্টপ্রতীয়মান। শিল্পক্ষেত্রে সেটাকে লক্ষ্য করা ঢের-ঢের বেশি কঠিন। ব্যাপারটা হল এই যে, একজন শ্রমিক একটা নির্দিষ্ট

---

* কার্ল মার্কস, 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব', ১ম ভাগ, ৪৫ পৃঃ।

পরিমাণ সময়ে মূল্য পয়দা করে তার নিজের জীবনধারণের খরচের চেয়ে বেশি। কিন্তু শ্রমিক যেসব পণ্য পয়দা করে সেগুলো তার ব্যবহার্য পণ্যগুলো থেকে একেবারেই আলাদা। জীবনভর সে হয়ত পয়দা করে নাট্ আর স্ক্রু, কিন্তু সে খায় রুটি, মাঝে-মাঝে মাংস, আর পান করে খুব সম্ভব ওয়াইন কিংবা বিয়ার। এক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত মূল্য লক্ষ্য করতে হলে নাট্ আর স্ক্রু-কে, রুটি আর ওয়াইন-কে একটাকিছু একক-শ্রেণীতে পরিণত করতে জানা চাই, অর্থাৎ থাকা চাই পণ্যের মূল্য-সংক্রান্ত ধারণা। এই ধারণা কেনের ছিল না। এতে তিনি স্রেফ আগ্রহান্বিত হন নি।

কৃষিতে উদ্বৃত্ত মূল্যটা যেন প্রকৃতির দান — সেটা যেন মানুষের মাগনা-শ্রমের ফল নয়। সেটা যেন স্বাভাবিক আকারের উদ্বৃত্ত উৎপাদে, বিশেষত শস্যে থাকে আপনা থেকেই। নিজ মডেলটাকে গড়ে তুলতে গিয়ে কেনে তাতে আনেন নি গরিব ভাগচাষীকে, তিনি এনেছেন তাঁর বড় প্রিয় প্রজা খামারীকে, যার আছে ভারবাহী পশু এবং খুব সাদাসিধে সরঞ্জাম, সে আবার জন খাটায়।

এই ধরনের খামারীদের অর্থনীতি নিয়ে ভাবতে গিয়ে কেনে পুঁজি সম্পর্কে একটাকিছু বিশ্লেষণ করেন, যদিও 'পুঁজি' শব্দটা পাওয়া যায় না তাঁর লেখায়। তিনি বুঝেছিলেন, যেমন ধরা যাক, জমি থেকে জলনিকাশ করা, নির্মাণের কাজ, ঘোড়া, লাঙল-মই বাবত খরচ-খরচা হল একরকমের দাদন, আর বীজ এবং খেতমজুরের ভরণপোষণ বাবত খরচ হল অন্য রকমের দাদন। আগের খরচটা হয় কয়েক বছরে একবার, সেটা পুনর্ভরণ হয় ক্রমে-ক্রমে, আর পরেরটা হয় বছর-বছর কিংবা সবসময়ে, সেটা পুনর্ভরণ হওয়া চাই প্রত্যেকটা ফসলের সময়ে। তদনুসারে avances primitives (যাকে আমরা বলি বদ্ধ পুঁজি) এবং avances annuelles (চলতি পুঁজি)-র কথা বলেছেন কেনে। এইসব ভাব-ধারণাকে বিস্তারিত করে তোলেন অ্যাডাম স্মিথ। এখন এসব তো অর্থবিদ্যার প্রাথমিক উপাদান, কিন্তু তখনকার দিনের পক্ষে এটা ছিল একটা মস্ত সাধনসাফল্য। 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব'-তে মার্কস ফিজিওক্র্যাটদের সম্পর্কে বিচার-বিবেচনার শুরুতে বলেছেন: 'বুর্জোয়া চৌহদ্দির ভিতরে **পুঁজির** বিশ্লেষণ ফিজিওক্র্যাটদেরই উল্লেখযোগ্য কৃতি। তাঁরা যথার্থই আধুনিক অর্থশাস্ত্রের জনক হয়ে উঠলেন এই কাজটারই জন্যে।'*

* কার্ল মার্কস, 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব', ১ম ভাগ, ৪৪ পৃঃ।

এইসব ধারণা চালু করে কেনে পুঁজির পরিচলন এবং পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের ভিত্তি স্থাপন করেন, — ঐ প্রক্রিয়াটা হল উৎপাদন আর বিক্রি প্রক্রিয়ার অবিরাম নবপর্যায় এবং পুনরাবৃত্তি, যেটা অর্থনীতির যুক্তিসম্মত ব্যবস্থাপনের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে **পুনরুৎপাদন**, এই কথাটাকেই সর্বপ্রথমে প্রয়োগ করেন কেনে।

কেনে তাঁর আমলের সমাজের শ্রেণীগত গঠনের বর্ণনা করেছেন এইভাবে। 'তিন শ্রেণীর নাগরিকদের নিয়ে জাতিটা: **উৎপাদী শ্রেণী, মালিক শ্রেণী এবং নিষ্ফলা শ্রেণী**।'*

আপাতদৃষ্টিতে বিভাগটা অদ্ভুতই বটে। কিন্তু এটা স্বভাবতই এসেছে কেনের মতবাদের মূল উপাদানগুলি থেকে, আর এতে প্রকাশ পেয়েছে ঐ মতবাদের গুণাগুণ দুইই। খামারী প্রজাদের শ্রেণী তো নিশ্চয়ই উৎপাদী, তারা নিজেদের মূলধন ব্যয় পুনর্ভরণ করে এবং নিজেদের অন্নসংস্থান করে শুধু তাই নয়, তার উপরি পয়দা করে কিছু নীট উৎপাদ। নীট উৎপাদ গ্রহীতাদের নিয়ে মালিক শ্রেণী: ভূস্বামী, রাজসভা, গির্জা, আর তাদের সমস্ত চাকরবাকরও। শেষে, বাদবাকি সবাইকে নিয়ে নিষ্ফলা শ্রেণী, অর্থাৎ — কেনের নিজেরই ভাষায় — 'কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমনসব ব্যাপারে এবং অন্যান্য কাজে যারা ব্যাপৃত'।

এই নিষ্ফলা বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন কেনে? কারিগর, মজুর এবং ব্যাপারীদের তিনি নিষ্ফলা বলে ধরেন ভূস্বামীদের থেকে ভিন্ন অর্থে। ওরা কাজ করে বটে, কিন্তু যা জমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় সেই শ্রমে তারা পয়দা করে ততটাই যতটা তারা ভোগ-ব্যবহার করে, তাতে তারা কৃষিজাতদ্রব্যের স্বভাবজ আকারটাকে বদলেই দেয় শুধু। কেনের বিবেচনায় এদের যেন অন্য শ্রেণী-দুটো জন খাটাত। মালিকেরা কাজ করে না, কিন্তু তারা জমির মালিক, যে-জমিকে কেনে মনে করতেন একমাত্র উৎপাদনের উপাদান যা বাড়াতে পারে সমাজের সম্পদ। নীট উৎপাদ আত্মসাৎ করাই তাদের সামাজিক কর্ম।

এই ছকটার দোষ-ত্রুটি বিপুল। শুধু এটা বলাই যথেষ্ট: শিল্প আর

* 'François Quesnay et la Physiocratie', Paris, 1958, t. II, p. 793.

কৃষি উভয় ক্ষেত্রে মজুর আর পুঁজিপতিদের একই শ্রেণীতে ফেলেছেন কেনে। এই অদ্ভুত ভুলটাকে কিছু পরিমাণে সংশোধন করেছিলেন তিউর্গো, আর স্মিথ সেটাকে একেবারেই বাতিল করে দেন।

ধরা যেতে পারে আর-একটা দফা, এটারও গুরুত্ব সামান্য নয়। কোন পুঁজিপতি যদি পায় শুধু মাইনে গোছের কিছু, তাহলে সে পুঁজি জমাতে পারে কিভাবে, কোথা থেকে? কেনে এটাকে এড়িয়ে গেছেন নিম্নলিখিত উপায়ে। তিনি বলেন, একমাত্র স্বাভাবিক, আর্থনীতিক বিচারে 'ন্যায্য' সঞ্চয়ন হল যেটা করা হয় নীট উৎপাদ থেকে, অর্থাৎ ভূস্বামীর আয় থেকে। ম্যানুফ্যাকচারার এবং বণিক সঞ্চয়ন করতে পারে শুধু এমন উপায়ে যেটা পুরোপুরি 'ন্যায্য' নয়: তাদের 'মাইনে' থেকে কিছুটা সরিয়ে নিয়ে। পুঁজিপতিদের মিতাচারের সাহায্যে সঞ্চয়নের সাফাইদারী তত্ত্বের উৎপত্তি এখান থেকেই। কেনে সর্বাগ্রে এবং সর্বোপরি সাধারণভাবে শ্রেণী-সহযোগই দেখেছেন সমাজে। শুম্পিটার বলেছেন, কেনে তুলে ধরেন 'বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের সর্বাত্মক সমন্বয়, এটাই তাঁকে করে তুলল উনিশ শতকের সমন্বয়বাদের (সে', কেরি, বাস্তিয়া) পথিকৃৎ'* — এই উক্তিটা আপতিক নয়।

কেনের মতবাদটাকে অবশ্য এতেই পর্যবসিত করা চলে না। দেখা যাক কোন্ ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত আসে এর থেকে। বড়-বড় খামারে কৃষিকাজ চালিয়ে সর্বতোভাবে কৃষির উন্নতিবিধানই স্বভাবতই ছিল তাঁর প্রথম সুপারিশ। তবে এটার পরে ছিল আরও দুটো সুপারিশ, যা তখনকার দিনে তত নির্বিরোধ মনে হয় নি। কেনে মনে করতেন, একমাত্র যথার্থ আর্থনীতিক 'উদ্বৃত্ত' হিসেবে শুধু নীট উৎপাদের উপরই কর ধার্য হওয়া উচিত। অন্যান্য সমস্ত করই অর্থনীতির উপর বোঝা। কার্যক্ষেত্রে তাতে কী বোঝাল? — না যাদের কাছে কেনে সমাজের অতসব গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানের কর্ম ন্যস্ত করছিলেন সেই সামন্ত মনিবদেরই দিতে হবে সমস্ত কর। তখনকার দিনে ফ্রান্সে অবস্থাটা ছিল একেবারেই তার বিপরীত: তারা আদৌ কোন করই দিত না। অধিকন্তু কেনে বললেন, যেহেতু শিল্প আর বাণিজ্যের 'হেপাজত করে' কৃষি তাই সেটা হওয়া চাই যথাসম্ভব কম খরচে। তার মানে ছিল উৎপাদন আর বাণিজ্যের উপর সমস্ত বাধা-নিষেধ আর নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে দেওয়া কিংবা অন্তত ঢিলে দেওয়া। Laissez faire (অবাধ-নীতি)-র পক্ষে দাঁড়ালেন ফিজিওক্র্যাটরা।

* J. A. Schumpeter, 'History of Economic Analysis', p. 234.

এইগুলি হল কেনের মতবাদের, আর ফিজিওক্র্যাট সম্প্রদায়ের প্রধান-প্রধান মর্মবস্তু। যাবতীয় দোষ-ত্রুটি এবং দুর্বলতা সত্ত্বেও এটা ছিল আর্থনীতিক এবং সামাজিক বিবেচনাধারার একটা সমগ্র সত্তা, যেটা তখনকার দিনে ছিল তত্ত্বে এবং চালিতকর্মে প্রগতিশীল।

কেনের ভাব-ধারণাগুলি ছড়িয়ে রয়েছে বহু সংক্ষিপ্ত রচনায় এবং তাঁর শিষ্য আর অনুগামীদের লেখায়। তাঁর নিজের রচনাগুলি ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল নানা আকারে, প্রায়ই অনামী। কিছু-কিছু ছিল পাণ্ডুলিপিতে — সেগুলি আবিষ্কৃত এবং প্রকাশিত হয় সবে বিশ শতকে। কেনের রচনাগুলি আজকালকার পাঠক অনায়াসে বুঝতে পারেন না, যদিও নাতিস্থূল এক খণ্ডে সেগুলি এখন রয়েছে: তাঁর প্রধান-প্রধান ধারণাগুলিকে অর্থের বিভিন্ন ছোপে এবং রকমফের আকারে নতুন করে তুলে ধরা হয়েছে, পুনরাবৃত্ত করা হয়েছে, যাতে সেগুলোকে ধরা কঠিন। কেনের শিষ্য দ্যুপোঁ দ্য নেমুর ১৭৬৮ সালের 'De l'origine et des progrès d'une science nouvelle' ('একটি নতুন বিজ্ঞানের উদ্ভব এবং অগ্রগতি') নামে একখানা বই প্রকাশ করেন। ফিজিও-ক্র্যাট সম্প্রদায় উদ্ভবের মোটামুটি বিবরণ এতে দেওয়া হয়। হতে পারে, বইখানার নামটাকে এখন আমরা যেভাবে বুঝছি তেমন ব্যাখ্যা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না, কিন্তু ইতিহাসে প্রতিপন্ন হয়েছে আসল কথাটাই তিনি বলেছিলেন। কেনের রচনাবলিতে বাস্তবিকই গড়ে উঠল একটি নতুন বিজ্ঞান — ক্ল্যাসিকাল ফরাসী আকারের অর্থশাস্ত্র।

ফিজিওক্র্যাটরা

ফিজিওক্র্যাটদের মতবাদের বুর্জোয়া সারমর্মটায় পরানো ছিল সামন্ততান্ত্রিক বেশ, এই হল সেটার একটা বিশেষত্ব। কেনে শুধু নীট উৎপাদকেই করযোগ্য করাতে চাইলেও তিনি কর্তৃপক্ষ মহলের মার্জিত স্বার্থের কথাটা প্রধানত মনে রেখেই সেটা করেছিলেন, — তাদের ভূমি থেকে আয় বাড়বে, ভূস্বামী অভিজাতকুলের শক্তি বাড়বে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন।

'কায়দা'টায় কাজ হয়েছিল অনেকটা। সেটা কর্তৃপক্ষ মহলের নির্বুদ্ধিতার জন্যেই শুধু নয়। তার আরও কারণ হল এই যে, ভূস্বামী অভিজাতেরা

প্রকৃতপক্ষে রক্ষা পেতে পারত শুধু বিভিন্ন বুর্জোয়া সংস্কারের সাহায্যেই, যেসব সংস্কার ইতোমধ্যে বলবৎ হয়েছিল ইংলণ্ডে — ভিন্ন পরিস্থিতিতে, তা ঠিক। তবে বৃদ্ধ ডাক্তার কেনের দেওয়া ব্যবস্থায় তেতো ওষুধের বড়িটাকে বেশ মিঠে করে বানিয়ে সুন্দর মোড়কে পুরে দেওয়া হয়েছিল।

গোড়ার কয়েক বছরে ফিজিওক্র্যাট সম্প্রদায়ের ফলাও উন্নতি হয়েছিল। ডিউকরা আর মার্কুইসরা এটার আনুকূল্য করছিলেন; এটা সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন কোন-কোন বৈদেশিক নৃপতি। তেমনি, এই সম্প্রদায়টিকে খুবই ভাল চোখে দেখেছিলেন দিদরো সমেত জ্ঞানালোকন দার্শনিকেরা। সবচেয়ে চিন্তাশীল অভিজাতেরা এবং বাড়ন্ত বুর্জোয়া উভয় পক্ষের সমর্থনলাভ করতে পেরেছিলেন ফিজিওক্র্যাটরা গোড়ার দিকে। ফিজিওক্র্যাটিক মহল আগে ছিল ভার্সাইয়ের 'চিলেকোঠার ক্লাব', তাতে শামিল হতে পারতেন বাছা-বাছা অল্প কয়েক জন মাত্র, কিন্তু আঠার শতকের সপ্তম দশকের শুরু থেকে তার উপর বলা যেতে পারে, সাধারণের ফিজিওক্র্যাটিক মহল গড়ে উঠেছিল প্যারিসে মার্কুইস মিরাবোর বাড়িতে। এখানে কেনের শিষ্যরা (তিনি নিজে যেতেন কদাচিৎ) গুরুজীর ভাব-ধারণা প্রচার করতেন, সাধারণ্যে তুলে ধরতেন, জোটাতেন নতুন-নতুন সমর্থক। ফিজিওক্র্যাটিক 'সেক্ট'-এর কোষকেন্দ্রটা ছিল দ্যুপোঁ দ্য নেমুর,* লেমের্সিয়ে দ্য লা রিভিয়ের এবং কেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অন্যান্যদের নিয়ে। এই কোষকেন্দ্রটিকে ঘিরে জড়ো হয়েছিলেন কেনের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের বিভিন্ন গ্রুপ (এঁরাও 'সেক্ট'-এর সদস্য), নানা রকমের দরদী এবং সহযাত্রীরা! তিউর্গো ছিলেন একটা বিশেষ স্থানে, তিনি ফিজিওক্র্যাট সম্প্রদায়ে ছিলেন অংশত, কিন্তু চিন্তাবীর হিসেবে তিনি ছিলেন এতই মস্ত এবং স্বতন্ত্র যাতে তিনি গুরুজীর পোঁ-ধরা মাত্র হন নি। তিউর্গো যখন 'ভার্সাইয়ের চিলেকোঠা'র ছুতোরের গড়া 'প্রোক্রাস্টিয়ান খাট'-এর** মাপে

* বিপ্লবের পরে দ্যুপোঁ চলে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সেখানে তাঁর ছেলে প্রতিষ্ঠা করেন পারিবারিক কারবার, যেটা বেড়ে শেষে হয়ে দাঁড়ায় কেমিক্যাল শিল্পে বিশাল একচেটে কারবার — 'দ্যুপোঁ দ্য নেমুর অ্যান্ড কম্পানি'।

** গ্রীক পুরাণের এক দৈত্য পথিকদের ধরে একখানা লোহার খাটে বেঁধে তার পা কেটে কিংবা টেনে লম্বা করে খাটের মাপসই করে নিত — তার সঙ্গে এই তুলনাটা। — অনুঃ

গুটিয়ে যেতে পারেন নি, কাজেই ফিজিওক্র্যাট সম্প্রদায় এবং সেটার নেতাকে আমাদের লক্ষ্য করা চাই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

কেনের শিষ্যদের ঐক্য আর সংহতি, গুরুর প্রতি তাঁদের পরম আনুগত্য নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয়। কিন্তু এটাই শেষে গিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছিল সম্প্রদায়টির দুর্বলতা। কেনের অভিমতগুলির, এমনকি তাঁর গোটা-গোটা উক্তির হুবহু বিবৃতি এবং পুনরাবৃত্তিই হয়ে দাঁড়িয়েছিল সম্প্রদায়টির সমগ্র ক্রিয়াকলাপ। ধরাবাঁধা নানা আপ্তবাক্যের আকারে ক্রমাগত বেশি পরিমাণে অকেজো হয়ে পড়েছিল তাঁর ভাব-ধারণাগুলি। প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মিরাবোর বাড়িতে নতুন-নতুন চিন্তাধারা আর আলোচনার জায়গায় ক্রমেই আরও বেশি পরিমাণে চলতে থাকল আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপার। ফিজিওক্র্যাসি এক কিসিমের ধর্মে পরিণত হতে থাকল — মিরাবোর বাড়ি সেটার পুজা-মন্দির, সেটার প্রার্থনা-অনুষ্ঠান কাল মঙ্গলবারের সন্ধ্যা।

সদৃশমনা মানুষের একটা গ্রুপ অর্থে 'সেক্ট'টা আমরা এখন যে-তাচ্ছিল্যের অর্থে শব্দটাকে ব্যবহার করি সেই রকমের 'সেক্ট'এ পরিণত হতে থাকল, সেটা হল — ভিন্নমতাবলম্বী যেকোন লোক থেকে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে এমনসব লোকের একটা গ্রুপ, যারা ধরাবাঁধা আপ্তবাক্যে অন্ধবিশ্বাসী।

ফিজিওক্র্যাটদের প্রকাশনার ভার ছিল দ্যুপোঁর উপর, হাতে যা পড়ত সেটাকে তিনি 'সম্পাদনা' করে তাতে ফিজিওক্র্যাটিক ধাঁজ ধরিয়ে দিতেন। এতে একটা মজাদার দিক ছিল: কেনে নিজেকে যতখানি ফিজিওক্র্যাট বলে কখনও জাহির করেছিলেন তার চেয়ে বেশি পরিমাণে ফিজিওক্র্যাট বলে নিজেকে মনে করে দ্যুপোঁ কেনের গোড়ার দিককার রচনাগুলি প্রকাশ করতে নারাজ হয়েছিলেন (দ্যুপোঁ মনে করতেন সেগুলি লেখার সময়ে কেনে পুরোদস্তুর ফিজিওক্র্যাট হয়ে ওঠেন নি)।

কেনের চরিত্রের কোন-কোন বৈশিষ্ট্য ছিল এই অবস্থা সৃষ্টি হবার অনুকূল। দ. ই. রজেনবের্গ তাঁর 'অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস'-এ লিখেছেন, 'যাঁর সঙ্গে একত্রে কেনে অর্থশাস্ত্রের প্রবর্তক বলে সম্মানিত হয়েছেন সেই উইলিয়ম পেটির মতো নয় — কেনে ছিলেন অনড় নীতিনিষ্ঠ মানুষ, কিন্তু এঁর ছিল মতান্ধতা আর গোঁড়ামির প্রবল প্রবণতা।'* কালক্রমে বেড়ে গিয়েছিল এই প্রবণতা, সেটাকে অবশ্য আরও চাগিয়ে তুলেছিল 'সেক্ট'-এর ভক্ত-

* দ. ই. রজেনবের্গ, 'অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস', ১ খণ্ড, মস্কো, ১৯৪০, ৮৮ পৃঃ (রুশ ভাষায়)।

আনুগত্য। এই নতুন বিজ্ঞানের নীতিগুলিকে 'স্বতঃপ্রতীয়মান' বলে বিশ্বাস ক'রে কেনে পরমতে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন, আর 'সেক্ট' এই অসহিষ্ণুতাটাকে আরও অনেক পরিমাণে প্রবল করে তুলেছিল। স্থান কাল আর পরিবেশ নির্বিশেষে নিজ মতবাদ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে কেনের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল।

তাঁর শিষ্টতা কিন্তু কমে যায় নি একটুও। তিনি যশ চান নি, কিন্তু হয়েছেন যশস্বী। শিষ্যদের তিনি তুচ্ছজ্ঞান করেন নি, কিন্তু তাঁরা খাটো করে ফেলেছিলেন নিজেদের। জীবনের শেষ কয়েক বছরে কেনে অসহ্যরকম জেদি হয়ে উঠেছিলেন। ছিয়াত্তর বছর বয়সে গণিতচর্চা শুরু করে ভেবে নিয়েছিলেন তিনি কিছু-কিছু মস্ত আবিষ্কার করেন জ্যামিতিতে। দালাঁবেয়ার লক্ষ্য করেছিলেন ঐসব আবিষ্কার ছিল রাবিশ। এই বৃদ্ধ যাতে নিজেকে হাস্যাস্পদ না করেন, যে রচনায় তিনি ঐসব ধারণা তুলে ধরেন সেটা যাতে প্রকাশ না করেন, এটা বোঝাতে তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা সবাই মিলে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বৃথাই। ১৭৭৩ সালে রচনাটা প্রকাশিত হলে মনে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছিলেন তিউর্গো: 'কেলেঙ্কারির আর সীমা-পরিসীমা রইল না — এ তো জ্যোতিহারা সূর্য।' এর উত্তরে শুধু বলা যায় সেই-যে কথায় বলে: সূর্যেও কলঙ্ক আছে।

১৭৭৪ সালে ডিসেম্বর মাসে ভার্সাইয়ে কেনে মারা যান। তাঁর জায়গায় যাঁকে বসান যেতে পারে এমন কাউকে ফিজিওক্র্যাটরা পান নি। তার উপর, তাঁদের অধোগতি তখন ঘটে গিয়েছিল অনেকখানি। ১৭৭৪ থেকে ১৭৭৬ সালে সরকারী পদে তিউর্গোর কার্যকালে তাঁদের আশা-ভরসা আর কাজকর্ম চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তিনি অবসর নিলে সেটা হয়েছিল তাঁদের উপর একটা প্রচন্ড আঘাত। প্রকৃতপক্ষে সেখানেই ফিজিওক্র্যাটদের শেষ। আর সেই ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত হয় অ্যাডাম স্মিথের 'জাতিসমূহের সম্পদ'। পরবর্তী পর্যায়ের ফরাসী অর্থনীতিবিদেরা — সিস্‌মন্দি, সে' এবং অন্যান্যেরা — চলেছিলেন ফিজিওক্র্যাটদের চেয়ে বরং স্মিথের দেখানো পথেই বেশি। ১৮১৫ সালে দুপোঁ খুবই বৃদ্ধ, ঐ সময়ে তিনি সে'-র কাছে লেখা চিঠিতে অনুযোগ করে লিখেছিলেন তিনি (সে') কেনের দুধে পালিত হয়ে 'নিজের ধাইমাকে পায়ে ঠেললেন'। তার উত্তরে সে' লিখেছিলেন, কেনের দুধের পরে তিনি খেয়েছিলেন অনেক রুটি আর মাংস, অর্থাৎ স্মিথ এবং অন্যান্য অর্থনীতিবিদদের রচনা তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন।

আঠার শতকের অষ্টম দশকে ফিজিওক্র্যাটদের মতবাদের পতন ঘটল সেটার দোষ-ত্রুটির ফলেই শুধু নয়। তীব্র সমালোচনা হয়েছিল এই মতবাদের — সেটা আবার নানা দিক থেকে। রাজসভার আনুকূল্য আর না থাকার ফলে ফিজিওক্র্যাটদের উপর প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তদের আক্রমণ চলেছিল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সমালোচনা করেছিলেন জ্ঞানালোকনের বাম তরফের লেখকেরা।

ডাক্তার কেনে-র 'আঁকাবাঁকা ধারা'

কেনের ব্যক্তিতা সম্পর্কে বহু আগ্রহজনক তথ্য আছে মার্মোন্তেলের স্মৃতিকথায়। এতে বলা হয়েছে ডাক্তার কেনে 'নীট উৎপাদের আঁকাবাঁকা ধারা' চিহ্নিত করতে শুরু করেছিলেন অনেক আগেই, ১৭৫৭ সালে। সেটা হল 'আর্থনীতিক সারণী'; কেনের নিজের এবং তাঁর শিষ্যদের বিভিন্ন রচনায় বারবার প্রকাশ করে এটার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল। তবে সেটার সমস্ত রকমফের আকারেই 'সারণী'টা একই: কৃষিক্ষেত্রে পয়দা হয় দেশের যে-থোক আর নীট উৎপাদ সেটা বস্তু এবং অর্থ আকারে কিভাবে পরিচালিত হয় কেনে যে-তিনটে শ্রেণীতে সমাজকে বিভক্ত করেন সেগুলির মধ্যে সেটা দেখান হয় পরিসাংখ্যিক দৃষ্টান্ত আর গ্রাফ্-এর সাহায্যে।

তবু এই 'আর্থনীতিক সারণী' সম্পর্কে আধুনিক মনোভাবের একটা সাধারণ ধারণা দেবার জন্যে আকাদমিশিয়ন ভ. স. নেমচিনভের বক্তব্য এখানে দেওয়া হচ্ছে। 'বিভিন্ন আর্থনীতিক-গাণিতিক প্রণালী এবং মডেল' বইখানার জন্যে তিনি লেনিন পুরস্কার পান, তাতে তিনি লিখেছেন: 'আঠার শতকে অর্থনীতি বিজ্ঞান গড়ে ওঠার প্রারম্ভে... ফ্রাঁসোয়া কেনে... প্রস্তুত করেন 'আর্থনীতিক সারণী', সেটা মানুষের পরিচিন্তন বিস্তারের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। এই সারণী প্রকাশিত হবার পরে দু'-শ' বছর কেটে যায় ১৯৫৮ সালে, তবু এতে রয়েছে যেসব ভাব-ধারণা সেগুলির তাৎপর্য মিলিয়ে যায় নি শুধু তাই নয়, সেগুলি বরং আরও বেশি মূল্যবান হয়ে উঠেছে। ...আধুনিক আর্থনীতিক লবজে কেনের সারণী হল সার্ব-আর্থনীতিক বিশ্লেষণের সর্বপ্রথম চেষ্টাগুলির একটা, যার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে থোক সামাজিক উৎপাদ সংক্রান্ত ধারণাটা।... বস্তু (পণ্য) আর অর্থ আকারে বৈষয়িক মূল্যবস্তুসমূহের চলন সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রের ইতিহাসে প্রথম সার্ব-

আর্থনীতিক ছক হল ফ্রাঁসোয়া কেনের 'আর্থনীতিক সারণী'। এতে রয়েছে যেসব ধ্যান-ধারণা সেগুলি হল জায়মান অবস্থায় ভবিষ্য আর্থনীতিক মডেল। বিশেষত, কার্ল মার্কস সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের পরিকল্প রচনার সময়ে ফ্রাঁসোয়া কেনের চমৎকার কাজের সপ্রশংস উল্লেখ করেছিলেন...'*

এই উদ্ধৃতির সাধারণ ধারণাটা পাঠকের কাছে স্পষ্টই হবে, তবে বিশেষ-বিশেষ দিক হয়ত স্পষ্ট করে তোলা দরকার। সামাজিক উৎপাদ, জাতীয় আয়, পুঁজি বিনিয়োগ, ইত্যাদি গোটা-গোটা আর্থনীতিক ব্যাপার এবং সেটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর্থনীতিক প্রশ্নগুলির বিশ্লেষণ হল সার্ব-আর্থনীতিক বিশ্লেষণ। তার বিপরীতে পণ্য, মূল্য, দাম, ইত্যাদি এবং পৃথক-পৃথক পুঁজির পরিচলন-সংক্রান্ত ধারণামৌল আর প্রশ্নের বিশ্লেষণ হল অণু-অর্থবিদ্যা। সামাজিক উৎপাদের পুনরুৎপাদন আর পরিচলনের একটা প্রকল্পিত পরিকল্প হল কেনের সার্ব-আর্থনীতিক মডেল — সেটা করা হয় কোন-কোন অনুমান আর স্বীকার্যের ভিত্তিতে। মার্কস তাঁর অতি চমৎকার পুনরুৎপাদন পরিকল্পের একটা প্রধান অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন এটাকে।

১৮৬৩ সালে ৬ জুলাই এঙ্গেলসের কাছে লেখা চিঠিতে মার্কস এক্ষেত্রে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণের বিবরণ প্রথমে দিয়ে একটা অঙ্কে আর নকশায় একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন: বদ্ধ পুঁজি (কাঁচামাল, জালানি, যন্ত্রপাতি) ব্যয়, চলতি পুঁজি (শ্রমিকদের মজুরি) এবং উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে কিভাবে থোক উৎপাদ দেখা দেয়। এই উৎপাদ গড়ে ওঠে সামাজিক উৎপাদনের পৃথক-পৃথক দুটো উপ-বিভাগে: যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, ইত্যাদির উৎপাদন (প্রথম উপ-বিভাগ), ব্যবহারের জিনিস উৎপাদন (দ্বিতীয় উপ-বিভাগ)।**

মার্কস এই চিঠিতে নিজের ছকটার ঠিক নিচে তুলে ধরেছিলেন 'আর্থনীতিক সারণী'টাকে, বরং বলা ভাল সেটার মর্মটাকে — এর থেকে দেখা যায় কেনের ভাব-ধারণা তাঁকে কতখানি অনুপ্রাণিত করেছিল। এমনকি এই

* ভ. স. নেমচিনভ, 'বিভিন্ন আর্থনীতিক-গাণিতিক প্রণালী এবং মডেল', মস্কো, ১৯৬৫, ১৭৫, ১৭৭ পৃঃ (রুশ ভাষায়)।

** এই চিঠি লেখার সময়েও মার্কস উলটে জীবনধারণের উপকরণ উৎপাদনকেই ধরতেন প্রথম উপ-বিভাগ হিসেবে। ভ. স. নেমচিনভ বলেন, এটা মার্কস করেন 'যেন ফিজিওক্র্যাটদের ধরন অনুসারে'।

আদি আকারেও মার্কসের ছকটা কেনের সারণী থেকে খুবই পৃথক নিশ্চয়ই; এতে দেখান হয় উদ্বৃত্ত মূল্যের আদত উৎপত্তিস্থলটা: মজুরি-শ্রমের উপর পুঁজিপতির শোষণ। তবে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা হল এই যে, কেনের রচনায় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ধারণার অঙ্কুর: **পুনরুৎপাদন আর কাটতির প্রক্রিয়াটা অব্যাহতভাবে চলতে পারে একমাত্র যদি কোন-কোন আর্থনীতিক অনুপাত বজায় রাখা হয়।**

কেনে তাঁর 'সারণী'তে আর মার্কস তাঁর প্রথম ছকে দুজনেই **সরল পুনরুৎপাদন** ধরে এগন; এতে উৎপাদন আর কাটতি প্রতি বছর পুনরাবৃত্ত হয় একই পরিসরে — সঞ্চয়ন আর সম্প্রসারণ ছাড়াই। এটা হল সরল থেকে যৌগিকে, বিশেষ থেকে অপেক্ষাকৃত সাধারণে স্বাভাবিক অগ্রগতি। আইনস্টাইন প্রথমে গড়েছিলেন বিশেষ অপেক্ষবাদ, যেটা শুধু জাড্যের গতিতে প্রযোজ্য, আর সাধারণ অপেক্ষবাদ তিনি গড়ে তুলেছিলেন পরে।

মার্কস মারা যাবার পরে এঙ্গেলস প্রকাশ করেছিলেন 'পুঁজি'র দ্বিতীয় খণ্ড, এতে মার্কস সরল পুনরুৎপাদন তত্ত্ব বিস্তারিত ক'রে **সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন** তত্ত্বের ভিত্তিস্থাপন করেন, — সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনে সঞ্চয়ন হয়, আর উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে। ভ. ই. লেনিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন-কোন রচনাও এইসব প্রশ্ন নিয়ে।

কেনের মন জুড়ে ছিল যে-প্রধান প্রশ্নটা সেটা আধুনিক অর্থবিদ্যার ভাষায় হল আর্থনীতিক অনুপাত-সংক্রান্ত প্রশ্ন, যাতে অর্থনীতির বিকাশ নিশ্চিত হয়। এই প্রশ্নটার স্রেফ উল্লেখ হলেই মনে আসে এখনকার দিনে সেটার চূড়ান্ত প্রাসঙ্গিকতা আর গুরুত্বের কথা। বলা যেতে পারে, সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং অন্যান্য দেশে অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে এখন যেসব অনুপাত রয়েছে তার মূলে ছিল কেনের ভাব-ধারণা। বিভিন্ন শাখার মধ্যে পরস্পর-সম্পর্ক প্রকাশ পায় এইসব অনুপাতে; অর্থনীতির ব্যবস্থাপনে এগুলির ভূমিকা বেড়ে চলছে।

অমার্কসীয় অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে ইদানীং কেনে সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। 'আর্থনীতিক সারণী'র দ্বিশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে সাড়ম্বরে। ফ্রান্স কেনেকে জাতির একজন মহাপ্রতিভাশালী ব্যক্তি হিসেবে মান্য করেছে।

নবম পরিচ্ছেদ

তিউর্গো — চিন্তাবীর মন্ত্রী এবং মানুষটি

১৬শ লুইর অধীনে অর্থব্যবস্থার নিয়ামক হিসেবে তিউর্গোর দু'বছরের কাজ বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সের ইতিহাসে একটা চমকপ্রদ অধ্যায়। তাঁর সংস্কারপন্থী ক্রিয়াকলাপ অকৃতকার্য হয়, কেননা তখন যা 'সংশোধিত' হতে পারত শুধু বিপ্লবের পথে সেটাকে তিনি সংশোধন করতে চেয়েছিলেন সংস্কারের সাহায্যে।

ডন্ কুইক্সোট ধরনের কিছু ছিল এই মানুষটির মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে তিনি একটি ডন্ কুইক্সোটই ছিলেন, সেটা ততটা নয় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ, যতটা কিনা ঘটনাচক্রে পড়ে: খুবই যুক্তিসম্মত ধ্যান-ধারণা আর খুবই উপযোগী ক্রিয়াকলাপ কখনও-কখনও উদ্ভট কুইক্সোটিক হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু উপমাটা মানানসই আরও একটা দিক থেকে: তিউর্গো ছিলেন মহানুভব, সমুন্নত নীতিনিষ্ঠ মানুষ, তাঁর মতো স্বার্থবুদ্ধিহীন মানুষ বিরল। সেরভানতেসের কল্পনায় গড়া জগতের মতো ১৫শ এর ১৬শ লুইর রাজসভায়ও এইসব সদগুণ ছিল পরক, বেখাপ্পা।

চিন্তাবীর

১৭২৭ সালে প্যারিসে তিউর্গোর জন্ম হয়। তিনি একটি সাবেকী নর্ম্যান অভিজাত পরিবারের মানুষ; রাষ্ট্রের খিদমত করার দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল এই পরিবারটির। তাঁর বাবা প্যারিসে যে-পদে ছিলেন সেটা এখনকার বিভাগীয় অধীক্ষক কিংবা মেয়রের মতো। তিউর্গো ছিলেন তৃতীয় ছেলে, তাই পরিবারের রেওয়াজ অনুসারে তাঁর যাজক হওয়াই অবধারিত ছিল। তাই

তখনকার দিনে যা সম্ভব ছিল তেমনি সেরা শিক্ষাই তিনি পেয়েছিলেন। সেমিনারি থেকে সসম্মানে স্নাতক হয়ে তিনি ডিগ্রি পাবার জন্যে সরবোনে ভরতি হন, তারপর সরবোন যাঁকে নিয়ে গর্ববোধ করত সেই ক্যাথলিকতন্ত্রের উদীয়মান তারকা তেইশ বছরের অ্যাবে হঠাৎ স্থির করলেন তিনি ধর্মযাজক হবেন না।

এটা ছিল একটি সুপরিণত চিন্তাশীল মানুষের সিদ্ধান্ত। এই সময়ে তিউর্গো বিস্তর সময় দিয়ে দর্শনচর্চা করতেন, ইংরেজ চিন্তাগুরুদের রচনাবলি অধ্যয়ন করতেন এবং বিষয়ীগত ভাববাদের বিরুদ্ধতা করে কতকগুলি দার্শনিক রচনা লেখেন; বিষয়ীগত ভাববাদে নিশ্চয় করে বলা হয়, সমগ্র বহির্জগৎ মানুষের চেতনা থেকে উদ্ভূত। তিউর্গোর ক্ষমতা লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়েছিলেন তাঁর আচার্যরা এবং বন্ধুবান্ধবেরা। ছ'টা ভাষা তিনি ভালভাবে জানতেন, বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্র নিয়ে অধ্যয়ন করতেন; তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। বাইশ বছর বয়সে তিউর্গো কাগজী মুদ্রা সম্পর্কে একটি ভাবগম্ভীর প্রবন্ধ লেখেন, তাতে তিনি লো-র প্রণালী এবং সেটার দোষ-ত্রুটির বিশ্লেষণ করেন। তবে এই সময়ে তিনি অর্থবিদ্যায় আগ্রহান্বিত ছিলেন প্রধানত বিস্তৃত দার্শনিক-ঐতিহাসিক প্রশ্নাবলির চৌহদ্দির ভিতরে।

১৭৫২ সালে তিউর্গো হন প্যারিস আদালতের একজন বিচারক, আর উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া পরিমিত অর্থ দিয়ে পরের বছর কিনে নেন আদালত-কক্ষের বিবরণকারীর পদ। এই পদে কাজ করেও তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নিয়ে অধ্যয়ন করতেন আর প্যারিসের মনোজগতের কেন্দ্রস্বরূপ সালোঁগুলিতেও যেতেন। খানদানী সমাজ আর দার্শনিক সালোঁগুলি উভয় ক্ষেত্রে যাঁরা শোভাবর্ধন করতেন তাঁদেরই একজন হয়ে উঠেছিলেন তরুণ তিউর্গো অচিরেই। দিদরোর সঙ্গে, দালাঁবেয়ারের সঙ্গে এবং 'এনসাইক্লোপেডিয়া'-য় তাঁদের সহকারীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। দর্শন আর অর্থবিদ্যা সম্পর্কে কতকগুলি প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন 'এনসাইক্লোপেডিয়া'-র জন্যে।

তিউর্গোর জীবনে একটা মস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় এসেছিলেন বিশিষ্ট প্রগতিশীল সরকারী কর্মকর্তা ভেন্সান গুর্নে; তিনি হলেন অর্থবিদ্যাক্ষেত্রে তিউর্গোর উপদেষ্টা। ফিজিওক্র্যাটদের মতো নয়—গুর্নে মনে করতেন শিল্প আর বাণিজ্য হল দেশের সমৃদ্ধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎপত্তিস্থল। তবে

তাঁদের সঙ্গে মিলে তিনি গিল্ডের বাধানিষেধের উপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন এবং সমর্থন করেছিলেন অবাধ প্রতিযোগিতা। যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কখনও-কখনও বলা হয়েছে, laissez faire, laissez passer-এর বিখ্যাত নীতির প্রবর্তক হলেন গুর্নে। তিনি তখন ছিলেন বাণিজ্য তত্ত্বাবধায়ক; তিউর্গো তাঁর সঙ্গে প্রদেশে-প্রদেশে সফর করেন, বাণিজ্য আর শিল্পের অবস্থা পরিদর্শন করেছিলেন। তাঁরা প্যারিসে ফেরার পরে তিউর্গো গুর্নের সঙ্গে কেনের 'চিলেকোঠার ক্লাবে' যেতে শুরু করেন, কিন্তু ফিজিওক্র্যাট সম্প্রদায়ের বাড়াবাড়িগুলো তখন তাঁকে আর সংক্রমিত করতে পারে নি। কেনের প্রধান-প্রধান ভাব-ধারণাগুলির কোন-কোনটার সঙ্গে একমত হলেও, ব্যক্তিগতভাবে কেনের প্রতি খুবই সশ্রদ্ধ হলেও তিউর্গো বিজ্ঞানক্ষেত্রে নিজস্ব পথই ধরেছিলেন অনেক দিক থেকে। গুর্নে মারা যান ১৭৫৯ সালে। তিনি মারা যাবার ঠিক পরেই তিউর্গো লিখেছিলেন 'Éloge de Gournay' ('গুর্নে-প্রশস্তি'), এতে তিনি প্রয়াত বন্ধুর মতামত বিবৃত করেন শুধু তাই নয়, নিজের আর্থনীতিক ভাব-ধারণাও প্রণালীবদ্ধভাবে তুলে ধরেন সেই প্রথম।

১৭৬১ সালে তিউর্গো লিমোঝ-এর অধীক্ষক নিযুক্ত হন। তাতে তাঁর বৈজ্ঞানিক আর সাহিত্যিক লেখার কাজে বাধা পড়ে। সেখানে তিনি ছিলেন তের বছর, মাঝে-মাঝে যেতেন প্যারিসে। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের মুখ্য প্রতিনিধি অধীক্ষক হিসেবে তাঁর উপর ছিল গোটা প্রদেশের সমস্ত আর্থনীতিক বিষয়ের ভার, তবে রাজার জন্যে কর আদায় করাই ছিল তাঁর প্রধান দায়িত্ব।

কঠোর বাস্তবতার সামনে পড়ে তিউর্গো লেখেন: 'পড়তে কিংবা লিখতে পারে এমন কৃষক বড় একটা নেই, আর বুদ্ধিসুদ্ধি কিংবা সততা আছে বলে ধরা যেতে পারে খুব অল্প কয়েক জনকে মাত্র; তারা অত্যন্ত একগুঁয়ে জাতের মানুষ, তাদের নিজেদেরই ভালর জন্যে পরিকল্পিত পরিবর্তনেও তারা বাধা দেয়।'*

কিন্তু তিউর্গো হতাশ হয়ে পড়েন নি। তিনি ছিলেন উদ্যমশীল, তাঁর আত্মবিশ্বাস এবং কর্তৃত্ব করার ক্ষমতাও ছিল —তাই সমস্ত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও

* D. Dakin, 'Turgot and the Ancien Régime in France', New York, 1965, p. 37 থেকে উদ্ধৃতিটা নেওয়া হয়েছে।

তিনি ঐ প্রদেশে কিছু-কিছু সংস্কার চালু করতে শুরু করেছিলেন। কর আদায়ের ব্যবস্থাটাকে তিনি সরল করতে চেয়েছিলেন। রাস্তা ভাল অবস্থায় রাখার জন্যে কৃষকদের বাধ্যতামূলক বেগার খাটার ঘৃণ্য কর্ভে প্রথার জায়গায় স্বেচ্ছায় মজুরি করার ব্যবস্থা চালু করে ভাল-ভাল রাস্তা তৈরি করেছিলেন; পশু-মড়ক আর ফসল কীট-পতঙ্গ নিবারণের জন্যে বিশেষ প্রচেষ্টা সংগঠিত করেছিলেন; আলু চালু করিয়ে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে নিজের জন্যে এবং অতিথিদের জন্যে রোজ আলু দিয়ে একটা পদ রান্না করতে হুকুম দিয়েছিলেন সর্দার বাবুর্চিকে।

শস্যহানি আর আকালের মোকাবিলা করতে হয়েছিল তিউর্গোকে। এইসব দুর্বিপাকের মধ্যে সাহসের সঙ্গে যুক্তিসম্মত উপায়ে কাজ করতে গিয়ে বাধ্য হয়ে তিনি নিজের তত্ত্বীয় নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন, তাঁর এইসব নীতি অনুসারে সবকিছু ছেড়ে দেওয়া চাই ব্যক্তিগত উদ্যম, অবাধ প্রতিযোগিতা আর ঘটনার স্বাভাবিক গতির উপর। প্রগতিশীল এবং মানবোচিত পন্থায় কাজ করেছিলেন এই সরকারী কর্মকর্তাটি। তবে ১৫শ লুইর রাজত্বে তিনি করে উঠতে পেরেছিলেন সামান্যই।

লিমোঝ থেকে এবং যখন প্যারিসে যেতেন তখন তিউর্গো ফিজিওক্র্যাটদের সাফল্য লক্ষ্য করতেন। প্যারিসে দ্যুপোঁর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়, আলাপ-পরিচয় হয় অ্যাডাম স্মিথের সঙ্গে। তবে এই সময়ে তিনি যা লিখতেন সেগুলি ছিল প্রধানত অন্তহীন রিপোর্ট, হিসাব, সরকারী মন্তব্যলিপি আর সার্কুলার। তিনি বিজ্ঞানচর্চা করতে পারতেন শুধু বিরল অবসর সময়ে — কোনমতে ফাঁকে-ফাঁকে। এরই মধ্যে তিনি ১৭৬৬ সালে প্রায় আপতিকভাবেই লিখে ফেলেছিলেন অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর প্রধান রচনা — 'Reflexions sur la formation et la distribution des riches-ses' ('সম্পদ সৃষ্টি এবং বণ্টন সম্পর্কে পরিচিন্তন'), সেটার মূল ভাব-ধারণাগুলি তাঁর মাথায় গড়ে উঠেছিল অনেক আগেই, তার টুকরোটাকরা তিনি লিখেছিলেন সরকারী দলিলপত্রে এবং অন্যান্য কাগজপত্রে।

অদ্ভুত ইতিহাস আছে এই রচনাটির। জেসুইট মিশনারিরা দুজন তরুণ চীনাকে ফ্রান্সে নিয়ে গিয়েছিল অধ্যয়নের জন্যে — তাদের পাঠ্যপুস্তক বা নির্দেশক হিসেবে তিউর্গো এটা লিখেছিলেন বন্ধুবান্ধবের অনুরোধক্রমে। দ্যুপোঁ এটা প্রকাশ করেন ১৭৬৯-১৭৭০ সালে। নিজ রীত অনুসারে তিনি সেটাকে 'ঠিকঠাক' করে তিউর্গোকে ফিজিওক্র্যাটে পরিণত করেন, ফলে তীব্র

বিরোধ দেখা দিয়েছিল এই দু'জনের মধ্যে। ১৭৭৬ সালে তিউর্গো নিজে সেটার একটা পৃথক সংস্করণ প্রকাশ করেন।

অল্পকথায় ভাবপ্রকাশের চমৎকার দৃষ্টান্ত এই 'পরিচিন্তন' পেটির রচনার সেরা-সেরা অংশগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। ১০০টা সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা নিয়ে এই 'পরিচিন্তন'; উপস্থাপনাগুলি আর্থনীতিক উপপাদ্যের মতো (কোন-কোনটাকে অবশ্য স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরা যেতে পারে)। তিউর্গোর উপপাদ্যগুলি স্পষ্ট তিনটে বিভাগে পড়ে।

প্রথম ৩১টা উপপাদ্যে তিউর্গো ফিজিওক্র্যাট — কেনের শিষ্য। কিন্তু নীট উৎপাদ তত্ত্বটায় তিনি অর্থের এমন একটা ছোপ দিয়েছিলেন যাতে মার্কস মন্তব্য করেন: 'ফিজিওক্র্যাটতন্ত্রটিকে সবচেয়ে পুরোপুরি বিকশিত করেন তিউর্গো।'* সেটার প্রারম্ভিক ভুয়ো সিদ্ধান্তসূত্রগুলোর বিকাশ নয়, কিন্তু ফিজিওক্র্যাটতন্ত্রের চৌহদ্দির ভিতরে বাস্তবতার সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার অর্থে এই বিকাশ। উদ্বৃত্ত মূল্য সম্পর্কে উপলব্ধির দিকে এগিয়েছেন তিউর্গো — তিনি 'নিছক প্রকৃতির দান' থেকে চলে গেছেন খামারীর শ্রমে পয়দা-করা উদ্বৃত্তে, যেটাকে আত্মসাৎ করে উৎপাদনের মুখ্য উপকরণ জমির মালিক।

মূল্য, দাম আর অর্থ নিয়ে তার পরের ১৭টা উপপাদ্য। এই পৃষ্ঠাগুলিতে এবং তিউর্গোর আরও কোন-কোন রচনায় বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা এক-শ' বছর পরে আবিষ্কার করেন বিভিন্ন বিষয়ীগত তত্ত্বের প্রথম-প্রথম অঙ্কুর, যেসব তত্ত্বের ফলাও প্রসার ঘটেছিল উনিশ শতকের শেষের দিকে। যেমন গোটা ফরাসী অর্থশাস্ত্র, তেমনি তিউর্গোও শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বে পৌঁছন নি। তাঁর মতে, বিভিন্ন রকমের প্রয়োজনের মধ্যে সম্পর্ক দিয়ে, বিনিময়ে যারা অংশগ্রহণ করে সেই বিক্রেতা আর ক্রেতাদের ইচ্ছার প্রবলতা দিয়ে নির্ধারিত হয় পণ্যের বিনিময়-মূল্য আর দাম। তবে তিউর্গোর এইসব ভাব-ধারণা তাঁর মতবাদের প্রধান অংশটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুব সামান্যই।

অর্থশাস্ত্রের ইতিহাসে তিউর্গো সবচেয়ে সম্মানিত একটি স্থানের অধিকারী হয়েছেন সেটা প্রধানত শেষের ৫২টা উপপাদ্যের জন্যে।

আগেই বলা হয়েছে, ফিজিওক্র্যাটতন্ত্রে সমাজকে বিভক্ত করা হয়

---

* কার্ল মার্কস, 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব', ১ম ভাগ, ৫৪ পৃঃ।

তিনটে শ্রেণীতে: উৎপাদী শ্রেণী (খামারীরা), জমির মালিকেরা, আর নিষ্ফলা শ্রেণী (বাদবাকি সবাই)। এই ছকে একটা চমৎকার সংযোজন করেন তিউর্গো। তাঁর মতে, শেষের শ্রেণীটা 'যেন আবার দুটো বর্গে বিভক্ত: ঝুঁকিদার ম্যানুফ্যাকচারার, কারখানা-মালিকদের বর্গ, যাদের সবার আছে মোটা পরিমাণ পুঁজি, যা তারা কাজে লাগায় তাদের দাদন বাবত লোক খাটিয়ে লাভ করার জন্যে; আর মামুলি কারিগরদের নিয়ে দ্বিতীয় বর্গটা, যাদের হাত ছাড়া কোন সম্বল নেই, যারা দাদন দেয় শুধু রোজকার শ্রম, যাদের কোন লাভ নেই মজুরি ছাড়া'।* এইসব প্রলেতারিয়ানের মজুরি কোনমতে জীবনধারণের উপযোগী ন্যূনকল্প পরিমাণে দাঁড়ায়, সেটা তিউর্গো উল্লেখ করেন রচনার অন্য একটা অংশে। আর তেমনি, 'খামারীদের শ্রেণীটাও কারখানা-মালিকদের শ্রেণীটার মতো দুটো বর্গে বিভক্ত — মালিক বা পুঁজিপতিদের বর্গ, যারা দাদন দেয়, আর মাইনে-পাওয়া মামুলি কর্মীদের বর্গ'।**

কেনের নকশায় সমাজটাকে তিনটে শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, তার চেয়ে বাস্তবতার আরও কাছাকাছি হল সমাজটাকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করার এই নকশাটা। এটা হল ফিজিওক্র্যাট আর ইংরেজ মনীষীদের মধ্যে একটা সেতু গোছের; উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে ইংরেজ মনীষীরা সমাজটাকে প্রধান তিনটে শ্রেণীতে স্পষ্ট বিভক্ত করেছিলেন: ভূস্বামীরা, পুঁজিপতিরা এবং মজুরি-করা লোক। শিল্প আর কৃষির মধ্যকার মূল সীমারেখাটা থেকে তাঁরা রেহাই পেয়েছিলেন, যা করতে পারেন নি তিউর্গো।

পুঁজির বিশ্লেষণ হল তিউর্গোর আর-একটা মস্ত সাধনসাফল্য; এটা কেনের বিশ্লেষণের চেয়ে ঢের বেশি প্রগাঢ় এবং ফলপ্রদ। কেনে পুঁজিকে ধরেছিলেন প্রধানত নানা স্বাভাবিক আকারের দাদনের (কাঁচামাল, মজুরি, ইত্যাদি) সাকল্য হিসেবে, কেননা তাঁর বিবেচনায় সমাজের শ্রেণীগুলির মধ্যে উৎপাদ বণ্টন-সংক্রান্ত প্রশ্নটার সঙ্গে পুঁজি তত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। কেনের ব্যবস্থাটায় লাভের কোন স্থান ছিল না; তাঁর পুঁজিপতির যেন 'চলে

---

* Turgot, 'Textes choisis et preface par Pierre Vigreux', Paris, 1947, p. 112.

** ঐ, ১১৪ পৃঃ।

যেত মাইনেটা দিয়ে'; এই 'মাইনেটা' নির্ধারিত হয় কোন্ নিয়ম অনুসারে সেটা তিনি খুঁজে দেখেন নি।

এক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়েছিলেন তিউর্গো। লাভ-সংক্রান্ত ধারণামৌলটা ছাড়া তিনি চলতে পারেন নি; যথাযথ অনুভব অনুসারে তিনি লাভ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ শুরু করেন শিল্পক্ষেত্রের পুঁজিপতিকে নিয়ে। লাভের উৎপত্তি এখানে বাস্তবিকই স্পষ্টপ্রতীয়মান, কেননা 'সমস্ত উদ্বৃত্ত আসে মাটি থেকে' এই মর্মে ফিজিওক্র্যাটের বদ্ধধারণা দিয়ে বিষয়টা এক্ষেত্রে ঝাপসা নয়।

এটা তো অদ্ভুতই বটে, ফিজিওক্র্যাট তিউর্গো 'স্বাভাবিক বিন্যাস কিছুটা লঙ্ঘন' করেছেন বলে ত্রুটিস্বীকার করে কৃষিকে ধরেছেন মাত্র দ্বিতীয় স্থানে। কিন্তু তাঁর ত্রুটিস্বীকার করার কোন কারণ ছিল না। উলটে, তাঁর যুক্তিটা খুবই পোক্ত: যে খামারী পুঁজিপতি জন খাটায় তার পুঁজি থেকে পাওয়া চাই অন্তত কারখানা-মালিকের মতো সমান লাভ, আর তার উপর কিছুটা বাড়তি, যা তার খাজনা হিসেবে দিতে হয় ভূস্বামীকে।

সবচেয়ে অদ্ভুত বোধহয় ৬২ নং উপপাদ্যটা। উৎপাদনে বিনিয়োজিত পুঁজির স্বয়ংবৃদ্ধির ক্ষমতা থাকে। এই স্বয়ংবৃদ্ধির মাত্রা অনুপাত নির্ধারিত হয় কী দিয়ে?

পুঁজি (প্রকৃতপক্ষে, সংশ্লিষ্ট পুঁজির দ্বারা শোষিত শ্রম) পয়দা করে উৎপাদের মূল্য — এটা কোন্-কোন্ উপাদান নিয়ে গঠিত তার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন তিউর্গো। প্রথমত, শ্রমিকদের মজুরি সমেত পুঁজি থেকে যা ব্যয় হয় সেটা পূরণ করে উৎপাদের মূল্য*। বাদবাকিটা (মূলত উদ্বৃত্ত মূল্য) তিন ভাগে বিভক্ত।

অর্থ-পুঁজির মালিক হিসেবে পুঁজিপতি 'অনায়াসে' পেতে পারে আয়ের সমান যে-লাভ সেটা হল প্রথম ভাগ। এটা হল লাভের যে-অংশটা আসে ঋণ বাবত সুদ হিসেবে। পুঁজিপতি স্থির করে সে অর্থ বিনিয়োগ করবে খামারে কিংবা কারখানায় — তার 'শ্রম, ঝুঁকি এবং দক্ষতা' বাবত দেওন হল

* একটা বিমা তহবিলের কথাও তিউর্গো উল্লেখ করেন বিশেষভাবে, — আনুষঙ্গিক খরচের (পশু-মড়ক, ইত্যাদি) জন্যে সেটা বরাদ্দ হওয়া চাই উৎপাদের মূল্য থেকে।

লাভের দ্বিতীয় অংশটা। এটা ঝুঁকিদারী উদ্যম বাবত আয়। এইভাবে শিল্পক্ষেত্রে লাভের একটা ভাগাভাগি তিউর্গো লক্ষ্য করেন: ঋণদাতা পুঁজিপতি এবং নির্বাহক পুঁজিপতির মধ্যে ভাগাভাগি। তৃতীয় ভাগটা হল ভূমি-খাজনা। এটা থাকে শুধু কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োজিত পুঁজির জন্যে। এই বিশ্লেষণটা নিশ্চয়ই অর্থনীতিবিজ্ঞান ক্ষেত্রে এক-কদম অগ্রগতি।

কিন্তু এর পরেই তিউর্গো হুট করে ধরলেন ভিন্ন পথ। যার থেকে আসে সুদ আর খাজনা দুইই, উদ্বৃত্ত মূল্যের সেই প্রধান সামান্যীকৃত আকারটা হল লাভ — এই সঠিক বিবেচনাধারা থেকে তিনি সরে গেলেন। প্রথমে তিনি লাভকে সুদে পর্যবসিত করলেন: কোন পুঁজিপতির হক থাকে এই ন্যূনকল্প পরিমাণটায়। সে যদি নির্ঝঞ্ঝাটে ডেস্কে বসে না থেকে পা বাড়িয়ে যায় কারখানার ধোঁয়া আর ঘামের মাঝে, কিংবা খেতমজুরদের নজরে-নজরে রাখার জন্যে সে যদি রোদে ঘুরে-ঘুরে ঘাম ঝরায়, তাহলে তার প্রাপ্য সামান্য বেশি — বিশেষ ধরনের মাইনে। সুদটাকেও আবার ভূমি-খাজনায় পরিণত করা হয়: কেননা পুঁজি দিয়ে সবচেয়ে সহজ-সরল যা করা হয় সেটা হল জমি-বন্দ কিনে সেটাকে খাজনাবিলি করা। এর পর উদ্বৃত্ত মূল্যের প্রধান আকারটা হল ভূমি-খাজনা, অন্যান্য সবকিছু সেটার উপজাতমাত্র। আবার গোটা সমাজটার 'চলে মাইনে পেয়ে', যা পয়দা হয় শুধু ভূমি থেকে। তিউর্গো ফিরে যান ফিজিওক্র্যাটদের কোলে।

জানাই আছে, মস্ত-মস্ত চিন্তাবীরদের ভুল-ভ্রান্তিও ফলপ্রদ এবং গুরুত্বপূর্ণ। কথাটা তিউর্গোর বেলায়ও প্রযোজ্য। পুঁজি বিনিয়োগের বিভিন্ন আকার নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন পুঁজির মধ্যে প্রতিযোগিতা-সংক্রান্ত, এবং বিনিয়োগের একটা ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে পুঁজির গতির সম্ভাবনার দরুন লাভের মাত্রার স্বাভাবিক সমতাবিধান-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলেন। এইসব প্রশ্নের মীমাংসার দিকে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেন রিকার্ডো। ফ্রান্স আর ইংলন্ডের ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্যায় এইসব অনুসন্ধানের ফলে মীমাংসাটা আসে ক্রমে, যা মার্কস দেন 'পুঁজি'র ৩য় খণ্ডে লাভ আর উৎপাদন-পরিব্যয় তত্ত্বে, ঋণের পুঁজি আর সুদ-সংক্রান্ত তত্ত্বে এবং ভূমি-খাজনা তত্ত্বে।

উত্তরপুরুষের জন্যে কিছু-কিছু বিখ্যাত উক্তি রেখে গেছেন বুরবোঁ রাজারা। কিংবদন্তিতে আছে, 'প্যারিসের দাম খ্রিস্টীয় ভজনগান' কথাটা উদ্ভাবন করেছিলেন ৪র্থ হেনরি। নিরঙ্কুশ- রাজতন্ত্র কী সেটা চুম্বকে ব্যক্ত করে ১৪শ লুই বলেছিলেন, 'L'état, c'est moi' ('আমিই রাষ্ট্র')। 'Après moi le déluge' ('আমি গেলে তো মহাপ্লাবন') এই সমানই বিখ্যাত উক্তিটা ১৫শ লুইর। ১৬শ লুইর কোন বিখ্যাত উক্তি পাওয়া যায় না — অচিরেই তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল বলে সম্ভবত, কিন্তু হয়ত তিনি স্রেফ মাথামোটা বলে। (ফিজিওক্র্যাট মার্কুইসের ছেলে) মিরাবো বলেছিলেন, রাজা ১৬শ লুইর বংশে একমাত্র পুরুষ ছিলেন মেরি-আঁতোয়ানেৎ।

১৭৭৪ সালের মে মাসে বসন্তরোগে মারা যান ১৫শ লুই। কঠোর প্রতিক্রিয়া আর আর্থ সংকট ছিল তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলির বৈশিষ্ট্য। কোন স্বৈরাচারী রাজা মারা যাবার পরে সাধারণত আসে উদারপন্থী ধারা — কোন নতুন জালিম পা বাড়িয়ে থাকলেও। বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল সারা ফ্রান্স। দার্শনিকেরা আশা করেছিলেন, বিশ বছর বয়সের অনুগ্র নমনীয় মেজাজের রাজা অবশেষে চালু করবেন 'যুক্তির যুগ', তিনি বলবৎ করবেন তাঁদের ভাব-ধারণাগুলিকে। এইসব আশা আরও বেড়ে গিয়েছিল উঁচু পদে তিউর্গো নিযুক্ত হবার ফলে; তাঁকে প্রথমে করা হয়েছিল নৌ-মন্ত্রী, আর কয়েক সপ্তাহ পরে অর্থ বিভাগের মহানিয়ামক, তার মানে কার্যক্ষেত্রে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন সমস্ত স্বরাষ্ট্রীয় বিষয়।

অনেকে বলেন, তিউর্গো মন্ত্রী হয়েছিলেন দৈবাৎ; তাঁর বন্ধু অ্যাবে দ্য ভেরি কথা বলেছিলেন মাদাম মোরেপার সঙ্গে, ইনি চাপ দিয়েছিলেন স্বামীর উপর, যিনি ছিলেন রাজার প্রিয়পাত্র, ইত্যাদি। এটা ঠিক শুধু অংশত। তিউর্গো নিযুক্ত হয়েছিলেন সড়-সাজশের ফলে। ধূর্ত রাজসভাসদ মোরেপা তিউর্গোর জনপ্রিয়তা এবং সুবিদিত সততা কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন নিজের মতলব হাসিল করার জন্যে। তিউর্গোর ধ্যান-ধারণা আর প্রকল্প নিয়ে তাঁর কোন গরজ ছিল না।

কিন্তু ব্যাপারটা শুধু তাই নয়। দেশটি পরিবর্তনের জরুরী প্রয়োজন বোধ করছিল, যতটা আগে কখনও হয় নি। একেবারে উপরতলার সামন্ত অভিজাতেরাও সেটা বুঝতে পারছিল। রাজসভার ঘোঁটের মধ্যে জড়িত নয়, সরকারী তহবিল তসরুফ করে কলঙ্কিত নয়, এমন একটি নতুন মানুষ দরকার ছিল। পাওয়া গেল সেই মানুষটিকে — তিনি তিউর্গো। ফ্রান্সের আর্থিক আর অর্থনীতি ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে জমে-ওঠা পর্বতপ্রমাণ আবর্জনাস্তূপ সাফ করার কাজটা হাতে নিয়ে তিনি সেটা সহজ হতে পারে বলে মনকে মিথ্যা প্রবোধ দেন নি। পুরোপুরি বুঝেসুঝেই তিনি বোঝাটাকে ঘাড়ে নেন এবং পিছপা না হয়ে বয়ে চলেন। তাঁর পথ ছিল সাহসী বুর্জোয়া সংস্কারের পথ। সাধারণ বিচারবুদ্ধি আর প্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সেটাকে অপরিহার্য মনে করেছিলেন।

তিউর্গো সম্পর্কে মার্কস লিখেছেন: 'যেসব ধীশক্তিবীর সাবেকী ব্যবস্থাটাকে উচ্ছেদ করেন তাঁদেরই একজন ছিলেন তিনি।'*

মন্ত্রিপদে থেকে ঠিক কী করেছিলেন তিউর্গো? এই পদে তাঁর কার্যকাল ছিল স্বল্প, সামনে বাধা-বিপত্তি ছিল বিপুল — এসব মনে রাখলে বলতে হয় অজস্র কাজই তিনি করেছিলেন। আখেরী, স্থায়ী ফলের হিসেবে দেখলে — যৎসামান্য। তবে তিউর্গোর ব্যর্থতারও ছিল বৈপ্লবিক তাৎপর্য। তিউর্গোর মতো মানুষও যখন সংস্কার চালু করতে পারলেন না, তার মানে সংস্কার ছিল অসম্ভব। কাজেই তিউর্গোর বিভিন্ন সংস্কার থেকে সিধে পথটা ধরে গিয়ে ঘটল ১৭৮৯ সালে বাস্তিল দখল, আর ১৭৯২ সালে টুইলেরিস প্রাসাদ দখল।

রাষ্ট্রের আর্থ পরিস্থিতিটাকে সুব্যবস্থিত করার সবচেয়ে জরুরী কাজটারই মোকাবিলা তিউর্গো করেছিলেন সরাসরি। কর-ইজারাদারি লোপ করা এবং ভূমিসম্পত্তি থেকে আয়ের উপর কর ধার্য করার মতো বিভিন্ন আমূল সংস্কার ছিল তাঁর দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচির মধ্যে। এই কর্মসূচি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহলগুলোর প্রতিক্রিয়া কি হবে সেটা তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন বলে তিউর্গো কর্মসূচিটাকে চটপট সাধারণের গোচরে আনতে চান নি। বহু পৃথক-পৃথক ব্যবস্থা বলবৎ করা, কর-ব্যবস্থার একেবারে দগদগে অসংগতি আর অবিচারগুলো দূর করা, শিল্প আর বাণিজ্যের উপর করের বোঝা লাঘব করা এবং কর-ইজারাদারদের উপর চাপ দেবার জন্যে

---

* Karl Marx, Friedrich Engels, 'Werke', Bd. 15, Berlin, 1969, S. 375.

তিনি সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করেছিলেন তখনকারমতো। অন্য দিকে তিনি বাজেট-ব্যয় সঙ্কোচ করতে চেষ্টা করেছিলেন, — এই ব্যয়ের প্রধান দফাটা ছিল রাজসভাসদবর্গের ভরণপোষণ। এই ব্যাপারে অপচয়ী মেরি-আঁতোয়ানেতের খামখেয়াল আর বিরাগের সঙ্গে তাঁর ঠোকাঠুকি লেগেছিল অচিরেই। বাজেটে সামান্য উন্নতি ঘটাতে এবং রাষ্ট্রীয় ক্রেডিট আবার চালু করতে পেরেছিলেন তিউর্গো। কিন্তু এই মন্ত্রীটির দুশমন বেড়ে যাচ্ছিল দ্রুত, তারা হয়ে উঠছিল আরও বেশি সক্রিয়।

তিউর্গো শস্যে আর ময়দায় অবাধ বাণিজ্য চালু করেছিলেন; আগেকার মন্ত্রীর মদতে কিছু ধূর্ত বদমাশ লোক একচেটে কায়েম করেছিল — সেটাকে তিনি ভেঙে দেন: এটা ছিল তাঁর একটা গুরুত্বপূর্ণ আর্থনীতিক ব্যবস্থা। তবে মূলত প্রগতিশীল এই ব্যবস্থাটার ফলে তাঁর সামনে মস্ত জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। ১৭৭৪ সালে ফসল হয়েছিল খারাপ; তারপর বসন্তকালে শস্যের দাম বেড়ে গিয়েছিল বেশকিছুটা। ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছিল কোন-কোন শহরে, বিশেষত প্যারিসে। তিউর্গোর অবস্থাটাকে বানচাল করার মতলবে তাঁর শত্রুরা অনেকাংশে উসকে দিয়েছিল, সংগঠিত করেছিল এইসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা — এটা কেউ প্রমাণ করতে না পারলেও এমনটা মনে করার সংগত কারণ আছে। মন্ত্রীটি কড়া-হাতে দমন করেছিলেন এইসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা। তিনি হয়ত ধরে নিয়েছিলেন লোকে নিজেদের স্বার্থ বোঝে না, তাই সেটাকে তাদের বুঝিয়ে বলা দরকার অন্য উপায়ে। এই সবকিছু তিউর্গোর বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল তাঁর শত্রুরা, এদের মধ্যে তখন তলে-তলে ছিলেন মোরেপা: ইনি ক্রমেই আরও বেশি পরিমাণে তিউর্গোকে ভয় এবং ঈর্ষা করতে লেগেছিলেন।

তবু দ্বিধা না করে এগিয়ে চলেছিলেন তিউর্গো। ১৭৭৬ সালের গোড়ার দিকে রাজা অনুমোদন করেছিলেন তিউর্গোর বিখ্যাত ছ'টি অনুশাসন, এগুলি সামন্ততন্ত্রকে আঘাত করেছিল তাঁর আগেকার অন্য যেকোন ব্যবস্থার চেয়ে বেশি পরিমাণে। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল দুটো অনুশাসন: বেগার খাটুনি বন্ধ করা এবং কারিগরী কর্মশালা আর গিল্ড লোপ করার অনুশাসন। শিল্প এবং উদ্যোগী পুঁজিপতি বর্গের দ্রুত বৃদ্ধির জন্যে শেষোক্ত অনুশাসনটা অপরিহার্য শর্ত বলে ধরেছিলেন তিউর্গো — সেটা ভিত্তিহীন ছিল না। এই দুটি অনুশাসনের বিরুদ্ধে এসেছিল প্রচণ্ড প্রতিরোধ, সেটার প্রধান শক্তি ছিল প্যারিসের

পার্লেমান [ধর্মাধিকরণ]। পার্লেমানে রেজিস্ট্রি হবার আগে সেগুলি আইন হিসেবে বলবৎ হতে পারে নি। লড়াইটা চলেছিল দু'মাসের বেশি সময় ধরে। তিউর্গো রেজিস্ট্রি করতে পেরেছিলেন শুধু ১২ মার্চ তারিখে, তখন অনুশাসনগুলি আইনে পরিণত হয়।

মস্ত মূল্য দিতে হয়েছিল এই জয়ের জন্যে। সংস্কারকামী মন্ত্রীটির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সাবেকী ব্যবস্থার সমস্ত শক্তি: রাজসভার ঘোঁট, চার্চের উপর-স্তরগুলো, অভিজাতকুল, বিচারকমণ্ডলী, গিল্ডের বুর্জোয়ারা।

তিউর্গোর সংস্কারগুলির গণতান্ত্রিক প্রকৃতিটাকে লোকে কিছুটা বুঝতে পেরেছিল। ঘৃণ্য বেগার খাটুনি উঠে গেল বলে কৃষকেরা যারপরনেই আনন্দিত হয়েছিল, কিন্তু তারা তাঁর নামটা জানত না বললেই হয়। প্যারিসের কিছুটা লেখাপড়া-জানা শিক্ষানবিস আর জার্নিম্যানরা খুশি হয়ে তিউর্গোর উদ্দেশে প্রশস্তি-শ্লোক লিখেছিল। কিন্তু জনসাধারণ ছিল অনেক নিচে, আর খুব কাছেই ছিল শত্রুরা। আক্রোশভরা প্রচারপত্র, ব্যঙ্গ-পদ্য আর ক্যারিকেচারে ছেয়ে গিয়েছিল প্যারিস, সেগুলোর জঘন্য স্রোতে ডুবে গিয়েছিল জার্নিম্যানদের খুশির শ্লোক আর ফিজিওক্র্যাটদের কেজো প্রবন্ধগুলি। ব্যঙ্গ-রচনাগুলোয় তিউর্গোকে নানা রূপে চিত্রিত করা হত: কখনও ফ্রান্সের অপদেবতা, কখনও নিরুপায় এবং ব্যবহারিক-বুদ্ধিহীন দার্শনিক, আর 'অর্থনীতিবাদী সেক্ট'-এর হাতে খেলার পুতুল কখনও-বা। তবে তিউর্গো ছিলেন দুর্নীতিপরায়ণতার ঊর্ধ্বে, তিনি ছিলেন সৎ — শুধু এসব দিক থেকে কেউ কোন প্রশ্ন তোলে নি: এসব বিষয়ে কারও কখনও কোন সংশয় ছিল না।

গোটা অপপ্রচার-অভিযানটা চালাত, সেজন্যে টাকা দিত রাজসভার ঘোঁট। অন্যান্য মন্ত্রীরাও তিউর্গোর বিরুদ্ধে চক্রান্ত ফাঁদত। তাঁকে বাস্তিলে পোরার জন্যে লুইর কাছে হন্যে হয়ে আবদার করতেন রানীজী। সবচেয়ে জঘন্য কুৎসাবাজদের মধ্যে একজন ছিলেন রাজার ভাই। এইসব হৈ-হল্লার মধ্যে অদম্য দৃঢ়, আত্মপ্রসাদে ভরপুর, নিঃসঙ্গ তিউর্গো ছিলেন বাস্তবিকই সমুন্নত ব্যথিত মানুষটি।

তখন তাঁর পতন অনিবার্য। চাপ আসছিল সবদিক থেকে — সেটা ১৬শ লুই শেষে মেনে নেন। রাজা তাঁর মন্ত্রীটির মুখের উপর অবসর নেবার কথা বলতে পারেন নি: তিউর্গোকে পদটি ছেড়ে দিতে বলার হুকুমটা তাঁকে জানিয়েছিল রাজার একজন দূত। সেটা হয় ১৭৭৬ সালের ১২ মে।

তিউর্গো যেসব ব্যবস্থা চালু করেছিলেন সেগুলির বেশির ভাগই, বিশেষত উল্লিখিত অনুশাসনগুলি পুরোপুরি কিংবা অংশত রদ করা হয়েছিল অচিরেই। প্রায় সবকিছুই তখন চলতে থাকল আগের মতোই। যেসব সমর্থক আর সহকারীদের তিউর্গো সরকারী চাকরিতে লাগিয়েছিলেন তারাও অবসর নেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে, তাদের কাউকে-কাউকে প্যারিস থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। চূর্ণবিচূর্ণ হল ফিজিওক্র্যাট আর জ্ঞানকোষ-রচয়িতাদের সমস্ত আশা-ভরসা।

মানুষটি

তিউর্গোর বয়স তখনও পঞ্চাশ হয় নি, কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। গেঁটে বাতের যন্ত্রণাটা খুবই কষ্ট দিত। তিনি মন্ত্রিপদে ছিলেন কুড়ি মাস, তার মধ্যে সাত মাস তিনি ছিলেন শয্যাশায়ী। তবু, তাঁর কাজ কখনও থামে নি — একটি দিনের জন্যেও নয়। বিভিন্ন খসড়া আইন-কানুন, বিবরণী আর চিঠিপত্র তিনি মুখে বলে লিখিয়ে নিতেন, কর্মকর্তাদের ডেকে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন, আদেশ-নির্দেশ দিতেন সহকারীদের। কখনও-কখনও তাঁকে ডুলিতে করে নেওয়া হত রাজার খাসকামরায়।

স্বাস্থ্য ভাল ছিল না বলে তিনি সবসময়ে কষ্ট পেতেন, তবু তিনি সেটাকে অগ্রাহ্য করেই চলতেন। কখনও-কখনও তিনি ক্রাচ্-এ ভর করে ছাড়া চলতে পারতেন না, সেটাকে তিনি কৌতুক করে বলতেন 'আমার থাবা'। যকৃতের একটা রোগে তিনি মারা যান ১৭৮১ সালে মে মাসে — অবসর নেবার ঠিক পাঁচ বছর পরে।

তিউর্গো হারিয়েছিলেন রাজার সুনজর, তাঁর সংস্কারগুলি ব্যর্থ হয়, তবু তিনি ছিলেন অবিচলিত, এমন স্থৈর্য দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা। সেন্সার-কর্মীরা তাঁর চিঠিপত্র খুলত, তাদের কথা নিয়ে তিনি তামাশাও করতেন। ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে গুটিয়ে গিয়ে তিনি যেন আনন্দই পেলেন: অধীক্ষক আর মন্ত্রী থাকার পনর বছরে তাঁর পড়ার, বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের কিংবা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ফুরসত জুটত না। এবার তিনি সময় পেলেন।

তিউর্গো তাঁর চিঠিপত্রে সাহিত্য আর সংগীত নিয়ে আলোচনা করতেন, পদার্থবিদ্যা আর জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়নের কথা বলতেন।

উৎকীর্ণ লিপি এবং রম্য সাহিত্য আকাদমির বাৎসরিক সভাপতি হিসেবে তিনি ১৭৭৮ সালে নতুন বন্ধু বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনকে অফিশিয়াল রীতি অনুসারে আকাদমিশিয়ান করেন। বিদ্রোহী মার্কিন উপনিবেশগুলির দূত হিসেবে ফ্র্যাঙ্কলিনের জন্যেই তিনি লিখেছিলেন অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর শেষ রচনা — 'Mémoire sur l'impôt' ('কর সম্পর্কে স্মৃতিকথা')। গোটা ফরাসী সমাজের মতো তিনিও এই সময়ে আমেরিকার ব্যাপারগুলো সম্পর্কে প্রবলভাবে আগ্রহান্বিত ছিলেন। আশাবাদ ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ — তিনি আশা রাখতেন জরাজীর্ণ সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপের ভুল-ভ্রান্তি আর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো এড়িয়ে চলতে পারবে সাগরপারের প্রজাতন্ত্রটি।

পুরন বন্ধু ডাচেস দ্য আন্‌ভিল এবং দার্শনিক হেলভেশিয়াসের বিধবা মাদাম হেলভেশিয়াসের বৈঠকখানায় তিউর্গো যেতেন নিয়মিতভাবে, সেখানে জমায়েত হতেন সবচেয়ে যুক্তিবাদী এবং জ্ঞানী-গুণী মানুষ। মানবিক বিচারবুদ্ধির এই মস্ত পূজারীটির বিচারশক্তি প্রখর এবং স্পষ্ট ছিল একেবারে শেষ অবধি।

ব্যক্তিগত জীবনে তিউর্গো ছিলেন কিছুটা কড়া মেজাজের নীরস গোছের মানুষ। মাঝে-মাঝে বলা হয়েছে তিনি নমনীয় ছিলেন না, বড় বেশি একরোখা ছিলেন। হয়ত এর ফলে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা কঠিন ছিল, তাঁর সঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠ ছিল তাদের পক্ষেও; আর যারা তাঁকে ভাল করে চিনত না তারা একটু ভড়কে যেত।

কপটতা, অবিবেচনা আর সামঞ্জস্যহীনতা তাঁকে উত্তেজিত করত বিশেষত। রাজসভার আদব-কায়দা তিউর্গো কখনও রপ্ত করেন নি। তাঁর জীবনীকার দাকিন লিখেছেন, তাঁর চেহারা দেখে ভার্সাইয়ের মানুষ অস্বস্তিবোধ করত, ভয় পেত 'তাঁর প্রখর বাদামী চোখ, প্রকাণ্ড কপাল, জাঁকাল গঠন, মাথার ভঙ্গিটাই, রোমক শিলামূর্তির মতো তাঁর গম্ভীর ধরনধারন'।

ভার্সাইয়ের রাজসভায় তিনি ছিলেন বেখাপ্পা। ট্যালির‍্যান্ড যে-গুণটার কথা বলেছেন — নিজ ভাব-ভাবনা স্পষ্ট করে তোলার জন্যে নয়, সেগুলো প্রচ্ছন্ন রাখার জন্যে ভাষা ব্যবহার করার গুণ — সেটা ছিল না তিউর্গোর বহু ক্ষমতার মধ্যে।

দশম পরিচ্ছেদ

মহাজ্ঞানী স্কট্ অ্যাডাম স্মিথ

১৯৭৩ সাল ছিল অ্যাডাম স্মিথের জন্মের ২৫০ম বার্ষিকী, আর তাঁর 'জাতিসমূহের সম্পদ' প্রকাশনের দ্বিশতবার্ষিকী পড়েছিল ১৯৭৬ সালে: অর্থশাস্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই দুটি বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছিল অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে। এই মহান স্কট্ এবং এই বিজ্ঞানক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার উপর মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছিল আবার।

ভিক্টোরিয়া যুগের ইংরেজ অর্থনীতিবিদ এবং প্রবন্ধকার ওয়াল্টার বেজ্‌হট ১৮৭৬ সালে লিখেছিলেন: 'অ্যাডাম স্মিথের অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে প্রায় অশেষ পরিমাণে, কিন্তু খোদ অ্যাডাম স্মিথ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যৎসামান্যই। অথচ তিনি ছিলেন সবচেয়ে জিজ্ঞাসু মানুষের একজন, কিন্তু তিনি ছিলেন কী রকমের মানুষ সে-সম্বন্ধে কিছু ধারণা না থাকলে তাঁর বই পড়ে বড় একটা কিছু বোঝা যায় না।'*

বেজ্‌হটের পর থেকে অবশ্য স্মিথচর্চা অনেক এগিয়েছে। তবু ইংরেজ পণ্ডিত আলেগজ্যান্ডার গ্রে ১৯৪৮ সালে বলেন: 'আঠার শতকের মনীষীদের মধ্যে এতই বিশিষ্ট ছিলেন অ্যাডাম স্মিথ, আর উনিশ শতকে তাঁর স্বদেশে এবং সাধারণভাবে সারা পৃথিবীতে যাঁদের প্রভাবের প্রাধান্য ছিল তাঁদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল এতই সুস্পষ্ট, যাতে তাঁর জীবনের সবিশেষ বিবরণ সম্পর্কে আমরা এতই কম ওয়াকিবহাল যা কিছুটা আশ্চর্যই বটে।

* Bagehot's 'Historical Essays', New York, 1966, p. 79.

...কাজেই তাঁর জীবনীকার প্রায় বাধ্য হয়েই তাঁর সামান্য মালমশলায় অভাবপূরণ করলেন অ্যাডাম স্মিথের জীবনী লেখার চেয়ে বরং তাঁর আমলের ইতিহাস লিখে।'*

যুগের চাহিদাই পয়দা করে যেমন দরকার তেমনি মানুষটিকে। ইংলণ্ডে পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির বাস্তব বিকাশ অনুসারে সেদেশের অর্থশাস্ত্র এমন একটা পর্বে পৌঁছল যাতে একটা তন্ত্র গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিল, অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞান প্রণালীবদ্ধ করে সেটার সামান্যীকরণের প্রয়োজন দেখা দিল। যেমন ব্যক্তি হিসেবে তেমনি তত্ত্বীয় পাণ্ডিত্যের দিক থেকেও স্মিথ চমৎকার প্রস্তুত ছিলেন এই কাজটার জন্যে। একাধারে বিমূর্ত চিন্তনের ক্ষমতা এবং মূর্ত-নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলার স্বাভাবিক গুণের অধিকারী হবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল; তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল বহুমুখী, তেমনি আবার তিনি ছিলেন অসাধারণ বিবেকী, আর বিদ্বৎসমাজে বিধেয় সততা তাঁর ছিল; খুবই স্বতন্ত্র এবং বৈচারিক চিন্তাধারার সাহায্যে তিনি অন্যান্যের ধ্যান-ধারণা কাজে লাগাতে পারতেন; পণ্ডিতের স্থিরতা আর সুপ্রণালীর সঙ্গে তাঁর মাঝে এক হয়ে মিলেছিল তত্ত্বীয় আর নাগরিক সাহসিকতা।

যেসব ব্যাপারকে মনে হয় সহজ-সরল মামুলি কিন্তু সেগুলো মানুষের পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোর অর্থ বোঝা এবং ব্যাখ্যা করা সম্ভব করে, অন্তত সেজন্যে চেষ্টা করে অর্থনীতিবিজ্ঞান — এটা এই বিজ্ঞানের একটা বিশেষক উপাদান। এমন একটা ব্যাপার হল অর্থ। অর্থ হাতে করে ধরে নি, কিংবা অর্থ কী তা জানে না, এমন কেউ নেই। কিন্তু অর্থের মধ্যে থাকে বহু রহস্য। অর্থনীতিবিদদের কাছে এই প্রশ্নটা এতই জটিল যা কখনও নিঃশেষে মীমাংসিত হবার নয়; এটা নিশ্চয়ই তাঁদের বিবেচনাধীনে থেকে যাবে আরও বহুকাল।

দৈনন্দিন আর্থনীতিক ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে স্মিথের ছিল একটা আশ্চর্য অনুভব। কেনা-বেচা, জমি খাজনাবিলি করা আর মজুরি দিয়ে জন খাটানো, কর দেওয়া আর বাটা — এই সবই তাঁর কলমে হয়ে উঠত বিশেষ অর্থ আর অগ্রহের ব্যাপার। দেখা গেল, রাজনীতি আর রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের 'গুরুগম্ভীর' উপরতলায় কী ঘটে তার তল পেতে আরম্ভও করা যায় না

* A. Gray, 'Adam Smith', London, 1948, p. 3.

ওগুলো না বুঝলে। বায়রন আর পুশকিনের আমলে অর্থশাস্ত্র এত আগ্রহ জাগিয়েছিল সেটা স্মিথেরই কৃতিত্ব।

শিল্পক্ষেত্রের বুর্জোয়ারা তখন বাড়ন্ত, তাদের স্বার্থ প্রকাশ করতে গিয়ে অ্যাডাম স্মিথ তাদের অবিমিশ্র সাফাইদার হন নি, এটা হল আর-একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। বিদ্বৎসমাজের পক্ষে বিধেয় অপক্ষপাত আর স্বাধীন বিচার-বিবেচনার জন্যে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সচেষ্ট থাকতেন শুধু তাই নয়, সেটা তিনি হাসিলও করেছিলেন অনেকাংশে। এইসব সদগুণ ছিল বলে তিনি একটা অর্থশাস্ত্রতন্ত্র গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। মার্কস বলেছেন, 'বুর্জোয়া সমাজের ভিতরকার শারীরবৃত্তটাকে উপলব্ধি করতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন।'* স্মিথের বইখানা মানব-সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সাধনসাফল্য, আর বিংশ শতাব্দীতে অর্থনীতি চিন্তনের পরাকাষ্ঠা।

স্কট্ল্যান্ড

স্মিথ ছিলেন স্কট্, তার উপর নমুনাসই স্কট্ যাঁর জাতিগত চরিত্র ছিল সুস্পষ্ট, এটা বিবেচনায় রাখলে শুধু তবেই তাঁর অর্থশাস্ত্র বোঝা যায়, এই মর্মে একটা গতানুগতিক কথা গম্ভীর চালে বলা হয়ে থাকে।

আর একজন মহান স্কট্, পেনিসিলিনের আবিষ্কর্তা আলেগজ্যান্ডার ফ্লেমিং-এর জীবনীর শুরুতে ফরাসী লেখক আঁদ্রে মরোয়া লিখেছেন: 'স্কট্স্ম্যানরা ইংলিশম্যান নয়। ধারে-কাছেও না।' অধ্যবসায়, মিতব্যয় আর সঞ্চয়কে সাধারণত বলা হয়ে থাকে স্কট্দের জাতিগত চরিত্রের নমুনাসই বিশেষত্ব। স্কট্রা মিতাচারী, স্বল্পভাষী এবং তৎপর-কেজো বলে গণ্য হয়। আর বিমূর্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার দিকে, 'দার্শনিকতা করার' দিকে তাদের ঝোঁক।

তবে স্কট্দের জাতিগত চরিত্র সম্পর্কে মামুলি ধরনের এইসব উক্তি কতখানি যথার্থ সেটা নয় আসল কথাটা। স্মিথের জীবনকালে তাঁর দেশের এবং দেশবাসীদের অবস্থাটা কেমন ছিল তার ব্যাখ্যা দেওয়াটা তাঁর মতামতের বিশেষ ধরন বোঝার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

---

* কার্ল মার্কস, 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব', ৩য় ভাগ, মস্কো, ১৯৬৮, ১৬৫ পৃঃ।

ইংলন্ড আর স্কট্ল্যান্ডের সম্মিলন আইন পাস হয়েছিল ১৭০৭ সালে। এতে উপকৃত হয়েছিল ইংরেজ আর স্কট্ শিল্পপতি, বণিক আর ধনী খামারীরা, তাদের প্রভাব বেড়েছিল ঐ সময়ে, সেটা বেশ মালুম হত। দুই দেশের মধ্যকার শুল্কের বেড়া তুলে দেওয়া হয়েছিল, ইংলন্ডে স্কট্ল্যান্ডের গবাদি পশু বিক্রি বেড়েছিল, আমেরিকায় ইংলন্ডের উপনিবেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের সুযোগ পেয়েছিল গ্লাস্গোর বণিকরা। এই সবকিছুর জন্যে স্কট্ল্যান্ডের বুর্জোয়ারা স্বদেশপ্রেম কিছুটা ছাড়তে প্রস্তুত ছিল: নতুন যুক্তরাজ্যে স্কট্ল্যান্ডের ভূমিকাটা হবে অধস্তন সেটা তো অবধারিতই ছিল। অন্য দিকে, স্কট্ অভিজাতদের বেশির ভাগই ছিল সম্মিলনের বিরোধী। তারা কয়েক বার বিদ্রোহ করেছিল পার্বত্য অঞ্চলের বিশ্বস্ত যুদ্ধপ্রিয় অধিবাসীদের সাহায্যে — এরা তখনও ছিল সামন্ততান্ত্রিক আমলে, গোষ্ঠীতন্ত্রের কোন-কোন অবশেষও ছিল তাদের মধ্যে। আর্থনীতিক বিচারে অপেক্ষাকৃত উন্নত সমভূমির মানুষ কিন্তু তাদের সমর্থন করে নি, তাই ব্যর্থ হয় প্রত্যেকটা অভ্যুত্থান।

সম্মিলনের পরে স্কট্ল্যান্ডের আর্থনীতিক উন্নয়ন ত্বরিত হয়েছিল, যদিও ইংলন্ডের প্রতিযোগিতার দরুন অর্থনীতির কোন-কোন শাখার, আর টিকে-থাকা সামন্ততান্ত্রিক রীত-রেওয়াজের ফলে আরও কোন-কোন শাখার ক্ষতি হয়েছিল। বিশেষত দ্রুত উন্নতি হয়েছিল গ্লাস্গো শহর আর বন্দরের; একটা গোটা শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছিল শহরটাকে ঘিরে। গ্রাম আর পার্বত্য অঞ্চলগুলি থেকে শ্রমিক পাওয়া যেত সস্তায়, বিস্তীর্ণ বাজার ছিল স্কট্ল্যান্ডে, ইংলন্ডে আর আমেরিকায়, এসব শিল্পের প্রসারে আনুকূল্য করেছিল। কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নতি ঘটাতে লেগেছিল বড় ভূস্বামীরা আর ধনী প্রজা-খামারীরা। সম্মিলন হয়েছিল ১৭০৭ সালে, আর ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'জাতিসমূহের সম্পদ' — এই দুটো ঘটনার মধ্যে সত্তর বছরে অনেকটা বদলে গিয়েছিল স্কট্ল্যান্ড। আর্থনীতিক অগ্রগতি গণ্ডিবদ্ধ ছিল প্রায় সম্পূর্ণতই স্কট্ল্যান্ডের সমভূমিতে, তা ঠিকই, কিন্তু এখানেই — কার্কাল্ডি, গ্লাস্গো আর এডিনবারোর মধ্যে ত্রিভুজীয় এলাকাটাতেই — কেটেছিল স্মিথের প্রায় সারা জীবন।

স্মিথ পূর্ণবয়স্ক হবার আগেই অর্থনীতি স্কট্ল্যান্ডের ভাগ্যটাকে অচ্ছেদ্যভাবে বেঁধে দিয়েছিল ইংলন্ডের ভাগ্যের সঙ্গে; গড়ে উঠছিল একক বুর্জোয়া জাতিসত্তা। স্মিথ সবকিছুকেই দেখতেন উৎপাদন-শক্তি আর

'জাতির সম্পদ'-এর বিকাশের হিসেবে — তাঁর কাছে বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ঐ বন্ধন। আরও বহু ওয়াকিবহাল স্কট্‌দের মতো তাঁর ক্ষেত্রেও স্কটিশ দেশাত্মবোধ 'সাংস্কৃতিক', ভাবাবেগের আকার ধারণ করেছিল — রাজনীতিক আকার নয়।

সমাজ-জীবন আর জ্ঞান-বিজ্ঞানক্ষেত্রে যাজকতন্ত্র আর ধর্মের প্রভাব কমে যাচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ধর্মসম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ আর ছিল না। যুক্তিবাদী মূলভাব, ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্ব এবং কার্যগত প্রবণতার দিক থেকে স্কট্‌ল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল অক্সফোর্ড আর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পৃথক। এদিক থেকে খুবই বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে পড়াশুনো করেছিলেন এবং পরে অধ্যাপনা করেছিলেন স্মিথ। স্টীম ইঞ্জিনের উদ্ভাবক জেম্‌স ওয়াট, আর আধুনিক রসায়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জোসেফ ব্লেক কাজ করেছিলেন স্মিথের সঙ্গে, তাঁরা তাঁর বন্ধু ছিলেন। আঠার শতকের ষষ্ঠ দশকে স্কট্‌ল্যান্ডে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের জোয়ারের কালপর্যায়; সেটা বিশেষত দেখা যায় বিজ্ঞান এবং ললিতকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বছর-পঞ্চাশেকে ছোট্ট স্কট্‌ল্যান্ডে প্রতিভাশালী মানুষের যে-দেদীপ্যমান কাতারটা দেখা দিয়েছিল সেটা জাঁকালোই বটে। আগেই যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা ছাড়াও এই কাতারে আরও ছিলেন অর্থনীতিবিদ জেম্‌স স্টুয়ার্ট আর দার্শনিক ডেভিড হিউম, ইতিহাসকার উইলিয়ম রবার্টসন, সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম ফেগুর্সন। ভূবিজ্ঞানী জেম্‌স হাট্‌ন, বিখ্যাত চিকিৎসক উইলিয়ম হাণ্টার এবং স্থপতি রবার্ট অ্যাডামের মতো অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ-পরিচয় ছিল স্মিথের। এঁদের এবং এঁদের রচনাবলির প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল স্কট্‌ল্যান্ডের এবং বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে অনেক দূর অবধি।

এমনই পরিবেশে, এমনই আবহাওয়ায় বিকশিত হয়েছিল স্মিথের মনীষা। স্বভাবতই, তিনি সংস্কৃতি আয়ত্ত করেছিলেন সেটা শুধু স্কট্‌ল্যান্ডের নয়। স্কটিশ প্রভাব ছাড়াও তাঁকে গড়ে তুলেছিল ইংলন্ডের জ্ঞান-বিজ্ঞান আর সংস্কৃতি, বিশেষত ইংলন্ডের দার্শনিক আর আর্থনীতিক চিন্তন, সেটাও কম পরিমাণে নয়। ব্যবহারিক দিক থেকে দেখলে, যুক্তরাজ্যের, লন্ডন সরকারের আর্থনীতিক কর্মনীতির উপর বিশেষ-নির্দিষ্ট (বণিকতন্ত্রবিরোধী) প্রভাব বিস্তার করাই ছিল তাঁর গোটা বইখানার উদ্দেশ্য।

শেষে বলা দরকার আর-একটা ধারার প্রভাবের কথা — সেটা ফরাসী। মেরি স্টুয়ার্টের আমল থেকে স্কট্‌ল্যান্ড ফ্রান্সের সঙ্গে চিরাগত যোগসূত্র বজায় রেখেছিল — এদেশে ফরাসী সংস্কৃতির প্রভাব ছিল ইংলন্ডে যেমনটা তার চেয়ে প্রবল। মঁতেস্ক্য আর ভল্টেয়রের রচনাবলি সম্পর্কে স্মিথ ওয়াকিবহাল ছিলেন; রুসোর গোড়ার রচনাগুলি এবং 'এনসাইক্লোপেডিয়া'র প্রথম-প্রথম খণ্ডগুলি তিনি সোৎসাহে গ্রহণ করেছিলেন।

প্রফেসর স্মিথ

এডিনবারোর কাছে কার্কাল্ডি নামে ছোট শহরে অ্যাডাম স্মিথের জন্ম হয় ১৭২৩ সালে। তাঁর বাবা ছিলেন কাস্টম্‌স বিভাগের কর্মচারী — তিনি মারা যান স্মিথের জন্মের কয়েক মাস আগে। তরুণী বিধবার একমাত্র সন্তান অ্যাডামের জন্যে মা নিয়োজিত করেছিলেন তাঁর গোটা জীবনটা। ছেলেটি ছিল ক্ষীণ, রোগাটে, সমবয়সী ছেলেদের বেশি হৈ-হল্লার খেলাধুলো সে এড়িয়ে চলত। পরিবারটির সংগতি-সংস্থান তেমন ছিল না, তবে ঠিক গরিবি দশায় পড়ে নি কখনও। ভাগ্য ভাল, কার্কাল্ডিতে একটি ভাল স্কুল ছিল, আর শিক্ষকটিও ছিলেন ভাল; বহু শিক্ষকই বাচ্চাদের মাথায় ঠেসে-ঠেসে ঢুকিয়ে দিতেন শুধু বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি আর ল্যাটিন ধাতুরূপ, কিন্তু এই শিক্ষকটি সেটাকে ঠিক মনে করতেন না। তার উপর, একেবারে শুরু থেকেই অ্যাডামকে ঘিরে ছিল বই আর বই। যে-বিপুল জ্ঞানের জন্যে স্মিথ পরে বিখ্যাত হয়েছিলেন সেটার সূচনা ছিল এমনই।

ঠিক বটে, অভিজাত তিউর্গোর মতো চমৎকার শিক্ষা তিনি পান নি, তার কারণটা স্পষ্টই। বিশেষত ফরাসী ভাষার ভাল শিক্ষক তাঁর কখনও ছিল না, তাই ফরাসী ভাষায় খুব ভাল বলতে পারতেন না, যদিও পড়তে পারতেন স্বচ্ছন্দে। আঠার শতকে ক্ল্যাসিকাল ভাষাগুলি যেকোন শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে অবশ্যশিক্ষণীয়, কিন্তু তার (বিশেষত প্রাচীন গ্রীক ভাষা) সত্যিকারের অধ্যয়ন তিনি করেন নি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হবার আগে।

স্মিথ গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হন খুব কম বয়সে, তখন তাঁর বয়স চোদ্দ (এটাই ছিল তখনকার দিনের রেওয়াজী)। যুক্তিবিদ্যা ছিল সমস্ত ছাত্রের পক্ষে আবশ্যিক, সেটার পাঠ্যধারা শেষ করে (প্রথম বর্ষ) তিনি নীতি শাস্ত্রের পাঠ্যধারা ধরেন, এইভাবে তিনি বেছে নেন সাহিত্যাদির

শাখা। তবে তিনি গণিত আর জ্যোতির্বিদ্যা নিয়েও পড়াশুনো করতেন; এই দুটো বিষয়ে তিনি খুবই ওয়াকিবহাল ছিলেন বরাবর। স্মিথের সতর বছর বয়সে সহপাঠীদের মধ্যে তাঁর নাম হয়েছিল পণ্ডিত এবং কিছুটা অদ্ভুত প্রকৃতির ছেলে বলে। গণ্ডগোলের ভিড়ের মধ্যে তিনি গভীর চিন্তায় ডুবে যেতেন, কিংবা চারপাশের অবস্থা ভুলে কথা বলতে থাকতেন আপনমনে। এইসব ছোটখাটো ছিটের ভাব তাঁর ছিল জীবনভর। ১৭৪০ সালে গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হবার সময়ে স্মিথকে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো চালিয়ে যাবার জন্যে। একজন লোকহিতৈষী ধনী ব্যক্তির উইল্‌-এ বরাদ্দ-করা টাকা থেকে এই বৃত্তি দেওয়া হয়েছিল স্মিথকে। স্মিথ অক্সফোর্ডে ছিলেন ছ'বছর, তাতে প্রায় কোন ছেদ পড়ে নি।

ছাত্ররা কী পড়ে তার উপর সতর্ক নজর রাখতেন অধ্যাপক আর সুপারভাইজররা; ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তার বইপত্র নিষিদ্ধ ছিল। অক্সফোর্ডে স্মিথের জীবনটা ছিল দুর্বিষহ; এই দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা তিনি পরে যখনই উল্লেখ করেছেন তাতে থেকেছে বিতৃষ্ণার ভাব। তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ, শরীর খারাপ থাকত প্রায়ই। আবারও তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিল বই। স্মিথ যেসব বিষয়ে পড়তেন তার পরিধি ছিল খুবই ব্যাপক, কিন্তু অর্থনীতিবিজ্ঞানে তাঁর কোন বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না এই সময়ে।

১৭৪৬ সালে কার্কাল্ডি গিয়ে তিনি সেখানে থাকেন দু'বছর, এই সময়ে তিনি শিক্ষালাভ করেন নিজে-নিজেই। একবার এডিনবারো গিয়ে তিনি ধনী ভূস্বামী এবং শিল্প-সাহিত্যের সমঝদার হেনরি হিউম (পরে লর্ড কেইম্‌স)-কে গুণমুগ্ধ করেন, সেটা এতখানি যাতে এই সমঝদারটি এই তরুণ পণ্ডিতের বক্তৃতামালার আয়োজন করেন ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে। এই বক্তৃতামালার ফল হয়েছিল খুবই সন্তোষজনক। পরে বদলান হয় বক্তৃতার বিষয়বস্তু, তাতে আলোচিত হতে থাকে প্রধানত প্রাকৃতিক নিয়মাবলি; আঠার শতকে এই ধারণাটার মধ্যে ব্যবহারশাস্ত্র ছাড়াও ছিল রাজনীতিক মতবাদ, সমাজবিদ্যা, অর্থবিদ্যা। অর্থশাস্ত্র বিষয়ে স্মিথের বিশেষ আগ্রহের প্রথম-প্রথম লক্ষণ দেখা দেয় এই সময়ে।

মনে হয় ১৭৫০-১৭৫১ সালে স্মিথ প্রকাশ করছিলেন আর্থনীতিক উদারনীতির প্রধান ধারণাগুলি। যা-ই হোক, ১৭৫৫ সালে একটা বিশেষ

মন্তব্যে তিনি বলেন এইসব ভাব-ধারণা ছিল তাঁর এডিনবারোর বক্তৃতামালায়: ‘রাষ্ট্রপুরুষ আর ঝুঁকিদার কারবারিরা মানুষকে সাধারণত ধরেন একরকমের রাজনীতিক বলবিদ্যার মালমশলা হিসেবে। প্রকৃতি যখন মানুষের ব্যাপারে ক্রিয়ারত থাকে সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রকৃতির রাজ্যে গোলযোগ সৃষ্টির করেন ঝুঁকিদার কারবারিরা; প্রকৃতি যাতে নিজ অভিপ্রায় বলবৎ করতে পারে সেজন্যে তার উদ্দেশ্য অনুসারে চলায় তাকে স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়ার চেয়ে বেশি কিছু দরকার হয় না। ...রাষ্ট্রকে সর্বনিম্ন বর্বর অবস্থা থেকে সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ পর্বে তুলবার জন্যে শান্তি, লঘুভার কর এবং সহনীয় ন্যায়বিচার ছাড়া বড় একটাকিছু লাগে না; অন্য সবকিছুই হয় ঘটনাক্রমে। যেসব সরকার এই স্বাভাবিক ধারাটাকে ব্যাহত ক'রে সবকিছুকে জোর করে চালিয়ে দেয় অন্য খাতে, কিংবা কোন একটা সন্ধিক্ষণে সমাজের প্রগতি রুখে দিতে চেষ্টা করে সেগুলো অস্বাভাবিক, সেগুলো টিকে থাকার জন্যে উৎপীড়ক এবং জালিম না হয়ে পারে না।’*

এটা হল আঠার শতকের বুর্জোয়াদের ভাষা; রাষ্ট্র তখনও সামন্ততান্ত্রিক বেশ পুরোপুরি ছেড়ে ফেলে নি, সেই রাষ্ট্রের প্রতি ঐ বুর্জোয়াদের মনোভাব ছিল এমনই কঠোর। তখনকার এই রচনাংশটিতেই স্মিথের রচনাশৈলীর স্বভাবসিদ্ধ সাহসিক এবং তেজীয়ান প্রকৃতিটা লক্ষ্য করা যায়। ইনি হলেন ইতোমধ্যেই সেই একই স্মিথ যিনি ‘জাতিসমূহের সম্পদ’-এ সক্রোধ ব্যঙ্গোক্তি করে বলেছেন ‘সেই খল এবং ধূর্ত জীবটা’র কথা ‘যাকে ইতরভাষায় বলা হয় রাষ্ট্রপুরুষ কিংবা রাজনীতিক, যার বিচার-সিদ্ধান্ত চালিত হয় ঘটনা-ব্যাপারের সাময়িক উঠতি-পড়তি অনুসারে।’** এটা তখনকার দিনের রাষ্ট্র সম্পর্কে সেই আমলের বুর্জোয়া ভাবাদর্শবিদের নেতিবাচক মনোবৃত্তিই শুধু নয়, — আমলাতন্ত্র আর রাজনীতিক চক্রীদের প্রতি গণতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীর স্রেফ প্রগাঢ় বিতৃষ্ণাও বটে।

১৭৫১ সালে স্মিথ গ্লাস্‌গো গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসরের পদে নিযুক্ত হন। তিনি মুখ্য অধ্যাপকের পদ (‘চেয়ার’) পান প্রথমে যুক্তিবিদ্যায়,

---

* W. R. Scott, ‘Adam Smith as Student and Professor’, Glasgow, 1937, pp. 53-54 থেকে উদ্ধৃত।

** A. Smith, ‘The Wealth of Nations’, Vol. I, London, 1924, p. 412.

পরে নীতিশাস্ত্রে, অর্থাৎ সমাজবিদ্যা বিভাগে। তিনি গ্লাস্‌গোতে ছিলেন তের বছর, তখন নিয়মিতভাবে বছরে দু'-তিন মাস কাটত এডিনবারোতে। বৃদ্ধ বয়সে তিনি লিখেছিলেন, এটা ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়। তিনি তখন ছিলেন খুবই অভ্যস্ত এবং অন্তরঙ্গ পারিপার্শ্বিকে, তিনি ছিলেন অধ্যাপক, ছাত্র এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের শ্রদ্ধাভাজন। কোন অযথা হস্তক্ষেপ হত না তাঁর কাজে, আর জ্ঞান-বিজ্ঞানক্ষেত্রে তাঁর মস্ত-মস্ত সাধনসাফল্য হবে বলে আশা করা হত। তাঁর একটি বন্ধুবান্ধব মহল গড়ে উঠেছিল। বৃটিশ কৌমার্য জীবন আর ক্লাবম্যান-এর বিশেষত্বগুলো দেখা দিচ্ছিল তাঁর চালচলনে, সেটা বজায় ছিল তাঁর জীবনভর।

যেমন নিউটন আর লাইবনিট্‌সের ক্ষেত্রে তেমনি — কোন নারীর বিশেষ ভূমিকা ছিল না স্মিথের জীবনে। এডিনবারো আর গ্লাস্‌গো-তে থাকার বছরগুলিতে তিনি দু'বার প্রায় বিয়ে করে ফেলেছিলেন, কিন্তু কোন-না-কোন কারণে কোন বার সেটা ঘটে নি, এই মর্মে ভাসা-ভাসা অসমর্থিত গুজব অবশ্য ছিল। তবে তাতে তাঁর মনের শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটেছিল বলে মনে হয় না। যা-ই হোক, তাঁর চিঠিপত্রে (যা খুবই সামান্য) কিংবা সমসাময়িকদের স্মৃতিকথায় অমন কোন ব্যাঘাতের কোন নামগন্ধ নেই।

জীবনভর তাঁর ঘরকন্না করেছিলেন মা এবং একটি আইবুড় আত্মীয়া। স্মিথ মারা যাবার মাত্র ছ'বছর আগে তাঁর মা, আর দু'বছর আগে ঐ আত্মীয়াটি মারা যান। স্মিথের বাড়িতে যাঁরা যেতেন তাঁদের একজন বলেন বাড়িটা ছিল 'একেবারেই স্কটিশ'। সেখানে খাওয়ান হত স্কটিশ খানা, স্কটিশ রীত-রেওয়াজ মেনে চলা হত। তাঁর পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই অভ্যস্ত জীবনযাত্রা। দীর্ঘকাল বাড়ি ছেড়ে থাকা তিনি পছন্দ করতেন না, সবসময়ে বাড়ি ফিরে যেতেন চটপট।

১৭৫৯ সালে স্মিথ প্রকাশ করেন তাঁর প্রথম দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক রচনা — 'Theory of Moral Sentiments' ('নৈতিক অনুভব তত্ত্ব')। নীতিবিদ্যা সম্বন্ধে এই বইখানা তখনকার কালের পক্ষে ছিল প্রগতিশীল, 'জ্ঞানালোকনে'র যুগ আর আদর্শের উপযোগী, কিন্তু আজ বইখানার গুরুত্ব শুধু প্রধানত স্মিথের দার্শনিক এবং আর্থনীতিক ধ্যান-ধারণা গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় একটা পর্ব হিসেবে। পরলোকে প্রতিফল এবং স্বর্গসুখের আশ্বাসের ভিত্তিতে বিবৃত খ্রিস্টীয় নৈতিকতার তীব্র সমালোচনা করেন স্মিথ। তাঁর নীতিবিদ্যায় একটা বিশিষ্ট স্থানে রয়েছে সমানতার সামন্ততন্ত্রবিরোধী

ধ্যান-ধারণা। সমস্ত মানুষ স্বভাবতই সমান, কাজেই নৈতিক মূলনিয়ম সবার বেলায় সমানই প্রযোজ্য।

তবে স্মিথ এগোচ্ছিলেন মানুষের আচরণবিধির অবিমিশ্র, 'স্বাভাবিক' নিয়মাবলি অনুসারে; ন্যায়-নীতিবোধ মূলত নির্ধারিত হয় সংশ্লিষ্ট সমাজের সামাজিক-আর্থনীতিক বিন্যাস দিয়ে, এই অনুভবটা তাতে ছিল খুবই অস্পষ্ট আকারে। তাই ধর্মীয় নৈতিকতা এবং 'সহজাত নীতিবোধ' বাতিল করে দিয়ে তিনি সেগুলোর জায়গায় বসালেন আর-একটা বিমূর্ত উপাদান — 'সহানুভূতির নীতি'। অন্যান্যের সম্বন্ধে মানুষের সমস্ত অনুভব আর আচরণের ব্যাখ্যা তিনি দিতে চেষ্টা করলেন 'তাদের চামড়ার ভিতরে ঢুকে পড়া'র ক্ষমতা দিয়ে, নিজেকে তাদের অবস্থায় কল্পনা করার এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি বোধ করার ক্ষমতা দিয়ে। এই ধারণাটাকে তিনি নিপুণ ধরনে এবং কখনও-কখনও সরস উক্তি দিয়ে বিস্তারিত করেছেন, কিন্তু তা যতই হোক, সেটা বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদী নীতিবিদ্যার ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে নি। স্মিথের 'নৈতিক অনুভব তত্ত্ব' আঠার শতক ছাড়িয়ে টেকে নি। স্মিথের নামটিকে চিরস্মরণীয় করে নি ঐ তত্ত্বটা। হয়েছে তার উলটোটা: 'জাতিসমূহের সম্পদ' রচয়িতার যশ তত্ত্বটাকে বিস্মৃতির মাঝে তলিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছে।

'তত্ত্ব'টা নিয়ে কাজ করবার সময়ে স্মিথের বৈজ্ঞানিক আগ্রহের অভিমুখ ইতোমধ্যে বদলে গিয়েছিল অনেকটা। তিনি ক্রমেই বেশি প্রগাঢ়ভাবে অধ্যয়ন করছিলেন অর্থশাস্ত্র। নিজস্ব ঝোঁকই শুধু নয়, যুগের চাহিদাও এতে তাঁকে উৎসাহ যুগিয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য আর শিল্পের শহর গ্লাস্‌গোতে আর্থনীতিক সমস্যাগুলো তখন মালুম হচ্ছিল বেশ প্রবলভাবে। শহরটিতে ছিল একটা অর্থশাস্ত্র ক্লাব — অভিনব ধরনের এই ক্লাবে আলোচ্য বিষয় ছিল বাণিজ্য আর শুল্ক, মজুরি আর ব্যাঙ্কিং, ভূমি-খাজনার শর্ত আর উপনিবেশ। স্মিথ অচিরেই হন এই ক্লাবের সবচেয়ে বিশিষ্ট সদস্যদের একজন। হিউমের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আর বন্ধুত্বও অর্থশাস্ত্রে স্মিথের আগ্রহ বাড়িয়ে তুলেছিল।

উনিশ শতকের শেষের দিকে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ এডুইন ক্যানান কিছু গুরুত্বপূর্ণ মালমশলার সন্ধান পেয়ে সেগুলি প্রকাশ করেন; স্মিথের ভাব-ধারণা কিভাবে গড়ে উঠেছিল সেটা স্পষ্ট করে তুলতে সেগুলি সহায়ক। গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ছাত্র স্মিথের লেকচার টুকে রেখেছিলেন,

তারপর সেগুলি সামান্য সংশোধন করে লেখা হয় — সেই মালমশলার কথা বলা হচ্ছে। মর্মবস্তু যা তার থেকে বলা যায় লেকচারগুলি ১৭৬২-১৭৬৩ সালের। সেগুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে, স্মিথ ছাত্রদের কাছে লেকচার দিচ্ছিলেন যে-নৈতিক দর্শন বা নীতিবিদ্যার পাঠ্যধারায় সেটা ততদিনে সমাজবিদ্যা আর অর্থশাস্ত্রের পাঠ্যধারায় পরিণত হয়েছিল। কতকগুলি লক্ষণীয় বস্তুবাদী ধারণা তিনি তাতে প্রকাশ করেন, যেমন: 'মালিকানা আসার আগে কোন সরকার হতে পারে না — সরকারের লক্ষ্যই হল সম্পদ নিরাপদ রাখা, গরিবদের হাত থেকে ধনীদের রক্ষা করা।'* কোন-কোন ধারণা, যা পরে বিস্তারিত করা হয় 'জাতিসমূহের সম্পদ'-এ সেগুলিকে প্রাথমিক আকারে দেখা যায় এইসব লেকচারের অর্থনীতি-সংক্রান্ত অংশগুলিতে।

বিশ শতকের চতুর্থ দশকে আবিষ্কৃত হয় আর একটা আগ্রহজনক জিনিস: 'জাতিসমূহের সম্পদ'-এর প্রথম কয়েকটা পরিচ্ছেদের খসড়া। বৃটিশ পণ্ডিতেরা বলেন, দলিলখানা ১৭৬৩ সালের। এতেও রয়েছে ভবিষ্য বইখানার কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ভাব-ধারণা: শ্রমবিভাগের ভূমিকা, উৎপাদী আর অনুৎপাদী শ্রম-সংক্রান্ত ধারণা, ইত্যাদি। এতে আরও আছে বণিকতন্ত্রের সুতীব্র সমালোচনা এবং অবাধ-নীতির সপক্ষে যুক্তি।

এইভাবে গ্লাসগোতে থাকার সময়ের শেষাশেষিই স্মিথের অর্থনীতি চিন্তন হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রগাঢ় এবং মৌলিক। কিন্তু নিজের সর্বপ্রধান রচনাটি লেখার জন্যে তিনি তখনও প্রস্তুত ছিলেন না। তরুণ ডিউক বাক্লিউর গৃহশিক্ষক হয়ে তিনি ফ্রান্সে ছিলেন তিন বছর, আর ফিজিওক্র্যাটদের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয় — এইভাবে সমাধা হয় সেই প্রস্তুতি।

ফ্রান্সে স্মিথ

উল্লিখিত ঘটনাগুলির পঞ্চাশ বছর পরে জাঁ বাতিস্ত সে' বৃদ্ধ দ্যুপোঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ১৭৬৫-১৭৬৬ সালে স্মিথের প্যারিসে থাকার সময়কার কথা। তার উত্তরে দ্যুপোঁ বলেছিলেন স্মিথ যেতেন কেনের 'চিলেকোঠার ক্লাবে'। কিন্তু ফিজিওক্র্যাটদের আড্ডাগুলোয় তিনি চুপচাপ বসে থাকতেন,

* A.Smith, 'Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms', Oxford, 1896, p. 15.

বড় একটাকিছু বলতেন না, তাই কেউ মনে করতে পারত না ইনি 'জাতিসমূহের সম্পদ'-এর হবু রচয়িতা হতে পারতেন। প্যারিসে স্মিথের বন্ধুত্ব হয়েছিল পণ্ডিত এবং লেখক অ্যাবে মোরেল্লের সঙ্গে, ইনি স্মৃতিকথায় স্মিথ সম্বন্ধে বলেছেন, 'ম্যাসিয়্যা তিউর্গো... তাঁর মনীষা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। আমরা তাঁকে দেখেছি অনেক বার; হেলভেশিয়াসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাণিজ্য তত্ত্ব, ব্যাঙ্কিং, জাতীয় ক্রেডিট এবং তিনি যে মহতী রচনার পরিকল্পনা করছিলেন সেটার অনেক বিষয় সম্পর্কে আমরা আলাপ করেছিলাম।'* এ'র চিঠিপত্র থেকে আরও জানা গেছে, গণিতবেত্তা এবং দার্শনিক দালাঁবেয়ার আর অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মহান যোদ্ধা ব্যারন হলবাখের সঙ্গে স্মিথের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। জেনেভার উপকণ্ঠে ভল্টেয়রের জমিদারবাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে স্মিথ কয়েক বার আলাপ-আলোচনা করছিলেন। ভল্টেয়রকে অন্যতম মহত্তম ফরাসী বলে মনে করতেন স্মিথ।

অত আগে, ১৭৭৫ সালে 'এডিনবারো রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত স্মিথের প্রবন্ধে দেখা যায় ফরাসী সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তাঁর বিভিন্ন লেকচার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় জন লোর ধ্যান-ধারণা আর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তিনি জানতেন বিস্তারিতভাবে। 'এনসাইক্লোপেডিয়া'-তে কেনের প্রবন্ধগুলি তিনি পড়েছিলেন, তবু ফিজিওক্র্যাটদের রচনাগুলি সম্পর্কে তাঁর জানা ছিল বোধহয় সামান্যই। তাঁদের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন প্রধানত প্যারিসে — ব্যক্তিগত দেখা-সাক্ষাৎ থেকে এবং ফিজিওক্র্যাটদের নানা লেখা থেকে, এগুলি তখন বেরচ্ছিল প্রচুর।

বলা যেতে পারে স্মিথ ফ্রান্সে গিয়েছিলেন একেবারে উপযুক্ত সময়টিতে। একদিকে তিনি ইতোমধ্যে হয়েছিলেন সুপরিণত পণ্ডিতব্যক্তি, তাঁর তখন ছিল নিজস্ব মতামত। আর অন্য দিকে, তাঁর তন্ত্রটা তখনও পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে নি, কেনে আর তিউর্গোর ধ্যান-ধারণা তিনি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন।

ফিজিওক্র্যাটদের বিশেষত তিউর্গোর উপর স্মিথের নির্ভর করা সংক্রান্ত প্রশ্নটার নিজস্ব ইতিহাস আছে। বুর্জোয়া সমাজের ভিতরকার

* A. Morellet, 'Mémoires sur le dix-huitième siècle, et sur la révolution française', t. I, Paris, 1822, p. 244.

শারীরবৃত্তটাকে তিনি বুঝেছিলেন অপেক্ষাকৃত গভীরভাবে। ইংরেজদের ঐতিহ্য অনুসারে এগিয়ে তিনি নিজ আর্থনীতিক তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বের ভিত্তিতে, যেখানে প্রকৃতপক্ষে কোন মূল্য-তত্ত্ব ছিল না ফিজিওক্র্যাটদের। ফিজিওক্র্যাটদের সঙ্গে তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রপদক্ষেপ তিনি করতে পেরেছিলেন এর ফলে: তিনি প্রমাণ করলেন কৃষি-শ্রমই শুধু নয়, সমস্ত উৎপাদী শ্রমই পয়দা করে মূল্য। সমাজের শ্রেণীগত গঠন সম্পর্কে স্মিথের ধারণা ছিল ফিজিওক্র্যাটদের চেয়ে স্পষ্ট।

আর তার সঙ্গে সঙ্গে, কোন-কোন ক্ষেত্রে ফিজিওক্র্যাটরা ছিল স্মিথের চেয়ে আগুয়ান। পুঁজিতান্ত্রিক পুনরুৎপাদন বন্দোবস্তটা সম্বন্ধে কেনের চমৎকার ধারণা সম্পর্কে কথাটা বিশেষত প্রযোজ্য। ফিজিওক্র্যাটদের ধারণা অনুসারে স্মিথ মনে করতেন শুধু আত্মকৃচ্ছ্রতা, মিতাচার আর ভোগ-ব্যবহারে সংযমের সাহায্যেই পুঁজিপতিরা সঞ্চয় করতে পারে। কিন্তু ফিজিওক্র্যাটদের অন্তত এই যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তিটা ছিল যে, তাদের মতে, পুঁজিপতিরা সঞ্চয় করে 'কিছু-না থেকে' — শিল্পক্ষেত্রের শ্রম তো 'নিষ্ফলা'। এই সাফাইটাও ছিল না স্মিথের। সমস্ত রকমের উৎপাদী শ্রমের সমতা, আর্থনীতিক বিচারে সম-মূল্য সংক্রান্ত উপস্থাপনায় তাঁর যুক্তি অসমঞ্জস। মূল্য পয়দা করার দিক থেকে দেখলে কৃষি-শ্রম তবু শ্রেয়: এক্ষেত্রে প্রকৃতি 'কাজ করে' মানুষের সঙ্গে মিলে — এই ধারণাটা তিনি ছাড়তে পারেন নি সেটা স্পষ্টই।

ফিজিওক্র্যাটদের সম্বন্ধে স্মিথের মনোভাব ছিল বণিকতন্ত্রীদের প্রতি তাঁর মনোভাব থেকে খুবই পৃথক। বণিকতন্ত্রীদের তিনি ভাবাদর্শগত দুশমন বলে গণ্য করতেন; তাঁর যাবতীয় পেশাগত সংযম সত্ত্বেও তিনি তাদের তীব্রতম সমালোচনা করতে ছেড়ে কথা বলেন নি (সেটা কখনও-কখনও ছিল মাত্রাতিরিক্ত)। সাধারণভাবে বলা যায়, ফিজিওক্র্যাটদের তিনি দেখতেন সহযোগী এবং বন্ধু হিসেবে, যারা একই লক্ষ্যের দিকে চলছিল ভিন্ন পথে। 'জাতিসমূহের সম্পদ'-এ তাঁর সিদ্ধান্তটা হল — 'তবে যাবতীয় অসম্পূর্ণতা আর ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও এই তন্ত্রটা বোধহয় অর্থশাস্ত্র বিষয়ে এযাবৎ যাকিছু প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি।'* আর-একটা

* A. Smith, 'The Wealth of Nations', Vol. III, London, 1924, p. 172.

অংশে তিনি লিখেছেন, এটা 'পৃথিবীর কোন জায়গায় কখনও কোন ক্ষতি করে নি, হয়ত করবেও না কখনও।'

শেষের মন্তব্যটাকে তামাশা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অচঞ্চল গুরুগম্ভীর চাল বজায় রেখে তিনি প্রায় অলক্ষ্যে তামাশা করতেন। বাস্তব জীবনেও তিনি ছিলেন এই রকমই। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার একটা অফিশিয়াল ডিনারের সময়ে তাঁর পাশের ভদ্রলোক (তিনি গিয়েছিলেন লণ্ডন থেকে) অবাক হয়ে কোন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেই ব্যক্তির প্রতি প্রত্যেকেই অত সসম্ভ্রম কেন যদিও তিনি তো স্পষ্টতই বিদ্যে-বুদ্ধির জাহাজ নন। উত্তরে স্মিথ বলেছিলেন: 'তা আমরা খুব ভালভাবেই জানি, কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই একমাত্র লর্ড।' প্রশ্নকর্তা ঠিক ধরতে পারলেন না সেটা ঠাট্টা কিনা।

স্মিথের বইখানায় ফ্রান্স এসেছে ফিজিওক্র্যাটদের সঙ্গে সরাসরি কিংবা পরোক্ষে সংশ্লিষ্ট ধ্যান-ধারণার মধ্যেই শুধু নয়, তাছাড়াও বহু পর্যবেক্ষণ (ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণও), দৃষ্টান্ত আর ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়েও। তাঁর সমস্ত মালমশলায় সাধারণ মূলভাবটা বৈচারিক। ফ্রান্সে ছিল সামন্ততান্ত্রিক, নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা এবং বুর্জোয়া ধারায় উন্নয়নের উপর বেড়ি পরান — এই ফ্রান্স স্মিথের পক্ষে ছিল বিদ্যমান বিন্যাস এবং আদর্শস্বরূপ 'স্বাভাবিক বিন্যাসের' মধ্যে অসংগতির জীবন্ত দৃষ্টান্ত। ইংলণ্ডে সবকিছু ছিল নিখুঁত, তা বলা চলত না, কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতা, ধর্মবুদ্ধির স্বাধীনতা, আর যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই উদ্যোগী কারবারের স্বাধীনতা নিয়ে যে 'স্বাভাবিক বিন্যাস' তার অনেকটা কাছাকাছিই ছিল ইংলণ্ডের ব্যবস্থাটা।

ফ্রান্সে তিন বছর থাকার ক্রিয়াফল কী হল স্মিথের নিজস্ব জীবনে? এক, তাঁর বৈষয়িক অবস্থার অনেকটা উন্নতি হল। ডিউক বাক্লিউর মা-বাবার সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল — স্মিথ বছরে তিন-শ' পাউণ্ড পাবেন সেখানে থাকার সময়েই শুধু নয়, সেটা হবে জীবনভর তাঁর পেনশন। এর ফলে তিনি তার পরের দশ বছর পুরোপুরি লাগাতে পেরেছিলেন বইখানার জন্যে: তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যান নি। দুই, তাঁর প্রকৃতিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন সমসাময়িক সবাই: তিনি হয়ে উঠেছিলেন অপেক্ষাকৃত সুশৃঙ্খল কর্মঠ এবং উদ্যোগী, এমনকি যাঁরা তাঁর ঊর্ধ্বতন তাঁদের সমেত নানা রকমের লোকের সঙ্গে ব্যবহারের ধরনধারনও রপ্ত করেন কিছুটা। তবে

সমাজে ভারি মানুষ হয়ে ওঠাটা তাঁর ঘটে নি; তাঁর যাঁরা পরিচিত তাঁদের বেশির ভাগই তাঁকে কিছুটা ছিটগ্রস্ত অন্যমনস্ক প্রফেসর হিসেবে দেখতেন। তাঁর অন্যমনস্কতার কথা তাঁর যশের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত রটে গিয়েছিল, সবাই সেটাকে দেখত তার যশেরই একটা অঙ্গ হিসেবে।

'আর্থনীতিক মানুষ'

স্মিথ প্যারিসে ছিলেন প্রায় এক বছর — ১৭৬৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৭৬৬ সালের অক্টোবর মাস। তবে প্যারিসের নামজাদা বৈঠকখানাগুলিতে আগের তিন বছর ধরে তাঁর বন্ধু হিউম কিংবা দশ বছর পরে ফ্র্যাঙ্কলিন যেমনটা পেয়েছিলেন তেমন আসনে তিনি উঠতে পারেন নি। ধনী-শৌখিন মহলে শোভা পাবার মতো করে ছাঁচে-ঢালা ছিলেন না তিনি, সেটা তিনি জানতেনও।

হেলভেশিয়াসের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়টা তাঁর পক্ষে ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; এই মানুষটি ছিলেন খুবই অমায়িক, তাঁর মনীষিতা ছিল অসাধারণ। হেলভেশিয়াস তাঁর দর্শনে নীতিবিদ্যার ধর্মীয় আর সামন্ততান্ত্রিক বেড়ি ভাঙতে চেয়েছিলেন। তিনি বললেন, আমিত্ব হল মানুষের একটা স্বাভাবিক স্বধর্ম এবং সামাজিক প্রগতির একটা কারক উপাদান। এই নতুন, মূলত বুর্জোয়া নীতিবিদ্যায় গোড়ায়ই ধরে নেওয়া হয় যে, প্রত্যেকেই স্বভাবতই সচেষ্ট থাকে নিজের সুবিধার জন্যে, সেটাকে সীমিত করে শুধু অন্যান্যের অনুরূপ চেষ্টা। সমাজে আত্মপরায়ণতার ভূমিকাটাকে তিনি তুলনা করলেন প্রকৃতির রাজ্যে অভিকর্ষের ভূমিকার সঙ্গে। বংশ আর পদ-পদবি নির্বিশেষে প্রত্যেককে তার যাতে ভাল হয় সেইভাবে চলতে দেওয়া চাই, তাহলে তার থেকে লাভবান হবে গোটা সমাজ — মানুষের স্বাভাবিক সমতা-সংক্রান্ত এই ধারণাটা হেলভেশিয়াসের ঐ ধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

এইসব ধ্যান-ধারণাকে বিস্তারিত করে স্মিথ সেটা প্রয়োগ করেন অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে। মানবপ্রকৃতি এবং মানুষ আর সমাজের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর মত ছিল ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের অভিমতের মূলে। Homo oeconomicus ('আর্থনীতিক মানুষ') সংক্রান্ত ধারণা দেখা দিয়েছিল একটু পরে, কিন্তু এটার উদ্ভাবকেরা সেটা করেন স্মিথের মতের ভিত্তিতে। 'অদৃশ্য

হস্ত' সম্বন্ধে বিখ্যাত কথাটা বোধহয় 'জাতিসমূহের সম্পদ' থেকে সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত উক্তি।

স্মিথের চিন্তাধারাটাকে বিবৃত করা যেতে পারে মোটামুটি নিম্নলিখিতরূপে। মানুষের আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের পিছনে প্রধান প্রেরণা হল আত্মপরায়ণতা। তবে, অন্যান্যের জন্যে কাজ ক'রে, নিজ শ্রম এবং নিজ শ্রমজাত দ্রব্য বিনিময়ের জন্যে হাজির করেই শুধু মানুষ সেই স্বার্থ হাসিল করতে চেষ্টা করতে পারে। এইভাবে গড়ে ওঠে শ্রমবিভাগ। লোকে পরস্পরকে সাহায্য করে এবং সেটা ক'রে তারা সমাজ উন্নয়নে আনুকূল্য করে, যদিও তাদের প্রত্যেকেই আত্মপরায়ণ এবং ভাবে শুধু নিজের স্বার্থ নিয়ে। নিজ বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি ঘটাবার জন্যে মানুষের স্বাভাবিক প্রচেষ্টা এমনই প্রবল চাড় যাতে সেটাকে অবাধে চালু থাকতে দেওয়া হলে তা সমাজের সমৃদ্ধি ঘটাতে পারে। অধিকন্তু, যা কথায় বলে, প্রকৃতিকে দরজা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে ঢুকে পড়বে জানলা দিয়ে: এই চাড় এমনকি 'অতিক্রম করতে পারে শতেক অবান্তর বাধা যেগুলো দিয়ে মানুষের নিয়মের নির্বুদ্ধিতা এটার ক্রিয়াধারা ব্যাহত করে প্রায়শ...'* এখানে স্মিথ তীব্র সমালোচনা করছেন বণিকতন্ত্রের, যেটা সঙ্কোচিত করে মানুষের 'স্বাভাবিক স্বাধীনতা' — কেনা-বেচা, ভাড়ায় খাটানো আর ভাড়া করা, পয়দা করা আর ভোগ-ব্যবহারের স্বাধীনতা।

প্রত্যেকে তার পুঁজি কাজে লাগাতে চেষ্টা করে এমনভাবে (দেখাই যাচ্ছে, স্মিথ বলছেন প্রকৃতপক্ষে পুঁজিপতির কথা, সাধারণভাবে স্রেফ মানুষের কথা নয়) যাতে সেটার উৎপাদের মূল্য হয় সবচেয়ে বেশি। এটা করতে গিয়ে সাধারণত সে জনকল্যাণের কথা ভাবে না, কী পরিমাণে সে সেটার উন্নতি ঘটায় তা সে উপলব্ধি করে না। তার বিবেচনায় থাকে শুধু তার নিজের লাভের কথাটাই, কিন্তু তাকে 'একখানা **অদৃশ্য হস্ত** (মোটা হরফ আমার — আ. আ.) এমন একটা লক্ষ্যসাধনে চালিত করে যেটা ছিল না তার অভিপ্রায়ের অঙ্গ। ...সমাজের স্বার্থের আনুকূল্য করতে যথার্থই চাইলে সে যা করে তার চেয়ে বেশি ফলপ্রদভাবেই সেটা সে অনেক সময়ে করে নিজস্ব স্বার্থ অনুসারে চলতে গিয়ে।'**

---

* A. Smith, 'The Wealth of Nations', Vol. II, London, 1924, p. 40.

** ঐ, ৪০০ পৃঃ

'অদৃশ্য হস্ত' হল বিষয়গত আর্থনীতিক নিয়মাবলির স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াধারা। এইসব নিয়মের ক্রিয়াশীলতা মানুষের ইচ্ছার অনপেক্ষ, অনেক সময়ে সেটার বিরুদ্ধ। এই বিজ্ঞানক্ষেত্রে আর্থনীতিক নিয়মাবলি-সংক্রান্ত ধারণাটাকে এমন আকারে চালু করে স্মিথ একটা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রপদক্ষেপ করলেন। অর্থশাস্ত্রকে তিনি দাঁড় করালেন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে। আত্মহিত এবং আর্থনীতিক উন্নয়নের স্বতঃস্ফূর্ত নিয়মাবলির ক্রিয়াশীলতা যে-পরিবেশে সবচেয়ে ফলপ্রদ সেটাকেই স্মিথ বলেন **স্বাভাবিক বিন্যাস**। স্মিথের বিবেচনায় এবং পরবর্তী পর্যায়গুলির অর্থশাস্ত্রকারদের বিবেচনায় এই ধারণাটার যেন আছে দ্বৈত অর্থ। এটা হল একদিকে আর্থনীতিক কর্মনীতির অর্থাৎ অবাধ-নীতির (পরে দ্রষ্টব্য) মূলনীতি এবং লক্ষ্য, আর অন্য দিকে একটা তত্ত্বীয় কাঠাম, আর্থনীতিক বাস্তবতা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের একটা 'মডেল'।

পদার্থবিদ্যায় জাড্য গ্যাস আর জাড্য তরল সংক্রান্ত বিমূর্ত ধারণা ব্যবহার করা হয় প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের একখানা সুবিধাজনক হাতিয়ার হিসেবে। বাস্তব গ্যাস আর বাস্তব তরলের ধর্ম 'জাড্য' নয়, কিংবা তেমনটা হয় শুধু নির্দিষ্ট কোন-কোন অবস্থায়। তবে 'সেগুলোর বিশুদ্ধ আকারে' বিভিন্ন ব্যাপার বিচার-বিশ্লেষণের জন্যে ঐসব বিচ্যুতি তুচ্ছ করা যেতে পারে। 'আর্থনীতিক মানুষ' এবং অবাধ ('জাড্য') প্রতিযোগিতা-সংক্রান্ত বিমূর্তন অর্থশাস্ত্রে কিছুটা একই ধরনের। বাস্তব মানুষটিকে আত্মহিতে পর্যবসিত করা যায় না। ঠিক যেমন পুঁজিতন্ত্রের আমলে পরম অবাধ প্রতিযোগিতা কখনও ছিল না, হতেও পারে না কখনও। তবে যারপরনেই জটিল এবং বহুধাবিচিত্র বাস্তবতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোকে পৃথক করে তুলে ধ'রে সেটাকে সরল, মডেল আকার দেবার কিছু-কিছু স্বীকার্য ছাড়া বিভিন্ন ব্যাপক আর্থনীতিক ব্যাপার আর প্রক্রিয়া নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা যেত না। এদিক থেকে দেখলে, 'আর্থনীতিক মানুষ' আর অবাধ প্রতিযোগিতা-সংক্রান্ত বিমূর্তন পুরোপুরি সমর্থনীয়, সেটা অর্থনীতিবিজ্ঞানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থেকেছে। বিশেষত এটা ছিল আঠার আর উনিশ শতকের পুঁজিতন্ত্রের আদত স্বধর্মের সঙ্গে মানানসই।

মার্কসীয় আর্থনীতিক তত্ত্ব থেকে দুটো দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হচ্ছে।

ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে স্থাপিত পণ্য-অর্থনীতিতে মূল্য নিয়ম ক্রিয়াশীল থাকে উৎপাদনের স্বতঃস্ফূর্ত নিয়ামক এবং চালকশক্তি হিসেবে।

যেমন, যদি কোন পণ্য-উৎপাদক কোন টেকনিকাল নবপ্রবর্তনের কারণে প্রত্যেকটা পণ্য-উৎপাদনের শ্রম-কালব্যয় কমিয়ে দেয় তাহলে পণ্যটার **একক মূল্য** কমে যায়। গড় সামাজিক শ্রম-কালব্যয় দিয়ে স্থির হয় **সামাজিক মূল্য**, সেটা কিন্তু বদলায় না যদি অন্যান্য অবস্থা থাকে একই। এই দক্ষ পণ্য-উৎপাদকটি তার পণ্যের প্রত্যেকটা (মূলনিয়মের দিক থেকে সামাজিক মূল্য দিয়ে নির্ধারিত) আগেকার দামে বিক্রি করে কিছুটা বেশি আয় করে, কেননা তখন সে এক কর্মদিনে পণ্যটা পয়দা করে অন্যান্যের চেয়ে ধরা যাক ২৫ শতাংশ বেশি। প্রতিযোগী পণ্য-উৎপাদকেরা নতুন-নতুন টেকনিক ধরতে চেষ্টা করে। এটা হল প্রযুক্তিগত অগ্রগতি চাগানোর বন্দোবস্তটার মূল উপাদান। মানুষের ইচ্ছার অনপেক্ষ উল্লিখিত স্বতঃস্ফূর্ত কারক উপাদানগুলির ক্রিয়াফলে প্রত্যেকটা পণ্যের জন্যে সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রমব্যয় কমে যায়, পড়ে যায় সামাজিক মূল্য। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এখানে এই পণ্য-উৎপাদক আয় সর্বোচ্চ মাত্রায় তোলার চেষ্টা করার কাজ চালাচ্ছে 'আর্থনীতিক মানুষ' হিসেবে, আর যে-পরিবেশে সেটা ঘটছে সেটা অবাধ প্রতিযোগিতার পরিবেশ।

আর-একটা দৃষ্টান্ত — অবাধ প্রতিযোগিতার পুঁজিতন্ত্রের আমলে লাভের গড় হারের উদ্ভব। কাজ-কারবারের বিভিন্ন শাখায় লাভের হার দীর্ঘকাল ধরে বেশকিছুটা পৃথক-পৃথক হতে পারে তা ভাবাই যায় না। লাভের হার সমান-সমান হয়ে যায়, এটা বিষয়গতভাবে অবশ্যম্ভাবী। বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং যেসব শাখায় লাভের হার কম সেগুলো থেকে যেখানে হারটা চড়া সেইসব শাখায় পুঁজির চলন — এই প্রণালীতে ঘটে ঐ সমতা। এক্ষেত্রেও পুঁজিপতিকে দেখা যায় একটামাত্র রূপে: মূর্তিমন্ত মুনাফামুগয়া। পুঁজির অবাধ চলনের সম্ভাবনা-সংক্রান্ত অবস্থাটা অবাধ প্রতিযোগিতা-সংক্রান্ত অবস্থার সমতুল। পুঁজির অবাধ চলন সঙ্কুচিত করার বিভিন্ন উপাদান বাস্তবে থেকেছে বরাবর, আর সেগুলো সম্বন্ধে মার্কস ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু মডেলটাকে নিয়ে 'সেটার আদর্শ আকারে' বিচার-বিবেচনা করার পরেই শুধু এইসব উপাদান ঢোকান যায় মডেলের মধ্যে।

মার্কস বলেছেন, পুঁজিপতি হল মূর্তিমন্ত পুঁজি। অর্থাৎ কিনা, ব্যক্তি-পুঁজিপতির ব্যক্তিগত গুণাগুণ অর্থশাস্ত্রে তাৎপর্যসম্পন্ন হতে পারে না। পুঁজির সামাজিক সম্পর্ক তার মারফত প্রকাশ পায়, শুধু এই কারণে এবং

এই পরিমাণে তার সম্বন্ধে এই বিজ্ঞানের আগ্রহ। স্মিথের ধারণার সঙ্গে একটাকিছু সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় এখানে। কিন্তু সিদ্ধান্ত একেবারেই পৃথক। স্মিথের বিবেচনায়, আত্মহিত হাসিল করার চেষ্টায় পুঁজিপতি পুঁজিতন্ত্রকে জোরদার করে অজানতে। আর মার্কসের বিবেচনায়, অনেকটা ঐভাবে চ'লে পুঁজিপতি পুঁজিতন্ত্রের উৎপাদন-শক্তির উন্নয়ন ঘটায় শুধু তাই নয়, অধিকন্তু পুঁজিতন্ত্রের স্বাভাবিক পরিণতি পতনের প্রস্তুতি চালায় বিষয়গতভাবে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে আরও একটা মৌলিক পার্থক্য। ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিবেচনা করে মার্কস মানুষকে দেখেন দীর্ঘ সামাজিক বিকাশের ফল হিসেবে। অর্থশাস্ত্রের বিষয় হিসেবে এই মানুষের অস্তিত্ব শুধু কোন একটা শ্রেণীবিভক্ত সমাজের কাঠামের ভিতরে, আর সে ক্রিয়াকলাপ চালায় সেই সমাজের নিয়মাবলি অনুসারে। কিন্তু স্মিথের বিবেচনায়, homo oeconomicus (আর্থনীতিক মানুষ)-এ প্রকাশ পায় চিরন্তন এবং স্বাভাবিক মানবপ্রকৃতি। মানুষ নয় বিকাশের ফল, সে বরং সেটার আরম্ভস্থল। স্মিথ তাঁর কালের সমস্ত বিশিষ্ট চিন্তাগুরুদের মতো, বিশেষত হেলভেশিয়াসের মতো মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে এই অনৈতিহাসিক, কাজেই ভুয়ো ধারণা পোষণ করতেন।

'আর্থনীতিক মানুষ'-সংক্রান্ত ধারণাটার সঙ্গে সঙ্গে স্মিথ তুলে ধরলেন বিপুল তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক গুরুত্বসম্পন্ন একটা প্রশ্ন — মানুষের আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের হেতু আর প্রবর্তনা-সংক্রান্ত প্রশ্ন। স্মিথের 'স্বাভাবিক' মানুষ দিয়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বুর্জোয়া সমাজের সত্যিকারের মানুষটিকে, এই কথাটা মনে রাখলে দেখা যায় ঐ প্রশ্নে স্মিথের উত্তরটা তখনকার দিনের পক্ষে ফলপ্রদ এবং প্রগাঢ়ই ছিল।

সমাজতন্ত্র যখন বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব থেকে একটা সামাজিক-আর্থনীতিক বাস্তবতায় পরিণত হয় তখন সেটার সামনেও পড়ে এই হেতু আর প্রবর্তনা-সংক্রান্ত সমস্যাটা। পুঁজিতন্ত্রের পতন এবং মানুষের উপর মানুষের শোষণ একেবারেই লোপ পাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের জন্যে বুর্জোয়া প্রবর্তনাও মিলিয়ে গেল।

কিন্তু ধনী হবার জন্যে লোকের যে-চাড়, যেটা অ্যাডাম স্মিথের মতে আখেরে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনকে ঠেলে এগিয়ে দেয়, সেটার জায়গায় এল কোন্ প্রবর্তনা? সেটা কি শুধু সমাজতান্ত্রিক চেতনা, শ্রমে উৎসাহ,

দেশপ্রেম? — যেহেতু কোন পুঁজিপতি নেই, কল-কারখানা আর জমির মালিক জনগণ, লোকে কাজ করে নিজেদেরই জন্যে...

হ্যাঁ, শ্রম আর ক্রিয়াকলাপের নতুন-নতুন এবং প্রবল প্রবর্তনা পয়দা করে বটে সমাজতন্ত্র। এটা হল পুঁজিতন্ত্রের উপর সমাজতন্ত্রের মস্ত প্রাধান্য। তবে এইসব প্রবর্তনা আকাশ থেকে পড়ে না; সেগুলি গড়ে ওঠে সমাজের এবং মানুষের নিজেদেরই, তাদের মানসতা নীতিবোধ আর চেতনার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের ধারায়। শ্রম অনুসারে বণ্টনের নিয়ম যেখানে ক্রিয়াশীল সে-সমাজে শ্রমের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রবর্তনা হিসেবে থেকে যায় বৈষয়িক স্বার্থ, এটা স্বাভাবিকই। লেনিনের ভাব-ধারণার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট আকারে উপস্থাপিত হয় পরিব্যয় হিসাবরক্ষণের মূল উপাদানগুলি, তাইই হয়ে দাঁড়িয়েছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনের মুখ্য প্রণালী। কিছুকাল আগে সোভিয়েত ইউনিয়নে আর্থনীতিক সংস্কার বলবৎ করা হয়; উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের নতুন পরিবেশে ঐ উপাদানগুলিকে বিকশিত এবং প্রগাঢ় করে তুলছে এই সংস্কার।

Laissez Faire (অবাধ-নীতি)

অবাধ-নীতিকে স্মিথ বলেছেন স্বাভাবিক স্বাধীনতা; এটা সরাসরি আসে মানুষ আর সমাজ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত থেকে। প্রত্যেকের আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের ফলে শেষে যদি ঘটে সমাজকল্যাণ তাহলে এই ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত করা চলে না কোনক্রমেই, সেটা তো স্পষ্টই।

স্মিথের বিবেচনায়, পণ্য আর অর্থের, পুঁজি আর শ্রমের অবাধ চলাচল থাকলে সমাজের সংগতি-সংস্থান কাজে লাগান যেতে পারে সবচেয়ে যুক্তিসম্মত, সর্বোপযোগী ধরনে। তাঁর আর্থনীতিক মতবাদ অবাধ প্রতিযোগিতার ধারণা দিয়ে শুরু হয়ে শেষ হয় তাতেই। 'জাতিসমূহের সম্পদ'-এর আদ্যন্ত জুড়ে রয়েছে সেই ধারণাটা। এমনকি ডাক্তার, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, আর... যাজকদের ক্ষেত্রেও স্মিথ প্রয়োগ করেছিলেন এটাকে। সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় আর 'সেক্ট'-এর যাজকদের তাদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার অধিকার দেওয়া হলে, কোন একটা বর্গকে একচেটে অধিকার তো নয়ই, কোন বিশেষাধিকারও দেওয়া না হলে তারা হয়ে দাঁড়াবে নিরুপদ্রব

(বড়জোর এটুকুই তাদের কাছ থেকে আশা করা যেতে পারে বলে ঠারেঠোরে বললেন তিনি)।

অবাধ-নীতির আবিষ্কারে নয়, সেটাকে অমন প্রণালীবদ্ধভাবে, পাকাপোক্ত করে প্রতিপন্ন করাতেই স্মিথের ভূমিকাটা। ফ্রান্সে পয়দা হলেও নীতিটাকে বিকশিত করে স্বাভাবিক পরিণতিতে নিয়ে আর্থনীতিক তত্ত্বের ভিত্তি করে তোলেন একজন ইংরেজ। পৃথিবীতে সবচেয়ে শিল্পসমৃদ্ধ দেশ হয়ে উঠেছিল ইংলণ্ড — অবাধ বাণিজ্য তখন বিষয়গতভাবে দেশটির স্বার্থের অনুযায়ী। ফ্রান্সে ফিজিওক্র্যাসির কেতাটা অনেকাংশে ছিল শিক্ষিত এবং উদারপন্থী অভিজাতদের খেয়ালখুশির ব্যাপার, সেটা কেটে গিয়েছিল অচিরেই। ইংলণ্ডে স্মিথ 'কেতাটা' হয়ে দাঁড়িয়েছিল বুর্জোয়াদের এবং বুর্জোয়া-বনে-যাওয়া অভিজাতদের মূলমন্ত্র। স্মিথের কর্মসূচিটাকে হাসিল করাই সারা পরবর্তী শতকে ইংলণ্ডের আর্থনীতিক কর্মনীতি ছিল কিছু পরিমাণে।

প্রথম-প্রথম পদক্ষেপ করা হয়েছিল স্মিথের জীবনকালেই। একটা মজার গল্প আছে এই প্রসঙ্গে। জীবনের শেষের দিকে স্মিথ বিখ্যাত হন। ১৭৮৭ সালে তিনি একবার লন্ডন যান, তখন গিয়েছিলেন মস্ত এক অভিজাতের বাড়িতে। বৈঠকখানায় ফলাও আসর জমেছিল, তাঁদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী উইলিয়ম পিট্। স্মিথ ঢুকলে সবাই উঠে দাঁড়ালেন। প্রফেসরের অভ্যাসমতো স্মিথ এক হাত তুলে বললেন, 'বসুন মহাশয়েরা।' তাতে পিট্ বললেন, 'না, আমরা বসব আপনি বসার পরে, আমরা সবাই তো আপনার শিষ্য।' এটা হয়ত কিংবদন্তি মাত্র। কিন্তু সেটা সম্ভবপর। পিট্ বাণিজ্যক্ষেত্রে একগুচ্ছ ব্যবস্থা চালু করেছিলেন যেগুলি মূলভাবের দিক থেকে 'জাতিসমূহের সম্পদ'-এ বিবৃত বিভিন্ন ধারণার অনুযায়ী।

স্মিথ তাঁর কর্মসূচিটিকে দফাওয়ারি তুলে ধরেন নি কোথাও। কিন্তু সেটা কিছু কঠিন কাজ নয়। অবাধ-নীতিটাকে স্মিথ যেভাবে বুঝেছিলেন সেটা কার্যক্ষেত্রে দাঁড়ায় নিম্নলিখিতরূপ।

এক, আজকাল যেটাকে বলা হয় শ্রমের সচলতা সেটায় যাতে বাধা পড়ে এমন সমস্ত ব্যবস্থা তিনি রদ করাতে চেয়েছিলেন। সর্বোপরি এটা প্রযোজ্য ছিল বিভিন্ন সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের বেলায় — যেমন বাধ্যতামূলক বৃত্তি-শিক্ষানবিসি এবং বসতি করা সংক্রান্ত আইন-কানুন। পুঁজিপতিদের ব্যবস্থাদি নেবার স্বাধীনতা কায়েম করাই ছিল এই দাবির বিষয়গত লক্ষ্য, সেটা

স্পষ্টই। তবে স্মিথ যখন এটা লেখেন সেই যুগটার কথা মনে থাকা চাই: তখনও ততটা নয় পুঁজিতন্ত্র যতটা কিনা পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের কমতিই ছিল বৃটিশ শ্রমিক শ্রেণীর দুর্ভোগের কারণ। কাজেই স্মিথের দাবিটা ছিল প্রগতিশীল, এমনকি মানবিক।

দুই, স্মিথ দাঁড়িয়েছিলেন ভূমিতে পূর্ণ অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে। তিনি বড়-বড় ভূমিসম্পত্তি মালিকানার বিরোধী ছিলেন; উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তানো ভূমি ভাগাভাগি হওয়া যাতে নিষিদ্ধ ছিল সেই জ্যেষ্ঠাধিকারের আইন তিনি রদ করাবার কথা তুলেছিলেন। আর্থনীতিক বিচারে সবচেয়ে সুবিবেচনার সঙ্গে যারা ভূমি কাজে লাগাতে পারে কিংবা যারা ভূমি হস্তান্তরিত করতে রাজি এমনসব মালিকের হাতে ভূমি পড়ুক, এটা তিনি চেয়েছিলেন। কৃষিক্ষেত্রে যাতে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ ঘটে সেই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল এইসব দাবি।

তিন, শিল্পে আর অন্তর্বাণিজ্যে সরকারী নিয়ামনের জেরগুলো লোপ করার প্রস্তাব তুলেছিলেন স্মিথ। তিনি চেয়েছিলেন, দেশীয় বাজারে কোন-কোন পণ্য বিক্রির উপর অন্তঃশুল্ক ধার্য হওয়া চাই শুধু রাজস্বের জন্যে — অর্থনীতির উপর প্রভাব খাটাবার জন্যে নয়। দেশের ভিতরে পণ্য চালানের উপর ইংলণ্ডে তখন আর কোন শুল্ক ছিল না। তবে স্মিথের সমালোচনা আরও বেশি জোরাল এবং যথাযথ ছিল ফ্রান্সের ক্ষেত্রে।

চার, ইংলণ্ডের গোটা বহির্বাণিজ্য কর্মনীতির বিস্তারিত সমালোচনা করে স্মিথ রচনা করেছিলেন অবাধ বহির্বাণিজ্য কর্মসূচি। এটা ছিল তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি, আর এটা সবচেয়ে সরাসরি চালিত হয়েছিল বণিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে। এইভাবে চালু হয় অবাধ বাণিজ্য আন্দোলন, যেটা উনিশ শতকে হয় ইংলণ্ডের শিল্পক্ষেত্রের বুর্জোয়াদের পতাকা।

স্মিথের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হল সমগ্র বণিকতান্ত্রিক কর্মনীতি: আবশ্যিক অনুকূল লেন-দেনস্থিতি, কোন-কোন পণ্য আমদানি-রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা, চড়া আমদানি-শুল্ক, রপ্তানিতে ভরতুকি, একচেটে-অধিকারী বাণিজ্য কম্পানি। তিনি ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক কর্মনীতির বিশেষত তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি খোলাখুলি বলেছিলেন, জাতির স্বার্থে নয়, বণিকদের একটা ছোট্ট জোটের স্বার্থ অনুসারে রচিত হয় ঐ কর্মনীতি। আয়ার্ল্যান্ডে এবং বিশেষত উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে ইংলণ্ডের শিল্প সঙ্কোচন আর বাণিজ্যের উপর বাধা-নিষেধের কর্মনীতি — এই

দুটোকেই স্মিথ মনে করতেন অদূরদর্শী এবং উদ্ভট। তিনি লিখেছেন: 'তবে একটা জাতি নিজেদের উৎপাদের প্রত্যেকটা অংশ দিয়ে যাকিছু পারে তা করতে নিষেধ করা কিংবা তাদের বিবেচনায় যা তাদের নিজেদের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক সেইভাবে তহবিল আর শিল্পক্ষেত্রের শ্রম ব্যবহার করতে নিষেধ করাটা হল মানুষের পরম অলঙ্ঘনীয় অধিকারের অতি নগ্ন লঙ্ঘন।*

এটা প্রকাশিত হয় ১৭৭৬ সালে, তার আগে থেকেই ইংলণ্ডের যুদ্ধ চলছিল বিদ্রোহী উপনিবেশগুলির সঙ্গে। মার্কিন প্রজাতান্ত্রিকতার প্রতি স্মিথের সহানুভূতি ছিল, যদিও তিনি সাচ্চা বৃটিশই ছিলেন; উপনিবেশগুলির অপসরণ নয়, পূর্ণ সমাধিকারের ভিত্তিতে ইংলণ্ড আর উপনিবেশগুলির সম্মিলন গঠনই তিনি সমর্থন করতেন। ভারতে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির লুণ্ঠন আর উৎপীড়নের কর্মনীতি সম্পর্কেও তিনি মত প্রকাশ করেন কম সাহসের সঙ্গে নয়। বইখানায় স্মিথ চার্চ এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে বহু তীব্র এবং কঠোর উক্তি করেন সেটাও মনে করা দরকার। ঠিক বটে, ইংলণ্ডে তাঁর মাথা যাবার ভয় ছিল না, স্বাধীনতাও বিপন্ন হয় নি, কারারুদ্ধ হবার সম্ভাবনাও ছিল না, যদিও বিভিন্ন সময়ে জেলে স্থান হয়েছিল তাঁর কোন-কোন ফরাসী বন্ধুদের — ভল্টেয়র, দিদরো, মোরেল্লে, এমনকি মিরাবোও। তবে ইংরেজ যাজকমণ্ডলী, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আর পত্র-পত্রিকার ভাড়াটে কলমচিদের ঘৃণা আর আক্রমণ কত হিংস্র হতে পারে তা তিনি জানতেন। এসবকিছুকে তিনি ভয় করতেন, ভয়টা গোপনও করেন নি।

ব্যক্তি হিসেবে স্মিথের প্রকৃতির যে-জিনিসটা আকর্ষণ করে সেটা এই যে, স্বভাবতই সাবধানী-সতর্ক মানুষ হলেও তাঁর লেখা এবং প্রকাশিত বইখানা সাহসিকতার পরিচায়ক।

* A. Smith, 'The Wealth of Nations', Vol. II, London, 1924, p. 78.

একটা তন্ত্রের প্রবর্তক অ্যাডাম স্মিথ

'জাতিসমূহের সম্পদ'

১৭৬৭ সালের বসন্তকালে স্মিথ চলে যান কার্কাল্ডিতে, তখন থেকে ছ'বছর প্রায় একটানা সেখানেই থেকে তিনি সমস্ত সময়টা দেন বইখানা লেখার কাজে। একখানা চিঠিতে তিনি খুঁতখুঁত করে বলেছিলেন, জীবনের একঘেয়েমি আর একই বিষয়ে সমস্ত কর্মোদ্যম এবং মনোযোগ বড় বেশি নিবিষ্ট করার ফলে তাঁর স্বাস্থ্যটা ভেঙে পড়ছিল। ১৭৭৩ সালে লণ্ডন যাবার সময়ে তিনি এতই অসুস্থ বোধ করেছিলেন যাতে তিনি মারা গেলে তাঁর সাহিত্যের উত্তরাধিকারী হবেন হিউম এই মর্মে অধিকার তাঁকে যথাবিধি দিয়ে যাবার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। স্মিথ ভেবেছিলেন তিনি যাচ্ছিলেন সমাপ্ত পাণ্ডুলিপি নিয়ে। আসলে কাজটা শেষ করতে তাঁর লেগেছিল আরও প্রায় তিন বছর। এডিনবারোর লেকচারগুলিতে আর্থনীতিক রচনার প্রথম-প্রথম অভিজ্ঞতাগুলি থেকে 'জাতিসমূহের সম্পদ'-এর কাল-ব্যবধান পঁচিশ বছরের। এটা বাস্তবিকই তাঁর সারা জীবনের কাজ।

'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations' ('জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি আর কারণ সন্ধান') লণ্ডনে প্রকাশিত হয় ১৭৭৬ সালের মার্চ মাসে।

বইখানা পাঁচ ভাগে। পূর্ববর্তী শতাব্দীর ইংরেজ আর ফরাসী অর্থনীতিবিদদের বহু ধ্যান-ধারণাকে পূর্ণাঙ্গ করে সেগুলির সামান্যীকরণ হয় স্মিথের তত্ত্বীয় তন্ত্রের মূল উপাদানগুলিতে — সেগুলিকে বিবৃত করা হয়েছে প্রথম দুই ভাগে। প্রথম ভাগে মূলত মূল্য আর উদ্বৃত্ত মূল্যের বিশ্লেষণ; এই দুটো নিয়ে তিনি বিচার-বিবেচনা করেছেন লাভ আর ভূমি-খাজনার নির্দিষ্ট আকারে। 'Of the Nature, Accumulation, and

Employment of Stock' ('পুঁজির স্বধর্ম, সঞ্চয়ন এবং নিয়োগ প্রসঙ্গে') — এটা দ্বিতীয় ভাগের শিরনামা। অংশত ইতিহাসক্ষেত্রে, কিন্তু প্রধানত আর্থনীতিক কর্মনীতিক্ষেত্রে স্মিথের তত্ত্বের প্রয়োগ নিয়ে বাকি তিনটে ভাগ। সামন্ততন্ত্রের আর পুঁজিতন্ত্র গড়ে ওঠার যুগে ইউরোপীয় অর্থনীতির বিকাশ নিয়ে বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে ছোট্ট তৃতীয় ভাগে। বিস্তৃত চতুর্থ ভাগটা হল অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস এবং পর্যালোচনা; বণিকতন্ত্র সম্বন্ধে আটটা পরিচ্ছেদ, আর ফিজিওক্র্যাসি সম্বন্ধে একটা। সবচেয়ে বড় পঞ্চম ভাগের বিষয়বস্তু হল রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা — আয়ব্যয়। যেসব ভাগে আছে অপেক্ষাকৃত ঘন নিবিড় স্পষ্ট-নির্দিষ্ট মালমশলা সেগুলিতেই রয়েছে মূল আর্থনীতিক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে স্মিথের সবচেয়ে বিশেষক কিছু-কিছু উক্তি।

অর্থশাস্ত্রের ইতিহাসে যেসব বই সবচেয়ে আগ্রহজনক সেগুলিরই একখানা নিশ্চয়ই 'জাতিসমূহের সম্পদ'। ওয়াল্টার বেজ্‌হট বলেন, আর্থনীতিক নিবন্ধই শুধু নয়, এটা হল 'প্রাচীনকাল সম্বন্ধে খুবই মজাদার বই'। কেনের নীরস বিশ্লেষণমূলক বিচার-বিবেচনা, তিউর্গোর উপপাদ্যগুলি এবং রিকার্ডোর 'নীতিগুচ্ছ', সেগুলিতে প্রগাঢ় বিমূর্তনের তনুকৃত বাতাবরণ — এইসব থেকে খুবই পৃথক এই বইখানা। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ আর নিজস্ব কৌতুকরসবোধের সঙ্গে অগাধ পাণ্ডিত্য এক হয়ে মিলেছে স্মিথের বইখানায়। 'জাতিসমূহের সম্পদ' থেকে গাদা-গাদা আগ্রহজনক তথ্য জানা যায় উপনিবেশ আর বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে, যুদ্ধবিগ্রহ আর ব্যাঙ্কিং প্রসঙ্গে, রুপোর খনি আর চোরাই চালানের ব্যাপারে... এবং আরও অনেককিছু। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, এর অনেকটারই কোন সম্পর্ক নেই আর্থনীতিক তত্ত্বের সঙ্গে। কিন্তু স্মিথের বিবেচনায় অর্থশাস্ত্র ছিল সমাজ সম্বন্ধে প্রায় সর্বাত্মক বিজ্ঞান।

অর্থশাস্ত্রে বিচার-বিশ্লেষণের মূল প্রণালীটা হল যৌক্তিক বিমূর্তন। অর্থনীতিবিদ্যায় একগুচ্ছ মূল প্রারম্ভিক ধারণামৌল স্থির করে এবং বিভিন্ন মৌলিক সাপেক্ষতা দিয়ে সেগুলিকে সংযুক্ত করে অপেক্ষাকৃত জটিল এবং মূর্ত-নির্দিষ্ট সামাজিক ব্যাপারগুলো বিশ্লেষণের কাজ আরম্ভ করা যায়। এই বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীটাকে গড়ে তোলেন অ্যাডাম স্মিথ। শ্রমবিভাগ, বিনিময়, বিনিময়-মূল্য, ইত্যাদি ধারণামৌলের ভিত্তিতে এবং প্রধান শ্রেণীগুলির আয়ের ব্যাপারটা ধরে তিনি নিজ তন্ত্রটা গড়ে তুলতে চেষ্টা

করেন। এদিক থেকে দেখলে, তাঁর বৃহত্তর অপ্রাসঙ্গিক আলোচনাকে এবং বর্ণনাগুলিকে তথ্যমূলক ব্যাখ্যা বলে ধরা যেতে পারে — যেসব ব্যাখ্যার রয়েছে কিছুটা প্রতিপাদক মূল্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণের উঁচু মান স্মিথ বজায় রাখতে পারেন নি। অনেক সময়ে বর্ণনা আর ভাসাভাসা ধারণার অত্যুৎসাহের তোড়ে তিনি অপেক্ষাকৃত প্রগাঢ় বিশ্লেষণমূলক ধরনটা বর্জন করেছেন। সেই যুগের বিশেষত্ব এবং এই বিজ্ঞানক্ষেত্রে স্মিথের স্থান অনুসারে বিষয়গতভাবে, আর তাঁর ধীশক্তির বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিষয়ীগতভাবে দেখা দিয়েছিল এই দ্বিত্ব।

এই প্রসঙ্গে মার্কস লিখেছেন: 'অতিসরল চালে স্মিথ নিজে বিচরণ করেন নিত্য-অসংগতির মাঝে। একদিকে তিনি বের করেন বিভিন্ন আর্থনীতিক ধারণামৌলের মধ্যকার নিহিত সংযোগটাকে বা বুর্জোয়া আর্থনীতিক ব্যবস্থার প্রচ্ছন্ন গড়নটা। অন্য দিকে, তার সঙ্গে সঙ্গে, তিনি সংযোগটাকে তুলে ধরেন যেভাবে সেটা দেখা দেয় প্রতিযোগিতার ব্যাপারে এবং তাই সেটা যেভাবে প্রতীয়মান হয় অবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষকের কাছে, ঠিক তেমনি যে বুর্জোয়া উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রকৃতপক্ষে জড়িত এবং গরজে তার কাছে। এর একটা ধারণায় অনুধাবন করা হচ্ছে বুর্জোয়া ব্যবস্থার ভিতরকার সংযোগটাকে, বলা যেতে পারে ভিতরকার শারীরবৃত্ত, আর অন্যটাতে, জীবনের বাহ্য ব্যাপারগুলোকে যেমনটা মনে হয়, সেগুলো যেমনটা দেখা দেয় সেইভাবে স্রেফ বর্ণিত, তালিকাভুক্ত, বিবৃত এবং বিন্যস্ত করা হয়েছে বিভিন্ন ছকে-বাঁধা সংজ্ঞার্থ অনুসারে। স্মিথের রচনায় উভয় প্রণালী পরস্পরের পাশাপাশি স্বচ্ছন্দে মানিয়ে-বনিয়ে রয়েছে শুধু তাই নয়, মিলেমিশেও যায় এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে যায় অনবরত।'*

মার্কস আরও বলেছেন, স্মিথের দ্বিত্বের কৈফিয়ত আছে, কেননা দ্বৈত বাস্তবিকই ছিল তাঁর কাজটার ধরনে। আর্থনীতিক জ্ঞান বিন্যস্ত করে তন্ত্র গড়ে তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁকে নিহিত সংযোগগুলোর বিমূর্ত বিশ্লেষণ দিতে হয়েছিল শুধু তাই নয়, তাছাড়া বুর্জোয়া সমাজের একটা বর্ণনাও দিতে হয়েছিল, বিভিন্ন সংজ্ঞার্থ আর ধারণার নামমালা স্থির করতে হয়েছিল। স্মিথের এই দ্বিত্ব, মূল বৈজ্ঞানিক নীতিগুলি অনুসারে চলায় তাঁর অসামঞ্জস্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল অর্থশাস্ত্রের পরবর্তী

* কার্ল মার্কস, 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব', ২য় ভাগ, মস্কো, ১৯৬৮, ১৬৫ পৃঃ।

বিকাশের পক্ষে। স্কট্‌ল্যান্ডের মানুষটির সমালোচনা করেন সর্বপ্রথমে বোধহয় ডেভিড রিকার্ডো: বর্ণনাকারী স্মিথের বিরুদ্ধে তিনি সমর্থন করেন বিশ্লেষণকারী স্মিথকে। তবু, রিকার্ডোর থেকে ভিন্ন ধারায় যাঁরা স্মিথের ভাসাভাসা, স্থূল ধারণাগুলিকে বিস্তারিত করেন তাঁরাও 'জাতিসমূহের সম্পদ' থেকে উদ্ধৃতি দিতে পেরেছেন।

বিজ্ঞান হিসেবে অর্থশাস্ত্র বিষয়টা সম্পর্কে প্রগাঢ় উপলব্ধি ছিল স্মিথের; এই উপলব্ধির গুরুত্ব বজায় রয়ে গেছে আজও অবধি। অর্থশাস্ত্রের আছে দুটো দিক। সর্বাগ্রে এবং সর্বোপরি অর্থশাস্ত্র হল সেই বিজ্ঞান যেটা কোন একটা সমাজে বৈষয়িক সম্পদের উৎপাদন বিনিময় বণ্টন আর ভোগ-ব্যবহারের বিষয়গত নিয়মাবলি নিয়ে বিচার-বিবেচনা করে; এইসব নিয়ম মানুষের ইচ্ছার অনপেক্ষ। স্মিথ তাঁর বিশ্লেষণের প্রথম দুই ভাগের বিষয়বস্তুর মর্মটা ভূমিকায় তুলে ধরতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে এই উপলব্ধিই বিবৃত করেছেন। তিনি বলেছেন বিচার-বিশ্লেষণ করা হচ্ছে এইসব বিষয়ে: সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধির **বিভিন্ন কারণ**, সমাজে বিভিন্ন **শ্রেণী** আর বর্গের মধ্যে উৎপাদ বণ্টনের **স্বাভাবিক** বিন্যাস, **পুঁজির স্বধর্ম**, পুঁজির ক্রম-**সঞ্চয়নের** উপায়াদি।

এটা হল সমাজের আর্থনীতিক কাঠামটা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করার **নির্দিষ্ট**, বিশ্লেষণমূলক ধরন। বাস্তবে যা বিদ্যমান সেটা নিয়ে এতে বিচার-বিবেচনা করা হয়, কেন আর কী করে এই বাস্তবতা দেখা দেয় তাও। স্মিথের বিবেচনায় অর্থশাস্ত্র হল সর্বাগ্রে **সামাজিক** সমস্যাবলির নিয়ে, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্কের বিশ্লেষণ, এটা গুরুত্বপূর্ণ।

তবে রয়েছে আরও একটা দিক। স্মিথের মতে, বিষয়গত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রশ্নের মীমাংসা অর্থশাস্ত্রের করা চাই: যুক্তি দিয়ে প্রতিপন্ন ক'রে এমন **আর্থনীতিক কর্মনীতি** অর্থশাস্ত্রের সুপারিশ করা চাই যাতে 'প্রচুর আয় বা জনসাধারণের জীবনধারণের সংস্থান হয়, কিংবা — আরও যথাযথভাবে বললে — এমন আয় বা নিজেদের জীবনধারণের সংস্থান করতে তারা নিজেরাই সমর্থ হয়'।* কাজেই, উৎপাদন-শক্তিবৃদ্ধির সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ যাতে সৃষ্টি হয় এমন অবস্থা সমাজে বলবৎ হবার ব্যবস্থা অর্থশাস্ত্রের করা চাই।

* Adam Smith, 'The Wealth of Nations', Vol. I, London, 1950, p. 395.

এটাই **মাফিকসই,** ব্যবহারিক ধরন। এমন ধরনে অর্থনীতিবিদকে এই প্রশ্নটার মীমাংসা করতে চেষ্টা করতে হয়: 'সম্পদবৃদ্ধি'র জন্যে কী করা দরকার, সেটা কিভাবে।

সাধারণত উভয় প্রণালী ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর-সংশ্লিষ্ট; যেকোন আর্থনীতিক ধারণায় এই দুটো পরস্পরের পরিপূরক। তবে, পরে আমরা দেখব, প্রথম কিংবা দ্বিতীয় ধরনটার প্রাধান্য ছিল পরবর্তী বহু সুবিদিত পণ্ডিতব্যক্তির পক্ষে মাফিকসই: যেখানে সে'-র সম্প্রদায় সেটার 'দৃষ্টবাদ' নিয়ে গর্ববোধ করত এবং মাফিকসই সুপারিশ বাতিল করার উপর জোর দিত, তার বিপরীতে সিস্‌মন্দি মনে করতেন অর্থশাস্ত্র হল সর্বাগ্রে এবং সর্বোপরি সমাজটাকে তাঁর বাঞ্ছিত ধারায় রূপান্তরিত করার বিদ্যা। তবে স্মিথের বিশেষত্বই ছিল বহুমুখিনতা — তিনি উভয় ধরনকে সংযুক্ত করেছিলেন খুবই অঙ্গাঙ্গিভাবে।

শ্রমবিভাগ

অ্যাডাম স্মিথ দেখিয়েছেন শ্রমবিভাগ হল সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধির প্রধান কারিকা উপাদান। তাঁর বিবেচনায় বিভিন্ন হাতিয়ার আর যন্ত্রপাতির প্রকৃত উদ্ভাবন আর উন্নতি শ্রমবিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একটা আলপিনের কর্মশালার শ্রমিকদের বিশেষসাধন এবং তাদের মধ্যে কর্মবিভাগের ফলে উৎপাদন বহুগুণ বাড়ান সম্ভব হয়েছিল, — তাঁর এই বিখ্যাত দৃষ্টান্ত স্মিথ উল্লেখ করেছেন। বইখানা জুড়ে শ্রমবিভাগ যেন একটা ঐতিহাসিক প্রিজ্‌ম, যেটার সাহায্যে তিনি আর্থনীতিক প্রক্রিয়াগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন।

স্মিথ লক্ষ্য করেন সমাজের 'সম্পদ' অর্থাৎ জিনিসপত্রের উৎপাদন আর ভোগ-ব্যবহার নির্ভর করে দুটো উপাদানের উপর: ১) জনসমষ্টির কত অংশ উৎপাদী শ্রমে নিযুক্ত থাকে, আর ২) শ্রমের উৎপাদনশীলতা। দূরদৃষ্টি ছিল, তাই তিনি মনে করতেন দ্বিতীয় উপাদানটা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যার ইয়ত্তা করা যায় না। শ্রমের উৎপাদনশীলতা কী দিয়ে নির্ধারিত হয়, এই প্রশ্নটা তুলে তিনি যে-উত্তর দিয়েছেন সেটা তখনকার দিনের পক্ষে খুবই যুক্তিসম্মত: শ্রমবিভাগ। যখন যন্ত্রপাতি ছিল বিরল, কায়িক শ্রমের প্রাধান্য ছিল, পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের সেই ম্যানুফ্যাকচারিং

পর্বে শ্রমবিভাগই তো বাস্তবিকই ছিল উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধির প্রধান কারক উপাদান।

শ্রমবিভাগে দ্বৈধভাব আছে। কোন একটা কর্মশালায় নিযুক্ত শ্রমিকেরা কাজের পৃথক-পৃথক অংশ করতে দক্ষ হয়ে ওঠে, আর সবাই মিলে পয়দা করে একটা পরিসমাপ্ত জিনিস, যেমন আলপিন। এই হল শ্রমবিভাগের একটা ধরন। অন্যটা একেবারেই ভিন্ন: পৃথক-পৃথক কারবার আর শাখার মধ্যে সমাজে শ্রমবিভাগ। পশুপালক পশুপ্রজন ক'রে পশু **বিক্রি করে** কাটার জন্যে, কসাই পশু কেটে চামড়া **বিক্রি করে** ট্যানারের কাছে, ট্যানার পাকা চামড়া প্রস্তুত ক'রে **বিক্রি করে** মুচির কাছে...

স্মিথ এই দুই ধরনের শ্রমবিভাগ গুলিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন নি এই দুয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটা: প্রথম ক্ষেত্রে পণ্য কেনা কিংবা বেচার ব্যাপার নেই, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা আছে। গোটা সমাজটাকে একটা পেল্লায় ম্যানুফ্যাক্টরি হিসেবে ধরে তিনি শ্রমবিভাগকে নিয়েছিলেন 'জাতিসমূহের সম্পদে'র স্বার্থে মানুষের আর্থনীতিক সহযোগের সর্বাত্মক আকার হিসেবে। বুর্জোয়া সমাজ সম্পর্কে তাঁর সাধারণ বিবেচনাধারার সঙ্গে এটা সংশ্লিষ্ট: এটাকে তিনি মনে করতেন একমাত্র সম্ভাব্য, স্বাভাবিক, চিরন্তন সমাজ। প্রকৃতপক্ষে স্মিথ যে-শ্রমবিভাগ লক্ষ্য করেছিলেন সেটা নির্দিষ্টভাবে পুঁজিতান্ত্রিক, সেটা দিয়ে নির্ধারিত ঐ শ্রমবিভাগের বিভিন্ন বিশেষত্ব আর ফলাফল। সেটা দিয়ে সমাজের প্রগতির আনুকূল্য হয় শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে পুঁজির কাছে শ্রমের বশবর্তিতা বাড়ে, মজবুত হয়।

আরও বহু প্রশ্নের মতো এটাতেও দু-মুখো স্মিথ বইখানার শুরুতে পুঁজিতান্ত্রিক শ্রমবিভাগের গুণগান করেছেন, যদিও আর-একটা অংশে সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়েছেন শ্রমিকের উপর এটার কুপ্রভাব: 'শ্রমবিভাগ চলতে থাকার সময়ে, যারা শ্রম দিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তাদের খুব বড় অংশটা, অর্থাৎ জনসমষ্টির প্রধান অংশটার নিয়োগ গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়ে অল্প কয়েকটা খুবই সহজ-সরল ক্রিয়াপ্রণালীতে, প্রায়ই একটা কিংবা দুটো... তার (শ্রমিকটির — **আ. আ.**) নিজস্ব বিশেষ কাজটায় তার দক্ষতা আয়ত্ত করতে গিয়ে এইভাবে যেন খোয়া যায় তার মনোজাগতিক, সামাজিক আর সাংসারিক সদগুণগুলি। তবে প্রত্যেকটা উন্নত এবং সভ্য সমাজে মেহনতী গরিব মানুষ অর্থাৎ জনসমষ্টির প্রধান অংশটা এই দশায় পড়বে সেটা

অনিবার্য, যদি তা রোধ করতে সরকার সযত্নে সচেষ্ট না হয়।'* শ্রমিক হয়ে পড়ে পুঁজির, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের অসহায় উপাঙ্গ, যেটাকে মার্কস বলেছেন 'খণ্ডিত শ্রমিক'।

এই অংশটার শেষ বাক্যটা বেশ চোখে পড়ে। অবাধ-নীতির কিন্তুহীন সমর্থকের কাছ থেকে এটা কিছুটা অপ্রত্যাশিতই বটে। ব্যাপারটা এই যে, পুঁজিতন্ত্রে একটা বিপজ্জনক প্রবণতা স্মিথ টের পেয়েছিলেন: সবকিছুকে স্বাভাবিক ধারায় ছেড়ে রাখা হলে জনসমষ্টির একটা বড় অংশের অধঃপতনের বিপদ দেখা দেয়। রাষ্ট্র ছাড়া কোন শক্তি সেটা রোধ করতে পারে বলে তিনি দেখতে পান নি।

শ্রমবিভাগ এবং পণ্য-বিনিময় প্রক্রিয়া বিবৃত করে স্মিথ তুলেছেন অর্থের প্রশ্নটা, যে-অর্থ ছাড়া নিয়মিত বিনিময় সম্ভব নয়। ছোট চতুর্থ ভাগে তিনি আলোচনা করেছেন অর্থের স্বধর্ম সম্বন্ধে, আর অন্যান্য সমস্ত পণ্যের মধ্য থেকে একটা বিশেষ পণ্য হিসেবে অর্থের উদ্ভবের ইতিহাস নিয়ে: অর্থ হয়ে দাঁড়াল সর্বার্থে-বিনিমেয়। অর্থ আর ক্রেডিট প্রসঙ্গ তিনি তুলেছেন বারবার, তবে তাঁর রচনায় এই দুটো আর্থনীতিক ধারণামৌলের ভূমিকা মোটের উপর গৌণ। অর্থকে তিনি দেখেছেন শুধু একটা টেকনিকাল হাতিয়ার হিসেবে, যেটা বিভিন্ন আর্থনীতিক প্রক্রিয়ার গতি সহজ করে দেয়, অর্থকে তিনি বলেন 'পরিচলনের মস্ত চাকাটা'। ক্রেডিটকে শুধু পুঁজিকে সক্রিয় করে তোলার একটা উপায় হিসেবে ধরে তিনি সেদিকে বিশেষ কোন নজর দেন নি। অর্থ আর ক্রেডিটকে স্মিথ দেখেছেন উৎপাদন থেকে উদ্ভূত বস্তু হিসেবে, আর উৎপাদনের সঙ্গে তুলনায় এই দুয়ের ভূমিকাটাকে গৌণ বলে লক্ষ্য করেছেন — এতেই তাঁর অভিমতের উৎকর্ষ। কিন্তু এই অভিমতটাও একপেশে এবং সীমাবদ্ধ। অর্থ আর ক্রেডিটের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখা দেয়, আর এই দুয়ের একটা মস্ত বিপরীত প্রভাব পড়ে উৎপাদনের উপর — এটাকে তিনি খাটো করে দেখেছেন।

'জাতিসমূহের সম্পদ'-এর প্রথম চারটে পরিচ্ছেদ স্বচ্ছন্দে পড়া যায়, তার মর্মবস্তু বেশ আমোদী। স্মিথের মতবাদের কেন্দ্রী অংশটা হল মূল্য-তত্ত্ব, সেটার ভূমিকা গোছের দাঁড়িয়েছে ঐ চারটে পরিচ্ছেদ। বিষয়টার

---

* A. Smith, 'The Wealth of Nations', Vol. II, London, 1924, pp. 263, 264.

'চূড়ান্ত বিমূর্ত প্রকৃতি'র কথা মনে রেখে পাঠকের 'ধৈর্য আর মনোযোগের' জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে তিনি এটা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন।

শ্রমঘটিত মূল্য

স্মিথের প্রথম-প্রথম সমালোচকেরা সাধারণত কাজে লাগিয়েছেন তাঁরই প্রণালী আর ধারণাগুলিকে। তাই তাঁর প্রভাব, বিশেষত রিকার্ডোর প্রভাবের সঙ্গে মিলে তাঁর প্রভাব একেবারে উনিশ শতকের সপ্তম দশক অবধি ছিল বিপুল। তারপর অবস্থাটা বদলে যায়। দেখা দেয় মার্কসবাদ — সেটা একদিকে; আর অন্য দিকে দেখা দেয় অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে বিষয়ীগত সম্প্রদায়— এটা অচিরেই প্রাধান্যশালী হয়ে দাঁড়ায় বুর্জোয়া বিজ্ঞানক্ষেত্রে।

স্মিথ সম্পর্কে মনোভাব ছিল 'কড়া', আর প্রথম শিকার হয়েছিল তো নিশ্চয়ই তাঁর মূল্য-তত্ত্ব। এটা অবশ্য অবিলম্বে ঘটে নি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সুবিদিত ইংরেজ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ অ্যালফ্রেড মার্শাল, যিনি রিকার্ডোর মতাবাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং নতুন বিষয়ীগত ধ্যান-ধারণার সঙ্গে তাঁর মিলজুল করাতে খুব চেষ্টা করেছিলেন, তিনি স্মিথ সম্বন্ধে লিখেছেন, 'মূল্য প্রসঙ্গে তাঁর ফরাসী এবং ইংরেজ সমসাময়িক আর পূর্বসূরিদের দূরকল্পনাগুলিকে সমন্বিত এবং বিস্তারিত করাই প্রধান কাজটা'* ছিল তাঁর।

চল্লিশ বছর পরে লিখেছিলেন পল ডাগলাস — এই বিশিষ্ট মার্কিন অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। তাঁর অভিযোগ এই: স্মিথের পূর্বসূরিদের যা ছিল সবচেয়ে মূল্যবান সেটা তিনি বাতিল করেন, আর নিজ মূল্য-তত্ত্ব দিয়ে তিনি ইংলণ্ডের অর্থশাস্ত্রকে ঢুকিয়ে দেন একটা কানাগলিতে, যেখান থেকে সেটা বেরিয়ে আসতে পারে নি গোটা এক শতাব্দীর মধ্যে। স্মিথ্ সম্বন্ধে বাহ্যত সসম্ভ্রম কিন্তু আসলে খুবই অবিশ্বাসী মনোভাবটাকে শুম্পিটার আরও জোরদার করে তুলেছেন 'আর্থনীতিক বিশ্লেষণের ইতিহাস'-এ। স্মিথ শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্ব সমর্থন করেন, এমনটা বলা যায় কিনা, এতেই তিনি প্রকৃতপক্ষে সংশয় প্রকাশ

* J. A. Schumpeter, 'History of Economic Analysis', p. 307 থেকে উদ্ধৃত।

করেছেন। শেষে, অর্থনীতি চিন্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুটা মাঝারি ধরনের একখানা মার্কিন পাঠ্যপুস্তকে (জে. এফ. বেল) আছে: 'মূল্য-তত্ত্ব ক্ষেত্রে স্মিথ যা দিয়েছেন সেটা স্পষ্ট করার চেয়ে গুলিয়ে দেয়ই বেশি। ভুলভ্রান্তি, বেঠিক কথা আর অসংগতিতে ভরা তাঁর আলোচনাটা।'*

এই সবকিছু থেকে একটা জিনিস নিঃসন্দেহে যথার্থ: স্মিথের মূল্য-তত্ত্বে গুরুতর ত্রুটিবিচ্যুতির দোষ আছে। কিন্তু, যা মার্কস বলেছেন, এইসব ত্রুটিবিচ্যুতি আর অসংগতি অর্থনীতি তত্ত্ব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক এবং উৎপাদী ছিল সেগুলোর নিজস্ব দিক থেকে। শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বের প্রারম্ভিক, সবচেয়ে সহজ-সরল সূত্রায়নে এটাকে নিছক মামুলি মনে হয়, সেটা থেকে স্মিথ এগিয়ে যেতে চেয়েছেন অবাধ প্রতিযোগিতার অবস্থায় পুঁজিতন্ত্রের আমলে পণ্য-অর্থ বিনিময় এবং দাম গড়ে ওঠার আসল ব্যবস্থাটায়। এই বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি এমন কোন-কোন অসংগতির সম্মুখীন হন যেগুলো মীমাংসার অসাধ্য। মার্কস মনে করেন এর আখেরী কারণ হল এই যে, স্মিথের (রিকার্ডোরও) বিবেচনায় পুঁজিতন্ত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না, পুঁজি আর মজুরি-শ্রমের মধ্যে সম্পর্কটাকে তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন চিরন্তন বলে — একমাত্র যা সম্ভব। তাছাড়া স্মিথ জানতেন শুধু 'সমাজের আদিম অবস্থা', যেটাকে তিনি মনে করতেন প্রায় অতিকথা হিসেবে। তবু মূল্য-সংক্রান্ত প্রশ্নটাকে তিনি ধরেছিলেন খুবই গভীর বৈজ্ঞানিক বিবেচনা অনুসারে।

উপযোগ-মূল্য আর বিনিময়-মূল্য সংক্রান্ত ধারণা-দুটোকে স্মিথ নির্দিষ্ট আকারে তুলে ধরেছিলেন এবং দুটোর মধ্যে সীমারেখা টেনেছিলেন তাঁর আগেকার সবার চেয়ে যথাযথভাবে। ফিজিওক্র্যাটদের অন্ধ মত বর্জন ক'রে এবং শ্রমবিভাগ সম্বন্ধে নিজস্ব তত্ত্বের ভিত্তিতে যুক্তি দিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন মূল্য পয়দা করার দিক থেকে সমস্ত রকমের উৎপাদী শ্রম সমতুল। এটা করতে গিয়ে তিনি বুঝেছিলেন বিনিময়-মূল্যের ভিত্তি হল — মার্কসের ভাষায় — মূল্যের সারমর্ম, অর্থাৎ মানুষের যাবতীয় উৎপাদী ক্রিয়াকলাপ হিসেবে শ্রম। শ্রমের দ্বৈত স্বধর্ম — বিমূর্ত আর মূর্ত শ্রম — মার্কসের এই আবিষ্কারের জমিন প্রস্তুত করল স্মিথের ঐ ধারণাটা। স্মিথ বুঝেছিলেন দক্ষ এবং জটিল শ্রম কোন নির্দিষ্ট সময়ে

* J. F. Bell, 'A History of Economic Thought', p. 188.

মূল্য পয়দা করে অদক্ষ এবং সাদাসিধে শ্রমের চেয়ে বেশি, আর সেটাকে পরেরটার হিসাবে প্রকাশ করা যায় কোন-কোন সহগের সাহায্যে। তিনি কিছু পরিমাণে আরও বুঝেছিলেন যে, কোন পণ্যের মূল্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয় পৃথক-পৃথক উৎপাদকের যথার্থ শ্রমব্যয় দিয়ে নয়, সেটা নির্ধারিত হয় সমাজের নির্দিষ্ট অবস্থায় আবশ্যক গড় শ্রমব্যয় দিয়ে।

পণ্যের স্বাভাবিক দাম আর বাজার-দর সম্বন্ধে স্মিথের ধারণা ফলপ্রদ হয়েছিল। স্বাভাবিক দাম বলতে তিনি বুঝেছিলেন, মূলত অর্থের হিসাবে বিনিময়-মূল্য, আর তিনি মনে করতেন, বাজার-দর শেষে গিয়ে এখানে দাঁড়ায় — এটা যেন উঠতি-পড়তির কেন্দ্র গোছের কিছু। অবাধ প্রতিযোগিতায় চাহিদা আর যোগানের ভারসাম্য বজায় থাকলে বাজার-দর আর স্বাভাবিক দাম হয়ে দাঁড়ায় একই। মূল্য থেকে দামের দীর্ঘমেয়াদী পার্থক্য ঘটাতে পারে যেসব কারক উপাদান সেগুলোকে বিশ্লেষণ করার ভিত্তিও তিনি স্থাপন করেন; একচেটেকে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন।

গোটা পরবর্তী শতাব্দীতে মূল্য আর দাম-গঠন সংক্রান্ত তত্ত্বের কেন্দ্রস্থলে ছিল যে-প্রশ্নটা সেটাকে স্মিথ তুলে ধরেছিলেন — এতে দেখা যায় তাঁর প্রগাঢ় বিচারবুদ্ধি। মার্কসীয় ধারণামৌলে এটা হল মূল্য থেকে উৎপাদন-পরিব্যয়ে রূপান্তর। স্মিথ জানতেন লাভটা হয়ে উঠতে চায় পুঁজির সমানুপাতিক; আর লাভের গড় হারটার স্বধর্ম তিনি বুঝতেন, সেটাকে তিনি করেছিলেন তাঁর স্বাভাবিক দামের ভিত্তি। এই ব্যাপারটাকে তিনি শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সমন্বিত করতে পারেন নি — এখানেই তাঁর দুর্বলতা।

মার্কস লিখেছেন, স্মিথের রচনায় দেখা যায় 'মূল্য সম্বন্ধে দুটো মাত্র নয়, এমনকি তিনটে, যথাযথভাবে বললে এমনকি চারটে খুবই বিসদৃশ মত পাশাপাশি রয়েছে স্বচ্ছন্দে এবং পরস্পর মিলেমিশে'।* দেখাই যাচ্ছে এর প্রধান কারণটা হল এই যে, শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্ব তখন যেভাবে গড়ে উঠেছিল এবং তিনি যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেটা এবং পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির বিভিন্ন যৌগিক মূর্ত-নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে বৈজ্ঞানিক

* ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, 'অ্যান্টি-ড্যুরিং', ২৭৫ পৃঃ (এই অংশটা মার্কসের লেখা। — অনুঃ)।

যুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে উপযুক্ত স্বাভাবিক যোগসূত্র তিনি দেখতে পান নি। কাজেই তিনি নিজের প্রারম্ভিক ধারণাটাকে রদ-বদল করতে এবং মানিয়ে-বনিয়ে নিতে আরম্ভ করেছিলেন।

প্রথমত, কোন পণ্যে নিহিত আবশ্যক শ্রমের পরিমাণ দিয়ে নির্ধারিত হয় যে-মূল্য (প্রথম এবং মুখ্য অভিমত) সেটার পাশাপাশি তিনি চালু করলেন একটা দ্বিতীয় ধারণা, যাতে কোন একটা পণ্য কিনতে যে-পরিমাণ শ্রম লাগে সেটা দিয়ে নির্ধারিত হয় মূল্য। সরল পণ্য-অর্থনীতিতে জন খাটানো হয় না, পণ্য-উৎপাদকেরা কাজ করে তাদের মালিকানাধীন উৎপাদনের উপকরণ দিয়ে — এই অবস্থায় সেটা পরিমাণের দিক থেকে একই। যেমন একজন তাঁতি একটুকরো কাপড় বিনিময় করে একজোড়া জুতোর জন্যে। বলা যেতে পারে, কাপড়ের ঐ টুকরোটা একজোড়া জুতোর তুল্যমূল্য, কিংবা জুতো-জোড়া তৈরি করতে মুচির যতটা সময় লেগেছিল তখনকার শ্রমের তুল্যমূল্য। কিন্তু মাত্রিক সমাপতন একত্বের প্রমাণ নয়, কেননা কোন পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হতে পারে শুধু একটা উপায়ে — অন্য পণ্যটার নির্দিষ্ট পরিমাণ দিয়ে।

এটাকে, মূল্য সম্বন্ধে তাঁর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটাকে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে স্মিথ একেবারেই বেসামাল হয়ে পড়েন। মুচি যদি খাটে পুঁজিপতির জন্য তাহলে তার তৈরি-করা জুতো-জোড়ার মূল্য এবং শ্রম বাবত সে যা পায় সেই 'তার শ্রমের মূল্য' একেবারেই ভিন্ন-ভিন্ন বস্তু। তার মানে, যে-মালিক মজুরটির শ্রম কেনে (প্রকৃতপক্ষে সে কেনে শ্রমশক্তি, শ্রমের সামর্থ্য, যা মার্কস প্রমাণ করেছেন) সে এই শ্রমের জন্যে যা পয়সা দেয় তার চেয়ে বেশি মূল্য পায়।

এই ব্যাপারটাকে শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করতে না পেরে ভুল করে স্মিথ স্থির করলেন শ্রম দিয়ে মূল্য নির্ধারিত হয় শুধু 'সমাজের আদিম অবস্থায়', যেখানে ছিল না পুঁজিপতি কিংবা মজুরি-শ্রমিক, অর্থাৎ — মার্কসীয় পরিভাষায় — সরল পণ্য অর্থনীতির অবস্থায়। পুঁজিতন্ত্রের পরিবেশের জন্যে স্মিথ মূল্য-তত্ত্বের একটা তৃতীয় আকার* দাঁড় করালেন: তিনি সিদ্ধান্ত করলেন কোন পণ্যের মূল্য স্থির হয় স্রেফ

* চতুর্থ আকার — শ্রমের বোঝার ফল হিসেবে মূল্য-সংক্রান্ত বিষয়ীগত ব্যাখ্যা — স্মিথের রচনায় দেখা যায় শুধু প্রাথমিক আকারে।

বিভিন্ন পরিব্যয় (খরচখরচা) দিয়ে, সেগুলোর মধ্যে শ্রমিকদের মজুরি এবং পুঁজিপতির লাভ (কোন-কোন শাখায় ভূমি-খাজনাও)। পুঁজি থেকে গড় লাভ, সেটাকে তিনি বলেন 'লাভের স্বাভাবিক হার', সেই ব্যাপারটায় যেন ব্যাখ্যা পাওয়া গেল ঐ মূল্য-তত্ত্ব দিয়ে, এজন্যেও তিনি আশ্বস্ত হলেন। মূল্যকে স্মিথ স্রেফ উৎপাদন-পরিব্যয়ের সমতুল বলে গণ্য করলেন — এই দুয়ের মধ্যে জটিল যোগ্যসূত্রগুলি তিনি দেখতে পেলেন না।

এটা হল 'উৎপাদন-পরিব্যয় তত্ত্ব', যেটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় এসেছিল পরবর্তী শতাব্দীতে। যে-পুঁজিপতি মনে করে তার পণ্যের দাম নির্ধারিত হয় প্রধানত খরচখরচা আর গড় লাভ দিয়ে, তাছাড়া কোন একটা সময়ে যোগান আর চাহিদা দিয়ে, তার ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করলেন স্মিথ। শ্রম, পুঁজি আর ভূমিসম্পত্তি মূল্য পয়দা করার দিক থেকে সমতুল— এইভাবে দেখাবার মস্ত সুযোগ দিল মূল্য সম্বন্ধে ঐ ধারণাটা। সে' এবং অন্যান্য অর্থনীতিবিদ যাঁরা অর্থশাস্ত্রটাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন পুঁজিপতি আর ভূস্বামীদের স্বার্থ সমর্থন করার জন্যে তাঁরা স্মিথের উপস্থাপনা থেকে ঐ সিদ্ধান্ত করেন অচিরেই।

বিভিন্ন শ্রেণী এবং সেগুলির আয়

আগেই জানা গেছে, দামের আখেরি ভিত্তি এবং আয়ের আখেরি উৎপত্তিস্থল-সংক্রান্ত পরস্পর-সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন-দুটোর উত্তর আসা চাই মূল্য-তত্ত্ব থেকে। প্রথম প্রশ্নটার আংশিক-সঠিক উত্তর দেন স্মিথ, কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে সেটাকে বনাতে না পেরে তিনি অবলম্বন করেন একটা স্থূল দৃষ্টিভঙ্গি। শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্ব গড়ে তুলতে গিয়ে তিনি দ্বিতীয় প্রশ্নটার বিজ্ঞানসম্মত মীমাংসায়ও কিছুটা সাহায্য করেন, কিন্তু এটাও অসমঞ্জস প্রতিপন্ন হয়।

'সমাজের আদিম অবস্থা' বলতে কী বোঝেন স্মিথ? এটাকে তিনি প্রায় অতিকথা বলে মনে করলেও এই অতিকথাটার একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থ আছে। তিনি কি ভেবেছিলেন সেটা এমন সমাজ যেখানে ছিল না ব্যক্তিগত মালিকানা? সম্ভবত তা নয়। কি অতীতে, কি ভবিষ্যতে, মানবজাতির কোন 'স্বর্ণযুগ' স্মিথ দেখতে পান নি। তাঁর মনে ছিল হয়ত এমন সমাজ যেখানে

ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল, কিন্তু ছিল না বিভিন্ন শ্রেণী। এমন সমাজ সম্ভব কিনা, কিংবা কখনও ছিল কিনা, সেটা একেবারেই ভিন্ন প্রশ্ন।

ধরা যাক একটা সমাজে আছে দশ লাখ খামারী, তাদের প্রত্যেকের আছে কোনমতে যথেষ্ট জমি আর শ্রমের হাতিয়ার, প্রত্যেকে পয়দা করে ঠিক যতটুকু দরকার নিজের ভোগ-ব্যবহার এবং তার পরিবারের জীবনধারণের প্রয়োজনে বিনিময়ের জন্যে। তাছাড়া এই সমাজে আছে দশ লাখ স্বাধীন কারিগর, এরা প্রত্যেকে কাজ করে নিজের শ্রমের হাতিয়ার আর কাঁচামাল দিয়ে। এ সমাজে মজুরি-করা শ্রম নেই।

কেনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এই সমাজে আছে দুটো শ্রেণী, আর স্মিথের দৃষ্টিভঙ্গিতে — একটা। স্মিথ যেভাবে দেখছেন সেটাই অপেক্ষাকৃত সঠিক, কেননা কোন শ্রেণীর মানুষ অর্থনীতির কোন্ শাখায় নিযুক্ত তদনুসারে হয় না ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণী, সেটা হয় উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে এদের সম্পর্ক অনুসারে। স্মিথ বলেন, এমন অবস্থায় পণ্য-বিনিময় চলে শ্রমঘটিত মূল্য অনুসারে, আর সমগ্র শ্রমফলের (বা শ্রমের মূল্যের) মালিক কর্মীটি: তার ভাগ্য ভাল, সেটা যার সঙ্গে ভাগাভাগি করতে হতে পারে এমন কেউ তখনও নেই। কিন্তু সেসব দিন কেটে গেছে বহুকাল আগে। ভূমি হয়েছে ভূস্বামীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আর কর্মশালা আর কল-কারখানাগুলো পুঁজিপতি মালিকদের হাতে। এমনই সমসাময়িক সমাজ। তিনটে শ্রেণী নিয়ে এই সমাজ: মজুরি-করা জন, পুঁজিপতি আর ভূস্বামীরা। বিভিন্ন মধ্যবর্তী স্তর আর বর্গও রয়েছে, সেটা লক্ষ্য করার মতো বাস্তবতাবোধ স্মিথের আছে। তবে বুনিয়াদী আর্থনীতিক বিশ্লেষণে সেগুলোকে না ধরে তিন-শ্রেণীর ছক অনুসারে চলা যায়।

এইভাবে মজুর এখন সাধারণত কাজ করে অন্য কারও জমিতে কিংবা অন্য কারও পুঁজির সাহায্যে। কাজেই তার সমগ্র শ্রমফলের মালিক সে আর নয়। এই উৎপাদ থেকে বা সেটার মূল্য থেকে প্রথম কাটা যায় ভূস্বামীকে দেয় খাজনা। দ্বিতীয়টা যা কাটা যায় সেটা হল পুঁজিপতি মালিকের লাভ, যে-পুঁজিপতি শ্রমিক খাটায় এবং তাদের দেয় কাজের হাতিয়ার আর মালমশলা।

পুঁজিপতি আর ভূস্বামীদের হাতে শ্রম শোষণের ফল হিসেবে উদ্বৃত্ত মূল্যটাকে বুঝবার কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন স্মিথ। তবে মার্ক্সের আগেকার সমস্ত অর্থনীতিবিদের মতো তিনিও উদ্বৃত্ত মূল্যটাকে একটা বিশেষ

ধারণামৌল হিসেবে আলাদা করে দেখান নি, — বুর্জোয়া সমাজের উপরিতলে সেটা যেসব নির্দিষ্ট আকারে দেখা দেয় সেইগুলো নিয়েই শুধু তিনি বিচার-বিবেচনা করেন; এইসব আকার হল — লাভ, খাজনা, ঋণ বাবত সুদ। 'জাতিসমূহের সম্পদ'-এ চারটে জায়গায় স্মিথ বলেছেন পূর্ণ শ্রমফল একসময়ে ছিল কর্মীর জিনিস, যা পরে তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় — এটা বের করেন পল ডাগলাস। ডাগলাস বলেছেন, এই উপস্থাপনাটা 'সমাজতান্ত্রিক চিন্তনের ইতিহাসে মহা গুরুত্বসম্পন্ন, আর এটা পাওয়া গেল অ্যাডাম স্মিথের রচনায় এটার তাৎপর্য মস্ত'।* খুবই ঠিক কথা। প্রসঙ্গত বলা দরকার, 'জাতিসমূহের সম্পদ'-এর খুবই সযত্ন-সতর্ক বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন পণ্ডিতেরা; বিভিন্ন ধরনের, এমনকি আত্মবিরোধী এত বেশি বক্তব্য উঁচু দরের রচনাগুলিতে দেখা যায় খুব কমই।

মূল্যকে স্মিথ ধরেছেন মজুরি, লাভ, খাজনা — এইসব আয়ের সাকল্য হিসেবে — এটা তাঁর আর-একটা চিন্তাধারা। বাস্তবিকপক্ষে, লাভ আর খাজনা যদি হয় পণ্যের মূল্যের অঙ্গ-উপাদান তাহলে পণ্যের পূর্ণ মূল্য থেকে ঐ দুটোকে পাওয়া যায় না। এখানে দেখা যাচ্ছে আয় বণ্টনের একেবারেই ভিন্ন চিত্র: উৎপাদনের প্রত্যেকটা ঘটক উপাদান (অভিধাটা দেখা দিয়েছিল পরে), অর্থাৎ শ্রম পুঁজি আর ভূমি পণ্যের মূল্য পয়দা করতে সক্রিয় থাকে, প্রত্যেকটার নিজস্ব অংশ থাকে স্বভাবতই। এটা থেকে বেশি দূরবর্তী নয় 'পুঁজির পবিত্র অধিকার', যা উনিশ শতকে বিঘোষিত করেছিলেন সাফাইদার অর্থনীতিবিদেরা।

মূল্যটাকে আয় থেকে গড়ে তুলে স্মিথ প্রত্যেকটা আয়ের স্বাভাবিক হার কিভাবে নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ পৃথক-পৃথক পণ্য এবং সমগ্র উৎপাদের মূল্য সমাজের শ্রেণীগুলির মধ্যে বণ্টিত হয় কোন্ নিয়ম অনুসারে, সেটা বিচার-বিশ্লেষণ করতে মনস্থ করলেন।

প্রধান তিনটে আয়ের প্রত্যেকটা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্মিথ কিছু পরিমাণে আবার তুলেছেন তাঁর উদ্বৃত্ত মূল্যে তত্ত্ব। মজুরি সম্বন্ধে তাঁর মত আজও আগ্রহের বিষয়। **মজুরি সম্পর্কে** তাঁর তত্ত্ব

---

* Adam Smith, 1776-1926. 'Lectures to Commemorate the 150th Anniversary of the Publication of *The Wealth of Nations*', Chicago, 1928, p. 96.

অনেক দিক থেকে সন্তোষজনক নয় নিশ্চয়ই, কেননা পুঁজিপতির কাছে শ্রমিকের শ্রমশক্তি বিক্রি করার সঙ্গে জড়িত সম্পর্কের আসল প্রকৃতিটা তিনি বোঝেন নি। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যথার্থ শ্রমই পণ্যটা, তাই কাজেকাজেই সেটার থাকে স্বাভাবিক দাম। কিন্তু এই স্বাভাবিক দামটাকে তিনি বাস্তবিক নির্দিষ্ট করেছিলেন যেভাবে মার্কস স্থির করেন শ্রমশক্তির মূল্য: সেটা হল শ্রমিকটি এবং তার পরিবারের প্রাণধারণের জন্যে আবশ্যক জীবনীয়। এতে একগুচ্ছ বাস্তবতাসম্মত এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদান স্মিথ সংযোজিত করেন।

এক, তিনি বুঝেছিলেন শ্রমশক্তির মূল্য (তাঁর অভিধায় 'স্বাভাবিক মজুরি') নির্ধারিত হয় জীবনোপায়ের ন্যূনকল্প পরিমাণ দিয়েই শুধু নয়, সেটা আরও নির্ভর করে স্থান-কালের পরিবেশের উপর, অর্থাৎ তার মধ্যে থাকে একটা ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদান। চামড়ার পাদুকার দৃষ্টান্তটা স্মিথ উল্লেখ করেছেন — জিনিসটা অবশ্যপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইংলণ্ডে নারী আর পুরুষের পক্ষে, স্কট্ল্যাণ্ডে শুধু পুরুষের পক্ষে, কারও পক্ষে নয় ফ্রান্সে। অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনের পরিধি বেড়ে চলে, আর আসল পণ্যের হিসাবে শ্রমশক্তির মূল্য বাড়া চাই — এ সিদ্ধান্ত তো অপরিহার্য।

দুই, স্মিথ স্পষ্ট বুঝেছিলেন মজুরি কম হবার, মজুরি ন্যূনকল্প পরিমাণের কাছাকাছি হবার একটা কারণ হল পুঁজিপতির সঙ্গে তুলনায় শ্রমিকের দরকষাকষি করার ক্ষমতার কমতি। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন খুবই কড়া ভাষায়। অনায়াসেই সিদ্ধান্ত হয় যে, শ্রমিকদের সংগঠন আর সংহতি, তাদের প্রতিরোধ মালিকদের অর্থলালসা সংযত করতে পারে।

শেষে, তিন, মজুরির গতিধারাটাকে তিনি সংশ্লিষ্ট করেছেন দেশের অর্থনীতির পরিস্থিতির সঙ্গে — এতে তিনি দেখিয়েছেন পৃথক-পৃথক তিনটে অবস্থা: উন্নতিশীল অর্থনীতি, পড়তি অর্থনীতি এবং বদ্ধ অর্থনীতি। তিনি মনে করতেন উন্নতিশীল অর্থনীতিতে মজুরি বাড়া চাই, কেননা অর্থনীতির প্রসার ঘটতে থাকলে শ্রমের জন্যে চাহিদা প্রচুর। পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির পরবর্তী বিকাশে দেখা গেছে অর্থনীতির প্রসার ঘটতে থাকলে সেটা মজুরিবৃদ্ধির জন্যে শ্রমিকদের লড়াইয়ে বাস্তবিকই সহায়ক হয়।

অর্থশাস্ত্রে একটা বিশেষ আর্থনীতিক ধারণামৌল হল **লাভ** —

এইভাবে সেটাকে পৃথক করে তুলে ধরার কাজটা সমাধা করেন স্মিথ। 'পরিদর্শন আর পরিচালনের' বিশেষ ধরনের কাজের বাবত বেতন মাত্র — লাভ সম্বন্ধে এই বক্তব্যটাকে স্মিথ একেবারেই বাতিল করে দেন। তিনি দেখিয়েছেন লাভের পরিমাণ নির্ধারিত হয় পুঁজির পরিমাণ দিয়ে, — লাভের পরিমাণটা কোনক্রমেই ঐ কাজটার কল্পিত দুঃসাধ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। এখানে এবং রচনাটার আরও কয়েকটা জায়গায় স্মিথ লাভের ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রকৃতপক্ষে শোষণজনিত আয় হিসেবে, উদ্বৃত্ত মূল্যের প্রধান আকার হিসেবে।

স্মিথের রচনায় এই অভিমতের পাশাপাশি রয়েছে লাভ সম্বন্ধে এই ভাসাভাসা বুর্জোয়া অভিমত: লাভ হল ঝুঁকি নেবার জন্যে, শ্রমিককে জীবনোপায় দাদন দেবার জন্যে, তথাকথিত 'মিতাচারের' জন্যে পুঁজিপতির প্রাপ্য স্বাভাবিক পারিতোষিক।

পুঁজি

মার্কসের আগেকার অর্থনীতিবিদেরা, তাঁদের মধ্যে ক্ল্যাসিকাল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রকারেরাও মনে করতেন পুঁজি হল স্রেফ সরঞ্জাম, কাঁচামাল, জীবনীয় বস্তু আর অর্থের সঞ্চিত তহবিল। তার মানে, পুঁজি ছিল বরাবর, থাকবে বরাবর, কেননা এমন তহবিল ছাড়া কোন উৎপাদন সম্ভব নয়। তাতে আপত্তি করে মার্কস পুঁজির ভিন্ন ব্যাখ্যা দিলেন: পুঁজি এই ঐতিহাসিক মৌলটা দেখা দেয় শুধু যখন শ্রমশক্তি হয়ে দাঁড়ায় একটা পণ্য, যখন সমাজে প্রধান স্থানে আসে পুঁজিপতি (যে উৎপাদনের উপকরণের মালিক) এবং মজুরি-খাটানো জন যার কিছুই নেই শ্রমশক্তি ছাড়া। পুঁজি হল এই সামাজিক সম্পর্কের অভিব্যক্তি। পুঁজি বরাবর ছিল না, পুঁজি কোনক্রমেই চিরন্তন নয়। পুঁজিকে পণ্য আর অর্থের সাকল্য হিসেবে ধরলেও সেটা শুধু এই অর্থে যে, সেগুলোতে অঙ্গীভূত থাকে মজুরি-শ্রমিকদের দেওয়া মাগনা (অতিরিক্ত) শ্রম, যেটাকে আত্মসাৎ করে পুঁজিপতি, আর এই শ্রমের নতুন-নতুন খাবলা আত্মসাৎ করতে সেগুলোকে ব্যবহার করা হয়।

স্মিথের রচনার যে জায়গাটা সম্বন্ধে মার্কস বলেছেন সেখানে তিনি উদ্বৃত্ত মূল্যের আসল উৎপত্তিস্থলটা ধরেছেন তাতে তিনি লিখেছেন:

'নির্দিষ্ট কিছু-কিছু লোকের হাতে পুঁজি জমে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কেউ-কেউ স্বভাবতই সেটাকে খাটায় পরিশ্রমী লোকদের কাজে লাগাবার জন্যে, এদের তারা যোগায় মালমশলা আর জীবনীয়, যাতে এদের কাজ দিয়ে তৈরি জিনিস বিক্রি ক'রে বা এদের শ্রম মালমশলার মূল্যে যেটুকু যোগ করে সেটা থেকে লাভ করা যায়।'* পুঁজি উদ্ভবের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটা এবং তার থেকে উদ্ভূত সামাজিক সম্পর্কের শোষণকর মর্মটার কথাই এখানে বলছেন স্মিথ। তবে দ্বিতীয় ভাগে পুঁজি সম্বন্ধে বিশেষ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্মিথ এই প্রগাঢ় দৃষ্টিভঙ্গিটা বর্জন করেন প্রায় পুরোপুরিই। পুঁজি সম্পর্কে তাঁর 'টেকনিকাল' বিশ্লেষণের মিল আছে তিউর্গোর বিশ্লেষণের সঙ্গে। কিন্তু বদ্ধ আর চলতি পুঁজি, পুঁজি বিনিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্র, ঋণের পুঁজি আর ঋণের সুদ, ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে স্মিথের বিচার-বিশ্লেষণ তিউর্গো কিংবা অন্য যেকোন জনের চেয়ে প্রণালীবদ্ধ এবং বিস্তারিত।

আর্থনীতিক অগ্রগতির নিষ্পত্তিকর কারক উপাদান হিসেবে **পুঁজি সঞ্চয়নের** উপর স্মিথ জোর দিয়েছেন: এটাই তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে, তাঁর গোটা ব্যাখ্যানে ফুটিয়ে তুলেছে প্রামাণিকতার পরিচয়। সঞ্চয় হল জাতির সম্পদের মূল উপাদান, যারা সঞ্চয় করে তারা প্রত্যেকেই জাতির হিতকারী, প্রত্যেকটি অমিতব্যয়ী লোক জাতির শত্রু — এটা প্রমাণ করতে খুবই অবিচলিত থেকে অধ্যবসায়ী চেষ্টা করেন অ্যাডাম স্মিথ। এতে দেখা যায় শিল্প-বিপ্লবের মূল আর্থনীতিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় উপলব্ধি। এখনকার ইংরেজ পণ্ডিতদের হিসাবে আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংলণ্ডে সঞ্চয়ের হার (জাতীয় আয়ের সঞ্চিত অংশ) গড়ে ৫ শতাংশের বেশি ছিল না। শিল্প-বিপ্লবের সবচেয়ে প্রবল কালপর্যায় হল ১৭৯০ সাল থেকে, তার আগে বোধহয় সেটা চড়তে শুরু করে না। পাঁচ শতাংশ নিশ্চয়ই খুবই কম। এখন প্রচলিত বিবেচনায় সঞ্চয়ের হার ১২ থেকে ১৫ শতাংশ হলে পরিস্থিতি মোটামুটি সন্তোষজনক, ১০ শতাংশ হলে সেটা বিপদ-সংকেত, আর ৫ শতাংশ মানে বিপর্যয়-সংকেত। সঞ্চয়ের হার বাড়িয়ে চলো যেমন করেই হোক! — আধুনিক লবজে বললে এটাই ছিল স্মিথের তাগিদ।

---

* A. Smith, 'The Wealth of Nations', Vol. II, p. 42.

সঞ্চয় করতে পারে কে? সঞ্চয় করা চাই কার? নিশ্চয়ই পুঁজিপতিরা — ধনী খামারী, শিল্পপতি, বণিক। স্মিথের বিচারে এটা তাদের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্ম। অনেক আগে, গ্লাসগোর লেকচারগুলিতেই তিনি স্থানীয় পুঁজিপতি পুঙ্গবদের 'কৃচ্ছ্র সাধনের' তারিফ করেছিলেন: একজনের বেশি চাকর রাখে এমন ধনীব্যক্তি গোটা শহরে প্রায় ছিলই না। স্মিথ লিখেছেন, উৎপাদী কর্মী কাজে খাটিয়ে লোকে বড়লোক হয়, আর চাকর খাটিয়ে লোকে হয়ে পড়ে গরিব। সমগ্র জাতির ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য: জনসমষ্টিতে যারা উৎপাদী কাজে নিযুক্ত নয় এমন লোকের সংখ্যা কমিয়ে সর্বনিম্ন মাত্রায় নামাতে চেষ্টা করা চাই। উৎপাদী কাজ সম্বন্ধে নিজ ধারণাটাকে স্মিথ শানিয়ে তাক করেছিলেন সমাজে সামন্ততান্ত্রিক বর্গের লোকেদের বিরুদ্ধে এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রিয় আমলাতন্ত্র, মিলিটারি, চার্চ, ইত্যাদি সবকিছুর বিরুদ্ধে। মার্কস বলেন, এই যারা উৎপাদনের উপর বোঝা এবং সঞ্চয়ন ব্যাহত করে, এই দঙ্গলটা সম্পর্কে সমালোচনার মনোভাবটায় প্রকাশ পায় তখনকার দিনের বুর্জোয়া আর শ্রমিক শ্রেণী দুয়েরই দৃষ্টিভঙ্গি।

স্মিথ লিখেছেন: 'দৃষ্টান্তস্বরূপ সার্বভৌম, আর তাঁর অধীনে যারা কাজ করে বিচার আর যুদ্ধ উভয়ের যাবতীয় অফিসার, গোটা ফৌজ আর নৌবাহিনী — সবাই অনুৎপাদী কর্মী। তাঁরা জনসেবক; অন্যান্যের শ্রমের বার্ষিক উৎপাদের একাংশ দিয়ে তাঁদের ভরণপোষণ চলে... একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চাই সবচেয়ে গুরু এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোন-কোন পেশা, আর কোন-কোন অতি ছেবলা পেশা উভয়ই: যাজক, আইনজীবী, চিকিৎসক, সমস্ত রকমের বিদ্বজ্জন; অভিনেতা, ভাঁড়, বাজিয়ে, অপেরা-গাইয়ে, নাচিয়ে, ইত্যাদি।'*

একই সঙ্গে সার্বভৌম আর ভাঁড়েরা! অফিসারেরা আর যাজকেরা পরজীবী! পণ্ডিতজনের ন্যায়পরতা অনুসারে স্মিথ আর্থনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুৎপাদী কর্মীদের মধ্যে ধরেছেন 'সমস্ত রকমের বিদ্বজ্জনকে'ও, তিনি নিজেই যাঁদের একজন। এইসব কথার মধ্যে নিশ্চয়ই রয়েছে কিছু-কিছু সাহসিক এবং জোরাল ব্যঙ্গ, কিন্তু পণ্ডিতের গাম্ভীর্য আর বিষয়ানুগতা দিয়ে তা চমৎকার প্রচ্ছন্ন। এমনই অ্যাডাম স্মিথ।

---

* A. Smith, 'The Wealth of Nations', Vol. I, London, 1924, p. 295.

স্মিথের মতবাদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছিল ইংলণ্ডে আর ফ্রান্সে, এই যে-দুই দেশে শিল্পোন্নয়ন সর্বোচ্চ স্তরে উঠেছিল আঠার শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে, আর বেশকিছুটা রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল বুর্জোয়াদের হাতে।

তবে ইংলণ্ডে স্মিথের অনুগামীদের মধ্যে কোন উঁচুদরের স্বতন্ত্রধারার চিন্তাগুরু ছিলেন না রিকার্ডোর আগে। স্মিথের প্রথম-প্রথম সমালোচকেরা ছিলেন ভূস্বামীদের আর্থনীতিক স্বার্থের প্রবক্তা। ইংলণ্ডে তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট ছিলেন ম্যালথাস এবং আর্ল লডারডেল।

ফ্রান্সে স্মিথের মতবাদ প্রথমে নিরুত্তাপ সাড়া জাগিয়েছিল শেষের দিককার ফিজিওক্র্যাটদের মধ্যে। তারপর বিপ্লব এসে মনোযোগ সরিয়ে দিল অর্থনীতি তত্ত্ব থেকে। পরিবর্তনের সূচনা হল উনিশ শতকের একেবারে গোড়ায়। 'জাতিসমূহের সম্পদ'-এর প্রথম উপযুক্ত অনুবাদ বেরয় ১৮০২ সালে, তাতে ছিল তরজমাকার জের্মেন গার্নিয়ে-র ভাষ্য। ১৮০৩ সালে সে' এবং সিস্‌মন্দির নিজ-নিজ বই প্রকাশিত হয়, তাতে দেখা যায় উভয় অর্থনীতিবিদ মোটের উপর স্মিথের অনুগামী। সে' এই স্কট্ পণ্ডিতের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে যেভাবে তুলে ধরেন সেটা 'বিশুদ্ধ' স্মিথের নিজস্ব ব্যাখ্যার চেয়ে উপযোগী হয় বুর্জোয়াদের পক্ষে। তবে সে' যে-পরিমাণে তেজীয়ান লড়াই চালান পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পোন্নয়নের সপক্ষে তাতে তাঁর বহু ভাব-ধারণাই আসে স্মিথের কাছাকাছি।

স্মিথের মতবাদ যেখানে প্রগতিশীল ছিল ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের ক্ষেত্রে, তাহলে যেসব দেশে প্রাধান্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীলতার এবং বুর্জোয়া বিকাশ শুরু হয়েছিল সবে, সেগুলিতে সেটা ছিল আরও স্পষ্টপ্রতীয়মান — জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ইতালি, স্পেন এবং নিশ্চয়ই রাশিয়া। কথিত আছে, গোড়ায় স্পেনের ইনকুইজিশন স্মিথের বইখানাকে নিষিদ্ধ করেছিল। জার্মান মার্কা বণিকতন্ত্র কামেরালিস্টিক-এর মেজাজে লেকচার দিতেন যেসব প্রতিক্রিয়াশীল জার্মান প্রফেসর তাঁরা স্মিথকে স্বীকার করতে চান নি দীর্ঘকাল যাবৎ। তবু সবচেয়ে বড় জার্মান রাজ্য প্রাশিয়ায়ই ঘটনাধারার উপর স্মিথের ভাব-ধারণার প্রভাব পড়েছিল: নেপোলিয়নীয়

যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে সেখানে যারা বিভিন্ন উদারপন্থী বুর্জোয়া সংস্কার চালু করেছিল তারা ছিল স্মিথের অনুগামী।

স্মিথের ছিল নানা অসামঞ্জস্য, তাঁর বইখানায় ছিল পাঁচমিশুলি, এমনকি পরস্পর-বিরুদ্ধ বিভিন্ন ভাব-ধারণা, তার ফলে যাদের অভিমত আর নীতি একেবারেই পৃথক এমনসব লোক তাঁর ভাবধারা থেকে গ্রহণ করতে এবং তাঁকে গুরু আর পূর্বসূরি বলে মনে করতে পেরেছিল — এই কথাটা মনে রাখা চাই তাঁর মতবাদ আর প্রভাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে। উনিশ শতকের তৃতীয় থেকে পঞ্চম দশকে যেসব ইংরেজ সমাজতন্ত্রী রিকার্ডোর মতবাদকে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে চালিত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা নিজেদের মনে করতেন অ্যাডাম স্মিথের মানস-উত্তরাধিকারী, আর তাই তাঁরা ছিলেনও বটে। পূর্ণ শ্রমফল এবং সেটা থেকে একাংশ পুঁজিপতি আর ভূস্বামীর জন্যে কেটে নেওয়া সম্বন্ধে স্মিথের যে-তত্ত্ব প্রধানত তারই ভিত্তিতে এঁরা দাঁড়িয়েছিলেন। অন্য দিকে ফ্রান্সে বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের ইতর সাফাইদার মতধারার প্রতিনিধি সে'-র সম্প্রদায়ও মনে করত তারা স্মিথের অনুগামী। স্মিথের আর-একটা চিন্তাধারা ছিল এঁদের ভিত্তি: উৎপাদ এবং তার মূল্য পয়দা করতে বিভিন্ন উৎপাদন-উপাদানের সহযোগ। অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে স্মিথের যুক্তিও এঁরা নিয়েছিলেন, কিন্তু সেটাতে জুড়ে দিয়েছিলেন একটা স্থূল ব্যবসাদারী প্রকৃতি।

তত্ত্বীয় প্রভাবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারাটা স্মিথ থেকে গিয়ে পৌঁছয় রিকার্ডো এবং মার্কসের কাছে।

তত্ত্বীয় এবং নির্দিষ্ট আর্থনীতিক আর সামাজিক কর্মনীতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যায় স্মিথের মতবাদের ছিল বিবিধ দিক। স্মিথের কোন-কোন অনুগামী নিয়েছিলেন সেগুলি থেকে একটামাত্র দিক: অবাধ বহির্বাণিজ্য, সংরক্ষণনীতির বিরুদ্ধে লড়াই। সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে এইসব যুক্তি ছিল কোথাও প্রগতিশীল, কোথাও বেশ প্রতিক্রিয়াশীল। যেমন প্রাশিয়ায় অবাধ বাণিজ্যের জন্যে আন্দোলন চালাত রক্ষণপন্থী য়ুঙ্কার মহলগুলো; সস্তা বিদেশী শিল্পজাত জিনিসপত্র আমদানি করায় এবং নিজেদের শস্য অবাধে রপ্তানি করায় তাদের স্বার্থ ছিল।

কিন্তু আগেই স্পষ্ট দেখা গেছে, স্মিথের বিবেচনায় অবাধ বাণিজ্য ছিল সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিস্তৃত আর্থনীতিক আর রাজনীতিক স্বাধীনতা কর্মসূচির শুধু একটা অঙ্গ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বহু প্রগতিশীল

এবং মুক্তি আন্দোলনে মালুম হয় স্মিথের ভাব-ধারণা (যা প্রায়ই আঠার শতকের অন্যান্য অগ্রণী চিন্তাগুরুদের ভাব-ধারণার সঙ্গে প্রায় অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত) — এটাই সভ্যতার ইতিহাসে স্মিথের মস্ত ভূমিকা।

এটা হয়ত সবচেয়ে স্পষ্ট ছিল রাশিয়ায়। ১৮২৬ সালের গোটা প্রথমার্ধ ধরে ডিসেম্ব্রিস্টদের ব্যাপারে তদন্ত চলছিল। তদন্তকালে প্রত্যেক বিদ্রোহীকে বিশেষ ধরনের প্রশ্নতালিকা দেওয়া হয়, তাতে বিশেষত বিদ্রোহীর 'অবৈধ এবং উদারনীতিক চিন্তাধারা'র উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন ছিল। ডিসেম্ব্রিস্টরা যে-লেখকদের নাম উল্লেখ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মঁতেস্ক্যু এবং ভল্টেয়রের নামের পাশে স্মিথের নামও কয়েক বার দেখা যায়। অর্থশাস্ত্র-সংক্রান্ত বিভিন্ন রচনার উল্লেখ ছিল বারবার, কিন্তু মনে রাখা দরকার তখন এর ব্যবহারিক অর্থ ছিল স্মিথের প্রণালী।

ডিসেম্ব্রিস্টদের অভিজাত বিপ্লবীদের কর্মসূচি আসলে ছিল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক। এই কর্মসূচিতে তাঁরা পশ্চিমী পন্ডিতদের সবচেয়ে প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা ব্যবহার করেছিলেন। স্মিথের প্রণালীতে স্বাভাবিক স্বাধীনতা তন্ত্র, আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, দাসপ্রথার (ভূমিদাসত্ব) উপর ধিক্কার, অন্য সমস্ত রকমের সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং শিল্পোন্নয়নের পক্ষে মত, সর্বজনীন কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করার দাবি, ইত্যাদি ডিসেম্ব্রিস্টদের আকর্ষণ করেছিল। স্মিথের অবাধ বাণিজ্য নীতিতেই তাঁদের কৌতূহল ছিল কম। ডিসেম্ব্রিস্ট এবং তাঁদের অনুরূপ মতের ব্যক্তিদের মধ্যে যেমন অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী তেমনি জায়মান রুশ শিল্পের জন্যে সংরক্ষণ শুল্ক চালু করার পক্ষপাতীরাও ছিলেন। তাঁরা (সাধারণভাবে তখনকার রুশ অর্থনীতিবিদরাও) স্মিথের মতাবাদে মূল্য, আয়, পুঁজি সংক্রান্ত বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক দিকগুলো সম্বন্ধে আরও কম উৎসাহ দেখাতেন।

কয়েক দশক ধরে রুশ শিক্ষিত সমাজে স্মিথের ভাবধারার প্রসারের পরিণতি হল ডিসেম্ব্রিস্টদের উপর তাঁর প্রভাব। ১ম আলেক্সান্দর সিংহাসনে আসীন হবার পরে উদারনীতিক চিন্তাধারার প্রসারের জোয়ারের মধ্যে ১৮০২-১৮০৬ সালে 'জাতিসমূহের সম্পদ'-এর প্রথম রুশ তরজমা প্রকাশিত হয়। স্মিথের বইখানা অনুবাদ করার কাজটা ছিল খুবই জটিল, কেননা বৈজ্ঞানিক আর্থনীতিক পরিভাষা এবং ধারণামৌলগুলি রুশ ভাষায় তখন সবে গড়ে উঠছিল। তবু রাশিয়ায় স্মিথের ধ্যান-ধারণা ছড়াবার পক্ষেই

নয়, সমগ্র রুশ অর্থনীতি চিন্তনের উন্নতির ক্ষেত্রেও এই বইখানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় এসেছিল। রাশিয়ায় স্মিথের মতবাদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি প্রসারিত হয়েছিল ১৮১৮-১৮২৫ সালের কালপর্যায়ে। ডিসেম্বরের অভ্যুত্থানের পরে এই মতবাদ প্রায় সম্পূর্ণভাবে রক্ষণশীল অধ্যাপকদের হাতে পড়ে যায়; এই মতবাদে যাকিছু সাহসিক আর জোরাল ছিল সেই সবই তাঁরা দূর করে দিয়েছিলেন।

উল্লেখযোগ্য যে এটা পুশকিনের নজর এড়িয়ে যায় নি, তিনি স্মিথ সম্পর্কে আগ্রহটাকে ফুটিয়ে তোলেন 'ইয়েভগেনি ওনেগিন' কবিতায়। ১৮২৯ সালে লেখা পুশকিনের একটি গদ্যগল্পে আছে: 'তোমার দূরকল্পনা এবং গুরু বিবেচনা ১৮১৮ সালের ব্যাপার। আচার-ব্যবহারের কৃচ্ছ্রতা আর অর্থশাস্ত্র ছিল সেকালের ফেশান। আমরা তরোয়াল না খুলে বল-নাচে যেতাম — নাচা আমাদের পক্ষে অনুচিত ছিল, আর মেয়েদের সঙ্গে ব্যাপৃত থাকার সময় আমাদের ছিল না। খবর দেবার সুযোগ পেয়ে তোমাকে জানাচ্ছি সবকিছু বদলে গেছে। অ্যাডাম স্মিথের স্থান অধিকার করেছে ফরাসী কুয়োদ্রিল নাচ।'

কমপক্ষে তিনজন ডিসেম্ব্রিস্টের সঙ্গে পুশকিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, এমনকি বন্ধুত্বই ছিল; রুশ অর্থনীতি চিন্তনে উন্নতি ক্ষেত্রে তাঁদের ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁরা হলেন নিকোলাই তুর্গেনেভ, পাভেল পেস্তেল এবং মিখাইল অরলোভ। তুর্গেনেভ নিজেকে স্মিথের শিষ্য বলে মনে করতেন, তরুণ পুশকিনের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠাতে তাঁর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তুর্গেনেভের 'কর তত্ত্ব সম্পর্কে প্রবন্ধমালা' বইয়ে (১৮১৮ সাল) স্মিথের মন্তব্যের উল্লেখ আছে বারবার। বইখানার শিরনামটা ছদ্ম; সেনসর ব্যবস্থার জন্যে এই নাম। আসলে এই বইয়ে ভূমিদাসপ্রথার সুতীব্র আর্থনীতিক, সামাজিক এবং রাজনীতিক সমালোচনা করা হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা — আর্থনীতিক আর রাজনীতিক স্বাধীনতার ধারণা স্মিথের সঙ্গে তুর্গেনেভের যোগসূত্র। অর্থশাস্ত্রকেই তুর্গেনেভ 'ইউরোপের জাতিগুলির নিয়মতান্ত্রিক স্বাধীনতা'র বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি বলে মনে করতেন।

স্মিথের মতো ডিসেম্ব্রিস্টরাও পুঁজিতন্ত্রের সচেতন সমর্থক ছিলেন না। তাঁরা মনে করতেন পুঁজিতন্ত্র হল সমানতা, স্বাধীনতা আর প্রগতির ব্যবস্থা। তাঁরা সেটার কোন-কোন নেতিবাচক দিকের উল্লেখ করেন শুধু ব্যতিক্রম হিসেবে। এটা দেখা যায় বিশেষত পেস্তেলের ধ্যান-ধারণায়।

স্মিথের ব্যক্তিত্ব

স্মিথের জীবন সম্বন্ধে আর বিশেষকিছু বলার নেই। 'জাতিসমূহের সম্পদ' প্রকাশিত হবার দু'বছর পরে, ডিউক বাক্লিউ এবং অন্যান্য প্রতিপত্তিশালী বন্ধুবান্ধব আর গুণমুগ্ধ ব্যক্তিদের চেষ্টায় তিনি একটা স্বাচ্ছন্দ্যের চাকরি পান: এডিনবারোতে স্কটিশ কাস্টম্‌স কমিশনারের পদ, মাইনে বছরে ছ'-শ' পাউন্ড। তখনকার দিনে এটা মোটা মাইনেই ছিল। স্মিথের বাদবাকি জীবনটা কেটেছিল কাস্টম্‌সে: শুল্ক আদায় তদারক করা, লণ্ডনের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান, চোরাই-চালানদার ধরার জন্যে মাঝে-মাঝে সৈন্য পাঠানো, এইসব ছিল তাঁর কাজ। এডিনবারোতে উঠে গিয়ে তিনি শহরের পুরানা মহল্লায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেন। আগের মতোই অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা চালিয়ে তিনি বেশকিছু টাকা খরচ করতেন পরোপকারে। দামী জিনিস তিনি রেখে যান একটামাত্র — বেশ বড় একটা লাইব্রেরি। স্মিথ একবার বলেছিলেন: 'আমি বাবুমানুষ সেটা শুধু আমার বইয়ে।'

স্মিথ যেটা পেয়েছিলেন এমন পদ আঠার শতকে দেওয়া হত শুধু স্বজনপোষণের ধরাধরির জোরে, এগুলো ছিল কাজকর্ম ছাড়া মহা আরামের চাকরি। তবে স্মিথ ছিলেন বিবেকবান, আচারনিষ্ঠায় তাঁর কিছুটা বাড়াবাড়ি ছিল, নিজের কাজকর্মকে তিনি গুরুত্ব দিয়েই দেখতেন, তাঁর বিস্তর সময় কাটত ডেস্কে। আর কোন গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের সম্ভাবনা রহিত হয়ে গিয়েছিল শুধু এরই ফলে (আর তার উপর ছিল বয়স এবং অসুস্থতা)। তাছাড়া, মনে হয় বৈজ্ঞানিক কাজ করার ইচ্ছাও তাঁর আর ছিল না। বড়রকমের তৃতীয় বই লেখার পরিকল্পনা তাঁর ছিল বটে প্রথমে, এটা হত সংস্কৃতি আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধারণ ইতিহাস। কিন্তু এই অভিপ্রায় তিনি ছেড়েছিলেন অচিরেই। জ্যোতির্বিদ্যা আর দর্শনের ইতিহাস, এমনকি ললিতকলা সম্বন্ধেও কিছু-কিছু আগ্রহজনক মন্তব্য পাওয়া গিয়েছিল তিনি মারা যাবার পরে; সেগুলি প্রকাশিত হয়। নিজ রচনার নতুন-নতুন সংস্করণ প্রকাশনের কাজে তাঁর বিস্তর সময় যেত। তাঁর 'নৈতিক অনুভব তত্ত্ব'-র ছ'টা সংস্করণ এবং 'জাতিসমূহের সম্পদ'-এর পাঁচটা সংস্করণ ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর জীবনকালে। 'জাতিসমূহের সম্পদ'-এর তৃতীয় সংস্করণে (১৭৮৪) স্মিথ কিছু-কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যোগ করেছিলেন,

বিশেষত 'বণিকতন্ত্র সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত' পরিচ্ছেদটি। বই-দুখানার বৈদেশিক সংস্করণগুলির উপরও তিনি নজর রাখতেন; তরজমা করে প্রকাশিত হয়েছিল দুটো ফরাসী, একটা জার্মান, একটা দিনেমার সংস্করণ; একটা ইতালীয় সংস্করণ প্রস্তুত করা হচ্ছিল। 'জাতিসমূহের সম্পদ' ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল আয়ার্ল্যান্ডে আর আমেরিকায়। 'জাতিসমূহের সম্পদ' প্রকাশিত হবার পরে প্রথম পঞ্চাশ বছরে বিভিন্ন সংস্করণের বইগুলো দিয়ে একটা ছোটখাটো পুরান বইয়ের দোকান ভরে যেতে পারত। প্রথম রুশ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮০২-১৮০৬ সালে। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লবের পরে চারটে সমেত মোট আটটা রুশ সংস্করণে প্রকাশিত হয় স্মিথের এই বইখানা।

স্কট্‌ল্যান্ডের রাজধানী এডিনবারো ছিল লন্ডনের পরে বৃটেনের দ্বিতীয় সংস্কৃতিকেন্দ্র; কোন-কোন দিক থেকে সেটা খাটো ছিল না লন্ডনের চেয়ে। অন্য দিকে, সেটা ছিল ছোট, অন্তরঙ্গ শহর। পুরান অভ্যাস অনুসারে স্মিথের ক্লাব ছিল এখানেও, তাতে তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন নিয়মিতভাবে। তাছাড়া, প্রতি রবিবার বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে খানা খেতেন। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ইউরোপে, তিনি হয়ে উঠেছিলেন যেন এডিনবারোতে দর্শনীয় কিছু। লন্ডন আর প্যারিস থেকে, বার্লিন আর সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে এসে যাত্রীরা এই স্কটিশ মহাজ্ঞানীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে চাইত।

স্মিথের চেহারা লক্ষণীয় ছিল না মোটেই। উচ্চতা ছিল গড় মাত্রার চেয়ে সামান্য বেশি; তিনি চলতেন সিধে হয়ে। সাদাসিধে মুখখানায় গঠন ছিল সুষম, ফেকাসে-নীল চোখ, সোজা নাকটা বড়। তিনি এমন পোশাক পরতেন যা লোকের নজরে পড়ে না। পরচুলো পরতেন শেষ অবধি। বাঁশের ছড়ি কাঁধে ফেলে হাঁটতে তিনি ভালবাসতেন। তিনি আপনমনে কথা বলতেন, সেটা এতই যাতে একবার রাস্তায় একজন ফেরিওয়ালী তাঁকে পাগল মনে করে পাশের একজনকে বলেছিল: 'হা ভগবান! আহা বেচারা! কিন্তু কাপড়-চোপড় তো খাসা!' তিনি ছিলেন অত্যন্ত অন্যমনস্ক। অন্যান্যের সঙ্গে ব্যবহারে তিনি ছিলেন সদাশয়, আলাপী। তাঁর সমসাময়িক একজন লিখেছেন (এতে থাকতে পারে কিছুটা অতিরঞ্জন): 'সঙ্গিদলের মধ্যে থেকে এমন অনুপস্থিত মানুষ আর দেখি নি; প্রকাণ্ড সঙ্গিদলের মাঝে বসে আছেন, ঠোঁট নড়ছে, কথা বলছেন আপনমনে, মুখে মৃদুহাসি। জাগরস্বপ্ন থেকে

জাগিয়ে যা নিয়ে আলাপ চলছে সেটার মধ্যে তাঁকে টেনে আনা হলে অমনি তাঁর মুখে খৈ ফুটতে থাকে, সেটা থামে না বিষয়টা সম্বন্ধে যা জানেন সবই বলে ফেলার আগে, আর তাতে যারপরনেই দার্শনিক বাচনভঙ্গি।'*

১৭৯০ সালের জুলাই মাসে সাতষট্টি বছর বয়সে স্মিথ মারা যান এডিনবারোতে। তার আগে প্রায় চার বছর ধরে তাঁর অসুস্থতা ছিল গুরুতর।

স্মিথের ছিল বিস্তর মানস সাহসিকতা, নাগরিক হিসেবে সাহসিকতাও ছিল কখনও-কখনও, কিন্তু তিনি লড়িয়ে ছিলেন না কোন দিক থেকেই। মানবিক গুণাবলি তাঁর ছিল; অবিচার নিষ্ঠুরতা আর জবরদস্তিতে তাঁর বিতৃষ্ণা ছিল, কিন্তু মোটামুটি সহজেই খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন সেগুলোর সঙ্গে। বিচারবুদ্ধি আর সংস্কৃতির বিজয়ে তাঁর বিশ্বাস ছিল, কিন্তু রূঢ় এই দুষ্ট দুনিয়ায় সেটার অদৃষ্ট সম্বন্ধে তাঁর ভয় ছিল খুবই। আমলাতান্ত্রিক কর্মকর্তাদের সম্বন্ধে তাঁর ছিল বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা, কিন্তু তেমনি একজন কর্মকর্তা হয়েছিলেন নিজেই।

গরিব মেহনতী মানুষের প্রতি, শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি স্মিথ খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। পারিশ্রমিক দিয়ে খাটানো লোককে যথাসম্ভব চড়া মজুরি দেবার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, কেননা তিনি বলতেন, 'সমাজের বৃহত্তর অংশটা গরিব এবং অসুখী থাকলে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারে না, সমাজ সুখী হতে পারে না।' নিজেদের শ্রম দিয়ে যারা গোটা সমাজটাকে চালায় তারা থাকবে গরিবির দশায় এটা অন্যায্য। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, সমাজে সবচেয়ে নিচে শ্রমিকদের স্থান 'স্বাভাবিক নিয়মে' পূর্বনির্দিষ্ট, তিনি ভাবতেন, 'মজুরের স্বার্থ সমাজের স্বার্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হলেও ঐ স্বার্থটা উপলব্ধি করতে কিংবা নিজ স্বার্থের সঙ্গে সেটার সংযোগ বুঝতে সে অপারক'।**

বুর্জোয়াদের উঠতি, প্রগতিশীল শ্রেণী হিসেবে ধরে স্মিথ বস্তুত তাদের স্বার্থ প্রকাশ করেন, তাদের বিস্তৃত দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ — সংকীর্ণ, সাময়িক স্বার্থগুলো নয়। কিন্তু নিজে অপেক্ষাকৃত নিম্ন-শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী হিসেবে

---

* C. R. Fay, 'Adam Smith and the Scotland of His Day', Cambridge, 1956, p. 79.

** A. Smith, 'The Wealth of Nations', Vol. I, London, 1924, p. 230.

তিনি খোদ পুঁজিপতিদের পছন্দ করতেন না মোটেই। তিনি মনে করতেন, মুনাফালালসা এদের বিচারবুদ্ধিহীন এবং নির্মম করে তোলে। লাভের জন্যে তারা সমাজের স্বার্থের বিরুদ্ধে করতে পারে না এমন কিছুই নেই। তাদের জিনিসপত্রের দাম বাড়াতে এবং তাদের শ্রমিকদের মজুরি কমাতে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে। অবাধ প্রতিযোগিতা সঙ্কুচিত এবং গণ্ডিবদ্ধ ক'রে সমাজের পক্ষে হানিকর একচেটে পয়দা করতে অবিরাম চেষ্টা করে শিল্পপতি আর বণিকরা।

সাধারণভাবে, স্মিথের বিবেচনায় পুঁজিপতি ছিল প্রগতির, 'জাতির সম্পদ' বৃদ্ধির স্বাভাবিক এবং নৈর্ব্যক্তিক হাতিয়ার। বুর্জোয়াদের স্বার্থ যে-পরিমাণে সমাজের উৎপাদন-শক্তি বিকাশের স্বার্থের সঙ্গে মেলে, শুধু সেই মাত্রায়ই স্মিথ তাদের সমর্থন করেন।

ডেভিড রিকার্ডো
'সিটি'* থেকে আগত মহাজ্ঞানী

লণ্ডন স্টক এক্সচেঞ্জের একজন ধনী কারবারি ১৭৯৯ সালে কোন সময়ে ছিলেন বাথ্ স্বাস্থ্যনিবাসে, সেখানে তাঁর স্ত্রীর জল-চিকিৎসা চলছিল। স্থানীয় সাধারণের গ্রন্থাগারে গিয়ে আপাতিকভাবেই অ্যাডাম স্মিথের 'জাতিসমূহের সম্পদ'-এর পাতা ওলটাতে-ওলটাতে বইখানা সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হয়ে সেটাকে তিনি নিজের ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে দিতে বলেন। অর্থশাস্ত্রে রিকার্ডো প্রথমে মনোযোগ দেন এইভাবে।

এই ঘটনা বলেছেন রিকার্ডো নিজেই, কিন্তু এটা চুটকি কথা; যেমন নিউটনের সেই আপেল কিংবা ওয়াটের কেট্‌লির গল্প। তিনি ছিলেন শিক্ষিত ব্যক্তি — স্মিথের বইখানার কথা তাঁর নিশ্চয়ই আগেই জানা ছিল। অর্থবিদ্যা বিষয়ে বিস্তৃত ব্যবহারিক জ্ঞান রিকার্ডোর ছিল আগে থেকেই; বিমূর্ত চিন্তন ক্ষমতাও ছিল কিছুটা, কেননা প্রকৃতি-বিজ্ঞানে তাঁর আগ্রহ ছিল। তবু বাথের ঐ গ্রন্থাগার একটা চাগানের কাজ করে থাকতে পারে নিশ্চয়ই।

রিকার্ডো টাকা করেই চলছিলেন, আর মণিকবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনো করতেন অবসর সময়ে। কিন্তু তাঁর প্রধান কাজ, তাঁর শখের খাটুনি তখন হয়ে দাঁড়াল অর্থশাস্ত্র। রিকার্ডোর সদগুণগুলির মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয়টা বোধহয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবল নিঃস্বার্থ অনুরাগ; অর্থ, পেশাগত সাফল্য কিংবা যশের জন্যে নয় — তাঁর বিজ্ঞান অধ্যয়ন ছিল অবিরাম আত্মপরায়ণতাবর্জিত সত্যানুসন্ধান। অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন তাঁর পক্ষে ছিল

* 'সিটি' — লণ্ডনের আর্থ-বাণিজ্য কেন্দ্র। — অনুঃ

একটা ভিতরকার, জৈব আবশ্যকতার মতো, নিজ প্রাণবন্ত স্বকীয়-মৌলিক ব্যক্তিত্ব প্রকাশের স্বাভাবিক উপায়। রিকার্ডো ছিলেন বিনীত, সারা জীবন তিনি নিজেকে মনে করে গেছেন বিজ্ঞানক্ষেত্রে অ্যামেচার গোছের বলে। তবে ইংলণ্ডের ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্র গড়ে তোলার কাজটা সমাধা করেন এই অ্যামেচারই।

অর্থনীতি-বিজ্ঞানক্ষেত্রে গবেষণার বিভিন্ন বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী গড়ে তোলাই রিকার্ডোর মস্ত অবদান। রিকার্ডোর কলম থেকে দেখা দিল যে 'নতুন বিজ্ঞান অর্থশাস্ত্র' তার কথা বলতেন তাঁর সমসাময়িকেরা; তাঁরা কিছু পরিমাণে সঠিক: সমাজের আর্থনীতিক ভিত্তি সম্বন্ধে জ্ঞানতন্ত্র হিসেবে বিজ্ঞানের বিশেষক উপাদানগুলি অর্থশাস্ত্রে দেখা দেয় সর্বপ্রথমে তাঁর রচনায়, সেটা ঠিকই। সমাজের বৈষয়িক সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে উৎপাদন আর বণ্টনের সবচেয়ে অনুকূল (সর্বোপযোগী) সামাজিক পরিবেশ কী, এই প্রশ্নটা অর্থনীতিবিদদের মন জুড়ে ছিল বরাবর, আর তার উত্তরটা বের করতে চেষ্টা করলেন রিকার্ডো। এই প্রশ্নে কতকগুলি ভাব-ধারণা তিনি ব্যক্ত করেন — সেগুলির তাৎপর্য বজায় রয়েছে আজও অবধি। তাঁর তত্ত্বীয় বিবেচনাধারার একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সেটার অদ্বৈতবাদ, অর্থাৎ আর্থনীতিক বাস্তবতার যাবতীয় বিচিত্র তথ্যাদির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যানের ভিত্তি হিসেবে একক সাধারণ ধারণার অস্তিত্ব। মহান পূর্বসূরি অ্যাডাম স্মিথের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে রিকার্ডো অর্থনীতিকে একটা যৌগিক ব্যবস্থা হিসেবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে এবং স্থিতির মূল উপাদানগুলি স্থির করতে চেষ্টা করেন। অর্থনীতিক্ষেত্রে রয়েছে বিভিন্ন বিষয়গত নিয়ম, আর আছে প্রাধান্যশালী ধারা হিসেবে এইসব নিয়মের সক্রিয়তা ঘটাবার কর্ম-বন্দোবস্ত — রিকার্ডোর এই প্রত্যয়ের সঙ্গে সেটা সংশ্লিষ্ট। অর্থনীতিতে 'আত্মনিয়মন কর্ম-বন্দোবস্ত' সংক্রান্ত প্রশ্নটার তত্ত্বীয় আর ব্যবহারিক গুরুত্ব এখনও বজায় রয়েছে। অর্থের পরিচলন আর ক্রেডিট, আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক সম্পর্ক, করাধান, ইত্যাদি স্পষ্ট-নির্দিষ্ট আর্থনীতিক ক্ষেত্রের বিকাশে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় এসেছে রিকার্ডোর রচনাগুলি। ভূমি-খাজনা এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ তত্ত্ব বিষয়ে রিকার্ডোর ব্যক্ত ভাব-ধারণা অর্থনীতি চিন্তা সম্পদ-ভাণ্ডারের উপাদান হয়ে রয়েছে। প্রগাঢ় তত্ত্ববিদ রিকার্ডো আবার তাঁর আমলের এবং তাঁর দেশের আর্থনীতিক সমস্যাবলির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। বিভিন্ন

আর্থনীতিক এবং সামাজিক প্রশ্নে তিনি ছিলেন নিপুণ তার্কিক এবং সুযোগ্য প্রবন্ধকার। বৈজ্ঞানিক নীতিবোধের যেসব সমুন্নত নীতি অনুসারে চলতেন রিকার্ডো সেগুলি শ্রদ্ধেয় এবং অনুকরণীয়।

রিকার্ডোর আমলে অর্থনীতিবিদের পেশা তখনও ছিল না, সেই কালের পক্ষেও এই বিজ্ঞানক্ষেত্রে তাঁর পথটা ছিল অসাধারণ, সেটা তাঁর সমসাময়িকদের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিল। তাঁর একজন অনুগামী ১৮২১ সালে লিখেছিলেন: 'এমনটা কি সম্ভব যে, একজন ইংরেজ, যিনি খাস বৈজ্ঞানিক মহলের কেউ নন, কিন্তু নানা বণিকতান্ত্রিক আর সামাজিক উদ্বেগে নিপীড়িত, তিনি যা সাধন করলেন সেটাকে ইউরোপের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং শতাব্দীব্যাপী চিন্তন এগিয়ে নিতে পারে নি এক-চুলও?'*

শিল্প-বিপ্লব

পঁচিশ বছর ধরে ইংলণ্ড যুদ্ধমান ছিল প্রায় অবিরাম। প্রথমে জ্যাকবিনদের সঙ্গে জেনারেল বোনাপার্টের সঙ্গে তারপর, আর শেষে সম্রাট নেপোলিয়নের সঙ্গে। ওয়াটার্লুর বিজয়ে যুদ্ধ শেষ হয় ১৮১৫ সালের গ্রীষ্মকালে। তখন ইংলণ্ডের জয়ের ফল উপভোগ করার সময় এল। ইংলণ্ডের বাণিজ্য স্তব্ধ করার আশায় নেপোলিয়ন চালু করেছিলেন মহাদেশীয় [রোধ] ব্যবস্থা — সেটা ভেঙে পড়ল। ইংলণ্ডের পণ্যদ্রব্যের জন্যে খুলে গেল ইউরোপীয় বাজার; এইসব পণ্যদ্রব্য তখন ছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে সেরা এবং সবচেয়ে রকমারি।

যুদ্ধ চালান হয়েছিল ইংলণ্ডের উপকূলগুলো থেকে বহু দূরে-দূরে — ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে, উপনিবেশগুলিতে, বারদরিয়ায়। সেটা ইংলণ্ডের ধনী হয়ে ওঠায় বাধা না হয়ে বরং আনুকূল্যই করে। আঠার শতকের শেষ তৃতীয়াংশ এবং উনিশ শতকের প্রথম তৃতীয়াংশ হল ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের যুগ। ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের পর্ব ছেড়ে পুঁজিতন্ত্র প্রবেশ করল যন্ত্রশিল্পের পর্বে। হস্তশিল্প কর্মশালার জায়গায় এল কল-কারখানা, তাতে

---

* M. Blaug, 'Ricardian Economics. A Historical Study', New Haven, 1958, p. V থেকে উদ্ধৃত।

নিযুক্ত শত-শত লোক। দেখা দিল বিষণ্ণ, ঝুল-কালিমাখা শহরগুলো: ম্যাঞ্চেস্টার, বার্মিংহাম, গ্লাস্‌গো... শিল্প-বিপ্লবের কেন্দ্রে ছিল সুতী-কাপড় শিল্প। এই শিল্পের জন্যে যন্ত্রপাতি আর জালানি যোগাবার শাখাগুলিও গড়ে উঠল। শুরু হল কয়লা আর লোহার যুগ। স্টীম হয়ে দাঁড়াল প্রধান চালকশক্তি। ১৮২২ সালে রিকার্ডো ইউরোপের মূলভূমিতে গিয়েছিলেন স্টীমারে; প্রথম স্টীম ইঞ্জিন দেখা দিয়েছিল তিনি মারা যাবার দু'বছর পরে।

বদলে যাচ্ছিল ইংলণ্ডের গ্রামাঞ্চল। কৃষকের স্বাধীন জোত-জমা কিংবা খাজনা-করা জোত-জমা আর থাকছিল না, সেগুলির জায়গায় আসছিল বড়-বড় তালুক এবং প্রজা-খামারীদের পুঁজিতান্ত্রিক খামার। গড়ে উঠছিল কৃষি প্রলেতারিয়েত, তারা ভরিয়ে তুলতে থাকল খনি শ্রমিক, মনিষ, রাজমিস্ত্রি আর কল-কারখানা শ্রমিকদের কাতার।

ইংলণ্ড ধনী হতে থাকল, কিন্তু এই সম্পদের সঙ্গে এল বণ্টনের অসমতা। শ্রেণীপ্রভেদ হয়ে উঠল আরও তীব্র এবং প্রকটিত। শ্রমিকদের পক্ষে সেটা হল বিকট নির্মম দুনিয়া, যেটা স্তম্ভিত করেছিল তরুণ এঙ্গেলসকে, যখন তিনি প্রথম ইংলণ্ডে যান ১৮৪২ সালে। কর্মদিনের দৈর্ঘ্য ছিল ১২-১৩ ঘণ্টা, কোন-কোন ক্ষেত্রে আরও বেশি। মজুরি যা ছিল তাতে উপোসী না থাকার মতো খাদ্য জুটত কোনমতে। বেকার কিংবা অসুস্থ হলে শ্রমিক এবং তার পরিবারের অনশন ছিল অবধারিত। যন্ত্রপাতি থাকায় কল-কারখানা মালিকেরা নারী আর অপ্রাপ্তবয়স্কদের আরও সস্তা শ্রম কাজে লাগাতে পারত — বিশেষত টেক্সটাইল শিল্পে।

শ্রমিকদের যেকোন সমিতি কিংবা ইউনিয়ন আইনত নিষিদ্ধ ছিল, সেটা বিদ্রোহ বলে গণ্য হত। এই নিদারুণ অবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রথম-প্রথম বিক্ষোভপ্রকাশগুলি হত হতাশা আর প্রচণ্ড ক্রোধের স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ। যন্ত্রপাতিকেই সব দুর্দশার মূল বলে অতি-সরল বিশ্বাসে ধরে নিয়ে লুডাইট্‌-রা যন্ত্র ভাঙত। ১৮১১-১৮১২ সালে তাদের আন্দোলন বেশ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। এইসব বেপরোয়া মানুষের সমর্থনে লর্ডসভায় বলেছিলেন একা, একমাত্র বায়রন। রিকার্ডো অবশ্য লুডাইট্‌দের কাজকর্ম সমর্থন করতে পারেন নি, কিন্তু শ্রমিক ইউনিয়ন আইনী করার জন্যে তিনি লড়েছিলেন, আর যন্ত্র ব্যবহারের সামাজিক ফলাফল সম্বন্ধে নিজ রচনায় স্থিরমস্তিষ্ক বিশ্লেষণ দেন সর্বপ্রথমে তিনিই। ১৮১৯ সালে

পিটার্সফিল্ড মহল্লায় ম্যাঞ্চেস্টারের শ্রমিকদের প্রকাণ্ড বিক্ষোভমিছিলের উপর সৈন্যরা গুলি চালায়। সমসাময়িকেরা এই ব্যাপক নরহত্যাটাকে অবজ্ঞাভরে উপহাস করে বলতেন 'পিটার্লু-র বিজয়' (ওয়াটার্লু সম্বন্ধে ইঙ্গিত)।

তবে তখনও, উনিশ শতকের গোড়ায় বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যকার শ্রেণীবৈর নয় সমাজের প্রধান বিরোধ, যা নির্ধারণ করে সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক আর ভাবাদর্শ। বুর্জোয়ারা তখনও ছিল উঠতি শ্রেণী, আর সাধারণভাবে বুর্জোয়াদের স্বার্থ মিল খেত উৎপাদন-শক্তি বিকাশের স্বার্থের সঙ্গে। শ্রমিক শ্রেণী তখনও ছিল কমজোর, অসংগঠিত। সামাজিক সম্পর্ক এবং রাজনীতিক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণী ছিল বিষয়ী নয়, বরং বিষয়।

বুর্জোয়াদের স্বার্থ অপেক্ষাকৃত বেশি বিপন্ন হচ্ছিল ভূস্বামীদের হামলার দরুন। শস্যের বর্ধিত দামের ফলে ভূস্বামীরা ভূমি-খাজনা পেত আরও বেশি, আর যুদ্ধের পরে তারা টোরি পার্লামেন্টে **শস্য আইন** পাস করিয়ে নিতে পেরেছিল, তাতে ইংলণ্ডে বিদেশের শস্যের আমদানি খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, রুটির চড়া দাম বজায় রাখতে সুবিধে হয়েছিল। কল-কারখানা মালিকদের পক্ষে এটা ছিল অলাভজনক, কেননা শ্রমিকদের উপোসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে তারা মজুরি বেশি দিতে বাধ্য হত তার ফলে। উনিশ শতকের গোটা প্রথমার্ধ জুড়ে শস্য আইন নিয়ে লড়াইটা ছিল ইংলণ্ডের রাজনীতিক জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান; অর্থনীতিবিদদের তত্ত্বীয় মতাবস্থান অনেকাংশে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল এই লড়াই দিয়ে। এই লড়াইয়ে ভূস্বামীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু পরিমাণে দাঁড়িয়েছিল শিল্পক্ষেত্রের বুর্জোয়া আর শ্রমিক শ্রেণীর যৌথ স্বার্থ।

রিকার্ডোর মতবাদ গড়ে উঠেছিল এবং ইংলণ্ডের ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায় সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছিল এই ঐতিহাসিক পটভূমিতে। মূল সামাজিক-আর্থনীতিক সমস্যাগুলিকে, বিশেষত পুঁজি আর শ্রমের মধ্যে সম্পর্কটাকে রিকার্ডো অত বৈজ্ঞানিক-বিষয়ানুগতা এবং অপক্ষপাতের সঙ্গে বিশ্লেষণ করতে পারলেন কিভাবে সেটা বোঝা যায় অংশত এই পটভূমি থেকে। এতে মনীষী রিকার্ডোর ব্যক্তিত্বেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল স্বভাবতই।

অর্থনীতিবিদ — সেটা কে? — যার পকেটে নেই একটা পেনি-ও, যে অন্যান্যকে এমন পরামর্শ দেয় যেটা অনুসারে চললে তাদের পকেটে পেনিটিও আর থাকে না। — এই মর্মে ইংরেজদের মধ্যে একটা রসিকতা চালু আছে। তবে সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম থাকে। রিকার্ডো প্রচুর ধন-দৌলত রাশীকৃত করেছিলেন, আর বন্ধুবান্ধবদের, বিশেষত ম্যালথাসকে তিনি টাকা খাটাবার এমন সুপরামর্শ মাঝে-মাঝে দিতেন যাতে তাঁদের অসন্তোষের কোন কারণ ঘটে নি।

রিকার্ডোর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন স্পেনীয় ইহুদি, তাঁরা ইনকুইজিশনের নির্যাতন এড়াবার জন্যে পালিয়ে হল্যান্ডে গিয়ে সেখানে স্থায়িভাবে বসবাস করেন। এই মহান অর্থনীতিবিদের বাবা আঠার শতকের সপ্তম দশকে ইংলন্ডে গিয়ে প্রথমে পাইকারী কেনা-বেচার ব্যবসা করেন, পরে হুণ্ডি আর সিকিউরিটির কারবার ধরেন। তাঁর সতরটি ছেলে-মেয়ের মধ্যে ডেভিড তৃতীয়। ১৭৭২ সালের এপ্রিল মাসে ডেভিডের জন্ম হয় লন্ডনে। একটা সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার পরে ডেভিডকে দু'বছরের জন্যে পাঠান হয় আমস্টার্ডামে, সেখানে খুড়োর দপ্তরে ব্যবসা-বাণিজ্যের আটঘাট শেখা শুরু হয়।

দেশে ফেরার পরে ডেভিডের পড়াশুনো চলেছিল অল্পকাল, কিন্তু প্রণালীবদ্ধ শিক্ষালাভ শেষ হয়ে যায় চোদ্দ বছর বয়সে। গৃহশিক্ষকের কাছে শিক্ষণ চলতে দিয়েছিলেন তাঁর বাবা। কিন্তু অচিরেই দেখা যায়, তাঁর বাবার বিবেচনায় যা ব্যবসায়ীর পক্ষে আবশ্যক সেটা ছাপিয়ে ছিল এই তরুণের আগ্রহের পরিধি। এতে তিনি অসন্তুষ্ট হন, পড়াশুনো বন্ধ হয়ে যায়। ষোল বছর বয়সেই ডেভিড দপ্তরে এবং স্টক এক্সচেঞ্জে বাবার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহকারী হয়ে ওঠেন। তিনি পরিণত হয়ে উঠেছিলেন বয়সের মাত্রা ছাপিয়ে। তিনি ছিলেন পর্যবেক্ষণে দৃঢ়, তীক্ষ্মবুদ্ধি, কর্মচঞ্চল, তাই তিনি অচিরেই স্টক এক্সচেঞ্জ এবং 'সিটি'-র কারবারী দপ্তরগুলিতে সবার নজরে পড়েন। তাঁর বাবা তাঁকে স্বাধীনভাবে করার কার্যভার দিতে শুরু করেন।

তবে বাপের স্বেচ্ছাচার আর রক্ষণশীলতা বরদাস্ত হয় না এমন মানুষের। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি ছিলেন উদাসীন, কিন্তু বাড়িতে ইহুদি ধর্মের সমস্ত

গোঁড়ামি মেনে চলতে হত, সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান করতে হত। বিরোধটা এসে গেল প্রকাশ্যে যখন রিকার্ডো বাবাকে জানিয়ে দিলেন তিনি একটি খ্রিস্টান মেয়েকে বিয়ে করতে মনস্থ করেছেন। এই তরুণীর বাবা ছিলেন একজন কোয়েকার চিকিৎসক; বড় রিকার্ডোর মতো একই ধরনের ঘরোয়া জালিম। উভয় পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে হল। খ্রিস্টান মেয়ে বিয়ে করে রিকার্ডো ইহুদি সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কৃত হলেন। কোয়েকার না হয়ে তিনি বেছে নেন ইউনিটারিয়ানিজম [একেশ্বরবাদ], যেটা ছিল সরকারী অ্যাংলিকান চার্চ থেকে বেরিয়ে-যাওয়া সেক্টগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মুক্ত, সবচেয়ে নমনীয়। খুব সম্ভব এটা ছিল তাঁর নাস্তিকতার উপর একটা শোভন আবরণ মাত্র।

রোম্যান্টিক ব্যাপারটার সুখী পরিসমাপ্তি ঘটল, কিন্তু তার উপর পড়তে পারত গরিবির কালো ছায়া, কেননা এই নবদম্পতি বাপ-মায়েদের কাছ থেকে কেউ কিছুই পেলেন না স্বভাবতই। আর পঁচিশ বছর বয়সেই রিকার্ডো হন তিনটি সন্তানের বাপ (তাঁর সন্তান ছিল শেষে মোট আটটি)। স্টক এক্সচেঞ্জে ফটকাখেলা ছাড়া কোন বৃত্তি তাঁর জানা ছিল না, সেই কাজই তিনি ধরলেন, তবে এবার বাপের সহকারী হিসেবে নয়, স্বাধীনভাবে। তাঁর বরাত ছিল ভাল, তায় ছিল নানা আলাপ-পরিচয়, সুখ্যাতি আর সামর্থ্যের আনুকূল্য। বছর পাঁচেক পরেই তিনি হয়ে দাঁড়ান মস্ত ধনী ব্যক্তি, তখন তিনি চালাতে থাকেন বড়-বড় কাজ-কারবার।

বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশের স্টক এক্সচেঞ্জে আজকাল প্রধানত বড়-বড় বেসরকারী কম্পানিগুলোর শেয়ার কেনা-বেচা হয়। আঠার শতকের শেষের দিকে জয়েন্ট-স্টক কম্পানি ছিল খুবই কম। ব্যাঙ্ক অভ্ ইংলন্ড, ঈস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি এবং অন্যান্য কম্পানির শেয়ার নিয়ে লেন-দেন ছিল স্টক এক্সচেঞ্জের কাজ-কারবারের নগণ্য ভগ্নাংশ, তাতে রিকার্ডো বড় একটা অংশগ্রহণ করতেন না। আরও অনেক চতুর কারবারির মতো তাঁরও সোনার খনিটা ছিল জাতীয় ঋণ এবং রাষ্ট্রীয় ঋণ বন্ডের সঙ্গে জড়িত লেন-দেন। যুদ্ধের প্রথম দশ বছরে — ১৭৯৩ থেকে ১৮০২ সালে — গ্রেট বৃটেনের নিহিত ঋণ ২৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ড থেকে বেড়ে হয়েছিল ৫৬ কোটি ৭০ লক্ষ পাউন্ড, আর ১৮১৬ সাল নাগাদ পরিমাণটা দাঁড়িয়েছিল ১০০ কোটি পাউন্ডের বেশি। তার উপর লন্ডনে চালু করা হয়েছিল বৈদেশিক ঋণ। নানা আর্থনীতিক আর রাজনীতিক উপাদানের

প্রভাবে বণ্ডের দাম ওঠাপড়া করত। সেই বাজার-দর নিয়ে ফটকাবাজি হল এই তরুণ ব্যবসায়ীর ধন-দৌলতের প্রধান উৎপত্তিস্থল।

রিকার্ডোর সমসাময়িকেরা বলেছেন, তাঁর ছিল আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতা আর সহজজ্ঞান, দ্রুত সাড়া দেবার ক্ষমতা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল সাবধানতা। তিনি কখনও আত্মহারা হন নি, উপস্থিতবুদ্ধি আর সুস্থির বিচারশক্তি হারান নি কখনও। যথাসময়ে বেচার কায়দাটা তিনি জানতেন: কখনও-কখনও প্রত্যেকটা বণ্ডে অল্প লাভেই কাজ করতেন, আর মোটা মুনাফা করতেন বড়-বড় লেন-দেনের সময়ে।

ধনী অর্থপতিরা ছোট-ছোট জোট বেঁধে সদ্য-চালু-করা ঋণে অর্থ বিনিয়োগের কণ্ট্র্যাক্ট বাগিয়ে নিত সরকারের কাছ থেকে। সোজা কথায়, নতুন ঋণের সমস্ত বণ্ড সরকারের কাছ থেকে পাইকারী কিনে নিয়ে তারা সেগুলোকে খুচরো বিক্রি করত। এইসব কারবার থেকে লাভের পরিমাণ হত বিপুল, যদিও মস্ত ঝুঁকিও থাকত কখনও-কখনও: বণ্ডের দাম হঠাৎ পড়ে যেতে পারত। রাজস্ব বিভাগের আয়োজিত নিলামে যাদের ডাক হত সবচেয়ে চড়া সেই অর্থপতিজোট পেত ঋণটা। ১৮০৬ সালে রিকার্ডো এবং অন্য দু'জন ব্যবসায়ীর ডাক নিলামে টেকে নি, ঋণটা পেয়েছিল অন্য একটা জোট। তার পরের বছর রিকার্ডো এবং তাঁর জোট ২ কোটি পাউণ্ডের ঋণের কণ্ট্র্যাক্ট পান। তারপরের দশ বছরে প্রত্যেকটা নিলামে তিনি ডাকতেন এবং কতকগুলি ঋণ চালু করেছিলেন।

১৮০৯-১৮১০ সাল নাগাদ ডেভিড রিকার্ডো হয়ে দাঁড়ান লণ্ডনের অর্থ-জগতে সবচেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন। তিনি লণ্ডনের সবচেয়ে অভিজাত মহল্লায় খুবই ব্যয়বহুল একটা শৌখিন বাড়ি কেনেন, তারপর গ্লস্টারশায়ারে গ্যাটকোম্ব পার্কে কেনেন একটা তালুক, সেখানে করেন নিজের পল্লীভবন। তারপর থেকে রিকার্ডো ব্যবসায় জগতে সক্রিয় জীবন থেকে ক্রমে-ক্রমে সরে গিয়ে হয়ে দাঁড়ান মস্ত ভূস্বামী, তখন তাঁর বাঁধা আয় হতে থাকে ভূমি, বণ্ড, ইত্যাদি থেকে। তখন তাঁর বিত্ত-সম্পত্তির পরিমাণ দশ লক্ষ পাউণ্ড, সেটা তখনকার দিনের পক্ষে প্রচুরই বটে।

এই হল কৃতী অর্থপতি, চতুর ব্যবসায়ী এবং মুনাফা-বীরটির জীবনী। আর বিজ্ঞানের বেলায়?

এই স্টক এক্সচেঞ্জের চতুর ওস্তাদ এবং সম্মানীয় গৃহকর্তাটির মন ছিল খুবই অনুসন্ধিৎসু, তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা মিটত না কিছুতেই। ছাব্বিশ বছর

বয়সে রিকার্ডো আর্থিক ব্যাপারে স্বাধীন হয়েছিলেন, এমনকি কিছুটা ধন-সম্পদও তাঁর জমেছিল, তখন তিনি হঠাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন-কোন শাখায় মন দিলেন, যেগুলি তিনি আগে অধ্যয়ন করতে পারেন নি পরিস্থিতির ফেরে: প্রকৃতি-বিজ্ঞান আর গণিত। কী তীব্র বৈসাদৃশ্য! সকালে স্টক এক্সচেঞ্জে আর দপ্তরে — ব্যবসায়ী, নিজ বয়স ছাপিয়ে ধীর-স্থির স্থৈর্যশীল মানুষটি, আর সন্ধ্যায় বাড়িতে অমায়িক উদ্যমী-উৎসাহী যুবক সরল গর্বভরে আত্মীয় স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের দেখাচ্ছেন বিদ্যুৎ নিয়ে পরীক্ষা আর মণিক-সংগ্রহ।

এইসব অধ্যয়নের প্রভাবে বিকশিত হয়েছিল রিকার্ডোর প্রখর ধীশক্তি। তাঁর আর্থনীতিক রচনাগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় এসেছিল যেসব গুণ সেগুলি গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছিল ঐ অধ্যয়ন: তাঁর চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সেটা ছিল যথাযথ, অতি সুস্পষ্ট, তাতে যুক্তির ধরনটা ছিল প্রায় গাণিতিক, বড় বেশি সাধারণ যুক্তি-তর্ক তাতে ছিল না-পছন্দ। একটা বিজ্ঞান হিসেবে অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে রিকার্ডো সংস্রবে আসেন এই সময়ে। তখনও স্মিথের মতবাদের আধিপত্য চলছিল। তাঁর প্রভাব পড়ল রিকার্ডোর উপর, এটা অনিবার্যই ছিল। তবু ম্যালথাসের প্রবল ছাপ পড়ল তাঁর মনে, ম্যালথাসের 'Essay on the Principle of Population' ('জনসংখ্যা তত্ত্ব প্রসঙ্গে নিবন্ধ') প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৯৮ সালে। পরে, ম্যালথাসের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয় হবার পরে রিকার্ডো তাঁকে লিখেছিলেন এই বইখানা প'ড়ে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর ভাব-ধারণা 'এতই স্পষ্ট এবং এতই সন্তোষজনকভাবে বিবৃত হয়েছে যাতে সেগুলি আমার মনে যে-আগ্রহ জাগিয়েছে সেটা অ্যাডাম স্মিথের বিখ্যাত রচনা যে-আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল শুধু সেটার চেয়েই খাটো'।*

উনিশ শতকের গোড়ায় লণ্ডনে দেখা দেন জেম্‌স মিল নামে তরুণ স্কট্; বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক প্রশ্নে তাঁর রচনাগুলি নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ চলতে থাকে। তাঁর সঙ্গে রিকার্ডোর আলাপ-পরিচয় হয়, সেটা অচিরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়ে বজায় ছিল রিকার্ডোর যাবজ্জীবন। প্রথমে মিলের ছিল পরামর্শদাতার ভূমিকা। রিকার্ডোকে তিনি নিয়ে যান

---

* J. H. Hollander, 'David Ricardo. A Centenary Estimate', Baltimore, 1910, pp. 47-48 থেকে উদ্ধৃত।

বিদ্বজ্জন আর লেখকদের একটা মহলে, তাঁর প্রথম-প্রথম রচনাগুলির প্রকাশনে উৎসাহ যোগান। একদিক থেকে দেখলে, পরস্পরের ভূমিকা পরে উলটে যায়। রিকার্ডোর প্রধান রচনাগুলি বেরবার পরে মিল হন তাঁর শিষ্য এবং অনুগামী। তিনি নিজ রচনায় রিকার্ডোর মতবাদের সবচেয়ে মজবুত দিকগুলোকে বিকশিত করেন নি কিংবা সমালোচকদের বিরুদ্ধে সমর্থন করেন নি সবচেয়ে ভালভাবে, সেটা আসলে রিকার্ডোর আর্থনীতিক মতবাদ ভেঙে পড়ার হেতু উপাদানগুলোর একটা — এসবই ঠিক। তবু মিলের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে দুটো ভাল কথাও থাকা চাইই: রিকার্ডোর স্বাভাবিক ক্ষমতার সাচ্চা গুণমুগ্ধ মিল রিকর্ডোকে লিখতে, অদলবদল করতে, প্রকাশ করতে তাগিদ দিতেন অবিরাম। কখনও-কখনও তাঁর ভূমিকাটা হত কোন প্রহসনের চরিত্রের মতো কিছুটা: রিকার্ডোকে তিনি 'টাস্ক্' দিয়ে তার ফলাফল সম্বন্ধে 'বিবরণ' চাইতেন। ১৮১৫ সালের অক্টোবর মাসে তিনি রিকার্ডোর কাছে লিখেছিলেন: 'আপনার বইখানা নিয়ে কাজ কেমন এগচ্ছে তার কিছু বিবরণ আমাকে দেবার মতো অবস্থায় আপনি ইতোমধ্যে এসে গেছেন আশা করি। কাজটা করতে আপনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেই আমি এখন বিবেচনা করছি।'*

কোন-কোন কৃতী ব্যক্তির পক্ষে এমন বন্ধু বড়ই প্রয়োজনীয়!

রচনার ব্যাপারে ভীরুতার দরুন রিকার্ডোর নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাসের কমি ছিল বরাবর। যে-কর্তব্যজ্ঞান আর 'নিষ্ঠা' স্মিথের ছিল বহু বছর ধরে তাঁর বইখানা লেখার সময়ে, তাও রিকার্ডোর ছিল না। ব্যবসা-কারবারের বাইরে রিকার্ডো ছিলেন নরম, এমনকি কিছুটা লাজুক প্রকৃতির মানুষ। অন্যান্যের সঙ্গে সংস্রবে তাঁর দৈনন্দিন জীবনে সেটা দেখা যায়। ১৮১২ সালে তিনি কেম্ব্রিজে গিয়েছিলেন, সেখানে তাঁর ছেলে ওস্‌মান তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষে। চল্লিশ বছর বয়সের এই ধনী এবং সম্মানিত মানুষটি সেই অনভ্যস্ত পরিবেশে অস্বস্তি বোধ করেছিলেন, জবুথবু হয়ে পড়েছিলেন। এই সফর সম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে লেখা একখানা চিঠিতে তিনি বলেছিলেন: 'ওস্‌মানের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারি এমন কিছু উপযোগী লোক যোগাড় করতে যাতে যথাসম্ভব আনুকূল্য

---

* D. Ricardo, 'The Works and Correspondence', Vol. 6, Cambridge, 1952, p. 309 থেকে উদ্ধৃত।

করতে পারি সেজন্যে আমার স্বভাবে যাকিছু ভীতু আর অমিশুক ভাব আছে সেগুলো অতিক্রম করতে আমি চেষ্টা করছি।'

দ্বারদেশে: অর্থ পরিচলন-সংক্রান্ত প্রশ্ন

মার্কস লিখেছেন, ১৮৪৪ আর ১৮৪৫ সালের ব্যাঙ্ক আইন নিয়ে পার্লামেণ্টে বিতর্কে (হবু প্রধানমন্ত্রী) গ্ল্যাডস্টোন একবার বলেছিলেন, অর্থ সম্বন্ধে দার্শনিকতাগিরি যত লোককে বোকা বানিয়েছে, এমনকি প্রেমও তত লোককে বোকা বানায় নি।*

অর্থ তত্ত্ব হল অর্থনীতি-বিজ্ঞানের সবচেয়ে জটিল ক্ষেত্রগুলোর একটা। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংলণ্ডে অর্থ আর ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত প্রশ্ন ছিল আবেগচঞ্চল তর্ক-বিতর্ক আর বিভিন্ন পার্টি এবং শ্রেণীর স্বার্থ-সংঘাতের কেন্দ্রস্থলে। ক্রেডিট আর অর্থ নিয়ে কাজ-কারবারে ওয়াকিবহাল রিকার্ডো অর্থনীতিবিদ এবং প্রবন্ধকার হিসেবে নিজ শক্তি পরখ করতে নামলেন প্রথমে এই রঙ্গভূমিতে সেটা স্বাভাবিকই। তখন তাঁর বয়স সাঁইত্রিশ।

১৭৯৭ সালে ব্যাঙ্ক অভ্ ইংলণ্ড-কে সেটার নোটের বদলে সোনা দেওয়া বন্ধ করতে দেওয়া হয়েছিল। নোট্‌গুলো হয়ে দাঁড়াল অবিনিময়ে কাগজী মুদ্রা। ১৮০৯-১৮১১ সালে প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধে আর পুস্তিকায় রিকার্ডো দেখালেন এই কাগজী মুদ্রার হিসাবে সোনার বাজার-দর বৃদ্ধিটা হল অতিরিক্ত পরিমাণে ছাড়ার দরুন সেটার অবচয়ের ফল এবং লক্ষণ। তাঁর প্রতিপক্ষীয়রা বললেন, সোনার দাম বাড়ল অন্যান্য কারণে, বিশেষত বিদেশে রপ্তানির জন্যে সোনার চাহিদার দরুন। নিপুণ তার্কিক এবং প্রবন্ধকার যিনি খুবই যুক্তিসম্মত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ধরনে বক্তব্য হাজির করতে পারেন — রিকার্ডোর এই প্রতিভা প্রকাশ পেল ঐসব রচনায়। এটা কেতাবী আলোচনা ছিল না মোটেই। নোট্‌গুলোর অবচয়ের ব্যাপারটা যার অস্বীকার করছিল তাদের পিছনে ছিল ব্যাঙ্ক অভ্ ইংলণ্ডের পরিচালকেরা, পার্লামেণ্টে রক্ষণশীল সংখ্যাগুরু পক্ষ, মন্ত্রীরা এবং গোটা 'যুদ্ধ পার্টি'। আখেরী বিচারে এটা ছিল ভূস্বামীদের শ্রেণীস্বার্থের প্রকাশ; যুদ্ধ আর মুদ্রাস্ফীতির ফলে তাদের আয় হচ্ছিল বেশি। অন্য দিকে, যেমন

---

* কার্ল মার্কস, 'অর্থশাস্ত্রের পর্যালোচনা নিবন্ধ', মস্কো, ১৯৭০, ৬৮ পৃঃ।

পরবর্তী সমগ্র ক্রিয়াকলাপে তেমনি তখনও রিকার্ডো ছিলেন শিল্পক্ষেত্রের বুর্জোয়াদের প্রবক্তা; এই বুর্জোয়াদের ভূমিকা তখন ছিল প্রগতিশীল। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন 'শান্তি পার্টি' হুইগ্ (উদারপন্থী) প্রতিপক্ষের কাছাকাছি।

অর্থ পরিচলনের বিদ্যমান ব্যবস্থার সমালোচনা করেই রিকার্ডো ক্ষান্ত দেন নি। তিনি প্রস্তুত করেছিলেন একটা নির্দিষ্ট আকারের কর্মসূচি, সেটাকে তিনি কোন-কোন পরবর্তী রচনায় আরও পূর্ণাঙ্গ করে তোলেন। তাঁর উপস্থাপনাটা ছিল এমন অর্থব্যবস্থা যেটা পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি উন্নয়নের চাহিদা মেটাতে পারে যথাসম্ভব। এখানে বলা দরকার, রিকার্ডোর ভাব-ধারণাগুলিকে অনেকাংশে বলবৎ করা হয় উনিশ শতকে। ১৮১৯ থেকে ১৯১৪ সাল অবধি ইংলণ্ডে স্বর্ণমান চালু ছিল।

এইসব ভাব-ধারণা ছিল সংক্ষেপে নিম্নলিখিতরূপ: ১) সুস্থিত অর্থ পরিচলন হল আর্থনীতিক বৃদ্ধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত; ২) স্বর্ণভিত্তিক অর্থব্যবস্থা স্বর্ণমানের ভিত্তিতেই শুধু সম্ভব এই সুস্থিতি; ৩) যত সোনা পরিচলনে থাকে তার প্রধান অংশটা কিংবা সবটারই জায়গায় আনা যেতে পারে নির্দিষ্ট হারে সোনার সঙ্গে বিনিমেয় কাগজী মুদ্রা, তাতে মস্ত সাশ্রয় হয় জাতির। ব্যাঙ্ক অভ্ ইংলণ্ড তখন ছিল বেসরকারী কম্পানি, সেটার নোট্ ছাড়ার এবং রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কেড়ে নেবার প্রস্তাব রিকার্ডো তুলেছিলেন তাঁর অসম্পূর্ণ শেষ রচনায়। তিনি বলেছিলেন, এই উদ্দেশ্যে একটা জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। তখনকার দিনের পক্ষে প্রস্তাবটা ছিল খুবই সাহসিক।

ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রের শক্তি আর দুর্বলতা দুইই প্রকাশ পেয়েছিল রিকার্ডোর অর্থ তত্ত্বে। অর্থ তত্ত্বটাকে তিনি দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছিলেন শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বের ভিত্তিতে, কিন্তু তাতে তাঁর সামঞ্জস্য ছিল না, আর বিভিন্ন নির্দিষ্ট আর্থনীতিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে তিনি সেটাকে প্রকৃতপক্ষে বাতিল করেই দিয়েছিলেন।

তাত্ত্বিক বিচারে, সমস্ত পণ্যের মতো স্বর্ণমুদ্রার মূল্যও নির্ধারিত হয় সেটা পয়দা করতে আবশ্যক শ্রমব্যয় দিয়ে। পণ্য আর অর্থ পরিচলনে পড়ার সময়ে দুয়েরই নির্দিষ্ট মূল্য থাকে। তার মানে, কোন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যের পরিচলন বজায় রাখতে হলে একটাকিছু পরিমাণ অর্থ থাকা চাই। যেমন ধরা যাক, পণ্যের মোট বার্ষিক পরিমাণ যদি হয় গড়

শ্রমের ১০০ কোটি কর্মদিনের সমতুল, আর এক-গ্রাম্ সোনায় যদি অঙ্গীভূত থাকে একটা কর্মদিন, তাহলে ১০০ কোটি গ্রাম্ সোনা দরকার পরিচলনের জন্যে। কিন্তু যদি ধরি প্রতি গ্রাম্ সোনা বছরে দশটা লেন-দেনে খাটে, সেটার পরিচলন ঘটে দশ বার, তাহলে এক-দশমাংশ সোনাই যথেষ্ট: ১০ কোটি গ্রাম্। তার উপর, ক্রেডিটে কাজ-কারবার চালিয়ে বাঁচান যায় সোনার একাংশ। মোটামুটি এই ধারণাটাই পরে বিবৃত করেন মার্কস।

কিন্তু রিকার্ডো এই যুক্তিধারা অনুসারে চলেন নি। কোন একটা দেশে পরিচলনে থাকতে পারে যেকোন পরিমাণ সোনা, সেটা যেভাবেই আসুক না কেন, এমনটা ধরে নিয়েই তিনি এগিয়েছিলেন। কোন একটা পরিমাণ পণ্যে পরিচলনের অবস্থায় থাকে কোন একটা পরিমাণ অর্থ — ব্যাপারটা স্রেফ এই, আর এইভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায় পণ্যের দাম। স্বর্ণমুদ্রা বেশি থাকলে দাম চড়ে, আর দাম পড়ে স্বর্ণমুদ্রা যদি হয় কম। এই হল মাত্রিক অর্থ তত্ত্ব, যেটা আগেই জানা আছে হিউমের কাছ থেকে। হিউমের থেকে রিকার্ডোর পার্থক্য এই যে, তিনি (রিকার্ডো) এটাকে শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বভাবতই তাতে কিছু সুরাহা হয় নি।

রিকার্ডোর চিন্তাধারার উপর চেপে ছিল অবিনিমেয় কাগজী মুদ্রা পরিচলন-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার বোঝাটা। কাগজী মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা নির্ধারিত হয় প্রধানত সেটার পরিমাণ দিয়ে। এই মুদ্রা যতই ছাড়া হোক না কেন, সেটা সবসময়েই পরিচলনের জন্যে আবশ্যক পূর্ণ-মূল্যের স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণের সমতুল। যেমন, ধরা যাক, যখন সোনার ডলারের চেয়ে কাগজী ডলারের পরিমাণ দ্বিগুণ হয় তখন প্রত্যেকটা কাগজী ডলারের দাম অর্ধেক হয়ে যায়।

কিন্তু কাগজী মুদ্রা পরিচলনের ব্যাপারটাকে রিকার্ডো আপনা থেকেই সোনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন কেন? তার কারণ দুয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটা ধরতে না পেরে তিনি সোনাকে মূল্যেরও প্রতীক বলে মনে করেন। অর্থকে তিনি শুধু পরিচলনের উপায় বলেই ধরেন, অর্থের জটিল এবং বহুধা কর্ম তিনি বিবেচনায় ধরেন নি।

রিকার্ডো ভেবেছিলেন, আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উঠতি-পড়তির কারণ বুঝবারও উপায় হতে পারবে তাঁর অর্থ তত্ত্ব। তিনি যুক্তি দেখান নিম্নলিখিতরূপে। কোন একটা দেশের খুব বেশি সোনা

থাকলে পণ্যের দাম বাড়ে, বিদেশ থেকে মাল আমদানি করাটা হয়ে দাঁড়ায় লাভজনক। দেশটির বাণিজ্যিক স্থিতিতে ঘাটতি দেখা দেয়, সেটা মেটাতে হয় সোনা দিয়ে। দেশ থেকে সোনা চলে যায়, দাম পড়ে, বিদেশের মাল আসা তখনকার মতো বন্ধ হয়ে যায়, আবার স্থিতি আসে সবকিছুতে। কোন একটা দেশে সোনা যথেষ্ট না থাকলে ঘটে উলটোটা। এইভাবে চালু থাকে একটা স্বয়ংক্রিয় কর্ম-বন্দোবস্ত, সেটা স্বাভাবিকভাবেই আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে স্থিতি ফিরিয়ে আনে এবং সোনা ভাগ-বাটোয়ারা করে দেয় বিভিন্ন দেশের মধ্যে। এর থেকে রিকার্ডো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে। তিনি বললেন, পণ্যের আমদানি রপ্তানির চেয়ে বেশি হলে, আর দেশ থেকে সোনা বেরিয়ে গেলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। সেটা আদৌ কোন কারণ নয় আমদানি গণ্ডিবদ্ধ করার। তাতে শুধু বোঝায় যে, দেশে সোনা আছে বড় বেশি, আর দাম বেশি চড়া। অবাধ আমদানি দাম কমাতে সহায়ক।

যেমন স্মিথের আমলে তেমনি রিকার্ডোর কালেও ইংলণ্ডে অবাধ বাণিজ্যের দাবিটা ছিল প্রগতিশীল। কিন্তু তাঁর স্বয়ং-নিয়মন তত্ত্বটা বাস্তবতা-বিরুদ্ধ। প্রথমত, মাত্রিক অর্থ তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়া এই তত্ত্বে এই ভ্রান্ত উপাদানটা ছিল যে, কোন দেশে অর্থের পরিমাণ দামের মাত্রা নির্ধারণ করে সরাসরি। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সোনার চলাচল ঘটে পণ্যের দামের বিভিন্ন আপেক্ষিক মাত্রার প্রভাবেই শুধু নয়। রিকার্ডোর সমালোচকেরা এটা উল্লেখ করেছিলেন যে, নেপোলিয়নীয় যুদ্ধবিগ্রহর সময়ে ইংলণ্ড থেকে সোনা বেরিয়ে গিয়েছিল ইংলণ্ডে দাম বেশি ছিল বলে নয় (অবস্থাটা ছিল তার উলটো: শিল্পজাত দ্রব্যের দাম সেখানে ছিল অনেকটা কম), কারণ ছিল — বিদেশে চড়া সামরিক ব্যয়, ফসলহানির বছরে বিদেশে শস্যক্রয়, ইত্যাদি — এই বক্তব্য অমূলক ছিল না।

রিকার্ডোর অর্থ তত্ত্বের যাবতীয় দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও সেটা অর্থনীতি বিজ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিল। বহু প্রশ্নে লোকের ধারণা আগে ছিল অত্যন্ত তালগোল পাকান, সেগুলো ক্রমেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল পরে, সেগুলোক নির্দিষ্ট আকারে তুলে ধরা হয়েছিল এই তত্ত্বে, সেইসব প্রশ্ন হল — অর্থ পরিচলনের বেগ; 'অর্থের জন্যে চাহিদা', অর্থাৎ অর্থনীতিতে অর্থের প্রয়োজন নির্ধারণ করে যেসব কারক উপাদান; কাগজী মুদ্রার বিনিময়ে সোনা পাওয়া যেতে পারত — এই উপাদানটার

ভূমিকা; সোনার আন্তর্জাতিক চলাচলের ক্রিয়াপ্রণালী; বাণিজ্য আর লেন-দেন স্থিতির উপর পণ্যের দামের মাত্রার প্রভাব।

পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় এখনকার কারেন্সি সংকটের কথা বিবেচনায় রাখলে শেষের দফাটা বিশেষ আগ্রহজনক। লেন-দেন স্থিতির উপর (কিংবা তাঁর ধারণা অনুসারে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যস্থিতি এবং বহুমূল্য ধাতু চলাচলের উপর) বিভিন্ন দেশের দামের পৃথক-পৃথক মাত্রার প্রভাব এবং দামের বিভিন্ন মাত্রার উপর বিশ্ব-কারেন্সির কমি-বাড়ের উলটো প্রভাব-সংক্রান্ত প্রশ্নে রিকার্ডো খুবই আগ্রহান্বিত ছিলেন। বিভিন্ন কারেন্সি ব্যবস্থায় এবং বিশ্ব-কারেন্সি হিসেবে বহুমূল্য ধাতুর ভূমিকায় তখন থেকে যতসব পরিবর্তন ঘটে গেছে তা সত্ত্বেও উভয় প্রশ্ন আজও অবধি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কমূলক। প্রথম প্রশ্নটা যে এখনও আলোচ্য বিষয় সেটা দেখা যায় দৃষ্টান্তস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেন-দেন স্থিতিতে ঘাটতি নিয়ে আলোচনা থেকে (এই ঘাটতি কতটা 'ডলারের নবমূল্যে'র ফল, অর্থাৎ বিদ্যমান বিনিময়-হারে অন্যান্য প্রধান পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির চেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দামে উচ্চতর মাত্রার ফল)। ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্রে (পশ্চিম জার্মানিতে) স্বল্পমেয়াদী পুঁজি আগমের ফলে সেখানে সোনা আর ডলারের বিপুল পরিমাণ অতিরিক্ত সঞ্চয়ন — এই পশ্চিম জার্মানির অভিজ্ঞতা থেকে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে অপর প্রশ্নটার তাৎপর্য (এই অবস্থাটার প্রভাবে পশ্চিম জার্মানিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা বাড়ে কিভাবে)।

১৮০৯ সাল অবধিও অর্থনীতিবিদ হিসেবে কোন পরিচয়ই ছিল না রিকার্ডোর। আর ১৮১১ সাল নাগাদ তাঁর বক্তব্য প্রামাণিক বলে স্বীকৃত হয়ে গেল, তিনি হলেন ব্যাঙ্কনোটের বিনিময়েতা পুনঃপ্রবর্তন আন্দোলনের নেতা। কিছুটা মিলের মারফত, কিছুটা অন্যান্য উপায়ে রিকার্ডোর আলাপ-পরিচয় হয় বিভিন্ন বিশিষ্ট রাজনীতিক সাংবাদিক আর পণ্ডিতদের সঙ্গে। তাঁর অতিথিবৎসল বাড়িতে খাসা খানাপিনার টেবিলে রাজনীতি অর্থনীতি আর সাহিত্যের নানা বিতর্কমূলক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা চলত। নিজের কোন চেষ্টা ছাড়াই রিকার্ডো এসে যান একটি বুদ্ধিজীবী মহলের কেন্দ্রস্থলে। কারণটা ছিল তাঁর ধীশক্তি ছাড়াও বুদ্ধিকৌশল, ধীর-স্থির স্বভাব, স্থৈর্য।

আলাপী হিসেবে রিকার্ডো সম্বন্ধে একটা সূক্ষ্মদর্শী বর্ণনা রয়েছে আইরিশ ঔপন্যাসিক মারিয়া এজওয়ার্থ-এর লেখায়: 'মিস্টার রিকার্ডোর আচরণ-ব্যবহার খুবই ধীর-স্থির, তাঁর মনটা সদাজাগ্রত, আলাপের মধ্যে

তিনি সর্বক্ষণ নতুন-নতুন বিষয়ের সূত্রপাত করেন। তাঁর চেয়ে ঠিকভাবে কিংবা জেতার জন্যে কম এবং সত্যের জন্যে বেশি করে যুক্তি দেন এমন কারও সঙ্গে কোন প্রশ্ন নিয়ে আমি কখনও তর্ক কিংবা আলোচনা করি নি। তাঁর বিরুদ্ধে তোলা প্রত্যেকটা যুক্তিকে তিনি পূর্ণ গুরুত্ব দিয়ে ধরেন, আর মনে হয় প্রশ্নটার যে-পক্ষে তাঁর মনের প্রত্যয় যতক্ষণ থাকে তার উপর একমুহূর্তও তিনি থাকেন না সে-পক্ষে। সত্যটাকে বের করলেন আপনি, না তিনি, এতে তাঁর যেন কিছুই এসে-যায় না — সত্যটা পাওয়া যায় যদি। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে একটাকিছুতে পৌঁছন যায়; বোঝা যায় নিজে ভ্রান্ত, না সঠিক, আর আলোচনার মধ্যে কখনও কারও মেজাজ দেখান ছাড়াই বুঝ-সমঝ হয়ে ওঠে আরও স্পষ্ট;... তিনি সর্বথা একজন অতি অমায়িক মানুষ, তেমনি আমি যাঁদের জানি তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ওয়াকিবহাল এবং সবচেয়ে বুদ্ধিমান।'* রিকার্ডো আর ম্যালথাসের মধ্যে বন্ধুত্বটা অর্থনীতি-বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা অদ্ভুত আত্মবিরোধী ব্যাপার। এই বন্ধুত্ব ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। তাঁদের দেখাসাক্ষাৎ হত প্রায়ই, পরস্পরের বাড়িতে আসা-যাওয়া চলত, পত্রালাপ হত খুবই ঘন-ঘন। অথচ এঁদের চেয়ে ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের দুটি মানুষের কথা কল্পনা করাও কঠিন। তাঁদের বন্ধুত্বের সমগ্র ইতিহাস হল ভাবাদর্শগত তর্ক-বিতর্ক আর মতভেদের ইতিহাস। তাঁরা যাতে একমত হতে পারেন এমনকিছু ছিল বিরল। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেননা তাঁদের তত্ত্ব-দুটো ছিল ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের অনুযায়ী: ভূস্বামী শ্রেণীর স্বার্থের বশবর্তী ছিল ম্যালথাসীয় অর্থশাস্ত্র, সেটা রিকার্ডোর পক্ষে ছিল একেবারেই অগ্রহণীয়; তেমনি ম্যালথাসও গ্রহণ করতে পারেন নি রিকার্ডোর সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন ভাব-ধারণাগুলি: শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্ব, খাজনাকে পরজীবী আয় হিসেবে দেখানো, অবাধ বাণিজ্য, শস্য আইন রদ করাবার দাবি।

রিকার্ডোর ছিল প্রবল বিজ্ঞানসম্মত বাস্তবতানিষ্ঠা এবং আত্মসমালোচনার গুণ — এটা হয়ত ম্যালথাসের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের একটা করণ। রিকার্ডো যাকিছু হাসিল করতেন এবং যেভাবে সেটা ব্যক্ত করতেন, তাতে তিনি কখনও তৃপ্ত হতে পারতেন না, তাই ম্যালথাসের তীব্র সমালোচনাটাকে তিনি

* D. Ricardo, 'The Works and Correspondence', Vol. 10, Cambridge, 1955, pp. 168-169, 170 থেকে উদ্ধৃত।

চাইতেন নিজ ভাব-ধারণাগুলিকে ঘষা-মাজা করা, বিশদ করে তোলা এবং বিকশিত করার একটা উপায় হিসেবে। আর ম্যালথাসকে সমালোচনা করার ভিতর দিয়ে তিনি নিজে আরও অগ্রসর হতেন।

তৌলনিক পরিব্যয় নীতি

যেসব কারক উপাদান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবাহ নির্ধারণ করে সেগুলো নিয়ে বিস্তর চিন্তা করেছিলেন রিকার্ডো। এটা তো বোঝাই যায়: কেননা ইংলণ্ডে বহির্বাণিজ্য বরাবর একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থেকেছে, এবং রয়েছে এখনও। কোন একটা দেশ কোন-কোন পণ্য রপ্তানি করে, আর আমদানি করে অন্য কোন-কোন পণ্য, এমনটা কেন হয়, আর উৎপাদনবৃদ্ধিতে, আর্থনীতিক অগ্রগতিতে বহির্বাণিজ্য কিভাবে আনুকূল্য করে — এইসব প্রশ্ন রিকার্ডো তুললেন মনে-মনে।

এইসব প্রশ্নে অ্যাডাম স্মিথের উত্তরটা ছিল অতি-সরল এবং বরং নিতান্তই মামুলি। স্কট্ল্যাণ্ডে মদিরা প্রস্তুত করার কথা হয়ত ভাবা যেতে পারে, কিন্তু তাতে শ্রমব্যয় হয় খুবই বেশি। স্কট্ল্যাণ্ডে ধরা যাক জই ফলিয়ে পোর্তুগালের মদিরার সঙ্গে বিনিময় করাই বেশি লাভজনক, সেখানে শ্রমব্যয় পড়ে মদিরা প্রস্তুত করতে কম, আর জই ফলাতে চড়া। তাতে খুব সম্ভব উভয় দেশ লাভবান হয়। এই ব্যাখ্যায় রিকার্ডো সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। লাভ যেখানে নির্ধারিত হয় স্বাভাবিক কারক উপাদান দিয়ে, শুধু সেইসব স্পষ্টপ্রতীয়মান ক্ষেত্রেই বাণিজ্য লাভজনক হতে পারে, তা নিশ্চয়ই নয়।

রিকার্ডো যুক্তি দেখালেন নিম্নলিখিতরূপে। এমনকি যদি এমনটাই ভাবা যায় যে, স্কট্ল্যাণ্ডে জই আর মদিরা দুইই পয়দা হয় কম পরিব্যয়ে, কিন্তু মদিরার চেয়ে জই সস্তায়, তাহলে পরিব্যয়ের নির্দিষ্ট অনুপাত থাকলে, আর বিনিময়ের নির্দিষ্ট সমানুপাত হলে স্কট্ল্যাণ্ডের **শুধু** জই ফলানো এবং পোর্তুগালের **শুধু** মদিরা প্রস্তুত করাই লাভজনক। এই হল তৌলনিক পরিব্যয় বা তৌলনিক সুবিধার নীতি। এই নীতিটাকে শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বের ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে রিকার্ডো সাংখ্যিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে সেটাকে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন; এমনসব দৃষ্টান্ত তিনি খুব পছন্দ করতেন এবং ব্যবহার করতেন সবসময়ে।

একটা সাংখ্যিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে রিকার্ডোর ভাব-ধারণা বিশদ করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে; দৃষ্টান্তটা উনিশ শতকের গোড়ার দিককার

বাস্তবতার যথাসম্ভব কাছাকাছি। মনে করুন ইংলন্ডে আর ফ্রান্সে পয়দা হয় শুধু দুটো পণ্য — কাপড় আর শস্য। ইংলন্ডে এক-মিটার কাপড় তৈরি করতে লাগে গড়ে ১০ ঘণ্টার শ্রম, আর ২০ ঘণ্টা লাগে এক-টন শস্য পয়দা করতে। ফ্রান্সে ঐ অঙ্ক-দুটো হল — কাপড়ের জন্যে ২০ ঘণ্টা, আর শস্যের জন্যে ৩০ ঘণ্টা। মূল্য নিয়ম অনুসারে, এক-টন শস্য বিনিময় হবে ইংলন্ডে ২ মিটার আর ফ্রান্সে দেড় মিটার কাপড়ের সঙ্গে। লক্ষ্য করা দরকার, এই দৃষ্টান্তটায় উভয় পণ্য উৎপাদনে ইংলন্ডের প্রাধান্য নিরঙ্কুশ, কিন্তু শুধু কাপড় উৎপাদনে প্রাধান্যটা **আপেক্ষিক।** শস্যে ফ্রান্সের আপেক্ষিক প্রাধান্য আছে। এটাকে তুলে ধরা যায় নিম্নলিখিতরূপেও: ফ্রান্সে কাপড় উৎপাদন ইংলন্ডের চেয়ে দ্বিগুণ ব্যয়সাধ্য, আর শস্য ফলানোটা মাত্র দেড়গুণ বেশি ব্যয়সাধ্য। এই **'মাত্র'টা** হল আপেক্ষিক প্রাধান্য।

ধরা যাক, উভয় দেশ রিকার্ডোর পরামর্শ অনুসারে বিশেষিত কৃতি ধরল — ইংলন্ড কাপড়ে, আর ফ্রান্স শস্যে। মনে করা যেতে পারে, শস্য আর কাপড়ের মধ্যে বিনিময়ের অনুপাত হবে ইংলন্ড আর ফ্রান্সের অনুপাত-দুটোর মাঝামাঝি কোথাও, ধরা যাক ১·৭ (অর্থাৎ এক-টন শস্যের জন্যে ১·৭ মিটার কাপড়)। বাদবাকি বক্তব্য একটা সারণিতে দিলেই আরও সুবিধে হবে:

	ইংলন্ড	ফ্রান্স
এক-মিটার কাপড় এবং এক-টন শস্যের জন্যে মোট কর্মঘণ্টা ব্যয়	৩০	৫০
বিশেষিত কৃতি ধরার আগে		
কাপড় উৎপাদন এবং ব্যবহার (মিটার)	১	১
শস্য উৎপাদন এবং ব্যবহার (টন) .	১	১
বিশেষিত কৃতি ধরার পরে		
কাপড় উৎপাদন (মিটার)	৩	—
শস্য উৎপাদন (টন)	—	১·৬৭
কাপড় ব্যবহার (মিটার)*	১	০·৬৭×১·৭=১·১
শস্য ব্যবহার (টন)*	২:১·৭=১·২	১
বিশেষিত কৃতির ফলে ব্যবহারে সাশ্রয়	০·২ টন শস্য	০·১ মিটার কাপড়

* ব্যাপারটাকে সহজ করার জন্যে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, বিশেষিত কৃতি চালু হবার পরে ইংলন্ডে একই পরিমাণ কাপড় ব্যবহৃত হয় এবং বাদবাকিটাকে বিনিময়

দেখা যাচ্ছে, প্রতি ৩০-ঘণ্টার সামাজিক শ্রম বাবত ইংলন্ডের অর্থনীতিতে ০·২ টন শস্যের সাশ্রয় হচ্ছে, আর ফ্রান্সে প্রতি ৫০-ঘণ্টার শ্রম বাবত সাশ্রয় হচ্ছে ০·১ মিটার কাপড়ের। বিশেষিত কৃতি এবং বহির্বাণিজ্য প্রসারের কল্যাণে — নিয়মের দিক থেকে দেখলে — দেশ-দুটি উভয় উৎপাদের ব্যবহার বাড়াতে পারে।

রিকার্ডো আরও বুঝেছিলেন যে, এই সাশ্রয়টাকে সাধারণত আত্মসাৎ করে একটা বিশেষ শ্রেণী — পুঁজিপতিরা। কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ চিন্তাধারা অনুসারে তিনি ধরে নিয়েছিলেন এতে বোঝাচ্ছে যে, বহির্বাণিজ্য থেকে লাভটা 'সাশ্রয় করতে এবং পুঁজি সঞ্চয়নে প্রবর্তনা... যোগায়'। পুঁজি সঞ্চয়ন আর্থনীতিক প্রসারের একটা গ্যারাণ্টি, আর বিশেষত, শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উপর সেটার কল্যাণ-প্রভাব পড়তে পারে, কেননা শ্রমশক্তির জন্যে চাহিদা তাতে বাড়ে। বিমূর্ত আকারে ধরলে, তৌলনিক পরিব্যয় নীতিটা সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশেষিত কৃতি থেকে যে-আর্থনীতিক সাশ্রয় হয় সেটা পায় কোন্ শ্রেণী — শুধু এই নিয়েই প্রশ্নটা। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ এবং উৎপাদনে বিশেষিত কৃতির গুরুত্ব বেড়ে যাবার ফলে মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদদের মনোযোগ পড়েছে এই নীতিটার উপর।

মার্কসবাদী রচনায় কখনও-কখনও এই কথাটার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় যে, রিকার্ডোর এইসব ভাব-ভাবনা পরে বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল সাফাইদারী মতলবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, আদি নীতিটা এক-জিনিস, আর বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরিবেশে সেটার ভাবাদর্শগত প্রয়োগ একেবারেই ভিন্ন ব্যাপার।

রিকার্ডোর বহির্বাণিজ্য তত্ত্বের সমালোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে মার্কস বলেছেন, **নীতির দিক দিয়ে দেখলে,** বিশেষিত কৃতি লাভজনক হতে পারে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশের পক্ষেও, কেননা এমন দেশ 'তার ফলে বিভিন্ন পণ্য পায় সেটা যেভাবে পয়দা করতে পারে তার চেয়ে সস্তায়'।* তৌলনিক

করা হয়। ফ্রান্স ব্যবহার করে একই পরিমাণ শস্য এবং বিনিময় করে বাদবাকিটাকে। অঙ্কগুলি দেওয়া হল মোটামুটি।

* কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ৩য় খণ্ড, মস্কো, ১৯৭১, ২৩৮ পৃঃ।

পরিব্যয় নীতি থেকে রিকার্ডো এমনসব সিদ্ধান্ত করতে শুরু করেছিলেন যেগুলো খাপ খায় অবাধ বাণিজ্যের অবস্থায় আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক সম্পর্কের সমন্বিত এবং সুস্থিত বিকাশ সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বের সঙ্গে, তা বটে। তিনি দেখতেন এইভাবে: বাণিজ্যে যারা অংশগ্রাহী তারা সবাই সেটা থেকে লাভবান হয়, বাণিজ্য একত্র করে গড়ে তোলে 'সারা সভ্য জগতের জাতিসমূহের সর্বব্যাপী সমাজ', আর সংযুক্ত করে অন্যান্য দেশের শস্য মদিরা এবং অন্যান্য কৃষিজাতদ্রব্য। ধাতব জিনিসপত্র এবং অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য উৎপন্ন হবে ইংলণ্ডে। এইভাবে তৌলনিক পরিব্যয় নীতিটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল শিল্পোৎপাদনে ইংলণ্ডের 'স্বাভাবিক' প্রাধান্য এবং পৃথিবীর সর্বপ্রধান শিল্পসমৃদ্ধ শক্তি হিসেবে দেশটির ভূমিকার সপক্ষে একটা যুক্তি এবং সাফাই। তৌলনিক পরিব্যয় নীতি এবং শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বের মধ্যে যোগসূত্রটা পরে নষ্ট হয়ে যায়। অর্থনীতিতে অনগ্রসর এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির কাঁচামাল আর খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনের একপেশে বিশেষিত কৃতিকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করার জন্যে, ঐসব দেশের শিল্পযোজনের বিরুদ্ধে একটা যুক্তি হিসেবে সেটা ব্যবহৃত হতে থাকে।

বুর্জোয়া ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অবাধ বাণিজ্য-সংক্রান্ত গোটা ধারণাটা বদলে গেল। অবাধ বাণিজ্য বিশেষত ইংরেজ বুর্জোয়াদের পক্ষে সুবিধাজনক হলেও সেটা তখন ছিল মোটের উপর প্রগতিশীল ধারা: ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য দেশে সামন্ততন্ত্র খতম করা, নতুন-নতুন অঞ্চলকে বিশ্ব-বাণিজ্যক্ষেত্রে টেনে আনা, পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব-বাজার গড়ে তোলা ছিল সেটার লক্ষ্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে অবাধ বাণিজ্য নীতি অন্তত উন্নয়নশীল দেশগুলির বেলায় প্রায়ই প্রতিক্রিয়াশীল। এমনকি পশ্চিম ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু অর্থনীতিবিদ পর্যন্ত স্বীকার করেন অবাধ বাণিজ্য চললে উন্নয়নশীল দেশগুলির চিরকাল কাঁচামাল যোগানদার হয়ে থাকাটা অবধারিত, তাতে শুধু বজায় থাকবে এইসব দেশের অনগ্রসরতা। এইসব দেশের অনগ্রসরতা অতিক্রম করতে সহায়ক হতে পারে শুধু বহির্বাণিজ্যক্ষেত্রে (যেমন অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও) সক্রিয় হস্তক্ষেপ, বিশেষত বিদেশের শিল্পজাতদ্রব্য আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করা, এমনসব জিনিস দেশ থেকে রপ্তানি করায় আনুকূল্য, ইত্যাদি।

স্মিথের 'জাতিসমূহের সম্পদ' যেভাবে বেরিয়েছিল সেটা থেকে একেবারে পৃথক ধরনে বেরয় রিকার্ডোর প্রধান রচনাটা। যুগটা ছিল যা উদ্দাম, আর যেমনটা ছিল রচয়িতার মেজাজ, তাতে বহু বছর ধরে নিরিবিলি কাজ করা তাঁর হয়ে ওঠে নি।

তখনকার দিনের বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল রিকার্ডোর বৈজ্ঞানিক আগ্রহ। এমন একটা সমস্যা ছিল শস্য আইন, যেটা ব্যাঙ্কিং আর অর্থ-সংক্রান্ত প্রসঙ্গকে পর্যন্ত হটিয়ে দিয়েছিল। ততদিনে উদারপন্থী শিবিরের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং প্রবন্ধকার রিকার্ডো ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই লড়াইয়ে। তাঁর কাজে নেমে পড়ার সাক্ষাৎ কারণটা ছিল ম্যালথাসের সঙ্গে তাঁর তর্ক-বিতর্ক; ম্যালথাস সমর্থন করছিলেন শস্য আইন এবং শস্যের চড়া দাম। এই তর্ক-বিতর্কের ভিতর দিয়ে রিকার্ডোর কলম থেকে বেরয় একটা তত্ত্বতন্ত্র। ১৮১৪-১৮১৭ সালে লেখা তাঁর রচনা হল ইংলণ্ডে বুর্জোয়া ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি।

স্মিথের তন্ত্রটা আর্থনীতিক বাস্তবতার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হিসেবে আর দাঁড়াতে পারল না। চল্লিশ বছরে পরিবর্তন ঘটেছিল খুবই বেশি। গড়ে উঠেছিল বুর্জোয়া সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, সেগুলির আর্থনীতিক স্বার্থ দানা বেঁধে উঠেছিল। শস্য আইন নিয়ে লড়াইটা চলেছিল খোলাখুলি প্রধানত শিল্পক্ষেত্রের বুর্জোয়া আর ভূস্বামী এই দুটো প্রধান শ্রেণীর অবস্থান থেকে। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় আয় বণ্টন-সংক্রান্ত প্রশ্নটা এসে গেল অর্থনীতি-বিজ্ঞানের পুরোভাগে। স্মিথের বেলায় এটা ছিল কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মধ্যে একটা মাত্র। আর রিকার্ডোর বেলায় এটা হল কার্যত অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু। তিনি লিখলেন: 'যেসব নিয়মে এই বণ্টন নিয়মিত হয় সেগুলোকে স্থির করাই অর্থশাস্ত্রের প্রধান সমস্যা; তিউর্গো, স্টুয়ার্ট, স্মিথ, সে', সিস্‌মন্দি এবং অন্যান্যের রচনার সাহায্যে এই বিজ্ঞানের বিস্তর উন্নতি হলেও সেগুলি খাজনা, লাভ এবং মজুরির স্বাভাবিক গতি সম্পর্কে সন্তোষজনক তথ্য যোগায় যৎসামান্যই।'*

---

* D. Ricardo, 'The Principles of Political Economy and Taxation', London, 1937, p. 1.

উৎপাদনের পরিবেশ এবং স্বার্থ বিবেচনায় রেখে রিকার্ডো **বণ্টন** নিয়ম স্থির করতে চেষ্টা করেন। কী বোঝায় তাতে বাস্তবিকপক্ষে? সর্বপ্রথমে, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমই পয়দা করে পণ্যের মূল্য, আর সেটার পরিমাপ হয় এই শ্রমের পরিমাণ দিয়ে, এই তত্ত্বটাকে তিনি করলেন নিজ তন্ত্রের ভিত্তি। তারপর, নির্দিষ্ট পুঁজিতান্ত্রিক আকারে উৎপাদনের বিচার-বিশ্লেষণ করে তিনি প্রশ্ন তুললেন উৎপাদনের উপকরণ ভূস্বামীদের (ভূমি) এবং পুঁজিপতিদের (কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল) হাতে থাকলে মূল্য গড়ে ওঠে কিভাবে, আয় বণ্টিত হয় কিভাবে। শেষে, তিনি বুঝলেন, বৈষয়িক সম্পদের বর্ধিত উৎপাদনই পুঁজিতন্ত্রের প্রধান কর্ম।

শ্রেণীতে-শ্রেণীতে সম্পর্ক এবং পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ-সংক্রান্ত প্রশ্নে রিকার্ডোর প্রধান সিদ্ধান্ত হল নিম্নলিখিতরূপ। আর্থনীতিক উন্নয়ন আপনাতে ছাড়া থাকলে, জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিতে চাষবাসের ক্রমপ্রসারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে কৃষিজাতদ্রব্যের দাম সমানে বাড়ে। এর থেকে ওঠা লাভ সবটাই যায় ভূস্বামীর হাতে, তখন পুঁজি থেকে লাভের হার কমে যায়। এর ফলে দুর্গতি হয় শ্রমিকদেরও, কেননা তাদের শ্রমের জন্যে চাহিদা তখন অপেক্ষাকৃত কম। রিকার্ডো লিখেছেন: 'ভূস্বামীদের স্বার্থ সবসময়েই সমাজের অন্য প্রত্যেকটি শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধ।'* এই ধারাটাকে প্রতিহত করতে পারে কী? — বিদেশ থেকে সস্তা শস্য আমদানি। এখান থেকে আসে শস্য আইনের অনিষ্ট: তাতে উপকৃত হয় শুধু পরজীবী ভূস্বামীরা।

নিজ অভিমত একখানা বইয়ে বিবৃত করার অভিপ্রায়ের কথা রিকার্ডো প্রথম উল্লেখ করেন ১৮১৫ সালের অগস্ট মাসে সে'-র কাছে লেখা একখানা চিঠিতে। সেবার সারা শরৎকালটায় তিনি খুব খেটে কাজ করেন — ক্রমেই আরও বেশি করে ডুবে যান এই কাজে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ, সফর, দেখা-সাক্ষাৎ করতে যাওয়া তখন কমে যায় একেবারেই।

এই কাজের মধ্যে তিনি অচিরেই প্রধান বাধাটার সম্মুখীন হলেন: মূল্য-সংক্রান্ত সমস্যা (সেটার বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হচ্ছে)। স্মিথের তত্ত্ব নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না, কিন্তু তখন সেটার জায়গায় অন্য

* 'Economic Essays by David Ricardo', London, 1966, p. 235.

তত্ত্ব দিতেও পারছিলেন না। মানসিক-যন্ত্রণাকর হয়ে উঠল তাঁর এই অনুসন্ধান। একখানা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভেবে স্থির করতে দু'সপ্তাহ লেগেছিল, তার আগে তিনি শান্তি পান নি। রিকার্ডোর এই সময়কার চিঠিগুলি সাধারণত অসন্তোষ আর সংশয়ে ভরা। তাঁর মন ভাল করার জন্যে মিল করতেন সবকিছু, স্তাবকতাও: '...অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে **চিন্তাবীর** হিসেবে আপনি তো ইতোমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ লেখকও হবেন আপনি তাতে আমি নিশ্চিত।' রিকার্ডো খুঁতখুঁত করতেন, কিন্তু বইখানা তিনি লিখে ফেলেছিলেন বিস্ময়কর কম সময়ের মধ্যে — এই বৈসাদৃশ্যটা কিছুটা মজাদারই বটে।

১৮১৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয় 'Principles of Political Economy and Taxation' ('অর্থশাস্ত্র এবং করাধানের মূলসূত্রগুলি') — ৭৫০ খানার সংস্করণ। তাড়াহুড়ো করার সমস্ত লক্ষণই দেখা যায় রিকার্ডোর এই বইখানায়। তিনি প্রকাশকের কাছে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিলেন ভাগে-ভাগে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে পাঠাতেন সংযোজনী আর সংশোধনী। বইখানার আরও দুটো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর জীবনকালে। প্রথম সংস্করণ থেকে এই দুটোর বিশেষ কোন তফাত ছিল না, শুধু 'মূল্য প্রসঙ্গে' পরিচ্ছেদটায় ছাড়া, এটাকে যথাযথ এবং প্রত্যয়জনক করতে রিকার্ডো চেষ্টা করেছিলেন খুবই।

বইখানার তৃতীয় সংস্করণে আছে স্পষ্ট তিনটে ভাগে বিভক্ত ৩২টা পরিচ্ছেদ। রিকার্ডীয় তন্ত্রের প্রধান সূত্রগুলি বিবৃত হয়েছে প্রথম সাতটা পরিচ্ছেদে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যগুলি সবই রয়েছে মূল্য আর খাজনা-সংক্রান্ত প্রথম দুটো পরিচ্ছেদে। মার্কস বলেছেন, এখানে রিকার্ডো পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর একেবারে সারমর্মটা অনুধাবন ক'রে তুলে ধরেছেন 'একেবারেই নতুন এবং চমকপ্রদ কিছু-কিছু ফল। এই প্রথম দুটো পরিচ্ছেদ যে-বিপুল তত্ত্বীয় সন্তোষবিধান করছে সেটা আসছে তারই থেকে...'* সাতটা তত্ত্বীয় পরিচ্ছেদের পরে এসেছে (পর-পর নয়) কর-সংক্রান্ত চোদ্দটা পরিচ্ছেদ। বাদবাকি এগারটা পরিচ্ছেদে আছে প্রধান পরিচ্ছেদগুলি লেখা হয়ে যাবার পরে যা দেখা দিয়েছে এমন নানা সম্পূরক উপাদান,

* কার্ল মার্কস, 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব', ২য় ভাগ, মস্কো, ১৯৬৮, ১৬৯ পৃঃ।

এবং প্রধানত স্মিথ, ম্যালথাস আর সে' সম্বন্ধে এবং অন্যান্য অর্থনীতিবিদ সম্বন্ধে বিবেচনা আর সমালোচনা।

অর্থনীতি-বিজ্ঞানের পক্ষে রিকার্ডোর ঐতিহাসিক গুরুত্বটাকে দুটো দফায় তুলে ধরা যায়। **শ্রম দিয়ে**, শ্রম-কাল দিয়ে **মূল্যের ব্যাখ্যা** দেবার একক নির্দেশক মূলসূত্র অনুসারে তিনি চলেছিলেন, আর অর্থশাস্ত্রের গোটা সৌধটাকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছিলেন এই ভিত্তিতে। এরই ফলে তিনি বিভিন্ন ব্যাপারের বাহ্য আকারের অনেক পিছনে দৃষ্টিপাত ক'রে পুঁজিতন্ত্রের আদত শারীরবৃত্তের কতকগুলি উপাদান আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তিনি বুর্জোয়া সমাজে **শ্রেণীতে-শ্রেণীতে আর্থনীতিক বিরুদ্ধতা** প্রমাণ করেন, সেটাকে নির্দিষ্ট আকারে তুলে ধরেন, আর এইভাবে পৌঁছে যান ইতিহাসক্রমিক বিকাশের একেবারে মূলে।

রিকার্ডোর তন্ত্রের উভয় কেন্দ্রী উপাদানকে মার্ক্স কাজে লাগান নিজ আর্থনীতিক তত্ত্বে, এই যে-তত্ত্ব বিপ্লব ঘটায় অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে। ইংলন্ডের ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্র হল মার্ক্সবাদের একটা আকর, সেটা প্রথমত রিকার্ডোর এই সাধনসাফল্যেরই ফলে। পক্ষান্তরে, পরবর্তী বুর্জোয়া অর্থনীতি-বিজ্ঞান রিকার্ডোর প্রধান উপস্থাপনা-দুটোই প্রত্যাখ্যান করে। স্বল্পকালের মধ্যেই প্রথম উপস্থাপনাটার দরুন রিকার্ডোর বিরুদ্ধে মাত্রাতিরিক্ত বিমূর্তন এবং পাণ্ডিত্যাভিমানের অভিযোগ ওঠে, আর বিশ্বনিন্দা এবং শ্রেণীবিদ্বেষে উসকানির অভিযোগ ওঠে দ্বিতীয়টার দরুন।

রিকার্ডোর কোন ভাবপ্রবণতা ছিল না। তাঁর অর্থশাস্ত্র ছিল রূঢ়, তার কারণ তাতে যে-জগৎটার বর্ণনা করা হয়েছে সেটাই রূঢ়। কাজেই সিস্‌মন্দির মতো যাঁরা রিকার্ডোর সমালোচনা করেছিলেন পৃথক-পৃথক ব্যক্তির মানবিকতা আর সহৃদয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা ভ্রান্ত। উৎপাদন উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে রিকার্ডো বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের বিশ্লেষণ করেন, তার ফলেই তাঁর বিবেচনাধারা হয়ে ওঠে বিজ্ঞানসম্মত, যেমন স্মিথেরও। তিনি শিল্পক্ষেত্রের বুর্জোয়াদের স্বার্থের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, সেটাও শুধু যে-পরিমাণে ঐ স্বার্থ ছিল এই উন্নত নীতির অনুযায়ী। উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় জীবন্ত রবট্‌-এর মতো শ্রমিকদের তিনি চিত্রিত করেছেন বটে। পুঁজিপতির পক্ষে যা বেশি লাভজনক সেটাকেই সে বেছে নেয় — শ্রমিক খাটায় কিংবা নতুন যন্ত্র বসায়। এতে ভাবপ্রবণতার কোন স্থান নেই। মার্ক্স লিখেছেন: 'এটা নির্বিকার, বিষয়গত, বিজ্ঞানসম্মত।

যাতে নিজ বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে **অপরাধ ঘটে না** সেই পরিসরে রিকার্ডো বরাবরই লোকহিতৈষী, যা তিনি ছিলেন **চলিতকর্মেও**।'*

লোকহিতৈষণা দিয়ে সমাজের অমঙ্গলগুলোর নিরাকরণ হতে পারে, এমনটা রিকার্ডো নিশ্চয়ই মনে করেন নি। কিন্তু বাস্তব জীবনে তিনি ছিলেন সদাশয় এবং বদান্য। গ্যাটকোম্ব পার্কের কাছেই তাঁর অর্থে শ্রীযুক্তা রিকার্ডোর তত্ত্বাবধানে চালান একটা বিদ্যালয়ে পড়ত ১৩০টি ছেলে-মেয়ে, সেই বিদ্যালয়ে ঘুরে-ঘুরে দেখার বিবরণ দিয়েছেন মারিয়া এজওয়ার্থ। বিভিন্ন হাসপাতালে তিনি অর্থদান করতেন, অর্থসাহায্য দিতেন বহু গরিব আত্মীয়-স্বজনকে। একখানা চিঠিতে আছে একটি গরিব বালিকার কথা; সে আগে ছিল রিকার্ডোর বাড়িতে চাকরাণী, একটা লম্পট ছোকরা মেয়েটিকে ফুসলে লন্ডনে নিয়ে গিয়ে তার সতীত্বহানির চেষ্টা করেছিল। এটা ১৮১৬ সালের গোড়ার দিককার কথা, ঠিক যখন রিকার্ডো ভীষণ খাটছিলেন বইখানা নিয়ে। তাঁর চেষ্টায় মেয়েটি মা-বাবার কাছে ফিরে যেতে পেরেছিল, এই চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি সময় দিতে নারাজ হন নি, যদিও ছেলেটি তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে পারত এমন ঝুঁকি ছিল।

---

* কার্ল মার্ক্স, 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব', ২য় ভাগ, ১১২ পৃঃ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ডেভিড রিকার্ডো — তন্ত্রের পরিসমাপ্ত আকার

মূল্য — এই ধাঁধাটা

মূল্যের স্বধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট বুঝ-সমঝের জন্যে খুব খেটে চেষ্টা করেছিলেন রিকার্ডো। নিজের আগেকার কোন অভিমত অসন্তোষজনক বলে লক্ষ্য করলে তিনি সেটা সংশোধন করতেন — এমনটা ঘটেছিল বারবার। কোন একটা বাধা বুঝি কাটানো গেল বলে যেই তাঁর মনে হত অমনি সেটার জায়গায় বাধা এসে পড়ত আর-একটা। 'On Value' ('মূল্য প্রসঙ্গে'), তাঁর এই শেষ রচনাটি অসম্পূর্ণ থেকে যায় — সেটা লিখতে-লিখতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ে মারা যান। অনপেক্ষ মূল্য বলতে তিনি বোঝাতেন যেটাকে মার্ক্স বলেছেন মূল্যের সারমর্ম — পণ্যে নিহিত শ্রমের পরিমাণ। আপেক্ষিক মূল্য বলতে তিনি বোঝাতেন বিনিময়-মূল্য — অন্য একটা পণ্যের যে-পরিমাণটা স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে সংশ্লিষ্ট পণ্যের একটা ইউনিটের সঙ্গে বিনিময় হয়। রিকার্ডোর দুর্বলতাটা ছিল এই যে, অনপেক্ষ মূল্য ধরতে পেরেও তিনি সেটার স্বধর্ম উপলব্ধি করতে কিংবা এই মূল্যে অঙ্গীভূত আদত শ্রমের প্রকৃতি বিচার-বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেন নি। সবসময়েই তাঁর আগ্রহ ছিল বিষয়টার শুধু মাত্রিক দিকটা নিয়ে: কিভাবে নির্ধারণ করা যায় বিনিময়-মূল্যের যথার্থ পরিমাণ, আর সেটার পরিমাপ করা যায় কী দিয়ে। সেখান থেকে আসে 'মূল্যের আদর্শ পরিমাপে'র সন্ধান — মরীচিকার জন্যে সন্ধান, অলীক কল্পনা।

সমস্ত বাস্তব আর্থনীতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজের মূল্য তত্ত্বটাকে খাপ খাওয়ান অসম্ভব হওয়ায় রিকার্ডো কখনও-কখনও হতাশ হয়ে পড়তেন। দুর্বলতার এই রকমের একটা মুহূর্তে তিনি একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন মূল্য-সংক্রান্ত প্রশ্নটাকে একেবারে বাদ দিয়ে সেটা ছাড়াই বণ্টন নিয়ম নিয়ে

বিচার-বিশ্লেষণই হয়ত সহজ-সরল হবে। কিন্তু দুর্বলতাটা কেটে যেত, আবার তিনি ধরতেন প্রধান কাজটা, আর কানাগলি থেকে বেরবার পথ খুঁজতেন।

অন্যান্য বহু প্রশ্নের মতো, রিকার্ডো শুরু করেন যেখানে থেমে গিয়েছিলেন স্মিথ। উপযোগ-মূল্য আর বিনিময়-মূল্য — পণ্যের এই দুটো উপাদানের মধ্যে অপেক্ষাকৃত যথাযথ সীমারেখা তিনি স্থির করেন। পুনরুৎপাদনের অসাধ্য নগণ্যসংখ্যক জিনিস (যেমন প্রাচীন মহাশিল্পীর আঁকা ছবি) ছাড়া সমস্ত পণ্যেরই বিনিময়-মূল্য স্থির হয় সেগুলো উৎপাদনের আপেক্ষিক শ্রমব্যয় দিয়ে।

জানাই আছে, নিজ শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্ব প্রসঙ্গে স্মিথের বিচার-বিবেচনায় অসামঞ্জস্য ছিল। তিনি মনে করতেন শ্রম দিয়ে, শ্রম-কাল দিয়ে মূল্যের সংজ্ঞার্থ দেওয়াটা প্রযোজ্য শুধু 'সমাজের আদিম অবস্থা'য়, যখন পুঁজি কিংবা মজুরি-শ্রম ছিল না। আধুনিক সমাজে পণ্য উৎপাদন এবং বিক্রি করা থেকে মজুরি, লাভ আর খাজনার আকারে যেসব আয় সেগুলোর সাকল্য দিয়ে মূল্য নির্ধারিত হয়। রিকার্ডোর যথাযথ যুক্তিসম্মত চিন্তাধারায় এমন অসামঞ্জস্য অগ্রহণীয় ছিল। মূলনীতি নিয়ে স্মিথের অদ্ভুত শিথিল আচরণটাকে তিনি সঠিক মনে করেন নি। মূল্য নিয়মের মতো একটা মূল নিয়ম সমাজবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে বর্জিত হতে পারে না। — না, রিকার্ডো বললেন, শ্রম-কাল অনুসারে মূল্যের সংজ্ঞার্থ একটা অনপেক্ষ, ব্যতিক্রমহীন নিয়ম।

তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া চাই: যেকোন সমাজে জিনিস পণ্য হিসেবে উৎপাদন করা হয় বিনিময়ের জন্যে এবং টাকা নিয়ে বিক্রি করার জন্যে। কিন্তু রিকার্ডো অন্য কোন সমাজের কথা ভাবতে পারেন নি। ইতিহাস যদি তাঁর জানা থেকেও থাকে তবু দৃষ্টান্তস্বরূপ আদিম সমাজে উৎপাদনের পরিবেশ তিনি নিশ্চয়ই গুরুত্ব দিয়ে ধরেন নি। কোন সম্ভাব্য ভবিষ্য সমাজ সম্পর্কে তিনি ভাবতে পেরেছিলেন শুধু 'মিস্টার ওয়েনের সামান্তরিকগুলির'* আকারে, সেগুলি তাঁর বিবেচনায় ছিল উদ্ভট অলীক কল্পনা, যদিও ওয়েন মানুষটিকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। স্মিথের মতো ইতিহাসবোধ রিকার্ডোর

---

* জ্যামিতিক ধারায় সুষম আকৃতির শ্রমিক বসতি (কমিউন) গড়ার কথা তুলেছিলেন রবার্ট ওয়েন, তারই উল্লেখ করা হয়েছে এখানে।

ছিল না, কাজেই যারা শিকার-বিনিময় করে এমনসব স্বাধীন শিকারীদের সমাজ এবং তাঁর সমসাময়িক কারখানায় উৎপাদন আর মজুরি-শ্রম ব্যবস্থার মধ্যে মস্ত পার্থক্যটা তিনি লক্ষ্য করতে পারেন নি। এককথায়, পুঁজিতান্ত্রিক ছাড়া কোন সমাজ তাঁর জানা ছিল না; এই সমাজের নিয়মাবলিকে তিনি স্বাভাবিক সর্বব্যাপী চিরন্তন বলে মনে করতেন।

তবু উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে শ্রমঘটিত মূল্য নিয়মের সর্বব্যাপী প্রযোজ্যতা সম্বন্ধে রিকার্ডোর তত্ত্বটি অর্থনীতি-বিজ্ঞান ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট অবদান। স্মিথ এবং তাঁর অনুগামীদের অভিমত অনুসারে বিশেষত এই সিদ্ধান্তটা আসে যে, অর্থ-মজুরি বাড়লে (তাতে সাধারণভাবে যেকোন পরিবর্তন ঘটলে) পণ্যের মূল্যে এবং দামে তদনুযায়ী পরিবর্তন ঘটে। এই বক্তব্যটাকে রিকার্ডো সরাসরি বাতিল করে দেন: 'কোন পণ্যের মূল্য, কিংবা যে-পরিমাণ অন্য কোন পণ্যের সঙ্গে সেটার বিনিময় হবে, তা নির্ভর করে সেটা উৎপাদনে আবশ্যক আপেক্ষিক পরিমাণ শ্রমের উপর, কিন্তু ঐ শ্রম বাবত দেওয়া পারিশ্রমিকের বেশি কিংবা কম পরিমাণের উপর নয়।'*

মজুরি যদি বাড়ে শ্রমের উৎপাদনশীলতায় কোন পরিবর্তন ছাড়াই, তাতে পণ্যের মূল্যের পরিবর্তন ঘটে না। অন্যান্য সমস্ত অবস্থা একই থাকলে, দামের উপরও তার প্রভাব পড়ে না — দামটা হল সোনার হিসাবে মূল্যের প্রকাশই মাত্র। বদলায় তাহলে কী? শ্রমিকের মজুরি এবং পুঁজিপতির লাভের মধ্যে মূল্যের বণ্টনটা বদলায়। অবাধ প্রতিযোগিতার অবস্থায় পুঁজিপতিরা তাদের পণ্যের দাম বাড়িয়ে মজুরিবৃদ্ধিজনিত ক্ষতি পূরণ করতে পারে না।

এই প্রশ্নটার মস্ত ভূমিকা আসছিল পরে। একেবারে শুরু থেকেই এটা ছিল গুরুতর রাজনীতিক প্রশ্ন, যেটা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল মজুরিবৃদ্ধির জন্যে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে। যেকোন মজুরিবৃদ্ধি নাকচ হয়ে যাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ার ফলে, তাই মজুরি বাড়াবার জন্যে লড়াই নিরর্থক: শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের পক্ষে হানিকর এই মতটাকে খণ্ডন করার জন্যে মার্কস মজুরি দাম আর লাভের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ বিশ্লেষণটা করেছিলেন বিশেষত রিকার্ডোর উপস্থাপনার ভিত্তিতে। মার্কস

* D. Ricardo, 'The Principles of Political Economy and Taxation', London, 1937, p. 5.

বলেন, 'মজুরির হার সাধারণভাবে বাড়লে তার ফলে লাভের সাধারণ হার কমে, কিন্তু, মোটের উপর, পণ্যের দামের উপর সেটার ক্রিয়া ঘটে না।'*

এই উপস্থাপনা আজও গুরুত্বপূর্ণ, সেটা এই বুর্জোয়া ধারণাটা প্রসঙ্গে যাতে বলা হয় শ্রমিকদের অর্থ-মজুরির বৃদ্ধিই জীবনযাত্রার ব্যয় এবং মুদ্রাস্ফীতি বাড়ার একমাত্র কিংবা প্রধান কারণ। তার সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার, রিকার্ডো এবং মার্কস যখন মত প্রকাশ করেছিলেন তখন অবস্থা ছিল এখনকার থেকে ভিন্ন-ভিন্ন, পুঁজিতন্ত্রের তখনকার কোন-কোন বিশেষত্ব ইতোমধ্যে মিলিয়ে গেছে কিংবা বদলে গেছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল — এক, অবাধ প্রতিযোগিতা, যে-অবস্থায় পৃথক-পৃথক শিল্পপতির নিজ-নিজ পণ্যের বাজার-দরের উপর প্রভাব খাটান সম্ভব ছিল না; আর দুই, স্বর্ণমানের ভিত্তিতে সুস্থিত অর্থ-পরিচলন, যাতে দামের বেড়ে-চলা মাত্রার সঙ্গে ক্রেডিট আর অর্থের সামঞ্জস্য ঘটাবার সম্ভাবনা ছিল সীমাবদ্ধ।

জানাই আছে, বাজার আর দামের উপর বিস্তর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাসম্পন্ন একচেটেগুলোর প্রাধান্য, আর অর্থ-পরিচলন এবং ক্রেডিটের ক্রমবর্ধমান পরিমাণের দিকে একপেশে নমনীয়তা সমসাময়িক পুঁজিতন্ত্রের একটা বিশেষক উপাদান। এই অবস্থায়, মজুরি যা বাড়ে সেটাকে শিল্পপতিরা পণ্যের দামের মধ্যে চালিয়ে দিতে পারে, — লাভ বজায় রাখতে এবং বাড়াবার জন্যে সেটা তারা করে সবসময়েই। অবশ্য সেটা করার সম্ভাবনা অন্তহীন নয়, আর সেটা নির্ভর করে বাজারে একায়ত্তির মাত্রা এবং আরও বহু উপাদানের উপর। মজুরি আর দামের মধ্যে মাত্রিক সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রশ্নটা এখনকার পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির রাজনীতিক জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে। একচেটেগুলো জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে সেটাকে সাধারণত আসল মজুরি বাড়ার ফল হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করে, যেখানে এই দামবৃদ্ধিই সমসাময়িক মুদ্রাস্ফীতির একটা প্রধান কারক উপাদান। এই প্রশ্নটায় মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদদের মনোযোগ দেওয়া দরকার স্বভাবতই।

পুঁজিতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রিকার্ডোর অভিমতে এবং তাঁর রাজনীতিক কর্মসূচিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে মজুরি আর লাভের মধ্যে উলটো অনুপাত-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটা। মনে পড়বে, রিকার্ডো মনে করতেন

* ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস, তিন-খণ্ডে 'নির্বাচিত রচনাবলি', ২ খণ্ড, ৭৫ পৃঃ।

কৃষিজাতদ্রব্যের দাম বাড়ার ঝোঁকটা স্থায়ী। তাতে আসল মজুরি বাড়া চাই: যেহেতু শ্রমিকেরা সবসময়েই পায় কোনমতে উপোস ঠেকাবার মতো ন্যূনকল্প মজুরি, তাই সেটা না বাড়লে তারা স্রেফ না খেয়ে মরে। কিন্তু তাতে পুঁজিপতিদের লাভ কমে যায় তদনুসারে, কেননা শিল্পজাতদ্রব্যের দাম তারা বাড়াতে পারে না। শস্য মাগ্‌গি হলে তাতে শিল্পপতিরা খোঁচা খায় এবং কোন একটা অবস্থায় তাদের পুঁজি সঞ্চয়নের চাড় আর থাকে না। রিকার্ডো যেভাবে বিবেচনা করেন তাতে সেটা ঘটায় আর্থনীতিক বিপর্যয়!

শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বের সামনে পড়ে যেসব প্রধান-প্রধান মুশকিল সেগুলো সম্বন্ধে রিকার্ডোও অবহিত ছিলেন স্মিথেরই মতো।

শ্রমিক আর পুঁজিপতির মধ্যে বিনিময়ের ব্যাখ্যা নিয়ে বাধে প্রথম মুশকিলটা। পণ্যের মূল্য পয়দা করে শুধু শ্রমিকের শ্রমই, আর এই শ্রমের পরিমাণ দিয়ে নির্ধারিত হয় মূল্যের পরিমাণ। কিন্তু শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিক মজুরি হিসেবে পায় মূল্যের অল্পাংশ। তাহলে মূল্য নিয়ম লঙ্ঘিত হয় এই বিনিময়ে। নিয়মটা প্রতিপালিত হলে শ্রমিকটির শ্রম দিয়ে পয়দা করা উৎপাদটার পূর্ণ মূল্যই সে পেত, কিন্তু তাহলে পুঁজিপতির কোন লাভ হত না। এইভাবে দেখা দেয় একটা অসংগতি: হয় তত্ত্বটা খাপ খায় না বাস্তবতার সঙ্গে, নইলে বিনিময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মূল্য নিয়ম লঙ্ঘিত হচ্ছে অবিরাম।

এই অসংগতি নিরসন করলেন মার্কস। তিনি দেখালেন পুঁজিপতির কাছে শ্রমিক যা বিক্রি করে তা নয় তার শ্রম, শ্রম হল শুধু একটা প্রক্রিয়া, কর্মবৃত্তি, মানুষের কর্মক্ষমতাব্যয়; সে বিক্রি করে শ্রমশক্তি, অর্থাৎ শ্রম করার সামর্থ্য। সেটা কিনতে গিয়ে পুঁজিপতি সাধারণত শ্রমিককে দেয় তার শ্রমশক্তির পূর্ণ মূল্য, কেননা শ্রম যা পয়দা করে সেটা দিয়ে নয়, জীবনধারণ আর বংশবৃদ্ধির জন্যে শ্রমিকের যা অত্যাবশ্যক সেটা দিয়েই নির্ধারিত হয় এই মূল্যটা। এইভাবে, পুঁজি আর শ্রমের মধ্যে বিনিময় হয় পুরোপুরি মূল্য নিয়ম অনুসারেই, সেটা শ্রমিকের উপর পুঁজিপতির শোষণ ছাড়া নয়।

বাস্তব জীবনে কলে-কারখানায় পয়দা-করা পণ্যের মূল্য দিয়ে পুঁজিপতির লাভ নির্ধারিত হয় না, সেটা নির্ধারিত হয় সংশ্লিষ্ট পুঁজির পরিমাণ দিয়ে, এই ব্যাপারটার সঙ্গে মূল্য নিয়মটাকে মেলানো যায় কেমন করে সেটা হল দ্বিতীয় মুশকিলটা। যেখানে মূল্য পয়দা হয় কেবল শ্রম দিয়েই, আর পণ্য

বিনিময় হয় মোটামুটি সেটার মূল্য অনুসারে, উৎপাদনের বিভিন্ন শাখা থাকে একেবারেই ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থায়। যেসব শাখায় আর শিল্পায়তনে কাজে লাগান হয় বিস্তর শ্রমশক্তি কিন্তু যন্ত্রপাতি, মালমশলা আর কাঁচামাল সামান্যই, সেগুলির পণ্য হওয়া চাই চড়া মূল্যের, পণ্য বিক্রি হওয়া চাই চড়া দামে, কাজেই লাভ হওয়া চাই বেশি। যেসব শাখায় পুঁজির পরিচলন দ্রুত, আর লাভ ওঠে দ্রুত, সেগুলো সম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে, যেসব শাখায় আর শিল্পায়তনে উৎপাদনের উপকরণে দেদার পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয় বা পুঁজির পরিচলন যেখানে অপেক্ষাকৃত ঢিমে তাতে পণ্য-মূল্য, দাম এবং লাভ অপেক্ষাকৃত কম হওয়া চাই।

কিন্তু এটা অসম্ভব! এটা পুঁজিতন্ত্রের প্রকৃত অবস্থার বিরুদ্ধ, কেননা সমান-সমান পুঁজি থেকে পয়দা-হওয়া লাভের হার একই রকমের, এটা তো সুবিদিত। নইলে যেসব শাখায় লাভ পয়দা হয় কম সেগুলো ছেড়ে চলে যেত পুঁজি। এইভাবে মনে হত শ্রমঘটিত মূল্য নিয়মটা সক্রিয় অনপেক্ষ গড় লাভ নিয়মের সঙ্গে মিল খায় না।

অ্যাডাম স্মিথ এই অসংগতিটাকে তুচ্ছ করেছিলেন, তাতে তিনি কার্যত শ্রমঘটিত মূল্য প্রত্যাখ্যান করেন এবং মূল্য বের করেন বিভিন্ন আয় থেকে, যেগুলোর একটা হল গড় লাভ। রিকার্ডো তা করতে পারেন নি, কেননা শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর ধারণার যোগসূত্রটা ছিল অপেক্ষাকৃত সুসমঞ্জস। সমান-সমান পুঁজি বাবত সমান-সমান লাভ-সংক্রান্ত ব্যাপারটাকে তিনি এই তত্ত্বের কাঠামের ভিতরে জোর করে ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। তাতে কাঠামটা যাতে ভেঙে না যায় সেজন্যে তিনি পুঁজির গঠনে আর পরিচলনে পার্থক্যগুলোর গুরুত্ব খাটো করে দেখাতে চেষ্টা করেন, তা করতে গিয়ে তিনি যে-নৈপুণ্য আর দৃঢ়সংকল্পের পরিচয় দেন সেটা আরও উপযুক্ত কোন প্রয়োজনে লাগালেই ঠিক হত। রিকার্ডো পাঠককে মূলত বোঝাতে চেয়েছেন যে, গড় লাভ মূল্য নিয়মটাকে বদলে দিলেও সেটা গৌণ ব্যাপার, সেটাকে উপেক্ষা করা যেতে পারে।

অবশ্য যা প্রতিপন্ন করার অসাধ্য সেটাকেই প্রতিপন্ন করতে তিনি চেষ্টা করছিলেন। পুঁজিতন্ত্রের পরিবেশে পণ্য উৎপন্ন হলে মূল্য নিয়ম সক্রিয় থাকে (এতে রিকার্ডো সঠিক), কিন্তু সরল পণ্য-উৎপাদনে যেমনটা সেভাবে সক্রিয় হতে পারে না (এটা তাঁর ভুল)। মূল্য রূপান্তরিত হয় উৎপাদন-পরিব্যয়ে, সেটার মধ্যে পড়ে পুঁজি থেকে গড় লাভ, এইভাবে পুঁজির গঠনে

আর পরিচলনে পার্থক্য মিটে যায়। বিভিন্ন শাখার মধ্যে পুঁজিতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রক্রিয়ায় এটা হাসিল হয়। মূল্য নিয়মটাকে এতে বাতিল করা হয় না, এতে সেটাকে আরও বিকশিত করা হয়। এটাই মার্কসের উত্তরটার সাধারণ রূপরেখা।

উৎপাদন-পরিব্যয় এবং মূল্যের মধ্যে পার্থক্যটা মৌলিক। এই দুটো কোন অবস্থায় একই হলে সেটা স্রেফ আপাতিক। কিন্তু রিকার্ডো প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, এই দুটো একই, অভিন্ন — যেকোন অন্যথা অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। অচিরেই দেখা গিয়েছিল তত্ত্বক্ষেত্রে তাঁর প্রতিপক্ষীয়দের সমালোচনা এই মতাবস্থানটাকে খণ্ডন করতে পারে সহজেই।

কেক্-ভাগাভাগি, বা
রিকার্ডীয় উদ্বৃত্ত মূল্য

রিকার্ডোর চিন্তাধারাটা ছিল মূলত গাণিতিক। অর্থনীতিবিদ্যা আর গণিতের হাত ধরাধরি করে চলার যুগ তখনও ছিল বহুদূরে, তাই তাঁর রচনাগুলিতে কোন সূত্র কিংবা সমীকরণ নেই। কিন্তু তাঁর চিন্তন আর ব্যাখ্যানের ধরনে যথাযথ গাণিতিক প্রতিপাদনের ছাপ আছে।* তাঁর কাছে যা গৌণ, সারবান নয়, এমন সবকিছু ঠেলে রেখে জটিল সংযুক্ত অর্থনীতিবিদ্যার সরল উপাদান আর মূলসূত্রগুলিকে পৃথক করে তুলে ধরে বিকশিত করে সেগুলির স্বাভাবিক পরিণতি ঘটাবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল রিকার্ডোর। তাঁর চিন্তনের যথাযথতা এবং যুক্তিযুক্ততা তাঁর সমসাময়িকদের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। তিনি ছিলেন চমৎকার তার্কিক। 'রিকার্ডোর ব্যাপারে নাক গলাতে যেও না,' জেমস মিল লিখেছিলেন একজন বন্ধুর কাছে। 'নিশ্চয় করে বলতে পারি, তাঁর ভুল ধরাটা চাট্টিখানি কথা নয়। অনেক সময়ে আমার মনে হয়েছে ধরে ফেলেছি তাঁর ভুল, কিন্তু তাঁর মতই গ্রহণ করেছি শেষে।'*

* অর্থনীতিবিদ্যায় গাণিতিক প্রণালীর পথিকৃৎ ফ্রান্সের আঁতোয়াঁ কুর্নো অনেক আগে, ১৮৩৮ সালে রিকার্ডোর চিন্তাধারার এই উপাদানটা লক্ষ্য করেছিলেন এবং জবড়জঙ্গসাংখ্যিক দৃষ্টান্তগুলো নিয়ে রিকার্ডীয় 'গণিতে'র দুর্বলতা দেখিয়েছিলেন (সেটা অমূলক নয়); 'কোন-কোন লেখক — যেমন স্মিথ আর সে' — বিশুদ্ধ সাহিত্যিক আঙ্গিকের যাবতীয় সৌষ্ঠব বজায় রেখে লিখেছেন অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে; কিন্তু অন্য কেউ-কেউ — যেমন রিকার্ডো — অপেক্ষাকৃত বিমূর্ত বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কিংবা অধিকতর যথাযথতার জন্যে চেষ্টা করতে গিয়ে বীজগণিত এড়াতে পারেন নি, আর সেটাকে শুধু ঢেকেছেন বিরক্তিকর বাগবাহুল্য-ভরা পাটিগণিতের হিসাব দিয়ে'। (A. A. Cournot, 'Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses', Paris, 1838, p. IX.)

তবে রিকার্ডোর গাণিতিক প্রণালীতে ছিল সেটার নিজস্ব দোষ-ত্রুটি। যেমন মূল্যের প্রশ্নে তেমনি বণ্টনেও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন প্রধানত মাত্রিক দিকটা। অংশ আর অনুপাত সম্পর্কে তিনি আগ্রহান্বিত ছিলেন, কিন্তু বণ্টনের ঠিক প্রকৃতিটা সম্পর্কে, সমাজের গঠন আর বিকাশের সঙ্গে বণ্টনের সংযোগ সম্পর্কে তাঁর বড় একটা আগ্রহ ছিল না।

সমাজের প্রধান তিনটে শ্রেণীর আয় হিসেবে মজুরি লাভ আর খাজনা সম্বন্ধে স্মিথের অভিমতটাকেই রিকার্ডো বিস্তারিত করেছিলেন প্রধানত। শ্রমিক এবং তার পরিবারের জীবনীয় দ্রব্যসামগ্রী বাবত খরচা হিসেবে মজুরির সংজ্ঞার্থটাকে তিনি নিয়েছিলেন পূর্বসূরিদের কাছ থেকে। তিনি ভেবেছিলেন এই তত্ত্বটাকে ম্যালথাসীয় জনসংখ্যা তত্ত্বের ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে তিনি সেটা আরও উৎকৃষ্ট করে তুলছিলেন: এই জনসংখ্যা তত্ত্বের প্রধান উপাদানগুলি তিনি গ্রহণ করেছিলেন, বোধহয় এই একটামাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেই তিনি ম্যালথাসের সঙ্গে একমত হন। ম্যালথাসের উপর নির্ভর করে রিকার্ডো মনে করেছিলেন মজুরিটা ন্যূনকল্প পরিমাণের ধরাবাঁধা চৌহদ্দির ভিতরে থাকে সেটা পুঁজিতন্ত্রের বিশেষ-নির্দিষ্ট নিয়মের দরুন নয়, সেটা হয় একটা সর্বব্যাপী স্বাভাবিক নিয়মের দরুন — সেই নিয়মটা হল এই যে, শ্রমিকদের আরও বেশি সন্তান জন্ম দিয়ে মানুষ করার জন্যে প্রয়োজনীয় জীবনধারণের উপকরণের ন্যূনকল্প পরিমাণটাকে যেই ছাড়িয়ে যায় গড় মজুরি অমনি শ্রমের বাজারে প্রতিযোগিতা প্রবলতর হয়ে ওঠে এবং মজুরি আবার কমে যায়।

ফের্ডিনান্ড লাসাল এবং অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী পরে তথাকথিত 'লৌহদৃঢ় মজুরি নিয়ম' খাড়া করেছিলেন ম্যালথাস আর রিকার্ডোর অভিমতের ভিত্তিতে। এই 'নিয়ম' থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে,

* J. B. Hollander, 'David Ricardo. A Centenary Estimate', Baltimore, 1910, p. 120.

আর্থনীতিক স্বার্থের জন্যে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম নিরর্থক, কেননা — এতে বলা হয় — মজুরিটা তো জীবনধারণের উপকরণের ন্যূনকল্প পরিমাণের সঙ্গে বাঁধা, সেটার নড়চড় হবার জো নেই। পশ্চিমে বলা হয়েছে এবং এখনও বলা হয় মার্কস মানতেন এই 'লৌহদৃঢ় নিয়ম', কিন্তু এমন ধ্যান-ধারণা মার্কসবাদের পক্ষে প্রকৃতপক্ষে বিজাতীয়।

রিকার্ডোর তত্ত্ব ছিল অনেকাংশ বদ্ধ। শ্রমের উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, সেটার গুণগান করেছিলেন পর্যন্ত, তবু তিনি দেখতে পান নি এই প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণী আপনিই বদলে যায়। বদলে যায় বিশেষত দুটো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান: ১) শ্রমিকের সাধারণ-স্বাভাবিক, সামাজিকভাবে স্বীকৃত প্রয়োজন বাড়ে, আর ২) শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন এবং সংহতি বাড়ে, জীবনযাত্রার মান উন্নীত করার জন্যে লড়াইয়ের সামর্থ্য বাড়ে, আর সেটার চেতনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলতর হয় শ্রেণীসংগ্রাম।

রিকার্ডো যেমনটা বুঝতেন তাতে সমাজে জাতীয় আয়ের বণ্টনটা যেন সাধারণভাবে নির্দিষ্ট আকারের একখানা কেক্‌ ভাগাভাগি করার মতো ব্যাপার। শ্রমিকদের ভাগে পড়ে কেক্‌খানার যে-টুকরোটা সেটা সামান্যই। বাদবাকি সবটা পায় পুঁজিপতিরা, কিন্তু তাদের সেটা ভাগাভাগি করতে হয় ভূস্বামীদের সঙ্গে, তার উপর, এদের অংশটা অবিরাম বাড়তে থাকে।

খাজনা (এবং শিল্পপতির ঋণ বাবত অর্থপতি ধনিককে দেওয়া সুদও) স্রেফ লাভ থেকে কাটা যায় — এই ধারণাটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এতে বোঝায় যে, লাভটাকে ধরা হত আয়ের মুখ্য, মূল আকার হিসেবে, যেটার ভিত্তি হল পুঁজি, অর্থাৎ লাভটাকে ধরা হত উদ্বৃত্ত মূল্য হিসেবে। লাভ আর উদ্বৃত্ত মূল্যকে রিকার্ডো সমতুল বলে ধরলেন, এটা অবশ্য তাঁর উৎপাদন-পরিব্যয় আর মূল্যকে সমতুল বলে ধরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। তার বণ্টন তত্ত্বেরও দোষ-গুণ ছিল তাঁর মূল্য তত্ত্বেরই মতো।

কোন একটা পণ্যের মূল্য এবং যা নিয়ে জাতীয় আয় সেই সমস্ত পণ্যের মূল্য বিষয়গতভাবে নির্ধারিত হয় শ্রমব্যয় দিয়ে। এই মূল্যটা দুটো ভাগে বিভক্ত — মজুরি এবং লাভ (খাজনা সমেত)। এর থেকে রিকার্ডো প্রলেতারিয়েত আর বুর্জোয়াদের শ্রেণীস্বার্থের মধ্যে মৌলিক দ্বন্দ্ব-অসংগতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছন। বহু বার তিনি লিখেছেন, মজুরি আর লাভ বদলাতে পারে শুধু ব্যস্ত অনুপাতে: মজুরি বাড়লে লাভ কমে, তেমনি তার উলটোটা। পুঁজিতন্ত্রের উৎসাহী মার্কিন সাফাইদার কেরি এইজন্যেই

রিকার্ডোর তত্ত্বটাকে বলেছেন শ্রেণীতে-শ্রেণীতে বিরোধ আর শত্রুতার তন্ত্র।

আবারও রিকার্ডোর আগ্রহ ছিল শুধু অনুপাত নিয়ে, বিষয়টার মাত্রিক দিকটা নিয়ে। মজুরি আর লাভের মধ্যে বিরোধ পয়দা করে যে সম্পর্ক সেটার প্রকৃতি, উৎপত্তি আর ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি বিবেচনা করেন নি। তাই তিনি 'উদ্বৃত্ত মূল্যের রহস্য' ভেদ করতে পারলেন না, যদিও শ্রমিকের শ্রম দিয়ে পয়দা-করা মূল্যের একটা অংশ তার কাছ থেকে আত্মসাৎ করে পুঁজিপতি এটা বুঝে তিনি ঐ 'রহস্য' ভেদ করার কাছাকাছিই পৌঁছেছিলেন।

ভূমি-খাজনার স্বধর্ম আর পরিমাণ রিকার্ডো বিশ্লেষণ করেন, এটা হল তাঁর সবচেয়ে চমৎকার বৈজ্ঞানিক সাধনসাফল্যগুলির একটা। পূর্বসূরিদের মতো নয় — তিনি নিজ খাজনা তত্ত্বটাকে গড়ে তোলেন শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বের মজবুত ভিত্তিতে। তিনি বিশদ করে দেখালেন খাজনার উৎপত্তিস্থলটা প্রকৃতির দান নয়, সেটা হল ভূমিতে প্রযুক্ত শ্রম। যেহেতু ভূমি সীমাবদ্ধ তাই উৎকৃষ্ট জমিগুলোতেই শুধু নয়, মাঝারি আর নিরেস জমিতেও চাষবাস করা হয়। কৃষিজাতদ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয় অপেক্ষাকৃত নিরেস জমিতে শ্রমব্যয় দিয়ে, আর উৎকৃষ্ট এবং মাঝারি গোছের জমি থেকে লাভ পয়দা হয় অপেক্ষাকৃত বেশি। যেহেতু লাভ দাঁড়ান চাই গড় পরিমাণে তাই এই বাড়তিটাকে খাজনা হিসেবে ভূস্বামীকে দিতে পুঁজিপতি-খামারীকে বাধ্য করা হয়।

রিকার্ডো মনে করতেন সবচেয়ে নিরেস জমি থেকে খাজনা ওঠে না। মার্কস দেখিয়েছেন এটা ভুল: ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকলে সবচেয়ে নিরেস জমি-বন্দটাকেও ভূস্বামী মুফত বিলি করবে না। রিকার্ডীয় খাজনাটাকে মার্কস বলেন **প্রভেদক** (অর্থাৎ ভূমির স্বাভাবিক প্রভেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট), আর এই যে-বিশেষ খাজনাটাকে রিকার্ডো লক্ষ্য করেন নি এটাকে মার্কস বলেন **অনপেক্ষ খাজনা**।

অল্প-অল্প বৃদ্ধি এবং গরিষ্ঠ পরিমাণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার যে-বিশ্লেষণ (অপরিণত আকারে) রিকার্ডো প্রয়োগ করেন সেটা এসেছিল একটা মস্ত ভূমিকায়: প্রযুক্তি আর চাহিদার নির্দিষ্ট মাত্রায় শেষের (মার্জিনাল) যে-জমি-বন্দ চাষবাস করার উপযোগী সেটাতে শ্রমব্যয় দিয়ে নির্ধারিত হয় কৃষিজাতদ্রব্যের মূল্য। অল্প-অল্প বৃদ্ধির (মার্জিন) প্রণালীটা পরে অর্থশাস্ত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আসে।

সাধারণ্যে বিজ্ঞান-প্রচারক সমসাময়িক আমেরিকান লেখক আর. এল. হেইলব্রোনার রিকার্ডীয় তন্ত্র সম্বন্ধে লিখেছেন: 'এটা ইউক্লিডেরই মতো মৌল, অনাবৃত, অসজ্জিত, স্থাপত্যধর্মী, কিন্তু একপ্রস্ত জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞার মতো নয় — এই তন্ত্রটায় রয়েছে মানবিক ভাবানুষঙ্গ: এটা একটা ট্র্যাজিক তন্ত্র।'* পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে যে-ট্র্যাজেডি রিকার্ডো লক্ষ্য করেন, আর এই ব্যবস্থাটার ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে তাঁর ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত, তাতে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের বাস্তব ধারাই প্রকাশ পেয়েছে। ভূস্বামীরা ইংলন্ড দেশটাকে খেয়ে ফেলে নি বটে। ইংলন্ডের পুঁজিতন্ত্রের 'উন-সঞ্চয়ন' ব্যাধি সম্বন্ধে রিকার্ডো যে-ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেটা তত ভয়ঙ্কর নয় বলে প্রতিপন্ন হল। ম্যালথাসীয়-রিকার্ডীয় করাল নিয়তি মেনে নিয়ে হাত গুটিয়ে থাকে নি শ্রমিক শ্রেণী। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার ট্র্যাজিক দশাটা দেখা গেল রিকার্ডো যেমনটা অনুমান করেছিলেন তার থেকে কিছুটা ভিন্ন।

তবে পুঁজিতন্ত্রের বহু উপাদানের স্বরূপই দেখতে পেয়েছিলেন এই চিন্তাগুরু। পুঁজিতন্ত্র প্রলেতারিয়েতকে উৎপাদনের একটা উপাঙ্গের অবস্থায় ফেলে রাখতে চায়, উপোসের মাত্রায় নামিয়ে দেয় শ্রমিকের মজুরি, তাঁর এমন বিবেচনাটা ছিল সম্পূর্ণ সঠিক। আর্থনীতিক অগ্রগতিক্ষেত্রে বৃহৎ ভূমি-মালিকানার সর্বনাশা প্রভাব পড়ে — তাঁর এই আশঙ্কাটাও ছিল যথার্থ। ইংলন্ডের অভিজ্ঞতায় যদি না হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য কয়েকটা দেশের অভিজ্ঞতায় আশঙ্কাটা যথার্থ প্রতিপন্ন হয়েছে।

ঘোর পরিণতির যে-আশঙ্কা রিকার্ডো করেছিলেন সেটাকে কিছুটা প্রশমিত করেছিল অন্তত দুটো বিবেচনা। এক, তিনি মনে করতেন, অবাধ বাণিজ্য, বিশেষত বিদেশ থেকে অবাধে শস্য আমদানির ফলে খাজনাবৃদ্ধি এবং লাভ-হ্রাস বন্ধ হয়ে অবস্থা অনেকটা বদলে যেতে পারে, বদলে যাবে। সর্বব্যাপী অত্যুৎপাদন এবং আর্থনীতিক সংকট অসম্ভব, এই মর্মে যে-মূলসূত্রটাকে পরে বলা হত 'সে'-র নিয়ম', সেটাকে তিনি সর্বত মেনে নিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, অন্তত এই দিকটা থেকে পুঁজিতন্ত্র বিপন্ন নয়।

---

* R. L. Heilbroner, 'The Great Economists', London, 1955, p. 78.

রিকার্ডো বললেন, দ্রব্য-সামগ্রী আর সার্ভিসের জন্যে সমাজের প্রয়োজনের সীমা-পরিসীমা নেই। মানুষের পেটে কিছু একটা পরিমাণ খাদ্যের বেশি না ধরলেও নানা 'সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর গয়নাগাঁটি'র জন্যে চাহিদার অন্ত নেই। প্রয়োজন আর ক্রয়ক্ষম চাহিদা তিনি গুলিয়ে ফেলছিলেন না তো? না, তিনি তেমন অতি-সরল ছিলেন না। তিনি বুঝতেন চাহিদার সঙ্গে নগদ টাকার ঠেকনো না থাকলে আর্থনীতিক বিচারে সেটার কিস্মৎ থোড়াই। কিন্তু সে'-র মতো রিকার্ডোও মনে করতেন, আয় পয়দা ক'রে উৎপাদন আপনা থেকেই দ্রব্য-সামগ্রী আর সার্ভিসের জন্যে ক্রয়ক্ষম চাহিদা সৃষ্টি করে, আর এই চাহিদার ফলে সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী আর সার্ভিসের কাটতি নিশ্চিত হয়, এটা অবশ্যম্ভাবী।

তাঁর বিবেচনায় পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা হল আদর্শ ধরনে নিয়মিত একটা কর্ম-বন্দোবস্ত, তাতে বিক্রির ব্যাপারে যেকোন মুশকিলের আসান হয়ে যায় চটপট এবং সহজেই: কোন পণ্য অতিরিক্ত পরিমাণে উৎপন্ন হতে থাকলে সেটার উৎপাদকেরা বাজার থেকে অচিরেই তদনুযায়ী ইশারা পেয়ে সেটার বদলে অন্য কোন পণ্য উৎপাদন করতে লেগে যায়। সর্বব্যাপী অত্যুৎপাদন অসম্ভব, এই মর্মে বক্তব্যটাকে রিকার্ডো তুলে ধরেন এইভাবে: 'উৎপাদ সবসময়েই কেনা হয় অন্য উৎপাদ দিয়ে কিংবা সার্ভিস দিয়ে; অর্থ হল এই বিনিময়টা ঘটাবার মাধ্যম মাত্র। কোন একটা পণ্য বড় বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হতে পারে, বাজারে সেটার সরবরাহ এত বেশি হয়ে যেতে পারে যাতে সেটার জন্যে ব্যয় করা পুঁজিটাও উঠে আসে না; কিন্তু এমনটা ঘটতে পারে না সমস্ত পণ্যের বেলায়।'*

এই কথাগুলি লেখার কালিটা শুকোতে-না-শুকোতেই ঘটনা সেটাকে খণ্ডন করেছিল সজোরে: ইংলন্ডে অত্যুৎপাদনের প্রথম সাধারণ সংকটের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল ১৮২৫ সালে, অত আগে। রিকার্ডোর ছিল বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা, তিনি আত্মসমালোচনা করতে পারতেন, তিনি হয়ত পরে সংশোধন করতেন নিজের মত; কিন্তু তিনি তখন আর বেঁচে ছিলেন না।

এইভাবে, ক্ল্যাসিকাল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের (ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের)

---

* D. Ricardo, 'The Principles of Political Economy and Taxation', p. 194.

তন্ত্রটার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে রিকার্ডোর রচনায়। সেটার প্রধান-প্রধান উপাদানগুলিকে বিবৃত করার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

১। বৈজ্ঞানিক বিমূর্তন প্রণালী প্রয়োগ করে বিভিন্ন আর্থনীতিক ব্যাপার আর প্রক্রিয়ার মর্ম উপলব্ধি করার কামনাটা ছিল ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের বিশেষক। খুবই বিষয়ানুগ এবং নিরপেক্ষ থেকে তাঁরা বিশ্লেষণ করতেন এইসব প্রক্রিয়া। এটা সম্ভব ছিল, তার কারণ শেষে গিয়ে যাদের স্বার্থের প্রবক্তা ছিল এই ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায় সেই শিল্পক্ষেত্রের বুর্জোয়ারা তখন ছিল একটা প্রগতিশীল শক্তি, আর বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েতের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম সমাজে প্রধান কারক উপাদান হয়ে ওঠে নি তখনও।

২। ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের ভিত্তিমূলে ছিল শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্ব; গোটা অর্থশাস্ত্র সৌধটাকে গড়ে তোলা হয়েছিল তারই উপর। তবে ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদেরা শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বটাকে যে-আকারে বিকশিত করেন তদনুসারে এগিয়ে ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায় পুঁজিতন্ত্রের নিয়মাবলির ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের বিবেচনায় পুঁজিতন্ত্র হল একমাত্র সমাজব্যবস্থা যেটা সম্ভব, চিরন্তন এবং স্বাভাবিক।

৩। সমাজে উৎপাদন আর বণ্টন-সংক্রান্ত প্রশ্ন ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায় লক্ষ্য করেছিল প্রধান শ্রেণীগুলির অবস্থানের দৃষ্টিকোণ থেকে। পুঁজিপতি আর ভূস্বামীদের আয়ের উৎপত্তিস্থল হল শ্রমিক শ্রেণীর উপর শোষণ, এই সিদ্ধান্তটার কাছাকাছি তাঁরা পৌঁছতে পেরেছিলেন তারই ফলে। তবে উদ্বৃত্ত মূল্যের স্বধর্মের ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারেন নি, কেননা একটা পণ্য হিসেবে শ্রমশক্তির বিশেষত্বটা সম্বন্ধে স্পষ্ট উপলব্ধি তাঁদের ছিল না।

৪। সামাজিক পুঁজি পুনরুৎপাদন সম্বন্ধে ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের ধারণার ভিত্তি ছিল আর্থনীতিক ব্যবস্থায় স্বাভাবিক স্থিতি-সংক্রান্ত মূলসূত্র। মানুষের ইচ্ছার অনপেক্ষ বিষয়গত, স্বতঃস্ফূর্ত আর্থনীতিক নিয়মাবলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাসের সঙ্গে সেটা সংশ্লিষ্ট ছিল। কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির আত্মনিয়মন প্রকৃতি-সংক্রান্ত ধারণাটা আবার ঐ অর্থনীতির দ্বন্দ্ব-অসংগতিগুলোকে চাপা দিত। সর্বব্যাপী অত্যুৎপাদন এবং সংকটের সম্ভাবনাটাকে ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায় অস্বীকার করত, এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৫। বুর্জোয়া ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্র ছিল অর্থনীতিক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সর্বোচ্চ মাত্রায় সীমাবদ্ধ রাখার (অবাধ-নীতির) সপক্ষে, অবাধ

বাণিজ্যের সপক্ষে। এই অর্থশাস্ত্রের আর্থনীতিক উদারনীতি অনেকাংশে সংযুক্ত ছিল রাজনীতিক উদারনীতি এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রচারের সঙ্গে।

পার্লামেন্টের সদস্য

রিকার্ডোর 'অর্থশাস্ত্র এবং করাধানের মূলসূত্রগুলি' বইখানার হুহু করে কাটতি হয় নি নিশ্চয়ই। পাঠক-সাধারণের জন্যে নয় — বইখানা ছিল অর্থনীতিবিদদের জন্যে। আর অর্থনীতিবিদ তখন বড় একটা ছিল না। সিস্‌মন্দি লিখেছেন, রিকার্ডো বলেছিলেন এই বইখানা বুঝবার মতো লোক পঁচিশ জনের বেশি ছিল না ইংলণ্ডে।

তবে বইখানা বের হবার একবছর পরে ম্যাক্‌কুলোখ সেটার একটা দীর্ঘ সপ্রশংস পর্যালোচনা প্রকাশ করেন, তাতে তিনি অপেক্ষাকৃত জনবোধ্য আকারে রিকার্ডোর ভাব-ধারণাগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন এবং আর্থনীতিক কর্মনীতির চলতি প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যগুলি তুলে ধরেন। মিলের এবং আরও কারও-কারও চেষ্টায় রিকার্ডোর বইখানা সর্বসাধারণের নজরে আসে, তাঁর নামটা তাদের মধ্যে সুপরিচিত হয়েছিল ইতোমধ্যে। ম্যালথাস লিখে ফেলেছিলেন তাঁর 'অর্থশাস্ত্রের মূলসূত্রগুচ্ছ', তাতে তিনি তত্ত্ব আর কর্মনীতির মূল প্রশ্নগুলি প্রসঙ্গে রিকার্ডোর বক্তব্যে আপত্তি তুলেছিলেন। রিকার্ডো তখন ধারণা করতে পেরেছিলেন সাফল্য বলতে তিনি যা বোঝেন সেটা তাঁর হাসিল হয়ে গিয়েছিল।

১৮১৯ সালে প্রকাশিত হয় রিকার্ডোর বইখানার দ্বিতীয় সংস্করণ, তখন তিনি ব্যবসা থেকে সরে যান একেবারেই, স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যতা ছেড়ে দেন। তাঁর ধন-দৌলত তখন বিনিয়োগ করা হয় ভূমি, স্থাবর সম্পত্তি এবং নিরাপদ ঝুঁকিবর্জিত বণ্ডে। একজন ধনী ভূস্বামী, ইংরেজ জেণ্টলম্যানের উত্তরাধিকারী হিসেবে মানুষ করা হয় তাঁর সন্তান-সন্ততিদের। (তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ভাই মোজেস রিকার্ডোকে এই মহান অর্থনীতিবিদের জীবনী প্রকাশ করতে দেন না তাঁর পরিবার, অর্থাৎ তাঁর বিধবা স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েরা: তিনি ছিলেন ইহুদিবংশীয়, তিনি স্টক এক্সচেঞ্জের কাজ-কারবার করতেন, এসব তাঁরা সাধারণ্যে গোচর করাতে চান নি।)

রিকার্ডোর সামাজিক মর্যাদা আর প্রবণতা যা ছিল তাতে পার্লামেন্টারী

ক্রিয়াকলাপই ছিল তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এই ক্ষেত্রে কাজে নামতেই বন্ধুবান্ধবেরা তাঁকে পরামর্শ দেন। ছিল বহু 'আজেবাজে বারো', সেগুলোর একটার মালিক, গরিব হয়ে-পড়া ভূস্বামীর কাছ থেকে পার্লামেণ্টের একটা সদস্যপদ কিনে নেওয়াই ছিল রিকার্ডোর কমন্সসভায় ঢুকবার একমাত্র উপায়। তাইই তিনি করলেন। একটা উপান্ত্য আইরিশ নির্বাচনক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হয়ে রিকার্ডো কখনও সেখানে যান নি, নির্বাচকদের কাউকে কখনও দেখেন নি — এটা খুবই ছিল তখনকার কালোপযোগী।

তিনি পার্লামেণ্টে ছিলেন মাত্র চার বছর, কিন্তু সেখানে তাঁর ভূমিকাটা ছিল বেশ বিশিষ্টই। শাসক টোরি পার্টি কিংবা প্রতিপক্ষ হুইগ্, কোনটারই তিনি যথাবিধি সদস্য ছিলেন না। হুইগ্ পার্টিই ছিল তাঁর পক্ষে অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য; আর বামতরফা এবং র‍্যাডিকাল প্রতিপক্ষ মহলগুলিতে তাঁর বেশ প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু কমন্সসভায় তিনি ছিলেন একটা স্বতন্ত্র অবস্থানে; হুইগ্ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তিনি ভোট দিতেন প্রায়ই। স্বভাবতই রিকার্ডোর পার্লামেণ্টারী ক্রিয়াকলাপে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছিল অর্থনীতি-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন। শস্য আইনের বিরুদ্ধে এবং অবাধ বাণিজ্য, জাতীয় ঋণ হ্রাস, আর ব্যাঙ্কিং এবং আর্থ ব্যবস্থা উন্নতির সপক্ষে তিনি লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রকাশনার স্বাধীনতার সপক্ষে এবং সভা-সমাবেশের অধিকার সীমাবদ্ধ করার বিরুদ্ধে বক্তব্যও দেখতে পাওয়া যায় তাঁর বক্তৃতাগুলির মধ্যে। অ্যাডাম স্মিথের মতো রিকার্ডোও রাজনীতিতে যথাসম্ভব পূর্ণ মাত্রায় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা সবাই বলেন, রিকার্ডো কমন্সসভায় বক্তৃতা করার সময়ে তাঁর বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনতেন সদস্যরা। সুদক্ষ বাগ্মী বলতে সাধারণত যা বোঝায় তা তিনি ছিলেন না। তবে বিভিন্ন ব্যাপার আর সমস্যার সামাজিক সারমর্ম উপলব্ধি করার জন্যে তাঁর চাড়, আর তাঁর লেখার যৌক্তিকতা এবং কার্যকরতা দেখা যায় পার্লামেণ্টে তাঁর বক্তৃতাগুলিতেও।

পার্লামেণ্টের অধিবেশন যখন চলত তখন রিকার্ডোর প্রায় সমস্ত সময়ই যেত পার্লামেণ্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে। এই কমাস তিনি লণ্ডনে থাকতেন। বাড়িতে সকাল কাটত পত্র-পত্রিকা পড়ে, চিঠি লিখে, বক্তৃতার মুসাবিদা করে, আগন্তুকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতে, তাছাড়া, কমিটি মিটিংয়ের জন্যে মাঝে-মাঝে যেতে হত ওয়েস্টমিন্‌স্টারে। কমন্সসভার অধিবেশন বসত বিকেলে, আর রিকার্ডো ছিলেন সবচেয়ে নিয়মিত এবং সময়নিষ্ঠ সদস্যদের

একজন। ১৮১৯ থেকে ১৮২৩ সাল অবধি তাঁর সমস্ত লেখাই সংশ্লিষ্ট ছিল পার্লামেণ্টের কাজকর্মের সঙ্গে। সবচেয়ে প্রধান লেখাগুলি ছিল শস্য আইন আর জাতীয় ঋণ প্রসঙ্গে।

তিনি পড়াশুনো করতে পারতেন শুধু গ্রীষ্মের কমাসে গ্যাটকোম্ব পার্কে, এখানকার বাসস্থানটা তাঁর সবচেয়ে ভাল লাগত। সেখানেই তিনি লেখেন ম্যালথাসের বইখানার সমালোচনা, নিজের 'মূলসূত্রগুলি'-র তৃতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করেন এবং মূল্য, ভূমি-খাজনা আর যন্ত্র ব্যবহারের আর্থনীতিক ফলাফল নিয়ে পরিচিন্তন চালিয়ে যান। ম্যালথাস, মিল, ম্যাক্‌কুলোখ এবং সে'-র সঙ্গে তাঁর ঘন-ঘন পত্রব্যবহার চলত। এই সময়ে রিকার্ডো ছিলেন ইউরোপীয় অর্থনীতি-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থলে। তাঁর বাড়িতে অর্থনীতিবিদদের নিয়মিত বৈঠক বসত, তার থেকে ১৮২১ সালে স্থাপিত হয় লণ্ডন অর্থশাস্ত্র ক্লাব, সেটাতে সবার স্বীকৃত প্রধান ছিলেন রিকার্ডো। প্রধান হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই শালীন, আর তিনি চলতেন খুবই বুদ্ধি-কৌশল অনুসারে।

মানবিক দিকটা
মানুষটির প্রতিকৃতি

এইসব প্রবল ক্রিয়াকলাপের মাঝে রিকার্ডোর মৃত্যু হয় হঠাৎ। ১৮২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মস্তিষ্কের প্রদাহ হয়ে তিনি মারা যান গ্যাটকোম্ব পার্কে। তখন তাঁর বয়স মাত্র একান্ন।

সাধারণ জীবনে কীরকমের মানুষ ছিলেন রিকার্ডো?

তাঁর চেহারার বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে: লম্বায় মাঝারি রকমের চেয়ে খাটো, রোগাটে কিন্তু সুগঠিত চেহারা এবং খুবই কর্মঠ; মুখখানা প্রীতিকর, তাতে বুদ্ধি সদাশয়তা আর আন্তরিকতার প্রকাশ; চোখ-দুটো ঘোর-ঘোর, অবহিত, হুঁশিয়ার; আচার-আচরণ সাদাসিধে এবং চিত্তাকর্ষক। যা জানা আছে তার থেকে বলা যায় অন্যান্যের সঙ্গে আলাপ-ব্যবহারে মানুষটি ছিলেন অমায়িক, প্রীতিকর। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করা তাঁর ধাতেই ছিল না, যদিও অর্থনীতি-বিজ্ঞান আর রাজনীতির বিভিন্ন প্রশ্নে তাঁদের সঙ্গে তাঁর মতভেদ ঘটত প্রায়ই।

সংসারী মানুষ হিসেবে, পরিবারের কর্তা হিসেবে সদগুণগুলি

রিকার্ডোর ছিল উঁচু মাত্রায়। তাঁর ছেলে-মেয়েরাই শুধু নয়, তাছাড়া তাঁর ছোট ভাই-বোনেরা, এমনকি স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনেরাও তাঁকে দেখতেন বিচক্ষণ এবং ন্যায়পর গুরুজন হিসেবে। (তাঁর ধন-সম্পদও হয়ত এই ব্যাপারে কিছুটা সংশ্লিষ্ট ছিল।) জীবনের শেষ বছরগুলিতে তিনি ছেলে-মেয়েদের মানুষ করার কাজে বিস্তর সময় দেন, বড় ছেলে এবং মেয়েদের বিয়ে দেন, মিটিয়ে দেন নানা পারিবারিক মনোমালিন্য। তাঁর বয়স মোটেই তত পরিণত ছিল না, তবু তাঁর নাতি-নাতনি এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে তাঁর ছেলে-মেয়েরা গ্যাটকোম্ব পার্কের অতিথিবৎসল বাড়িতে জড়ো হলে তাঁর মনে হত তিনি যেন বাইবেলের এক কুলপতির মতো। তাঁর প্রকাণ্ড বাড়িটা সবসময়ে লোকে গিজগিজ করত, তারা শুধু আত্মীয়-স্বজন নয়, তাছাড়াও হরেক রকমের অতিথি — লন্ডনে পরিচিত লোকজন, তাদের সঙ্গে তাদের পরিচিত লোকজন, প্রতিবেশী ভূস্বামীরা, ছেলে-মেয়েদের বন্ধুবান্ধব।

রিকার্ডো সুশিক্ষিত ছিলেন, তবে তাঁর জ্ঞান আর আগ্রহের পরিধি অ্যাডাম স্মিথের মতো অত সর্বব্যাপী ছিল না। এটাকে রিকার্ডোর ন্যূনতা বলা কঠিন। অর্থনীতি-বিজ্ঞানক্ষেত্রে ইতিহাসনির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের জন্যে সমগ্র মননশক্তি একটা ক্ষেত্রে নিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক ছিল। সর্বতোমুখ জ্ঞানলাভের চেষ্টা করতে গেলে স্বল্পকালের মধ্যে তিনি অর্থশাস্ত্রের জন্যে যা করলেন তেমনটা হয়ত করতে পারতেন না।

রিকার্ডো এবং মার্কস

মার্কস লিখেছেন: '...মূল্য, অর্থ আর পুঁজি সম্বন্ধে আমার তত্ত্ব সেটার মূলসূত্রগুলির দিক থেকে স্মিথ এবং রিকার্ডোর মতবাদের অত্যাবশ্যক অনুবৃত্তি।'* তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উভয় ইংরেজ অর্থনীতিবিদের প্রগাঢ় সমালোচনা করেন এবং নতুন প্রলেতারিয়ান অর্থশাস্ত্র গড়ে তোলেন সেটার ভিত্তিতে।

রিকার্ডোর তত্ত্ব সম্বন্ধে মার্কসের সমালোচনা হল সমালোচনা কত ন্যায়পর এবং গঠনমূলক হতে পারে তার আদর্শস্বরূপ। মার্কসের দীর্ঘ 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব'-র প্রায় তৃতীয়াংশ রিকার্ডো সম্বন্ধে। রিকার্ডো

---

* কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ১ খন্ড, ২৬ পৃঃ।

তাঁর নিজস্ব সঠিক প্রারম্ভিক সিদ্ধান্তসূত্রগুলিকে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বিস্তারিত করলে কিভাবে তাঁর যুক্তি দেখাতে হত, সেটা মার্কস দেখিয়েছেন: রিকার্ডোকে সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি এই কায়দাটা প্রয়োগ করেছেন বহু বার। ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের বিষয়গত, ইতিহাসক্রমে অবধারিত সীমাবদ্ধতাটাকে খুলে ধরেছেন মার্কস। রিকার্ডো ছিলেন মহা প্রতিভাবান, কিন্তু কাল আর শ্রেণীর খাড়া করা চৌহদ্দি ডিঙিয়ে যেতে পারে না কোন প্রতিভা। মার্কস রিকার্ডোর সমালোচনা করেন তিনি বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ বলে নয়; বৈজ্ঞানিক ধারণায় অসামঞ্জস্যের দরুন মার্কস তাঁর সমালোচনা করেন, ঐ ধারণাটা তো বুর্জোয়া না হয়ে পারে নি।

মার্কস কী গড়ে তুললেন স্মিথ আর রিকার্ডোর মতবাদের ভিত্তিতে?

শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বটাকে একটা প্রগাঢ় এবং যুক্তিসিদ্ধ তন্ত্রে পরিণত করে মার্কস মূলত নতুন অর্থশাস্ত্রের গোটা সৌধটাকে দাঁড় করান সেই ভিত্তিতে। যেসব অসংগতি আর কানাগলি রিকার্ডোকে পীড়া দিয়েছিল সেগুলো থেকে শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বটাকে মুক্ত করলেন মার্কস। পণ্যে নিহিত শ্রমের দ্বৈত স্বধর্ম — মূর্ত শ্রম এবং বিমূর্ত শ্রম — আবিষ্কার করে মার্কস তার বিশ্লেষণ করলেন, এই হল ব্যাপারটার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য। শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্ব অনুসারে এগিয়ে মার্কস আরও গড়ে তুললেন অর্থ-সংক্রান্ত তত্ত্ব, তাতে থাকল ধাতব মুদ্রা এবং কাগজী মুদ্রা পরিচলন-সংক্রান্ত ব্যাপারের ব্যাখ্যা।

শ্রমশক্তি একটা পণ্য হিসেবে সেটার স্বধর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে এবং শ্রমশক্তি কেনা-বেচার ঐতিহাসিক পরিবেশের রূপরেখা তুলে ধরে মার্কস উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব গড়ে তুললেন শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বের ভিত্তিতে এবং সম্পূর্ণত তদনুসারে। সেই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যাখ্যা করে দেখান হল যে, পুঁজি আর শ্রমের মধ্যে 'ন্যায্য', তুল্যমূল্য বিনিময়ের কাঠামের ভিতরে প্রকৃতপক্ষে যা ঘটে সেটা হল শ্রমিক শ্রেণীর উপর শোষণ।

মার্কসের বিবেচনায়, মুফত শ্রম এবং সেটার উৎপাদকে পুঁজির আত্মসাৎ করার সাধারণ আকারটা হল উদ্বৃত্ত মূল্য। রিকার্ডোর রচনায় দেখা যায় এই ধারণাটার অঙ্কুর — সেটাকে পূর্ণবিকশিত করে একক তন্ত্র হিসেবে গড়ে তোলা হল। এই তন্ত্রে স্থান পেল বিভিন্ন নির্দিষ্ট আকারের না-খেটে-করা আয় — লাভ, খাজনা আর ঋণের বাবত সুদ। প্রবলভাবে স্পষ্ট ফুটে উঠল বণ্টন-সংক্রান্ত প্রশ্নের শ্রেণীগত প্রকৃতিটা।

যা আগেই বলা হয়েছে, গড় লাভ এবং উৎপাদন-পরিব্যয় সংক্রান্ত তত্ত্ব দিয়ে মার্কস রিকার্ডোর 'অনিবার্য' অসংগতিটার নিরসন করে দিলেন। কিন্তু শুধু তাই নয়। এটা করার ভিতর দিয়ে তিনি বিপুল গুরুত্বসম্পন্ন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন: প্রত্যেকটি পুঁজিপতি সরাসরি 'তার' শ্রমিকদের শোষণ করলেও সমস্ত পুঁজিপতি যেন তাদের সবার উদ্বৃত্ত মূল্য একই ভাঁড়ে রেখে ভাগাভাগি করে নেয় নিজ-নিজ পুঁজি অনুসারে। আর্থনীতিক দিক দিয়ে, একটা সমগ্র সত্তা হিসেবে পুঁজিপতি শ্রেণীটার অবস্থান শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে।

ভূমি-খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডোর তত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত উপাদানগুলি কাজে লাগিয়ে মার্কস গড়ে তুললেন একটি প্রগাঢ় ধারণা যাতে ভূস্বামীদের একরকমের আয় হিসেবে খাজনা সম্বন্ধে এবং কৃষিতে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ-সংক্রান্ত নিয়মাবলির ব্যাখ্যা করা হয়।

সর্বব্যাপী অত্যুৎপাদন এবং সংকট অসম্ভব, এই মর্মে রিকার্ডো এবং সে'-র অভিমতটাকে মার্কস বাতিল করে দিলেন। সর্বপ্রথম তিনিই পুনরুৎপাদন তত্ত্বের মূলসূত্রগুলি বিবৃত করলেন এবং পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিতে পর্যাবৃত্ত সংকটের অনিবার্যতা দেখিয়ে দিলেন।

রিকার্ডোর অংশত ম্যালথাসের কাছ থেকে পাওয়া সামাজিক হতাশার জায়গায় এল পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়নের সাধারণ মার্কসীয় নিয়ম, যেটা স্বভাবতই আসে তাঁর সমস্ত শিক্ষা থেকে। পুঁজিতন্ত্রের উন্নতিশীল বিকাশের বিদ্যমান সম্ভাবনা, আর আখেরে বৈপ্লবিক উপায়ে পুঁজিতন্ত্রের পতন এবং সেটার জায়গায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার অবশ্যম্ভাবিতা, উভয়ই প্রতিপন্ন করলেন মার্কস।

রিকার্ডোর সময়ে — এবং পরে

অর্ধ-শতাব্দী আগে কেনের শিষ্যরা যেমন বলতেন একটি 'নতুন বিজ্ঞান' উদ্ভূত হবার কথা, ঠিক তেমনি রিকার্ডোর জীবনের শেষের বছরগুলিতে এবং তিনি মারা যাবার পরে 'নতুন বিজ্ঞান অর্থশাস্ত্রে'র কথা বলাটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ঠিক বটে রিকার্ডোর রচনাগুলিতে অর্থশাস্ত্র (বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনক্ষেত্রে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক) বিষয়টার রূপরেখা তুলে ধরা হল এবং বিস্তারিত করা হল অর্থশাস্ত্রের প্রণালী (বৈজ্ঞানিক বিমূর্তন)। মনে হল যথাযথ বিজ্ঞান এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিশেষক প্রলক্ষণগুলি একটা কিছু পরিমাণে এতে দেখা দিল। তবে অর্থশাস্ত্র হল একটা শ্রেণীগত বিজ্ঞান। অর্থনীতি-বিজ্ঞানীর মনোগত অভিপ্রায় যা-ই হোক, তাঁর ভাব-ধারণা সবসময়েই সরাসরি কোন একটা শ্রেণীর স্বার্থের আনুকূল্য করে ন্যূনাধিক পরিমাণে। রিকার্ডোর মতবাদ ছিল খোলাখুলি এবং স্পষ্টতই বুর্জোয়া। তবে ইংলণ্ডে শ্রেণীসংগ্রাম যখন প্রকোপিত হয়ে উঠেছিল তখন এই খোলাখুলি ভাব আর স্পষ্টতাই বুর্জোয়াদের আর খুশি করতে পারে নি: উনিশ শতকের চতুর্থ আর পঞ্চম দশকে — চার্টিস্ট আন্দোলনের সময়ে — সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সমগ্র সামাজিক আর রাজনীতিক জীবনের কেন্দ্রস্থল।

শতাব্দীর একেবারে মাঝামাঝি অবধি এবং তার পরেও ইংলণ্ডের বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে একটা প্রধান স্থানে ছিলেন রিকার্ডোর অনুগামীরা, তাঁরা ঐ নতুন পরিস্থিতিতে রিকার্ডোর মতবাদের অধিকতর সাহসিক এবং অপেক্ষাকৃত র‍্যাডিকাল দিকগুলি বর্জন করে মতবাদটাকে বুর্জোয়াদের স্বার্থের সঙ্গে মানিয়ে নিতে শুরু করেন। তাঁরা হয় রিকার্ডো সম্বন্ধে

মামুলি ভাষ্য লিখেই ক্ষান্ত দেন, নইলে সাফাইদারির ছোপ লাগিয়ে দেন তাঁর ভাব-ধারণায়।

বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে ইংলন্ডের নতুন আর্থনীতিক সাহিত্য সম্যক অধ্যয়ন করে মার্কস ১৮৫১ সালে এঙ্গেলসের কাছে লিখেছিলেন: 'Au fond [প্রকৃতপক্ষে], এ. স্মিথ আর ডি. রিকার্ডোর আমলের পরে এই বিজ্ঞানের কোন অগ্রগতি ঘটে নি, যদিও বিশেষ-বিশেষ গবেষণাক্ষেত্রে করা হয়েছে অনেককিছু, তার মধ্যে কিছু-কিছু খুবই সূক্ষ্ম-মার্জিত ধরনের কাজ।'*

বিশেষিত আর্থনীতিক বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছিল প্রচুর, তাতে প্রকাশ পায় পুঁজিতন্ত্রের দ্রুত উন্নয়ন এবং অর্থনীতির পৃথক-পৃথক দিক নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের বিষয়গত প্রয়োজন। অর্থনীতি-বিজ্ঞানের কঙ্কালটা হয়ে উঠছিল রক্তমাংসের শরীর। খুবই উন্নত হয়ে উঠেছিল পরিসংখ্যান, বিশেষত অনুক্রমণ প্রণালী। শিল্পের পৃথক-পৃথক শাখা গড়ে ওঠার বর্ণনা এবং বিশ্লেষণ করা হয়। মূর্ত-নির্দিষ্ট গবেষণা চালান হয় ভূমি-অর্থনীতি, দামের গতিবিধি, অর্থ পরিচলন এবং ব্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে। বিস্তর রচনা প্রকাশিত হল শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্বন্ধে। ঐ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে স্থায়িভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল অর্থশাস্ত্র।

এই সবকিছু হল বুর্জোয়া, অফিশিয়াল বিজ্ঞানের ব্যাপার। কিন্তু উনিশ শতকের তৃতীয় থেকে পঞ্চম দশকের ইংলন্ডে সেটার পাশাপাশি দেখা দেন অন্যান্য লেখক, যাঁদের মার্কস বলেন অর্থশাস্ত্রীদের প্রলেতারিয়ান প্রতিপক্ষ। রিকার্ডোর মতবাদের যেসব উপাদানকে ঘুরিয়ে ধরা যায় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সেগুলিকে তুলে নিয়ে তাঁরা কাজে লাগান।

মার্কসের আর্থনীতিক মতবাদ গড়ে তোলার কাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় এসেছিল উনিশ শতকের তৃতীয় থেকে পঞ্চম দশকের ইংলন্ডের অর্থশাস্ত্র। মার্কসের 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব'-র অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে ঐ কালপর্যায়ের ইংলন্ডের অর্থনীতিবিদদের অভিমতের বৈচারিক বিশ্লেষণ। মার্কসের শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্ব আর দাম-গঠন, লাভ তত্ত্ব এবং পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়নের সাধারণ নিয়ম প্রতিপন্ন করতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় এসেছিল এই সমালোচনা।

---

* Karl Marx, Friedrich Engels, 'Werke', Bd. 27, S. 228.

'বুর্জোয়া সমৃদ্ধির যুগটা' ইংলন্ডের মতো এত অমানবিক এবং কপটী হয়ে দেখা দেয় নি আর কোথাও। সমাজে মানুষে-মানুষে একমাত্র এবং ব্যাপক যোগসূত্র হল অর্থ। পুঁজি আছে কিনা এবং থাকলে সেটা কত, এটাই তখন ছিল মানুষের কদর স্থির করার একমাত্র মাপকাঠি। পঞ্চাশ থেকে এক-শ' বছর আগেও যেকোন গরিব মানুষ বহু সূত্রে সংশ্লিষ্ট থাকত তার জন্মস্থান এলাকার সঙ্গে, শেষ উপায় হিসেবে সে নির্ভর করতে পারত সম্প্রদায়ের সাহায্যের উপর, এমনকি জমিদারের আনুকূল্য পর্যন্ত পেতে পারত কখনও-কখনও, কিন্তু 'বুর্জোয়া সমৃদ্ধির যুগে' তার ভরসা করতে পারার মতো রইল না কিছুই। তখন সে প্রলেতারিয়ান, খাটুনির হাত দুখানা যার একমাত্র সম্পত্তি, পুঁজিপতির কাছে এই হাত-দুখানা বিক্রি করাই তার জীবনধারণের একমাত্র উপায়।

পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের শোষণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করল এবং তা পেল। নিজ কর্মজীবনের প্রথমার্ধে বুর্জোয়া রীত-রেওয়াজের তীব্র সমালোচক টমাস কার্লাইল সেই ব্যবস্থাটার নাম দিয়েছিলেন 'অরাজকতা যুক্ত কনস্টেবল'। এতে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, পুঁজিপতিদের টাকা করার এবং তারা যেমনটা উপযুক্ত মনে করে সেইভাবে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করার পূর্ণ স্বাধীনতা রাষ্ট্র তাদের দেয়, কিন্তু এই 'স্বাধীনতা' এবং ব্যক্তিগত মালিকানায় পাহারা দেবার কাজটা করে পুলিসের সাহায্যে।

এই কার্লাইল-ই অর্থশাস্ত্রকে প্রথমে বলেছিলেন dismal science ('ম্লানিময় বিজ্ঞান')। এটা দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি? — এক, যা আমাদের জানা আছে, রিকার্ডীয় অর্থশাস্ত্র ছিল একেবারেই ভাবাবেগবর্জিত। শ্রমিকদের নিদারুণ অবস্থার কথা তাতে গোপন করা হয় নি, কিন্তু সেটাকে স্বাভাবিক বলে ধরা হয়েছে। দুই, এদিক দিয়ে সেটা ম্যালথাসের কাছাকাছি, তাতে জনসংখ্যা আর প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে যুগযুগান্তরের ব্যবধানটা গরিবির প্রধান কারণ বলে গণ্য, কাজেই সেটার দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

তবে অর্থশাস্ত্র মোটেই ম্লানিময় বিজ্ঞান ছিল না ইংরেজ ধনকুবেরদের পক্ষে। তারা মনে করত স্মিথ আর রিকার্ডোর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান তাদের আরও ঝটিতি ধনী হয়ে ওঠার উপায়াদি বের করতে সহায় হবে। এই

বিবেচনা অনুসারে ব্যাখ্যাত অর্থশাস্ত্রের জনপ্রিয়তা প্রকাশ পেয়েছিল নানা ব্যঙ্গকৌতুকের আকারে। মারিয়া এজওয়ার্থের দেওয়া একটা বিবরণে আছে, উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে অর্থশাস্ত্র নিয়ে কথাবার্তা বলাটা লন্ডনের লেডিদের মহলে খুবই কেতাদুরস্ত হয়ে উঠেছিল। ধনী মহিলাদের দাবি ছিল তাঁদের মেয়েদের গৃহশিক্ষিকাদের এই বিষয়টা শেখাতে পারা চাই। ফরাসী আর ইতালীয় ভাষা, সংগীত, ড্রয়িং, নাচ, ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানে নিজেকে সুসজ্জিত মনে করতেন এমন একজন গৃহশিক্ষিকা ঐ অনুরোধটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে ইতস্তত করে বলেছিলেন, 'না ম্যাডাম, আমি অর্থশাস্ত্র পড়াই এমন কথা তো বলতে পারি নে, তবে কিনা, আপনি উপযুক্ত মনে করলে আমি সেটা শেখার চেষ্টা করব।' তাঁর জবাব: 'না গো ম্যাডাম, আপনি যখন ওটা পড়ান না, আপনাকে দিয়ে আমার কাজ চলবে না।'

'ধনী হবার বিজ্ঞানে' সরাসর ঠেকনো দিতে পারে এমন একটা দর্শন ইংরেজ বুর্জোয়াদের দরকার হয়ে পড়েছিল। এই দর্শনটা হল নীতিবিদ্যায় উপযোগবাদ, আর এপিস্তেমলজি (জ্ঞানতত্ত্ব)-তে দৃষ্টবাদ। উপযোগবাদের প্রবর্তক হলেন জেরেমি বেন্থাম। বেন্থামের (utilitarianism) উপযোগবাদটা (ল্যাটিন utilitas থেকে — প্রয়োজন সাধন-সংক্রান্ত দর্শন) বহিঃপ্রকৃতি এবং মানুষের আচরণ সম্বন্ধে হেলভেশিয়াস এবং স্মিথের গড়ে-তোলা মতের সঙ্গে ইতিহাসক্রমে সংশ্লিষ্ট। মানুষ স্বভাবতই আত্মপরায়ণ। আর্থনীতিক সিদ্ধান্ত সমেত যেকোন সিদ্ধান্তের সারমর্মটা এই যে, সুবিধা আর অসুবিধাগুলোকে (পরিতোষ আর কষ্ট, লাভ আর ক্ষতি) সে মনে-মনে বিবেচনা করে নেয়, তাতে সে চেষ্টা করে যাতে আগেরটা হয় সবচেয়ে বেশি, আর সবচেয়ে কম হয় পরেরটা। অবাধে যুক্তিযুক্ত বাছনটা করলে সে সবচেয়ে কৃতকার্য হয়। এটার জন্যে সবচেয়ে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করাই সমাজ, রাষ্ট্র এবং আইনপ্রণেতাদের লক্ষ্য। সমাজ তো ব্যক্তিসমষ্টি মাত্র। প্রত্যেকটি ব্যক্তির লাভ, পরিতোষ আর সুখ যত বেশি হয়, ততই বেশি 'সমগ্র সুখ' হবে সমাজে। 'সবচেয়ে বেশি মানুষের জন্যে সবচেয়ে বেশি সুখ' — এই কুখ্যাত ধরতাই বুলিটা তুলেছিলেন বেন্থাম। এই দর্শন থেকে আসে ব্যক্তিবাদের মূলসূত্র, যেটা পুরোপুরি আত্তীকৃত হয় বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রে: প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সংগ্রামে প্রত্যেকে তার নিজের জন্যে। পুঁজিপাতির অবাধে শ্রমশক্তি কেনার এবং শ্রমিকের অবাধে সেটা বেচার সুযোগ থাকা চাই।

এতে ধরে নেওয়া হয় প্রত্যেকে নিজের পক্ষে সবচেয়ে লাভজনক ধরনে এই লেন-দেন করবে।

'হিসাবকষিয়ে মানুষ' সংক্রান্ত এই ধারণাটাকে কয়েক দশক পরে গ্রহণ করে অর্থশাস্ত্রের বিষয়ীগত সম্প্রদায়। বিভিন্ন পণ্য ভোগ-ব্যবহার থেকে পাওয়া পরিতোষের বিভিন্ন মাত্রার তুলনা করা, শ্রমের 'অনুপযোগ' (ভার)-এর সঙ্গে মজুরির উপযোগের তুলনা করা, ইত্যাদি হল এই সম্প্রদায়টার বিবেচনায় প্রধান আর্থনীতিক প্রশ্ন।

সাধারণভাবে বললে, বেন্থামের উপযোগবাদটা গোড়ায় ছিল প্রগতিশীল, কেননা এতে বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধ্যান-ধারণা তুলে ধরা হয় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে। তবে বেন্থামপন্থীদের পরিমিত উদারপন্থী দাবিদাওয়া যখন অনেকাংশে মিটল, আর পক্ষান্তরে বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েতের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম প্রকোপিত হয়ে উঠল তখন উপযোগবাদের আর দাঁড়াবার জায়গা রইল না, সেটা মিলেমিশে গেল পুঁজিতন্ত্রের সাফাইদার মতধারার মধ্যে।

দৃষ্টবাদ (positivism — ল্যাটিন positivus থেকে) হল উনিশ শতকের পশ্চিম-ইউরোপীয় দর্শনের ক্ষেত্রে একটা মোটা-দাগের মতধারা। ইংলন্ডে এটা অনেক আগেকার, হিউমের অজ্ঞেয়বাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। এই সব ধ্যান-ধারণা অনুসারে, তথ্যাদির স্রেফ বিবরণ দেওয়া এবং সেগুলিকে সুবিন্যস্ত করাই বিজ্ঞানের কাজ, তা ছাড়িয়ে গেলে সেটা নিরর্থক 'অধিবিদ্যা'। এটা হল বুর্জোয়াদের টাকা হাতানোর সচেতন বিষয়বুদ্ধিগত স্থূল দর্শন। সবচেয়ে বিশিষ্ট দৃষ্টবাদী দার্শনিক হলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। মিলের আর তাঁর যুগের (মধ্য-উনিশ শতক) অর্থনীতি তত্ত্বের এবং বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের তৎপরবর্তী বিকাশেরও ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় দৃষ্টবাদী দর্শন।

ম্যালথাস এবং ম্যালথাসবাদ

ম্যালথাস অর্থশাস্ত্রের ইতিহাসে একটি জঘন্য চরিত্র। তাঁর 'জনসংখ্যা তত্ত্ব প্রসঙ্গে নিবন্ধ' প্রকাশিত হবার পরে কেটে গেছে প্রায় ২০০ বছর, তবু তাঁর ধ্যান-ধারণা এবং তিনি নিজে এখনও গরম-গরম ভাবাদর্শগত এবং রাজনীতিক আলোচনার বিষয়বস্তু। সমাজব্যবস্থা যা-ই হোক সেটা নির্বিশেষে অতিপ্রজতাই মানুষের সমস্ত দুর্গতি-দুর্দশার কারণ, এমনটা যাতে নিশ্চয়

করে বলা হয় সেই জনসংখ্যা তত্ত্বই ম্যালথাসবাদ, যেটার সূত্রপাত করেন টমাস রবার্ট ম্যালথাস। উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রশ্নে পুঁজিতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের মধ্যে ভাবাদর্শগত সংগ্রামে ম্যালথাসবাদের ভূমিকাটা বর্তমানে খাটো নয়। প্রতিক্রিয়াশীল ম্যালথাসবাদীরা নিশ্চয় করে বলছে, অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং জনসংখ্যার অতি দ্রুত বৃদ্ধিই এইসব দেশের কেন্দ্রী সমস্যা: এই সমস্যাটার সমাধান এবং ন্যূনকল্প মূলত বুর্জোয়া সংস্কার এইসব দেশের 'উন্নত সমাজে পৌঁছবার পথ' খুলে দিতে পারে (এই 'উন্নত সমাজ'টা অবশ্য পুঁজিতান্ত্রিক)। মার্কসবাদীরা বলছেন, এই দেশগুলির আর্থনীতিক অনগ্রসরতা যথাসম্ভব দ্রুত ঘোচাতে হলে অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পথে কিছু-কিছু আমূল সামাজিক রূপান্তর অবশ্যপ্রয়োজনীয়। জন্ম-হার এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের কোন একটা কর্মনীতি ফলপ্রদ হতে পারে সেই পরিস্থিতিতে সেই কাঠামের ভিতরে। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির পরস্পর বৈপরীত্য স্পষ্টপ্রতীয়মান।

এই বিজ্ঞানক্ষেত্রে ম্যালথাসের স্থানটা নির্ধারিত হচ্ছে দুটো উপাদান দিয়ে: তাঁর জনসংখ্যা 'নিয়ম', আর রিকার্ডোর সমালোচক আর সাহায্যকারী, বিরুদ্ধবাদী এবং বন্ধু হিসেবে তাঁর অদ্ভুত ভূমিকা।

সারি-র গিল্ডফোর্ডে ম্যালথাসের জন্ম হয় ১৭৬৬ সালে, তিনি হলেন একজন শিক্ষিত ভূস্বামীর মেজ ছেলে। ইংরেজ পরিবারের ভূসম্পত্তি সন্তান-সন্ততির মধ্যে ভাগাভাগি হয় না বলে তিনি কিছুই পান না, কিন্তু তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন উত্তম, সেটা প্রথমে বাড়িতে, পরে কেম্ব্রিজে জিসাস কলেজে। কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে তিনি অ্যাংলিকান চার্চের একজন যাজক হন এবং একটা গ্রাম্য যাজকপল্লীতে সহকারী যাজকের পদ পান। ১৭৯৩ সালে তিনি জিসাস কলেজে 'ফেলো' হন, এই পদে তিনি ছিলেন ১৮০৪ সালে বিয়ে করা অবধি: কৌমার্য ছিল এই ফেলোশিপের একটা শর্ত।

তরুণ ম্যালথাসের বিস্তর সময় কাটত বাবার বাড়িতে, বাবার সঙ্গে তিনি দর্শন আর রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা আর তর্ক-বিতর্ক করতেন, তার কোন শেষ ছিল না। এটা অদ্ভুত মনে হতে পারে, বুড়ো বাপ ছিলেন উৎসাহী-উদ্যমী, আশাবাদী, আর জোয়ান ছেলেটি — সন্দেহবাদী, দুঃখবাদী। বাবার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক চালাবার জন্যে যুক্তির সন্ধান চালাতে-চালাতে ম্যালথাস আঠার শতকের কোন-কোন লেখকের রচনায় পান এই

ধারণাটা: জীবনীয় দ্রব্য-সামগ্রী যেমনটা বাড়ে তার চেয়ে দ্রুত লোকে বংশবৃদ্ধি করে, আর জনসংখ্যাবৃদ্ধি বন্ধ করা না হলে সেটা প্রতি ২০-২৫ বছরে দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ম্যালথাসের মনে হয় খাদ্য উৎপাদন অমন চড়া হারে বাড়তে পারে না সেটা তো একেবারেই স্পষ্ট। তার মানে প্রাকৃতিক শক্তিগুলো মানুষকে গরিবি থেকে নিষ্কৃতি পেতে দেবে না। গরিব মানুষের অপরিমিত বংশবৃদ্ধিই সমাজে তাদের শোচনীয় অবস্থার প্রধান কারণ। এই কানাগলি থেকে বেরবার পথ নেই। এ ব্যাপারে কোন বিপ্লবে কিছুই ফায়দা হবার নয়।

১৭৯৮ সালে ম্যালথাস একখানা ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করেন 'An Essay on the Principle of Population as It Affects the Future Improvement of Society' ('সমাজের ভবিষ্য উন্নতির উপর জনসংখ্যা নিয়ম প্রসঙ্গে নিবন্ধ')। তীব্রভাবে আপসহীন থেকে, এমনকি অসূয়াপর হয়ে তিনি বিবৃত করেন নিজ অভিমত। যেমন তিনি লেখেন: 'যে-জন ভূমিষ্ঠ হয় আগেই দখল-করা জগতে সে যদি জীবনীয় দ্রব্য-সামগ্রী পেতে না পারে বাপ-মায়ের কাছ থেকে, যাদের কাছে সে ন্যায্য দাবি করতে পারে, আর সমাজ যদি তার শ্রম না চায়, খাদ্যের সামান্যতম বরাদ্দও দাবি করার **অধিকার** তার নেই, যেখানে সে রয়েছে সেখানে তার থাকার কোন অছিলাই প্রকৃতপক্ষে নেই। জীবনধারণের ভূরিভোজে তার জন্যে কোন পাত করা হয় না। প্রকৃতি তাকে দূর হয়ে যেতে বলে এবং নিজ হুকুম তামিল করে অগৌণে।'*

ম্যালথাস হয়ত সেই জাতের ইংরেজ জেন্টলম্যানদের একজন যারা তাদের শ্রেণী এবং জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয়ী, যারা গরিব দুর্ভাগা অসমর্থ মানুষের সম্বন্ধে সমস্ত অস্ফুট কথা ঘৃণা করে, যারা অচঞ্চল, স্থৈর্যসহকারে, সাদা দস্তানা আর নিখুঁত কেতাদুরস্ত ফ্রক্‌কোট প'রে কল-কারখানায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর সিপাহী-নিধন উভয় ক্ষেত্রে হাজির থাকতে পারে। এদের বিবেচনায় নিষ্ঠুরতা একটা যুক্তিসম্মত অপরিহার্য ব্যাপার, আর মানবিকতা — বিপজ্জনক কল্পনাবিলাস।

---

* J. M. Keynes, 'Essays and Sketches in Biography', New York, 1956, p. 26 থেকে উদ্ধৃত। কয়েকটা পরবর্তী সংস্করণ থেকে এই অংশটা বাদ দেওয়াটাকে ম্যালথাস আবশ্যক মনে করেছিলেন।

প্রসঙ্গত বলি, ম্যালথাসের সমসাময়িকদের অনেকে বলেছেন তিনি ছিলেন মিশুক, এমনকি প্রীতিপাত্র: রিকার্ডোর সঙ্গে বন্ধুত্ব থেকে সেটা প্রতিপন্ন হয়। তাঁর স্থৈর্য আর প্রশান্ত ভাবটা ছিল খুবই লক্ষণীয়। তাঁকে কেউ রাগত, আনন্দে আত্মহারা কিংবা মনমরা দেখে নি কখনও। তাঁর রূঢ় অভিমতের জন্যে তাঁর যে-সমালোচনা হয়েছিল তাতে তিনি নির্বিকার ভাব দেখাতে পেরেছিলেন (হয়ত তেমনি ভান করেছিলেন) ঐ গুণটা ছিল বলে।

ইংরেজদের উপর ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবের কথা ভেবে আতঙ্কিত ইংরেজ শাসক শ্রেণী যা চাইছিল সেটা ঠিক ম্যালথাসের ঐ বইখানাই। বইখানার সাফল্য দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন ম্যালথাস নিজেই, তিনি নতুন সংস্করণ প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন। নিজ তত্ত্বের সমর্থনে মালমশলা সংগ্রহ করতে তিনি যান বিদেশে। প্রথম সংস্করণ থেকে খুবই পৃথক হল দ্বিতীয়টা: এটা হল একটা বিস্তৃত নিবন্ধ, তাতে নানা অবান্তর ইতিহাস পরিক্রমা, বিভিন্ন লেখকের সমালোচনা, ইত্যাদি। ম্যালথাসের জীবনকালে এই 'নিবন্ধ'-র ছ'টা সংস্করণ প্রকাশিত হয়, শেষ সংস্করণটার আকার প্রথমটার চেয়ে পাঁচগুণ বেশি!

তখন ঈস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির সবে প্রতিষ্ঠিত কলেজে আধুনিক ইতিহাস এবং অর্থশাস্ত্রের প্রফেসরের পদে ম্যালথাস নিযুক্ত হন ১৮০৫ সালে। এই কলেজে যাজকের কাজও করতেন তিনি। অর্থশাস্ত্র ক্লাবের বৈঠকগুলিতে তিনি হাজির থাকতেন নিয়মিতভাবে, সেখানে তিনি সবসময়ে রিকার্ডো আর জেম্‌স মিলের বিরোধিতা করতেন। ভূমি-খাজনা সম্বন্ধে নিজের রচনা ম্যালথাস প্রকাশ করেন ১৮১৫ সালে, আর ১৮২০ সালে 'অর্থশাস্ত্রের মূলসূত্রগুচ্ছ', এই বইখানার বেশির ভাগটা জুড়ে থাকে রিকার্ডোর সঙ্গে তাঁর তর্ক। ম্যালথাসের লেকচার আর বক্তৃতাগুলো নীরসতা আর গোঁড়ামির জন্যে বিশিষ্ট। তাঁর কথা বলায় একটা খুঁত ছিল আজন্ম — এই কারণেও তাঁর বক্তৃতাদি শোনাটা কষ্টকর ছিল। রাজনীতিক মতের দিক থেকে তিনি ছিলেন হুইগ্, কিন্তু খুবই নরমপন্থী, যিনি সবসময়েই খুঁজতেন মাঝামাঝি নিরাপদ পন্থাটা, এটা তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে একখানা ইংরেজী জীবনী অভিধানে। ম্যালথাসের সন্তান-সন্ততি ছিল তিনটি। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি হঠাৎ মারা যান ১৮৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে।

ম্যালথাসীয় জনসংখ্যা তত্ত্বটাকে বাজে কথা কিংবা স্থূল ধর্মীয় সাফাইদারি বলে উড়িয়ে দেওয়াটা ঠিক নয়। ডেভিড রিকার্ডো এবং চার্লস ডারউইনের মতো মানুষও তাঁদের চিন্তনের উপর সেটার প্রভাবের কথা বলেছেন। মার্কস এবং এঙ্গেলস লিখেছেন, পুঁজিতন্ত্রের আদত দোষ-ত্রুটি আর অসংগতি তাতে প্রকাশ পেয়েছে — যদিও বিকৃত আকারে।

ম্যালথাস বললেন, জীবনীয় দ্রব্য-সামগ্রী যতটা বাড়ে, জনসংখ্যা তার চেয়ে দ্রুত বাড়ার প্রবণতা থাকে। এটা 'প্রমাণ করতে' তিনি পাঠকের মাথায় কষে বাড়ি মারলেন তাঁর কুখ্যাত গাণিতিক শ্রেণী-নিয়মের হাতুড়িটা দিয়ে: প্রতি পঁচিশ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে পারে, কাজেকাজেই সেটা বাড়ে গুণোত্তর শ্রেণীর সংখ্যামালার মতো — ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪... যেখানে, তাঁর মতে, একই রকমের কালপর্যায়গুলিতে জীবনীয় দ্রব্য-সামগ্রী বাড়তে পারে বড়জোর সমান্তর শ্রেণীতে —১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭... 'দুই শতাব্দীতে জনসংখ্যা আর জীবনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর অনুপাত হবে ২৫৬:৯, তিন শতাব্দীতে ৪০৯৬:১৩, আর দু'হাজার বছরে অনুপাতটা যা দাঁড়াতে পারে সেটা প্রায় অসংখ্যেয়।'*

ম্যালথাস বোধহয় ছিলেন উত্তম মনোবিৎ, তাই এমনসব সহজ-সরল এবং চমকপ্রদ উদাহরণের জোরটা তিনি বুঝতেন। এটা একটা প্রবণতা মাত্র, সেটা পাঠক ভুলে যেতে পারে, তাই যেখানে মানুষের বসবাস করা কিংবা কাজ করার তো কথাই নেই, দাঁড়াবারও জায়গা নেই এমন ধরাধামের এই দিব্যচিত্রখানা সামনে দেখে তার মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা অসম্ভব, এই কথা বলে লেখক তাঁর পাঠকের কল্পনাটাকে কিছুটা প্রশমিত করেন: প্রবণতাটা যাতে বাস্তব হয়ে না দাঁড়ায় তার ব্যবস্থা করে প্রকৃতি নিজেই। প্রকৃতি সেটা করে কিভাবে? যুদ্ধ, রোগ, গরিবি এবং দুরাচারের সাহায্যে। ম্যালথাসের বিবেচনায় ওগুলো সবই মানুষের পাপবুদ্ধির জন্যে, উৎপাটনের অসাধ্য কামপ্রবৃত্তির জন্যে স্বাভাবিক (তিনি বলতে চান — বিধিনির্দিষ্ট) শাস্তি। অন্য কোন উপায় কি সত্যিই নেই? হ্যাঁ

---

* T. R. Malthus, 'An Essay on the Principle of Population', Vol. I, London, 1862, p. 11.

আছে — বললেন ম্যালথাস তাঁর বইখানার দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে শুরু করে: সেটা হল 'নিবর্তনমূলক সংযম', অর্থাৎ, সাদা কথায়, জিতেন্দ্রিয়তা। বিলম্বে বিবাহ, কৌমার্য এবং বৈধব্য সম্বন্ধে ম্যালথাস সপ্রসংশ। কিন্তু তিনি যতসব আশ্বাস দেন তা সত্ত্বেও এইসব উপায়ের ফলপ্রদতা সম্পর্কে ম্যালথাস বাস্তবিক বিশ্বাস করতেন না নিজেই, তাই আবারও তিনি নির্দিষ্ট নিরোধের অপরিহার্যতার কথায় ফিরে যান। লক্ষ্য করার মতো একটা ব্যাপার: গর্ভনিরোধক উপায়-উপকরণ নিয়ে ইতোমধ্যে তখনই লোকে বলাবলি করছিল, কিন্তু তিনি সেটার পক্ষে ছিলেন না। এমন উপায়ে জন্ম-হার সংযত করাটা তাঁর মতে প্রকৃতির অর্থাৎ ঈশ্বরের এখতিয়ারে হস্তক্ষেপ বলে তিনি সেটাকে নাকচ করে দেন। ম্যালথাসের ব্যবস্থাটায় অতিপ্রজতা মানুষের জীবনে একটা অভিসম্পাতই শুধু নয়, সেটা একরকমের আশীর্বাদও বটে — স্বভাবত অলস শ্রমিককে কাজে প্রবৃত্ত করাবার জন্যে ঐশ্বরিক কশা। শ্রমিকেরা সবসময়েই সংখ্যায় অত্যধিক, শুধু তাদের মধ্যে অবিরাম প্রতিযোগিতার ফলেই তারা কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়।

ম্যালথাসের তত্ত্বটা অত্যন্ত অনমনীয় এবং গোঁড়ামিদুষ্ট। পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের কোন একটা পর্বে যা সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা, যেটা কোনক্রমেই প্রামাণিক নয়, সেটাকে তিনি যেকোন যুগ এবং যেকোন সমাজব্যবস্থার পক্ষে সর্বাত্মক নিয়ম হিসেবে তুলে ধরতে চান।

সর্বোপরি কথাটা হল এই যে, অবাধ জননের প্রবণতাটাকে স্রেফ জীবনীয় উপকরণের ঊনতা দিয়ে এবং সেটা থেকে উদ্ভূত ম্যালথাসীয় দৈত্য-দানোগুলোর সাহায্যে দমন করা যায়, তা ঠিক নয়। ম্যালথাস বলতে চান, জীবনীয় উপকরণের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেটার প্রতিক্রিয়া হিসেবে জন্ম-হার এবং জনসংখ্যা বাড়তে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত যখন জীবনীয় উপকরণের বৃদ্ধিটা অকার্যকর হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এই প্রবণতাটা অনপেক্ষ নয়। সমাজ বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্বে সেটার জায়গায় আসতে পারে ঠিক বিপরীত প্রবণতাটা: জীবনীয় উপকরণ বাড়লে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নীত হলে সেটা জন্ম-হার এবং স্বাভাবিক জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমাতে সহায়ক হয়। বর্তমানে পশ্চিমের ধনী দেশগুলিতে এই বৃদ্ধির হারটা এশিয়া আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকার গরিব দেশগুলিতে যা তার অর্ধেক থেকে তৃতীয়াংশ মাত্র। জানাই আছে, গত বিশ-পঁচিশ বছরে

জাপানে আর্থনীতিক অগ্রগতি ঘটেছে বিস্তর, যদিও সেখানে জন্ম-হার অর্ধেকটা কমে গেছে।

জনসংখ্যা আর গণদারিদ্র্যের মধ্যে 'নিয়তিনির্দিষ্ট' সম্পর্কটাকে ঘুচিয়ে দেয় সমাজতন্ত্র। বৈষয়িক সম্পদের উৎপাদনে এবং সার্ভিসের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব দ্রুত বৃদ্ধি ঘটায় এই নতুন সমাজব্যবস্থা, আর সেগুলির অপেক্ষাকৃত ন্যায়পর বণ্টনও ঘটায়। তার সঙ্গে সঙ্গে এই সমাজ নিশ্চিত করে মানুষের কল্যাণ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারী-পুরুষের সাচ্চা সমতা, দ্রুত সাংস্কৃতিক অগ্রগতি, আর এইভাবে যুক্তিসম্মত এবং মানবিক উপায়ে জনসংখ্যা নিয়ামনের পথ খুলে দেয়। **সর্বোপযোগী জনসংখ্যা** বজায় রাখা, অর্থাৎ যাতে উৎপাদন আর ভোগ-ব্যবহার সর্বোচ্চ মাত্রায় তোলা যায় এবং সবার সুখ-সমৃদ্ধির জীবন নিশ্চিত হয় জনসংখ্যার এমন বৃদ্ধি ঘটানো সংক্রান্ত সমস্যাটা হল মানবজাতি সবচেয়ে মস্ত-মস্ত যত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সেগুলোরই একটা, আর সেটার সমাধান সম্ভব হয়ে ওঠে সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজমেরই আমলে।

জনসংখ্যা আর সংগতি-সংস্থানের মধ্যে চিরন্তন দ্বন্দ্বক্ষেত্রে দ্বিতীয় ম্যালথাসীয় মল্লের কথায় এবার আসা যাক — সেটা হল জীবনীয় উপকরণের সমান্তর শ্রেণীর বৃদ্ধি। এ ব্যাপারে ম্যালথাস আরও বেশি বেঠিক।

বাস্তবিকপক্ষে তিনি যে-চিত্রটা তুলে ধরেছেন সেটা মোটামুটি নিম্নলিখিতরূপ। ধরা যাক, একটা জমি-বন্দ থেকে একজনের জীবিকানির্বাহ হয়। সে বছরে ২০০ কর্মদিন শ্রম দেয়, আর জমি-বন্দটা থেকে পায় ধরা যাক ১০ টন গম, যেটা তার পক্ষে কোনমতে যথেষ্ট। সেখানে এল আর একজন (হতে পারে একটি সাবালক পুত্র) — সে আরও ২০০ কর্মদিন খাটল সেই একই জমি-বন্দে। ফসল কি উঠবে দ্বিগুণ — ২০ টন? ম্যালথাস মনে করেন, ঠিক তা নয়; সেটা বেড়ে ১৫ কিংবা ১৭ টন হলেই উত্তম। সেখানে তৃতীয় লোক এলে অতিরিক্ত ২০০ কর্মদিন বাবত তাদের আগম হবে আরও কম। কাউকে চলে যেতে হবে।

এই হল প্রাথমিক আকারে তথাকথিত ঊন-আগম নিয়ম, বা মাটির ক্রম-ঊন উর্বরতা নিয়ম, যেটা হল ম্যালথাসের মতবাদের ভিত্তি। আছে কি এমন কোন নিয়ম? বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের এমন কোন অনপেক্ষ এবং সর্বব্যাপী নিয়ম নেই। কোন-কোন আর্থনীতিক পরিবেশে এমন কোন-কোন পরিস্থিতি এবং ব্যাপার দেখা দিতে পারে যাতে ব্যয়বৃদ্ধির সমানুপাতিক

উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটে না। কিন্তু এটা কোনক্রমেই সর্বব্যাপী নিয়ম নয়। এটা হল বরং অর্থনীতির সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে একটাকিছু গোলযোগ ঘটেছে বলে অর্থনীতিবিদ কিংবা ইঞ্জিনিয়রদের উদ্দেশে সংকেত।

উল্লিখিত উদাহরণটায় চিত্রিত করা হয়েছে একেবারেই প্রকল্পিত এবং কৃত্রিম একটা পরিস্থিতি, তাতে মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদ সদ্ব্যবহার করার প্রশ্নটা নিয়ে বিবেচনা সম্পূর্ণ হয়ে যায় না। এখানে যে শ্রমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা হয় উৎপাদনের কোন-কোন উপকরণের সঙ্গে একত্রে। এই সংযোগটা ঠিকভাবে বেছে নেওয়া হলে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ কর্মকাল থেকে পাওয়া আগম কমে না। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, তার ফলে শ্রমের জোটে ক্রমেই বেশি-বেশি উৎপাদনকর যন্ত্রপাতি আর প্রণালী। আলোচ্য জমি-বন্দটাকে আশপাশের কতকগুলো জমি-বন্দের সঙ্গে সংযুক্ত করা যেতে পারে, তাহলে উৎপাদনের পরিসরবৃদ্ধি, উন্নততর সংগঠন, বিশেষীকরণ এবং প্রযুক্তির আরও ফলপ্রদ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে আগম খুব সম্ভব বাড়ে।*

পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে কৃষি উন্নয়নের পরবর্তী বিকাশের ইতিহাসে ম্যালথাসের মতবাদ এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো খণ্ডিত হয়ে গেছে। ভূমি-সংক্রান্ত প্রশ্নে বিভিন্ন রচনায় ভ. ই. লেনিন সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন বারবার:

* 'উন-আগম নিয়মে' এইসব স্পষ্টপ্রতীয়মান আপত্তি বিবেচনায় রেখে আধুনিক বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা সেটার ক্রিয়াক্ষেত্রটাকে ম্যালথাস যা করেছিলেন তার চেয়ে অনেকটা গুটিয়ে নেন। এঁরা বলেন, উৎপাদনের অন্যান্য কারক উপাদানের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের সঙ্গে-আলোচ্য কারক উপাদানটায় একটা বর্ধিত পরিমাণ যোগ করা হলে, কেবল তখনই ঐ 'নিয়মটা' সক্রিয় হয়। জানাই আছে, উৎপাদনের মূল কারক উপাদানগুলো বলতে বোঝায় শ্রম পুঁজি আর ভূমি। উল্লিখিত উদাহরণে এমন একটা পরিস্থিতি চিত্রিত হয়েছে যেটা স্পষ্টত একেবারেই অবাস্তব। এতে ধরে নেওয়া হয় যে, ভূমি আর পুঁজি (উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ) থাকে অপরিবর্তিত, আর বদলায় শুধু শ্রমের পরিমাণ। তবু 'উন-আগম নিয়ম'টাকে এখনও কোন-না-কোন আকারে কাজে লাগায় ম্যালথাসপন্থীরা। এই 'নিয়ম' টাকে নাকচ করে দিয়ে মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদেরা কিন্তু উৎপাদন-পরিব্যয় বাবত আগম (স্বাভাবিক আকারে উৎপাদনবৃদ্ধি) সংক্রান্ত বাস্তব এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটাকে তুচ্ছ করেন না কোনক্রমেই। উল্লিখিত কারক উপাদানগুলি (এবং আরও বহু কারক উপাদান) অনুসারে আগম বিভিন্ন হয়। বিনিয়োজিত পুঁজির প্রতি রুবল, প্রতি কর্মদিনের শ্রম এবং ভূমির প্রতি হেক্টর বাবত আগম বাড়াবার কাজটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ফলপ্রদতা উন্নীত করার জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিরই একটা।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমশক্তি আপেক্ষিকভাবে (কোন-কোন ক্ষেত্রে এমনকি অনপেক্ষভাবেই) কমিয়ে কৃষি উৎপাদ অনেকটা বাড়ান সম্ভব হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কৃষিক্ষেত্রে ঐ একই অভিমুখে সমানই লক্ষণীয় বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটছে উত্তর আমেরিকায় এবং পশ্চিম ইউরোপে। এর থেকে আবার নতুন করে প্রতিপন্ন হচ্ছে এই ব্যাপারটা: জীবনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর 'উন-উৎপাদন'-এর দরুন নয়, একটা ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিতন্ত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে এই ব্যবস্থাটা যেসব সামাজিক দ্বন্দ্ব-অসংগতির উদ্ভব ঘটায় সেগুলোরই দরুন।

প্রলেতারিয়েতের একাংশকে 'বাড়তি' করে ফেলা এবং স্থায়ী বেকারবাহিনী সৃষ্টি করার প্রবণতাটা পুঁজিতন্ত্রের সহজাত — সেটাই প্রকাশ পেয়েছে অতিপ্রজতার উপর ম্যালথাসের সমগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ করার ভিতর দিয়ে। কিন্তু ব্যাপারটা ম্যালথাসের বক্তব্যের বিপরীত: প্রাকৃতিক সংগতি-সংস্থানের সঙ্গে তুলনায় এই অতিপ্রজতার দরুন মানুষ 'বাড়তি' হয়ে যাওয়াটা অনপেক্ষ নয়, সেটা হল পুঁজিতন্ত্রের অবস্থায় আপেক্ষিক শ্রমিক-বাড়তি।

বিষয়গত বিচারে ম্যালথাসের রচনাগুলির অর্থটা বহুলাংশে হয়ে দাঁড়িয়েছে ভূস্বামীদের স্বার্থের সপক্ষতা। রিকার্ডোর সঙ্গে নিজের পার্থক্যটা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে ম্যালথাস কূটাভাসটা লক্ষ্য করেন নিজেই: 'মিঃ রিকার্ডো বেশকিছু পরিমাণ খাজনা পান, তিনি সেই খাজনার জাতীয় গুরুত্বটাকে অত খাটো করে ধরলেন; যেখানে যে কখনও কোন খাজনা পায় নি, তা পাবার আশাও রাখে না, সেই আমার বিরুদ্ধে হয়ত সেটার গুরুত্ব বাড়িয়ে ধরার অভিযোগ উঠতে পারে — এটা কিছুটা অদ্ভুতই বটে।'* এর কোন অর্থ থাকলে সেটা শুধু এই যে, স্থূল সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কারও মানসিকতা আর চিন্তাধারার ব্যাখ্যা মেলে না: এই জটিল ক্ষেত্রটা শুধু তার সামাজিক অবস্থান দিয়ে নির্ধারিত হয় না। (প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, রিকার্ডো শুধু পরে হয়েছিলেন ভূস্বামী, আর ম্যালথাস ভূস্বামী ছিলেন জন্মসূত্রে, তিনি যাজক এবং প্রফেসর হয়েছিলন শুধু পরে।)

অর্থনীতিক্ষেত্রে বিবেচনাধারা রিকার্ডোর থেকে ম্যালথাসের খুবই পৃথক

* T. R. Malthus, 'Principles of Political Economy', Oxford, a. o., 1951, pp. 216-217.

হয়েছিল তাঁর (ম্যালথাসের) এই শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যক্তিগত গুণাগুণের ফলে। বিশেষত, বলা যেতে পারে, রিকার্ডো যেন দৃষ্টিপাত করেছিলেন বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-অসংগতি আর সমস্যার উপর দিয়ে সুদূরে — এগুলোকে তাঁর মনে হয়েছিল পৃথক-পৃথক এবং অস্থায়ী ব্যাপার, কিন্তু ম্যালথাস থেমে গিয়ে তা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেন। এমনটাই হয়েছিল সংকট-সংক্রান্ত প্রশ্নে: রিকার্ডো সেটাকে উপেক্ষা করেন, কিন্তু ম্যালথাস তা করেন নি।

আগেই বলা হয়েছে, এই প্রশ্নে বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র দুটো প্রধান মতধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। স্মিথ এবং রিকার্ডো মনে করতেন, পুঁজিতন্ত্রের মূল প্রশ্নটা হল সঞ্চয়ন, তাতে উৎপাদনবৃদ্ধি নিশ্চিত হয়, আর চাহিদা এবং কাটতির দিক থেকে দেখলে কোন গুরুতর মুশকিল নেই। ম্যালথাস (যেমন সিস্‌মন্দিও) এই দৃষ্টিভঙ্গিটার বিরুদ্ধাচরণ করলেন, সর্বপ্রথমে তিনিই কাটতি-সংক্রান্ত সমস্যাটাকে এনে ফেললেন আর্থনীতিক তত্ত্বের কেন্দ্রস্থলে। পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের দ্বন্দ্ব-অসংগতিগুলো সম্বন্ধে তিনি লক্ষণীয় বোধশক্তির পরিচয় দেন সেটা করতে গিয়ে। রিকার্ডো ধরে নিয়েছিলেন, পুঁজিপতিদের চাহিদা (উৎপাদনের প্রয়োজনানুযায়ী পণ্যের চাহিদা সমেত) এবং শ্রমিকদের চাহিদা একত্রে যেকোন পরিমাণ পণ্য কাটতি নিশ্চিত করতে পারে। সেটা মূল নিয়মের দিক থেকে সঠিকই বটে। কিন্তু এমন কাটতির সম্ভাবনা থেকে এটা বোঝায় না যে, কার্যক্ষেত্রে সেটা চলে স্বচ্ছন্দে এবং কোন দ্বন্দ্ব-ব্যাঘাত ছাড়াই। মোটেই তা নয়। পুঁজিতন্ত্র বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই বেশি ধ্বংসকর হয়ে ওঠে অত্যুৎপাদন সংকটগুলো, তাতে কাটতির প্রক্রিয়াটা ব্যাহত হয়। পুঁজিপতি আর শ্রমিকদের সঙ্গে যেগুলি সংশ্লিষ্ট নয় এমনসব সামাজিক শ্রেণী আর বর্গ রয়েছে, তাতে কাটতি সমস্যার সমাধান খুঁজেছিলেন ম্যালথাস। তিনি বলতেন, সমগ্র উৎপন্ন পণ্যরাশির কাটতি নিশ্চিত করতে পারে শুধু তাদেরই চাহিদা। এইভাবে, স্মিথ যাদের বলেন পরজীবী সেই ভূস্বামী আর তাদের চাকর-বাকর এবং অফিসার আর যাজকেরাই ম্যালথাসের মতে সমাজের ত্রাণকর্তা।

কাটতি এবং 'ক্রয়ক্ষম চাহিদা' সংক্রান্ত কারক উপাদানের প্রশ্নে ম্যালথাসের ভাব-ধারণা জিইয়ে তুলে সেটাকে অবলম্বন করে কেইন্সীয় মতধারা, যেটা হল বিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের প্রধান মতধারা। অর্থনীতি-বিজ্ঞান রিকার্ডোর দেখান পথে না গিয়ে ম্যালথাসের বাতলানো পথ ধরলে

পুঁজিতন্ত্রের ঢের বেশি ভাল হত, এই মর্মে কেইন্সের উক্তিটা আপাতিক নয়। মধ্য বর্গগুলিতে পণ্যদ্রব্যের ভোগ-ব্যবহার এবং এই ভোগ-ব্যবহারে রাষ্ট্রীয় উৎসাহন হল সমসাময়িক আর্থনীতিক কর্মনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ সংকট-নিরোধক ব্যবস্থা। পুঁজিতন্ত্রের মূল নিয়মাবলির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে অপারক বুর্জোয়া আর্থনীতিক চিন্তন পরিস্থিতির চাপে পড়ে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার নির্দিষ্ট দ্বন্দ্ব-অসংগতিগুলোর উগ্রতা কমাবার কোন-কোন উপায় বের করা হয় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হাতড়ে-হাতড়ে।

রিকার্ডোর মতবাদের ভাঙন

উনিশ শতকের তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকে জেম্‌স মিল আর ম্যাক্‌কুলোখের রচনাগুলিতে খুবই কষ্টস্বীকার করে রিকার্ডোর মতবাদটাকে অক্ষরে-অক্ষরে তুলে ধরা হয় জনবোধ্য আকারে। এই মতবাদের মূলভাবটা তাঁরা বোঝেন নি, তাই সেটাকে বিকশিত করতে পারেন নি। রিকার্ডোর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অনুগামীরা সামর্থ্যের দিক থেকে ছিলেন মাঝারি গোছের — সেটা লক্ষ্য করেছেন আধুনিক বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরাও। শুম্পিটার লিখেছেন, রিকার্ডোর মতবাদ 'তাঁদের হাতে মিইয়ে গিয়ে কার্যত তৎক্ষণাৎ হয়ে পড়ল বাসি, অনুৎপাদী'। তবে তিনি মনে করেন মতবাদটাই নিষ্ফলা এবং সেটাই উল্লিখিত অবস্থার প্রধান কারণ।

এই মহান অর্থনীতিবিদের রেখে-যাওয়া মতবাদের এই শোচনীয় পরিণতির আসল কারণটা কী? রিকার্ডো রেখে যান একটি প্রগাঢ় ধারণাতন্ত্র, কিন্তু সেটা আবার ছিল নানা দগদগে অসংগতি আর ফাঁক দিয়ে ঠাসা। তিনি নিজেই সে-সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন অন্য কারও চেয়ে বেশি। রিকার্ডোর মতবাদটিকে উপযুক্ত ধরনে বিস্তারিত করতে হলে তাঁর মতবাদের মূলসূত্রগুলি আয়ত্ত করে তারপর বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ঐসব অসংগতির নিরসন করা আবশ্যক ছিল।

রিকার্ডোর চারপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজেরা এমন কাজ হাসিল করতে অপারক ছিলেন, এটা নিশ্চয়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয়। বিজ্ঞানে ব্যক্তির ভূমিকা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, সেটাও ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকার বেলায় যেমন সেই একই নিয়মের অধীন: সংশ্লিষ্ট জরুরী কাজ সমাধা

করতে সক্ষম মানুষকে পয়দা করে সংশ্লিষ্ট যুগ, ঐতিহাসিক আবশ্যকতা। কথাটা হল এই যে, রিকার্ডোর মতবাদের সৃজনশীল বিকাশ ঘটাবার জন্যে একটা ভিন্ন ভাবাদর্শের দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল। বুর্জোয়া ভাবাদর্শ কাঠামের ভিতরে সেটা ছিল আদপেই অসম্ভব। এই কারণেই রিকার্ডোর সাচ্চা উত্তরাধিকারী হল মার্কসবাদ।

রিকার্ডোর সামনে পড়েছিল প্রধান দুটো অসংগতি — তা আবার মনে করা যাক। এক, শ্রম আর পুঁজির মধ্যে বিনিময় (সহজ কথায় — পুঁজিপতির মজুরি দিয়ে শ্রমিক খাটান) তাঁর শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বের সঙ্গে কিভাবে খাপ খায় সেটা তিনি ব্যাখ্যা করে বলতে পারেন নি। একজন শ্রমিক যদি 'তার শ্রমের মূল্য'-র পুরোটা পায় (আমরা জানি এই কথাটা ভুল, কিন্তু রিকার্ডো বলেন এইভাবেই), অর্থাৎ তার মজুরি যদি হয় তার শ্রম দিয়ে পয়দা-করা পণ্যের মূল্যের সমান, তাহলে তো লাভ ব্যাপারটার কোন অর্থ করা অসম্ভব। তবে শ্রমিক যদি পায় 'তার শ্রমের মূল্য'-র চেয়ে কম তাহলে কোথায় থাকে তুল্যমূল্য বিনিময়, মূল্য নিয়ম? দুই, সমান-সমান পরিমাণ পুঁজি থেকে সমান-সমান পরিমাণ লাভ-সংক্রান্ত ব্যাপারটার সঙ্গে শ্রমঘটিত মূল্যটাকে তিনি মেলাতে পারেন নি। কেবল শ্রমই যদি পয়দা করে মূল্য তাহলে যেসব পণ্য পয়দা করতে শ্রমব্যয় হয় সমান-সমান সেগুলো বিক্রি হওয়া চাই মোটামুটি একই দামে — সেগুলোর উৎপাদনে লাগান পুঁজির পরিমাণ যা-ই হোক না কেন। কিন্তু তাতে বোঝায় পুঁজি বাবত লাভের ভিন্ন-ভিন্ন হার, যেটা কোন দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার হিসেবে স্পষ্টতই অসম্ভব।

মার্কস কিভাবে এইসব অসংগতির নিরসন করেন তা আমরা আগেই জেনেছি। উনিশ শতকের তৃতীয় আর চতুর্থ দশকের ইংরেজ অর্থনীতিবিদেরা সেটাকে কিভাবে ধরেছিলেন তা দেখা যাক। পৃথক-পৃথক লেখক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে না — স্রেফ সাধারণ ধারাটা নির্দেশ করা হচ্ছে। রিকার্ডোর অনুগামীরা এইসব অসংগতির নিষ্পত্তি করতে না পেরে সেগুলোর পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করেন নিম্নোক্ত উপায়ে।

পুঁজি হল পুঞ্জীভূত শ্রম — মিল, ম্যাক্‌কুলোখ এবং অন্যান্যেরা আবার শুরু করেন একেবারে এই রিকার্ডীয় সূচনা থেকেই। কাজেই পুঁজির সাহায্যে শ্রম দিয়ে পয়দা-করা পণ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে পুঁজির মূল্য। এর অর্থ যদি এই হয় যে, পণ্যের মূল্যের মধ্যে থাকে যন্ত্রপাতি কাঁচামাল জ্বালানি ইত্যাদির পাত্রান্তরিত মূল্য, তাহলে কথাটা ঠিক। কিন্তু তবু লাভটা আসে

কোথা থেকে সেটা বের করার দিকে আমরা এগতে পারলাম না। কেননা এইসব উৎপাদনের উপকরণের মূল্য তৈরি-পণ্যে পুনরুৎপন্ন হবার জন্যেই শুধু কোন পুঁজিপতি পুঁজি আগাম দেবে না, অর্থাৎ কিনবে না এইসব উপকরণ।

না — ঐসব অর্থনীতিবিদ বললেন, তাঁরা সেটা বোঝাতে চান নি। শ্রমিক কাজ করে কলে-কারখানায়, কিন্তু তাই করে যন্ত্রও। সেইভাবে বলা যেতে পারে তুলো কয়লা ইত্যাদিও 'কাজ করে', কেননা এগুলো সবই পুঞ্জীভূত শ্রম। কাজ ক'রে সেগুলো মূল্য পয়দা করে। সেগুলো পয়দা করে মূল্যের যে-অংশটা সেটা লাভ। স্বভাবতই সেটা যায় পুঁজিপতির হাতে, সেটা পুঁজির সমানুপাতিক।

এটা হল রিকার্ডীয় অসংগতির একটা অপ-মীমাংসা। এই যুক্তি অনুসারে, শ্রমিক পায় তার 'শ্রমের পূর্ণ মূল্য', কেননা নতুন পয়দা-করা মূল্য থেকে যাকিছু সে পায় না সেটা সে পয়দা করে নি, তার তাজা শ্রম দিয়ে সেটা পয়দা হয় নি, সেটা পয়দা হয়েছে পুঁজিতে অঙ্গীভূত অতীত শ্রম দিয়ে। এই সংযুক্ত শ্রম দিয়ে পয়দা-করা পণ্যের মূল্যটা থেকে পুঁজিপতির পুঁজি বাবত গড় লাভটা আসে যখন পণ্যটা বিক্রি হয়ে যায়। শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্ব, রিকার্ডোর মতবাদের এই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটাকে অপসারিত করে ঐ ধারণাটা — পড়ে থাকে ঐ মতবাদের শুধু খোলকটা। সেক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য গড়ে ওঠে উৎপাদনের উপকরণের জন্যে পুঁজিপতির ব্যয় আর মজুরি থেকে এবং লাভ থেকে। অর্থাৎ কিনা, উৎপাদন-পরিব্যয় যুক্ত লাভ হল মূল্য।

বলবেন এটা তো মামুলি কথা, যা সুবিদিত। পুঁজিপতি না হয়েই কেউ লক্ষ্য করতে পারে পুঁজিপতি তার পণ্যের দাম স্থির করে মোটামুটি এইভাবে: সে তার খরচ-খরচার হিসাব কষে সেটার সঙ্গে যোগ করে বেশকিছুটা লাভ। আর একটুও তলিয়ে না দেখে প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত ভাসাভাসা মামুলি ব্যাপার বিবৃত হয় এই তত্ত্বে। কিন্তু কোন ব্যাপারের বাহ্য আকার দিয়ে যেখানে সেটার মর্ম উদ্‌ঘাটিত হয় না সেখানেই থেমে যায় ঐ 'বিজ্ঞান'।

পুঁজিপতির পক্ষে খুবই চমৎকার এই ছকটা! তাহলে তো শ্রম বাবত যা ন্যায্য পারিতোষিক তেমনি মজুরিই পায় শ্রমিক। পুঁজিপতিও ন্যায্য পারিতোষিক পায় তার ঘর-বাড়ি, যন্ত্রপাতি এবং মালমশলার 'শ্রম' বাবত। এর সঙ্গে অনায়াসে আরও বলা যায় ভূমির মালিকের খাজনা পাওয়াটা

পুরোপুরিই ন্যায়সম্মত: কেননা 'কাজ করে' ভূমিও। রিকার্ডোর মতবাদে স্পষ্ট হয়ে ওঠে শ্রেণীতে-শ্রেণীতে বৈরিতা, সেটা এখানে মিলিয়ে গেল, তার জায়গায় এসে গেল শ্রম পুঁজি আর ভূমির শান্তিময় সহযোগ। আরও আগে ফ্রান্সে অনুরূপ একটা ছক হাজির করেছিলেন সে', তাতে তফাতটা এই যে, সেটাকে তিনি শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করার ঝামেলার মধ্যে যান নি। শ্রম — মজুরি, পুঁজি — লাভ, ভূমি — খাজনা: উৎপাদনের বিভিন্ন কারক উপাদান এবং যথাক্রমে সেগুলির আয়ের মধ্যে যোগসূত্রস্বরূপ এই ত্রয়ী ইংলণ্ডের অর্থশাস্ত্রে গেড়ে বসেছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ।

এই মূল্য-তত্ত্ব, যেটাকে অনেক সময়ে বলা হয় উৎপাদন-পরিব্যয় তত্ত্ব, এর ছিল একটা স্পষ্টপ্রতীয়মান ত্রুটি। পণ্যের মূল্যের ব্যাখ্যা করা হল খরচ-খরচা দিয়ে, অর্থাৎ সেটা উৎপাদনে যেসব জিনিস লাগে সেগুলোর মূল্য দিয়ে। আসলে দামের ব্যাখ্যা করা হল দাম দিয়ে। এটা তো ঠিকই যে, কাপড়ের খরচ পড়ে গজ-প্রতি এত শিলিং এত পেনি, তার কারণ শ্রমের খরচ পড়ে এতটা, যন্ত্রপাতি বাবত এতটা, তুলো বাবত এতটা, ইত্যাদি। কিন্তু যন্ত্রপাতির খরচ কেন পড়ে এতটা — তার বেশিও নয়, কমও নয়? ইত্যাদি, ইত্যাদি। দামের আখের ভিত্তি-সংক্রান্ত প্রশ্নটা বরাবরই অর্থশাস্ত্রের একটা কেন্দ্রী প্রশ্ন — সেটাকে এখানে স্রেফ বাদ দিয়ে যাওয়া হয়েছে, আর আয়ের উৎপত্তিস্থল-সংক্রান্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটার ফয়সালা করা হয়েছে জোড়াতালি দিয়ে।

এই মুশকিলটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টায় উনিশ শতকে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ দশকে অর্থনীতিবিদেরা রিকার্ডো থেকে ক্রমেই আরও দূরে সরে যান এবং ক্রমেই আরও বেশি-বেশি করে জমিন প্রস্তুত করেন জেভন্স আর মার্শালের ধারণার জন্যে; তাঁরা যেভাবে যুক্তি দেখান সেটা এখানে দেওয়া হচ্ছে। একদিকে, খরচ-খরচাটাকে ধরা হতে থাকল বিষয়গত মূল্য হিসেবে নয় — যে-মূল্য শেষে গিয়ে নির্ভর করে শ্রমব্যয়ের উপর, সেটাকে ধরা হতে থাকল শ্রমিক আর পুঁজিপতির বিষয়ীগত ক্ষতি স্বীকার হিসেবে। পক্ষান্তরে, মূল্যকে একটামাত্র চল-উপাদান উৎপাদন-পরিব্যয়ের কর্ম বলে গণ্য করা হতে থাকল কম পরিমাণে, আর বেশি-বেশি পরিমাণে গণ্য করা হতে থাকল অনেকগুলো চল-উপাদানের কর্ম হিসেবে, সেগুলোর মধ্যে বিশেষত কোন একটা পণ্যের জন্যে খদ্দেরের চাহিদা এবং তার পক্ষে সেটার উপযোগের

কর্ম হিসেবে। মূল্যকে দাম চড়া-পড়ার স্বাভাবিক ভিত্তি হিসেবে, কেন্দ্র হিসেবে আর ধরা হল না। দামের একটা সরাসর ব্যাখ্যা দেওয়া নিয়েই তখন দাঁড়াল প্রশ্নটা, আর দাম তো ধার্য এবং পরিবর্তিত হয় বহু কারক উপাদানের প্রভাবে।

পুঁজিপতিদের তথাকথিত 'উপরতি' দিয়ে পুঁজিতান্ত্রিক লাভের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চলতে থাকল — এগুলোও হল রিকার্ডোর মতবাদটিকে স্থূল করে তোলার নতুন-নতুন পদক্ষেপ। এই ধারণাটা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ইংরেজ অর্থনীতিবিদ এন. সিনিয়র-এর (১৭৯০-১৮৬৪) নামের সঙ্গে। কাজের যন্ত্রপাতি, ঘর-বাড়ি আর মালমশলা থেকে লাভ পয়দা হয়, এই মর্মে ব্যাখ্যাটা বহু অর্থনীতিবিদের কাছে সন্তোষজনক হল না। কাজেই খাড়া করা হল এই তত্ত্বটা: লাভ পয়দা হয় পুঁজিপতির উপরতি থেকে — সে তো তাঁর পুঁজিটা বিলাসব্যসনে খরচ করে ফেলতে পারত, কিন্তু সেটা থেকে সে 'বিরত' থাকে।

মনে করা যাক দু'জন পুঁজিপতির প্রত্যেকের অর্থ-পুঁজি আছে ১০,০০০ পাউন্ড করে। একজন পুঁজি বিনিয়োগ করল ধরা যাক একটা ভাঁটিখানায়, সে আপিসে বসে, কাজের তদারক করে। বছরের শেষে তার লাভ হল ১,০০০ পাউন্ড বা পুঁজির ১০ শতাংশ। অন্য পুঁজিপতিটিরও আছে ১০,০০০ পাউন্ড, কিন্তু বিয়ার চোলাইয়ের গন্ধ আর তদারকির ঝামেলা তার ভাল লাগে না। কিন্তু নতুন বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া, ইত্যাদির জন্যে টাকা খরচ করে ফেলতেও সে চায় না। সে প্রথম পুঁজিপতিটির কাছে এই প্রস্তাব করল: তোমার পুঁজির সঙ্গে যোগ করে নাও আমার ১০,০০০ পাউন্ড, তোমার ভাঁটিখানাটাকে আরও বাড়াও, আমাকে দিও বছরে ৫ শতাংশ — ৫০০ পাউন্ড। প্রথম পুঁজিপতি রাজি হল। অন্য জনের পুঁজি থেকে লাভ হবে এর নিজের মতো একই হারে। কিন্তু ঐ পুঁজির মালিককে তার দিতে হবে এই লাভের অর্ধেক।

'উপরতি' তত্ত্বের রচয়িতারা প্রশ্ন তোলেন: দ্বিতীয় পুঁজিপতিটি কি তার টাকা উল্লিখিত উপায়ে ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে খরচ করতে পারত? — হ্যাঁ, তা পারত। কিন্তু সে বিরত রইল। তা না করে সে বরং মনস্থ করল একবছর অপেক্ষা করবে, পুঁজি বাবত সুদ পাবে, দু'বছর অপেক্ষা করবে — সুদ পাবে আরও (অধিকন্তু, পুঁজিটা থেকে যাচ্ছে অক্ষত, সেটাকে সে খুশিমতো যেকোন সময়ে খরচ করতে পারে!)। লোকে তো স্বভাবতই

ভবিষ্যতের জন্যে অপেক্ষা না করে সঙ্গে সঙ্গেই সবকিছু উপভোগ করতে চায়। ভবিষ্যতে সবকিছু উপভোগ করবে বলে বর্তমানে সেগুলো ত্যাগ করতে স্থির করে এই পুঁজিপতিটি একটা ক্ষতিস্বীকার ক'রে পারিতোষিক পাবার অধিকারী হল।

আর প্রথম পুঁজিপতিটির বেলায়? ভাঁটিখানাটা বেচে দিয়ে সে টাকাটা খরচ করে ফেলতেও পারত। সে তা করছে না, কাজেই উপরতির জন্যে সে-ও একই পারিতোষিকের অধিকারী। তবে বিয়ারটা 'নিজেই' চোলাই করে বলে তার অবস্থা সহযোগীটির চেয়ে সুবিধাজনক। তদারকি, ব্যবস্থাপন আর পরিচালনের কাজ বাবত মাইনে তার প্রাপ্য। তাই প্রকৃতপক্ষে সে ১,০০০ পাউন্ড লাভ পায় না, তার পুঁজি বাবত হয় দু'রকমের আয়: ৫০০ পাউন্ড উপরতি বাবত, আর ব্যবস্থাপনের মাইনে বাবত আরও ৫০০ পাউন্ড।

একটা আর্থনীতিক উপাদান হিসেবে লাভ এক্ষেত্রে একেবারেই মিলিয়ে গেল। অর্ধ-শতাব্দী পরে অ্যালফ্রেড মার্শাল উল্লিখিত ত্রয়ী (শ্রম, পুঁজি, ভূমি)-র জায়গায় বসিয়েছিলেন শ্রম — মজুরি, ভূমি — খাজনা, পুঁজি — সুদ, 'সংগঠন' — কারবারী আয় এই চারটে কারক উপাদানের সমবায়: এটা কিছুটা যুক্তিসম্মতই ছিল। 'উপরতি' (abstinence) কথাটা শুনতে তো তেমন শোভন নয় (কোটিপতি কিনা টাকা খরচ করা থেকে বিরত থাকে, নিজ প্রয়োজন মেটায় না পুরোপুরি!) — সেটার জায়গায় মার্শাল বসালেন অপেক্ষাকৃত শোভন শব্দ 'প্রতীক্ষা' (waiting)। প্রত্যেকটা কারক উপাদান বাবত পারিতোষিকের পরিমাণ কিভাবে স্থির করা যায়, তার ব্যাখ্যা দেবারও চেষ্টা হল নতুন-নতুন বিষয়ীগত পার্যন্তিক তত্ত্বের ভিত্তিতে। অন্যান্য অর্থনীতিবিদ তুলে ধরলেন পুঁজির আরও একটা উপাদান — ঝুঁকি, আর তদনুসারে তাঁরা হাজির করলেন পুঁজিপতির জন্যে আরও এক ধরনের পারিতোষিক — ঝুঁকি বাবত দেওন গোছের একটাকিছু। ঝুঁকি বাবত পারিতোষিকটা পড়ে ঋণের সুদ, না, ঝুঁকির কারবারী আয়, এর কোন্ খাতে (কিংবা দুইয়েই) সেটা নিয়ে তর্কাতর্কি চলছে অদ্যাবধি।

মার্ক্স সমস্যাটার নিষ্পত্তি করলেন কিভাবে? সুদ এবং ঝুঁকিদারী-কারবারী আয়, এই দুই ভাগে লাভের বিভাগটা বাস্তব, আর ক্রেডিটের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপারটার গুরুত্ব হয়ে দাঁড়ায় আরও বেশি। কাজেই, নিজের পুঁজি কাজে লাগায় যে-পুঁজিপতি সে লাভটাকে ভাগ

করে দুই ভাগে: তদবস্থ পুঁজির ফল (এটাকে মার্ক্স বলেন **পুঁজি-সম্পত্তি**) এবং উৎপাদনে সরাসরি লাগানো পুঁজির ফল (**পুঁজি-কর্ম**)। কিন্তু এর থেকে এমনটা বোঝায় না যে, এই উভয় আকারে পুঁজি — উপরতি কিংবা শ্রমের সাহায্যে — মূল্য পয়দা করে এবং সেটা যে-অংশ পয়দা করে সেটাকে ন্যায়ত আত্মসাৎ করে। পুঁজির এই দ্বৈত স্বধর্ম হল শ্রমের উপর পুঁজির শোষণের, উদ্বৃত্ত মূল্য পয়দা করার একটা অপরিহার্য অবস্থা। উদ্বৃত্ত মূল্য পয়দা হয়ে সেটা প্রতিযোগিতার প্রক্রিয়ায় যখন গড় লাভে পরিণত হয় তখন পুঁজির মালিকেরা এবং সেটাকে প্রকৃতপক্ষে কাজে লাগায় যেসব পুঁজিপতি (এরা যদি একই লোক না হয়) তাদের মধ্যে সেটা ভাগাভাগি হবার প্রশ্ন দেখা দেয়। তবে এই প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ শুধু একটা বিবেচনা থেকে: ঐ দুই রকমের পুঁজিপতিরা শ্রমিকের মাগনা শ্রমের ফলটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে কিভাবে।

লাভটাকে পর্যবসিত করা যায় ঋণ বাবত সুদ এবং 'ব্যবস্থাপন বাবত পারিশ্রমিকে', এই মর্মে বক্তব্যটা জয়েণ্ট-স্টক কম্পানিগুলোর, বিশেষত এখনকার একচেটেগুলোর চলিতকর্মে খণ্ডিত হয়ে যায়। এইসব কম্পানি ধার-করা পুঁজি বাবত সুদ দেয়, শেয়ারহোল্ডারদের ডিভিডেন্ড দেয় (এটাও এক রকমের ঋণের সুদ), আর উৎপাদন, বিক্রি, ইত্যাদি কাজের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজারদের খুবই মোটা-মোটা টাকা মাইনে দেয়। কিন্তু এসব ছেড়ে দিয়েও এইসব কম্পানির থাকে অবণ্টিত লাভ, সেটাকে লাগান হয় সঞ্চয়নে। রাষ্ট্রকে দেওয়া কর সম্বন্ধে কিছুই বলা হচ্ছে না। অবণ্টিত লাভ এবং করের জন্যে টাকা আসে কোথা থেকে, সেটা লাভ সম্বন্ধে বুর্জোয়া তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা বেশ কঠিন।

জন স্টুয়ার্ট মিল

উনিশ শতকের ষষ্ঠ-সপ্তম দশকে ইংলন্ড পেঁছয় আর্থনীতিক আর রাজনীতিক ক্ষমতার শিখরে। এই সমৃদ্ধির ফলটাকে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে ভাগাভাগি করতে বুর্জোয়ারা পেরেছিল — সেটা করতে তারা বাধ্য হয়েছিল — বিশেষত প্রবসনের ফলে ইংলন্ডে আপেক্ষিক অতিপ্রজতার চাপ কিছুটা লাঘব হয়েছিল বলে। এতে সংশ্লিষ্ট হয়েছিল সর্বাগ্রে এবং সর্বোপরি শ্রমিকদের মধ্যে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন বর্গগুলো — যেটাকে বলা হয়

'শ্রমিক অভিজাতবর্গ'। শতাব্দীর শেষাশেষি কাজের পরিবেশে উন্নতি হয়েছিল, আর জীবনযাত্রার মানও উন্নীত হয়েছিল গোটা শ্রমিক শ্রেণীর। কতকগুলো কারখানা আইন পাস হয়েছিল, ট্রেড ইউনিয়ন বৈধ হয়েছিল, সেগুলি বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল অচিরেই। তবে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রাম ক্রমেই বেশি-বেশি পরিমাণে চলে গিয়েছিল নিছক আর্থনীতিক স্বার্থের ক্ষেত্রে, সেটা বুর্জোয়াদের পক্ষে উপযোগী ছিল সাধারণভাবে।

শাসকদের বিভিন্ন শ্রেণী এবং সেগুলোর বিভিন্ন ঘোঁটের মধ্যে শক্তির পরস্পর-বিন্যাস, আর সংগ্রামের দরুনও নির্ধারিত হয়েছিল শ্রমিক শ্রেণী সম্বন্ধে কর্মনীতি। উদারপন্থী বুর্জোয়াদের বহু মুখপাত্রের বিবেচনায় এই সংগ্রামটা ছিল মানবতা আর প্রগতির চিরন্তন আদর্শগুলির জন্যে, এই প্রগতি ঘটাতে সমাধিকারভোগী সমস্ত মানুষের সহযোগের জন্যে, পরম মূল্যবোধ হিসেবে স্বাধীনতা আর পরমত-সহিষ্ণুতার জন্যে সংগ্রাম। মনে হয়, জন স্টুয়ার্ট মিলের মানসতা এবং বিদ্যানুশীলন আর সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মর্ম বুঝতে হয় ঐভাবেই। নির্মম আর্থিক জগৎটাকে মিলের নিশ্চয়ই ভাল লাগত না, কিন্তু এই জগতের অধিকতর অশুভ দিকগুলো ক্রমে অতীতের গর্ভে চলে যাবে বলে তিনি ভরসা রাখতেন। তিনি আগ্রহান্বিত ছিলেন এমনকি সমাজতন্ত্রেও, সেটা অবশ্য ক্রমবিকশিত সমাজতন্ত্র — বিপ্লব কিংবা শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া। তবে শেষে গিয়ে দেখা গেল, মিল ছিলেন 'মধ্যপন্থা ধরা' সংক্রান্ত ধারণার একজন প্রবক্তা, আপস আর সারগ্রাহিতায় পারদর্শী। শ্রমিক শ্রেণীকে আর তুচ্ছ করা যাচ্ছিল না, সেটার অধিকার আর দাবির সঙ্গে পুঁজির অর্থশাস্ত্রের সহযোজন ঘটাতে তিনি চেষ্টা করেন।

মিলের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আগ্রহের কিছু নেই তা নয়। ১৮০৬ সালে তাঁর জন্ম হয় লন্ডনে; তিনি হলেন দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ এবং রিকার্ডোর বন্ধু জেমস মিলের বড় ছেলে। জেমস মিল কড়াকড়ি করতেন প্রায় রূঢ়তার পর্যায়ে, আর তাঁর নীতিনিষ্ঠার মাত্রা ছিল গোঁড়ামির পর্যায়ে — তাঁর ছিল ছেলে মানুষ করার নিজস্ব পদ্ধতি, সেটা তিনি প্রয়োগ করেন নিজের ছেলের ক্ষেত্রে। ছেলেটির 'কর্মদিন' ছিল কড়াকড়ি করে ধরাবাঁধা। বয়স আট বছর হবার মধ্যেই ছেলেটির যেসব বই পড়া হয়ে গিয়েছিল তার তালিকাটা দেখলে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। ছিল না খেলনা, ছিল না গল্প, অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা চলত না। ঐ সবকিছুর জায়গায় ছিল বাবার সঙ্গে বেড়ানো, তখন পরীক্ষা চলত পড়ে ফেলা বই সম্বন্ধে, আর

তারপর ছিল ছোট ভাই-বোনদের সঙ্গে পাঠাভ্যাস। ছেলেটি হয়ে উঠেছিল মহা প্রতিভাসম্পন্ন, তার জ্ঞান লক্ষ্য করে সবসময়েই আশ্চর্য হতেন তার বাবার বন্ধুবান্ধবেরা। পড়া আর মনন-চিন্তনের অভ্যাস ছেলেটির স্বভাবেরই অঙ্গ হয়ে উঠেছিল অচিরে। স্বাধীনভাবে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন উচ্চতর গণিত আর বিভিন্ন প্রকৃতি-বিজ্ঞান। তবে প্রিয় বিষয়টা ছিল ইতিহাস। বিভিন্ন প্রাচীন এবং আধুনিক লেখকদের বক্তব্যের ব্যাখ্যা কিংবা সমালোচনা করে তিনি প্রবন্ধ লিখতেন। বাবার ধরাকাট না কমে বরং বেড়েই চলত। ছেলের পরিণত এবং স্বাধীন চিন্তন চাইতেন জেমস মিল। ছেলেকে অসম্ভব-অসম্ভব 'টাস্ক' দিতে তাঁর খুব ভাল লাগত। ছেলের সর্বদা মনে করা চাই তাঁর জ্ঞান সমঝ আর সামর্থ্য খুবই কম। তাইই ভাবত ছেলেটি, কেননা সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার প্রায় কোন সুযোগই তাকে দেওয়া হত না। শুধু পরে, বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এবং শোচনীয় দোষ-ত্রুটি।

তের বছর বয়সে কিশোর মিলের অর্থশাস্ত্রের একটা পাঠ্যধারা নিয়ে পড়াশুনো চলে বাবার কাছে। বাবা লেকচার দিতেন, বিভিন্ন জটিল প্রশ্ন নিয়ে দু'জনের বিস্তারিত আলোচনা চলত, বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখতে হত ছেলেটিকে। জন স্টুয়ার্ট মিল পুরন কথা মনে করে পরে লেখেন: 'বাবার অধ্যয়নকক্ষে থাকাটা ছিল আমার অভ্যাসগত, তাই আমার পরিচয় হয়েছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ডেভিড রিকার্ডোর সঙ্গে। তাঁর প্রসন্ন মুখভাব আর সদয় আচার-আচরণের জন্যে তরুণেরা খুবই আকৃষ্ট হত তাঁর প্রতি; আমি অর্থশাস্ত্রের ছাত্র হবার পরে তিনি আমাকে ডাকতেন তাঁর বাড়িতে এবং তাঁর সঙ্গে বেড়াতে এই বিষয়ে আলাপ করার জন্যে।'*

১৮২২ সালে মিল প্রকাশ করেন অর্থশাস্ত্র বিষয়ে তাঁর প্রথম-প্রথম রচনা — মূল্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে ছোট-ছোট দুটো প্রবন্ধ। তাঁর কাম্য ছিল রাজনীতিক কর্মজীবন, কিন্তু তাঁর বাবার সিদ্ধান্ত হল অন্য রকম। ঈস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির একটা বিভাগের কর্তা ছিলেন তাঁর বাবা, সেখানে সর্বকনিষ্ঠ কেরানির কাজে তাঁকে ভরতি করা হয় পরের বছর, আর তাতে তিনি মই বেয়ে উঠতে থাকেন উপরে। আপিসের কাজ গোড়ার দিকে তাঁর উদ্দীপনাময় মননশীল ক্রিয়াকলাপে বিশেষ কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি।

---

* J. S. Mill, 'Autobiography', London, 1940, p. 45.

তিনি দিনে চোদ্দ ঘণ্টা কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাই নিজের জন্যে এবং প্রকাশনের জন্যে তাঁর পড়া আর লেখা এবং ভাই-বোনদের পড়ানো চলতেই থেকেছিল। মিল নিজেকে বলতেন একটা চিন্তাশীল যন্ত্র। তবে সমগ্র বহুমুখী জীবন আর স্বাভাবিক জগতের সমস্ত আবেগ কামনা-বাসনা আর সংবেদনের স্থান পূরণ করতে পারল না বুদ্ধিবৃত্তিগত তন্দ্ভূত বাতাবরণ। তার পরিণতি হল স্নায়বিক অবসাদ, নৈরাশ্য, আত্মহত্যাকামনা।

লণ্ডনের একজন ধনী বণিকের স্ত্রী দুটি সন্তানের মা ২২-বছর বয়সী সুন্দরী বুদ্ধিমতী মিসিস হ্যারিয়েট টেইলরের সঙ্গে মিলের পরিচয় হয় ১৮৩০ সালে। মিসিস টেইলরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আর বন্ধুত্বের ফলে তাঁর বিষাদবায়ু কেটে যায়। মিলের চেষ্টায় এবং তাঁর অংশগ্রহণে মিসিস টেইলরকে ঘিরে গড়ে ওঠে চিন্তাশীল এবং উদার মনোভাবাপন্ন কিছু লোকের একটা মহল। হ্যারিয়েট টেইলর ক্রমে হয়ে উঠেছিলেন মিলের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং তাঁর রচনার প্রথম পাঠিকা আর সমালোচক।

উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে মিল একটা রাজনীতিক পত্রিকা বের করেন, সেটা হয়েছিল তখন পার্লামেণ্টে হুইগ্ পার্টির সবচেয়ে বাম তরফের 'দার্শনিক র‍্যাডিকাল' গ্রুপের মুখপত্র। ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক রচনা — 'A System of Logic' ('যুক্তিবিদ্যার একটা তন্ত্র'), আর ১৮৪৪ সালে — 'Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy' ('অর্থশাস্ত্রের কিছু-কিছু অমীমাংসিত প্রশ্ন প্রসঙ্গে প্রবন্ধগুচ্ছ')। শেষোক্ত বইখানায় রয়েছে এই বিজ্ঞানক্ষেত্রে মিলের যা মৌলিক অবদান, আর 'Principles of Political Economy' ('অর্থশাস্ত্রের মূলসূত্রগুচ্ছ') (১৮৪৮) নামে ঢাউস বইখানা হল নিপুণভাবে করা সংকলন মাত্র। তাসত্ত্বেও, কিংবা বরং ঠিক সেই কারণেই মিলের বইখানা যতখানি সাফল্য লাভ করেছিল তার জুড়ি ছিল না; তাঁর জীবনকালে সেটার সাতটা সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, আর তরজমা হয়েছিল বহু ভাষায়।

হ্যারিয়েট টেইলরের স্বামী মারা যাবার পরে ১৮৫১ সালে মিলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হতে পেরেছিল। মিসিস মিল বেঁচে ছিলেন আর আট বছর, এই সমগ্র কালপর্যায়ে তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ ছিলেন। মিলের নিজের স্বাস্থ্যও খারাপ ছিল; আত্মত্যাগ করা আর সুখে-দুঃখে নির্বিকার

থাকতে পারার ব্যাপারে তিনি ছিলেন আদর্শস্বরূপ। মিলের 'আত্মজীবনী' আর চিঠিপত্র এবং তাঁকে যাঁরা জানতেন তাঁদের স্মৃতিকথা পড়লে পরস্পরবিরোধী ভাব জাগে মনে। মানুষটি ছিলেন দুর্বলচিত্ত; তাঁকে যেভাবে মানুষ করা হয়েছিল সেটা আর তাঁর বাবার কঠোর-কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিত্বই বোধহয় সেটার কারণ। প্রকৃতপক্ষে, কুড়ি বছর ধরে তাঁর জীবনটা ছিল অবিরাম, কখনও-কখনও যন্ত্রণাকর এবং অবমাননাকর আপসের ব্যাপার। তিনি সমাজের নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধে আপত্তিও তুলেছেন, আবার সেগুলোর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও চান নি বড় একটা। এটা তাঁর প্রকৃতির খুবই বিশেষক। যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান আর রাজনীতিক্ষেত্রে, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি বাধাবিঘ্নের সামনে সাহস করে দাঁড়াতে পারেন নি, স্থিরসংকল্প হয়ে কিছু করতে পারেন নি। উটপাখির মতো বালিতে মাথা গুঁজে থাকাটাই ছিল তাঁর মনঃপূত। তিনি গড়ে তুলেছিলেন নিজস্ব বিশেষ, বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিগত জগৎ, সেখানে তিনি কমবেশি শান্তি-স্বস্তি বোধ করতেন। কার্লাইল একবার বলেছিলেন, নিজেকে যে-জন বড়ই সুখী মনে করে সে অসুখী।

অন্য দিকে, মিলের নৈতিক চরিত্র কিছু শ্রদ্ধা না জাগিয়ে পারে না। তিনি উন্নত-নীতিনিষ্ঠ এবং সংগতিপূর্ণ ছিলেন নিজস্ব ধরনে। মনে রাখা দরকার, মিল আর হ্যারিয়েট টেইলর রীত-রেওয়াজের বিরুদ্ধাচারী ছন্নছাড়া মানুষ ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন ভিক্টোরীয় যুগের সম্ভ্রান্ত বুর্জোয়া সমাজের মানুষ, — 'শালীনতা' লঙ্ঘন ক্ষমা করত না এই সমাজ।

১৮৫৮ সালে মিলের ঈস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির কাজ শেষ হয়ে যায়; সিপাহী বিদ্রোহের পরে ভারতে কম্পানির কর্তৃত্ব তুলে নেওয়া হয়েছিল সরাসরি ইংলণ্ড সরকারের হাতে। কম্পানিটাকে তুলে দেওয়া হয়। পরবর্তী বছরগুলিতে মিল কয়েকটা রাজনীতিক এবং দার্শনিক রচনা প্রকাশ করেন, কিন্তু অর্থশাস্ত্র নিয়ে আর ব্যাপৃত থাকেন নি — 'মূলসূত্রগুচ্ছ'-র নতুন-নতুন সংস্করণগুলি না ধরলে। তিনি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধারণাটাকে বিস্তারিত করেন ('On Liberty' ['মুক্তি প্রসঙ্গে']), আর দাঁড়ান নারীর অধিকারের সপক্ষে ('The Subjection of Women' ['নারীর অধীন দশা'])। তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন কয়েক বছর। একটা নির্বাচনে পরাস্ত হবার পরে তিনি ফ্রান্সে যান, সেখানে আভিনিওঁ-তে মারা যান ১৮৭৩ সালে।

পুঁজিতন্ত্রের আমলে বণ্টনে অবিচারের কথা মিল যেখানে বলেছেন সেই রচনাংশটা উদ্ধৃত করে মার্কস 'পুঁজি'-র প্রথম খণ্ডে বলেছেন: 'ভুল-বোঝাবুঝি এড়াবার জন্যে বলতে চাই জন স্টুয়ার্ট মিলের মতো ব্যক্তিরা তাঁদের রেওয়াজী আর্থনীতিক আপ্তবাক্যগুলো এবং তাঁদের আধুনিক মতধারাগুলোর মধ্যে অসংগতির জন্যে দোষভাগী হলেও স্থূল আর্থনীতিক সাফাইদার-পালের মধ্যে তাঁদের শ্রেণীভুক্ত করাটা খুবই ভুল।'*

মিল যে-পরিমাণে স্মিথ আর রিকার্ডোর চালু করা মূলসূত্রগুলি আঁকড়ে থাকতে চেষ্টা করেন ততটাই তাঁর বিচার-বিবেচনা বিজ্ঞানসম্মত; বুর্জোয়াদের খুশি করার জন্যে বিভিন্ন বাস্তব প্রক্রিয়া বিকৃত করা থেকে তিনি বিরত থাকেন সচেতনভাবে। কিন্তু মনীষীদের মতবাদ তিনি বিকশিত করেন নি, উলটে বরং সেগুলিকে তিনি ইতর অর্থশাস্ত্রের বিদ্যমান মাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন। ম্যালথাস, সে' এবং সিনিয়র-এর প্রবল প্রভাব পড়ে তাঁর উপর। এই প্রসঙ্গে মার্কস লিখেছেন মিলের সারগ্রাহিতার কথা, মিলের রচনায় সমঞ্জস বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ না-থাকার কথা, আর তাঁর রচনাগুলিকে মার্কস 'বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের দেউলিয়াপনা' বলে অভিহিত করেছেন। 'আপস-রফার অর্থশাস্ত্র'-কে বিকশিত এবং সুনির্দিষ্ট আকারে দাঁড় করান মিল, — শ্রমিক শ্রেণীর দাবিদাওয়ার সঙ্গে পুঁজির স্বার্থের সমন্বয় ঘটাতে চেষ্টা করে এই অর্থশাস্ত্র।

মধ্য-উনিশ শতকে যাতে অর্থশাস্ত্র-বিজ্ঞানটিকে সমগ্রভাবে ধরে সমীক্ষা করা হয়েছে এমন গবেষণা-আলোচনার মধ্যে মিলের 'মূলসূত্রগুচ্ছ'-ই সর্বশ্রেষ্ঠ, এই হল সেটার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব। ১৮৯০ সালে মার্শালের 'অর্থশাস্ত্রের মূলসূত্রগুচ্ছ' প্রকাশিত হওয়া অবধিই এটা ছিল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের সবচেয়ে প্রামাণিক ব্যাখ্যান। ভিক্টোরীয় যুগের মুক্ত মানসতা সম্বন্ধে শুম্পিটার সপ্রশংস, — কোন রচনায় শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি একটু সহানুভূতি প্রকাশ করা হলে, অর্থপুজনের নিন্দা করা হলে, সমাজতন্ত্রের উদ্দেশে ধিক্কার দেওয়া না হলেও সেটা বুর্জোয়াদের কাছে

* কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ১ খণ্ড, ৫৭২ পৃঃ।

বেদবাক্য হয়ে উঠতে পারত। মিলের বইখানায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা এই নয় যে, তিনি পুঁজিতন্ত্রের সমালোচনা করলেন; সেটা হল এই যে, তাঁর বিবেচনায় উন্নতি আর শান্তিময় প্রসারের ধারায় এটা এক রকমের ক্রমবিকশিত সমাজতন্ত্রে পরিণত হতে পারে, যে-সমাজতন্ত্র বুর্জোয়াদের বিপন্ন করে না। বুর্জোয়াদের স্বার্থসেবা করতে চূড়ান্ত কট্টর রক্ষণপন্থী এবং ডাহা সাফাইদার বরাবরই ছিল বহু, কিন্তু ঐ সেবাকর্মে জন স্টুয়ার্ট মিলের অবদান ছিল বোধহয় তাদের চেয়ে বেশি। বিশ শতকের বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের আর্থনীতিক আর সামাজিক ধ্যান-ধারণার পূর্বসূরি হলেন মিল।

মার্কস বহু বার তুলে ধরেছেন এই ধারণাটা: উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের পরে বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র দুটো প্রধান ধারায় বিভক্ত হয়ে যায় — একদিকে ডাহা সাফাইদারি, অর অন্য দিকে, 'পুঁজির ঐশ অধিকার' এবং শ্রমিকদের স্বার্থ, এই দুইই রেখে একটা মধ্যপন্থা বের করার চেষ্টা। এই ধারা দুটো আবার সমসত্ত্ব ছিল না। বিষয়গত বিজ্ঞানসম্মত বিচার-বিশ্লেষণের কিছুটা সুযোগ ছিল পরেরটায়। বিভিন্ন সংস্কারপন্থী কর্মসূচির ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করতেও এমন বিচার-বিশ্লেষণ অপরিহার্য হতে পারত।

'ইতর অর্থশাস্ত্র' সংক্রান্ত ধারণাটাকে মার্কস ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট করেন নিম্নোক্ত দুটো জিনিসের সঙ্গে: উৎপাদনের বিভিন্ন কারক উপাদান সংক্রান্ত তত্ত্ব (কুখ্যাত ত্রয়ী), তার মজুরি লাভ এবং খাজনা, এইসব আয় সম্বন্ধে সাফাইদারী বিচার-বিবেচনা, যাতে এগুলিকে ধরা হয় ঐসব কারক উপাদানের স্বাভাবিক ফল এবং পারিতোষিক হিসেবে, মজুরি-শ্রমের উপর পুঁজির শোষণের সঙ্গে সেগুলির যেন একেবারে কোন সংস্রবই নেই। মার্কসের 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব'-র একটি নতুন সংস্করণ প্রস্তুত করতে গিয়ে সোভিয়েত পণ্ডিতেরা তিন-খণ্ডে রচনাবলির শেষে 'আয় এবং সেটার উৎপত্তিস্থল — ইতর অর্থশাস্ত্র' এই শিরনামায় দিয়েছেন মার্কসের পাণ্ডুলিপিতে আলোচ্য প্রশ্নটা সংক্রান্ত অংশগুলি। বিশেষত, মার্কস লিখেছেন: 'পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর প্রতিনিধিরা যারা এই উৎপাদন-ব্যবস্থাটার কাছে দাসের মতো আবদ্ধ, যাদের চেতনায় ফুটে ওঠে শুধু সেটার বাহ্য আকারটা, প্রকৃতপক্ষে তাদের ধ্যান-ধারণা, অভিপ্রায়, ইত্যাদিকে রূপান্তরে প্রকাশ করেন ইতর অর্থনীতিবিদেরা — এঁদের কোনক্রমেই গুলিয়ে ফেলা চলে না আমরা যাঁদের সমালোচনা করছি সেই আর্থনীতিক বিচার-

বিশ্লেষণকারীদের সঙ্গে।'* তবে আয় এবং সেটার উৎপত্তিস্থল-সংক্রান্ত প্রশ্ন যতই মস্ত গুরুত্বসম্পন্ন হোক, অর্থশাস্ত্রকে শুধু তাতেই পর্যবসিত করা চলে না। সঞ্চয়ন আর ভোগ-ব্যবহার, সংকট আর রাষ্ট্রের আর্থনীতিক ভূমিকা, এমনসব প্রশ্ন ক্রমেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এসে গেছে এই বিজ্ঞানে। আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের কতকগুলি ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দেয়। আয় সম্বন্ধে এই ইতর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মূলত মিলেরও, তবে এক্ষেত্রেও তাঁর বিবেচনাধারাটাকে শুধু এতেই গণ্ডিবদ্ধ করা চলে না।

তাঁর প্রধান আর্থনীতিক রচনাটি পাঁচ-ভাগে — তাতে যথাক্রমে উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময়, পুঁজিতন্ত্রের উন্নতি এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা। সবই চমৎকার ইংরেজীতে লেখা — স্পষ্ট, যুক্তিসম্মত, স্বচ্ছন্দ। বড় বেশি স্বচ্ছন্দ! রিকার্ডোর ঝলমলে দ্বন্দ্ব-অসংগতিগুলোর কিছুই এতে নেই, এটা স্রেফ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে সারগ্রাহিতার কায়দায় এক করে দেবার চেষ্টা।

রিকার্ডো আর স্মিথের বই দুখানা মূল্য-তত্ত্ব দিয়ে শুরু, আর এখানে সেটাকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে তৃতীয় ভাগে। এটা আপতিক নয়: শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্ব মিলের আর্থনীতিক মতবাদের ভিত্তি নয় কোনক্রমেই, যদিও সেটাকে তিনি যথাবিধি প্রত্যাখ্যান করেন নি।* মিলের তন্ত্রে তদবস্থ উৎপাদনের সঙ্গে মূল্যের সম্পর্ক বড় একটা নেই — এতে মূল্য হল বিনিময়ের ক্ষেত্রে, পরিচলনের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার মাত্র। কোন

---

* কার্ল মার্কস, 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব', ৩য় ভাগ, ৪৫৩ পৃঃ।

** মিলের ব্যাখ্যানের ধরনটা লক্ষ্য করা যায় অর্থনীতি বিষয়ে একেবারে আধুনিক ইঙ্গ-মার্কিন পাঠ্যপুস্তকগুলি অবধি। পল. স্যামুয়েলসনের পাঠ্যপুস্তকে বিন্যাসটা এমন যাতে প্রথম দুই ভাগে রয়েছে একটা সাধারণ 'উৎপাদন তত্ত্ব', তাতে আলোচনা করা হয়েছে সেটার বৃদ্ধিকর উপাদানগুলি নিয়ে, আর মূল্য-সংক্রান্ত প্রশ্নটাকে ঢোকানো হয়েছে শুধু তৃতীয় ভাগে, আর সেটার উপর লাগানো হয়েছে 'দাম-গঠনে'র ঢাকনা। স্বভাবতই, শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্বেরও নামগন্ধ এতে নেই, কিন্তু দাম-গঠনের কারক উপাদানগুলিকে আবার বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে মিলের ধাঁচে, যদিও প্রয়োগ করা হয়েছে বিশ্লেষণের একটা পরবর্তীকালের পদ্ধতি: তাতে দামের আখেরি ভিত্তির সন্ধান বাতিল করে দিয়ে সেটার জায়গায় আনা হয়েছে চাহিদা আর যোগানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে সক্রিয় কতকগুলি কারক উপাদান।

একটা পণ্যকে অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে, বিশেষত অর্থের সঙ্গে বিনিময়ের বিশেষক সম্পর্কটা হল মূল্য, এই মাত্র। এই সম্পর্ক স্থাপিত হয় বাজারে।

পেটি থেকে রিকার্ডো অবধি বুর্জোয়া মনীষীরা বিষয়টা সম্বন্ধে বিবেচনা করেন মোটামুটি এইভাবে: বিনিময়-মূল্য আর দামের আখেরি ভিত্তি হল শ্রমব্যয়, আর অন্যান্য সমস্ত কারক উপাদানের ক্রিয়াফলে এই ভিত্তি থেকে এটা-ওটা বিচ্যুতি দেখা দেয়। দামের আখেরি ভিত্তিটাকে মিল কার্যত অপসারিত করেন। তাঁর চিন্তনে রিকার্ডীয় ধারাটাকে দেখা যায় এখানে: তাঁর বিবেচনায়, উৎপাদন-পরিব্যয় দিয়ে দাম নির্ধারণ করার উপায়টা মূল পণ্যরাশির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এইসব পণ্যের 'স্বভাবতই এবং স্থায়িভাবে বিনিময় হয় পরস্পরের মধ্যে, — সেটা হয় সেগুলো উৎপাদনের জন্যে দেয় মজুরির আপেক্ষিক পরিমাণ অনুসারে এবং যারা ঐ মজুরি দেয় সেইসব পুঁজিপতির যে-আপেক্ষিক পরিমাণ লাভ হওয়া চাই তদনুসারে'।*

তবে, মূল্যটাকে এমন ধরনে বিবেচনা করতে গিয়ে রিকার্ডোর ঘনিষ্ঠতম শিষ্যরা গিয়ে পড়েছিলেন যে-কানাগলিতে সেটা এড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি প্রকৃতপক্ষে সেখান থেকে ভিন্নপথে গিয়ে সিদ্ধান্ত করেন যে, যোগান আর চাহিদা যেখানে সমান-সমান তাতেই নির্দিষ্ট হয় পণ্যের বিনিময়-মূল্য (এবং দাম)। কোন পণ্যের যোগান নির্ধারণ করতে গিয়ে খরচ-খরচাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে গণ্য হওয়া চাই — এই মতাবস্থানে দাঁড়িয়ে মিল উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাতে চেষ্টা করেন।

আগেই বলা হয়েছে, মূল্য সম্বন্ধে সারগ্রাহিতার ধরনে বিবেচনা করার কায়দাটা পরবর্তী বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীরা রপ্ত করেন। দামের আখেরি ভিত্তি সম্বন্ধে পূর্বসূরি মনীষীদের প্রশ্নটার জায়গায় বস্তুত বসান হল অন্য একটা প্রশ্ন: আর্থনীতিক ব্যবস্থার স্থিতির অবস্থা অনুযায়ী দাম স্থির হয় কিভাবে। প্রশ্নটাকে শ্রমঘটিত মূল্য (প্রতিযোগিতা এবং উৎপাদন-পরিব্যয় তত্ত্ব) থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়, তার মজবুত ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েই সেটার উত্তর দেওয়া হয় মার্কসবাদী ধারণা অনুসারে। মিল কিন্তু প্রথম প্রশ্ন থেকে দ্বিতীয়টাকে বিচ্ছিন্ন করার পথ ধরেন। সেটা হল যোগান আর চাহিদার

---

* J. St. Mill, 'Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy', London, 1873, p. 291.

ভিত্তিতে দাম-গঠনের আনুষ্ঠানিক বিশ্লেষণের সূচনা — সেটাকে শতাব্দীর শেষে বিকশিত করে তুলেছিলেন অন্যান্য বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা।

মিলের মূল্য-তত্ত্ব প্রায় সম্পূর্ণতই সামাজিক মর্মবস্তুবর্জিত, যেটা ছিল স্মিথ আর রিকার্ডোর। মূল্য নিয়ে বিচার-বিবেচনা করার আগেই তিনি বণ্টন আর আয়-সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলেন, এর থেকে সেটা দেখা যায়। স্মিথ আর রিকার্ডোর পক্ষে এটা একেবারেই অসম্ভব হত, কেননা তাঁরা বিবেচনা করেছিলেন শ্রম দিয়ে পয়দা-করা এবং পরিমাপ-করা মূল্যের বণ্টন সম্বন্ধে। উৎপাদের পূর্ণ মূল্য থেকে পুঁজিপতি আর ভূস্বামীদের জন্যে কেটে নেওয়া অংশটা হল উদ্বৃত্ত মূল্য, এইভাবে সেটাকে বুঝবার কাছাকাছি তাঁরা পৌঁছেছিলেন ঐ কারণেই।

এই দৃষ্টিভঙ্গিটা মিলের একেবারেই ছিল না তা নয়। রিকার্ডোর মতো তিনিও লিখেছিলেন, শ্রম বাবত যা খরচ তার চেয়ে বেশি মূল্য সেটা পয়দা করে, এরই থেকে আসে পুঁজিপতির লাভ। এটাও কিন্তু গুরুর প্রতি শুধু মৌখিক আনুগত্য। লাভ পুঁজিপতির মিতব্যয়িতার ফল, এই ব্যাখ্যাটা তিনি মেনে নেন প্রকৃতপক্ষে। বণ্টনের মাত্রিক দিক, কারক উপাদান তিনটের — অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে শ্রেণী-তিনটের — প্রত্যেকটার অংশ-সংক্রান্ত প্রশ্নে মিলের একেবারে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। রিকার্ডোর বিবেচনাধারা আঁকড়ে থাকতে চেয়ে তিনি বলেন, খাজনার অংশটা নির্ধারিত হয় জমির হ্রাসপ্রাপ্ত উর্বরতা নিয়ম অনুসারে এবং অপেক্ষাকৃত নিরেস জমিতে চাষবাস হবার ফলে, কাজেই সেটা বাড়ার ঝোঁক থাকে। মজুরির মাত্রা কার্যত সুস্থিত থাকে, কেননা সেটা নির্ধারিত হয় যাকে বলা হয় মজুরি তহবিল সেটা দিয়ে। লাভ হল মূলত উৎপাদের মূল্যের একটা অবশেষ — সেটার মাত্রা খুবই অনির্দিষ্ট।

উনিশ শতকের একেবারে শেষ অবধি রিকার্ডোর পরবর্তী সমস্ত অর্থশাস্ত্রে মজুরি তহবিল তত্ত্বের প্রাধান্য ছিল। এই তত্ত্বের সমর্থকেরা একটা প্রকাণ্ড দেশের অর্থনীতিকে ধরেন এমন একটা খামার হিসেবে যেটার মালিক তার মজুরদের একবছরের খোরাক আলাদা করে রাখে। যা জমিয়ে রাখে তার চেয়ে বেশি তাদের দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার জমিতে ফসল ফলাবার জন্যে তার মজুরদের যা দরকার তার বেশি খাদ্যও সে জমিয়ে রাখবে না। এই ছকটাকে সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে দেখা যায়, সমাজে সবসময়েই থাকে অত্যাবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রীর খুবই ধরাবাঁধা এবং

প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী মজুদ, যা পুঁজিপতিরা জমিয়ে রাখে ('খরচ বাঁচিয়ে মজুত রাখে') তাদের শ্রমিকদের খোরাকের জন্যে। এই তহবিলটাকে শ্রমিকদের সংখ্যা দিয়ে সোজা ভাগ করলে মজুরির মাত্রাটা পাওয়া যায়। এর থেকে যে-চিত্রটা ফুটে ওঠে সেটা মনে করিয়ে দেয় উল্লিখিত 'লৌহদৃঢ় মজুরি নিয়ম'-এর কথা: মজুরি তহবিল অপরিবর্তিত থেকে গেলে শ্রমিক শ্রেণী কোন সংগ্রাম চালিয়ে সেটার অবস্থার কোন উন্নতি আদায় করতে পারে না: বড়জোর, কোন একটা বর্গের শ্রমিকেরা কিছু পেতে পারে অন্য একটা বর্গের শ্রমিকদের লোকসান করিয়ে। পালগ্রেইভ-এর 'অর্থশাস্ত্র অভিধান'-এ (উনিশ শতকের শেষে প্রকাশিত সারগর্ভ সংকলন) মজুরি তহবিল সম্বন্ধে প্রবন্ধের লেখক বলেন, অফিশিয়াল অর্থশাস্ত্রের প্রতি ইংরেজ শ্রমিকদের বিরূপতার একটা কারণ হল ঐ তত্ত্বটা।

নিজ স্বভাবসুলভ ধরনে জন স্টুয়ার্ট মিল বইখানার এক-পৃষ্ঠায় মজুরি তহবিল তত্ত্বটাকে যথাযথ আকারে তুলে ধরেছেন, অন্য একটা পৃষ্ঠায় বলেছেন পুঁজিতন্ত্রের অবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানের বেশকিছুটা উন্নতির সম্ভাবনার কথা। ১৮৬৯ সালে তিনি একটা প্রবন্ধে এই তত্ত্বটাকে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু 'মূলসূত্রগুচ্ছ'-র একটা নতুন সংস্করণে নিজের পুরন বিবেচনাধারাটাকে বজায় রাখেন।

আপস-রফা এবং যেগুলোর সামঞ্জস্যবিধান অসাধ্য সেগুলোর সামঞ্জস্যবিধানের ঝোঁক এই মানুষটির বিশেষক একেবারে শেষ অবধি।

আর্থনীতিক কল্পনাবিলাস: সিস্‌মন্দি

অর্থশাস্ত্রের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে সুইজারল্যান্ডের অর্থনীতিবিদ সিস্‌মন্দির রচনাগুলি। তিনি যে-যুগের মানুষ, যখন তাঁর কর্মকাল, তার থেকে এখনকার কাল-ব্যবধান সত্ত্বেও ঐসব রচনার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য আজও অবধি বজায় রয়েছে কোন-কোন দিক থেকে। 'আর্থনীতিক কল্পনাবিলাসের স্বধর্ম প্রসঙ্গে (সিস্‌মন্দি এবং আমাদের দেশী সিস্‌মন্দিপন্থীরা)' রচনায় ভ.ই. লেনিন লিখেছেন: '...সিস্‌মন্দি রয়েছেন অর্থশাস্ত্রের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে... প্রধান-প্রধান মতধারাগুলি থেকে একধারে তাঁর অবস্থান — তিনি ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদনের সোৎসাহ প্রবক্তা, আর বৃহদায়তনের কারবারের সমর্থক এবং ভাবাদর্শবিদদের বিরোধী।'*

শিল্প-বিপ্লব এবং পুঁজিতন্ত্রের জয়যাত্রার যুগে সর্বপ্রথমে সিস্‌মন্দি-ই এই সমাজব্যবস্থা এবং এটার আর্থনীতিক কর্ম-বন্দোবস্তের প্রগাঢ় এবং সুতীব্র সমালোচনা করেন — সর্বোপরি এটা থেকেই নির্ধারিত হয় তাঁর এবং তাঁর ভাব-ধারণার ভূমিকাটা। **পেটি-বুর্জোয়া** দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয় এই সমালোচনা, কিন্তু এই ভাবাদর্শগত মতাবস্থান ছিল বলেই তিনি দেখতে পেরেছিলেন পুঁজিতান্ত্রিক উন্নয়নের দ্বন্দ্ব-অসংগতি আর সমস্যাগুলো, যা উপেক্ষা করেছিলেন তাঁর দেদীপ্যমান সমসাময়িক এবং বিরুদ্ধবাদী রিকার্ডো, যিনি হলেন ক্ল্যাসিকাল **বুর্জোয়া** অর্থশাস্ত্রের সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রবক্তা। সিস্‌মন্দি হলেন প্রাক্-মার্কসীয় কালের প্রথম উঁচুদরের

* ভ. ই. লেনিন, 'সংগৃহীত রচনাবলি', ২ খন্ড, ১৩৩ পৃঃ।

অর্থনীতিবিদ যিনি পুঁজিতন্ত্রের স্বাভাবিক এবং চিরন্তন প্রকৃতি-সংক্রান্ত আপ্তবাক্যের যাথার্থ্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেন। অর্থশাস্ত্রকে তিনি দেখেন বুর্জোয়া সম্পদ-সমৃদ্ধি এবং সেটা বর্ধন-সংক্রান্ত বিজ্ঞান হিসেবে নয়, বরং মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির স্বার্থে সামাজিক কর্ম-বন্দোবস্তটার উন্নতিসাধন-সংক্রান্ত বিজ্ঞান হিসেবে। তখন সদ্যোজাত প্রলেতারিয়েত এবং মেহনতী মানুষের অন্যান্য অংশের কঠোর দুর্ভাগ্যের জন্যে তাদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিতে ভরা সিস্‌মন্দির রচনাগুলি। নতুন যুগের সামাজিক-আর্থনীতিক সাহিত্যে **প্রলেতারিয়েত** শব্দটিকে তিনি চালু করেন, তাতে তিনি জিইয়ে তুলে নতুন করে ব্যাখ্যা দেন এই ল্যাটিন কথাটার। এখনও অবধি কখনও-কখনও পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শ হল পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির কর্ম-বন্দোবস্ত সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিষয়গত জ্ঞানের একটা উৎপত্তিস্থল।

সিস্‌মন্দির রচনাশৈলী হৃদয়গ্রাহী, প্রাণবন্ত, তাতে ফুটে ওঠে যিনি জরুরী সামাজিক সমস্যাবলির মীমাংসার উপায় খুঁজেছিলেন সেই মানবতাবাদী র‍্যাডিকাল মানুষটির ব্যক্তিত্ব।

রিকার্ডো যে-অর্থে মার্কসের পূর্বসূরি ছিলেন, সিস্‌মন্দি তা নন। উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বক্ষেত্রে সিস্‌মন্দি বিশেষ কোন মৌলিকত্বের পরিচয় নেই, প্রকৃতপক্ষে এতে তিনি স্মিথকে ছাড়িয়ে এগন নি। তবে মার্কসবাদ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে তাঁর পুঁজিতন্ত্রের সমালোচনার, সংকট সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণের একটা ভূমিকা ছিল নিশ্চয়ই। জেনেভার এই অর্থনীতিবিদ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রগাঢ় এবং সারগর্ভ মূল্যায়ন দেখা যায় মার্কসের বহু রচনায়।

জেনেভার মানুষটি

জাঁ শার্ল লেওনার সিস্‌মোঁদ দ্য সিস্‌মন্দি-র জন্ম হয় ১৭৭৩ সালে জেনেভার উপকণ্ঠে। তাঁর পূর্বপুরুষেরা উত্তর ইতালি থেকে ফ্রান্সে গিয়ে দীর্ঘকাল বসবাস করে পরে কালভাঁর ধর্মমত গ্রহণ করে ধর্মীয় নির্যাতন এড়াবার জন্যে পালিয়ে গিয়ে জেনেভায় বসবাস করেন স্থায়িভাবে। এই অর্থনীতিবিদের বাবা ছিলেন কালভাঁপন্থী যাজক; পরিবারটি ছিল ধনী এবং জেনেভার অভিজাত-সম্প্রদায়ের মধ্যে।

আঠার শতকের জেনেভা ছিল একটা ছোট্ট স্বাধীন প্রজাতন্ত্র; সুইজারল্যান্ডের অন্যান্য ক্যান্টনগুলির সঙ্গে জেনেভার পরিমেল ছিল ক্ষীণসূত্রে সংশ্লিষ্ট। সিস্‌মন্দির মহান স্বদেশবাসী এবং কিছু পরিমাণে

গরুর রুসোর মতো তিনিও ছিলেন — তাঁর একজন জীবনীকারের ভাষায় — জন্মসূত্রে আর মানসতা উভয়ত জেনেভার মানুষ, কিন্তু মানসতার ধারা আর রচনার উদ্দেশের দিক থেকে ফরাসী। সিস্‌মন্দির তত্ত্বীয় রচনাগুলি সবই ফরাসী ভাষায় লেখা হয় এবং প্রকাশিত হয় সাধারণত প্যারিসে। বহুলাংশে ফরাসী অর্থনীতি চিন্তনের প্রতিনিধি বলেই তাঁকে ধরা যেতে পারে।

সিস্‌মন্দির শৈশব আর যৌবন কেটেছিল শান্তিময় প্যাট্রিয়ার্কাল পরিবেশে — কিছু পরিমাণে এর থেকে দেখা যায় তাঁর ধ্যান-ধারণার মূল। জীবনভর তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল সুখ সাধারণত আসে সৎ মেহনতী কারিগর আর খামারীদের ঘরে, আর কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্যের দপ্তর এবং ব্যাঙ্কগুলো যেখানে সেইসব বড়-বড় শহর ছেড়ে চলে যায়। তবে এই প্যাট্রিয়ার্কাল জীবনটাই তখন চলে যাচ্ছিল অতীতের গর্ভে, সেটাকে খতম করে দিচ্ছিল শিল্প-বিপ্লব, এই বিপ্লবের মধ্যে হস্তশিল্পের জায়গায় আসছিল কারখানায় উৎপাদন, আর নিজ ওস্তাদি আর অনাড়ম্বর সচ্ছলতা নিয়ে গর্ববোধ করত যে-স্বাধীন কারিগর তার জায়গায় এসে যাচ্ছিল নিঃস্ব প্রলেতারিয়ান।

আঠার বছর বয়সে সিস্‌মন্দি বাধ্য হয়ে, লেখাপড়া শেষ না করেই লিয়োঁতে গিয়ে একজন বণিকের কেরানির কাজ নেন — এই বণিকটি ছিলেন তাঁর বাবার এক বন্ধু। জ্যাকবিন বিপ্লব অচিরেই লিয়োঁতে পেঁছে তারপর ছড়িয়ে পড়ে জেনেভায়, আর সবসময়েই সেটার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র থাকে সন্নিহিত ফ্রান্সের সঙ্গে। শুরু হয় সিস্‌মন্দি পরিবারের নিবাস-বদলের পালা। ১৭৯৩ সালের গোড়ার দিকে তাঁরা চলে যান ইংলণ্ডে, সেখানে থাকেন আঠার মাস। ফিরে আসার স্বল্পকাল পরেই তাঁরা আবার পালাতে বাধ্য হন, এবার তাঁরা যান উত্তর ইতালিতে, সেটাও কিন্তু অচিরে যায় ফ্রান্সের দখলে। সিস্‌মন্দি (ছোট) পাঁচ বছর ধরে একটা খামার চালিয়েছিলেন তুস্কেনিতে; যে-টাকা তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তাই দিয়েই কেনা হয় খামারটা। এই ডামাডোলের বছরগুলিতে তিনি রাজনীতিক-সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে কয়েক বার জেলে যান। জেনেভা সরকারীভাবে ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হবার (১৭৯৮) পরে সিস্‌মন্দি পরিবার স্বদেশে ফেরেন; ফ্রান্সে প্রথম কন্সাল নেপোলিয়ন বোনাপার্ট 'আইন-শৃঙ্খলা স্থাপন করেন'।

তরুণ সিস্‌মন্দির যোগ্যতার ধারা এবং স্বাভাবিক ঝোঁক মোটামুটি

স্পষ্ট-নির্দিষ্ট হয়ে উঠেছিল ততদিনে। তাঁর প্রথম বই হল তুস্কেনির কৃষি সম্বন্ধে। ১৮০৩ সালে প্রকাশিত হয় অর্থশাস্ত্র বিষয়ে তাঁর একটি রচনা — 'De la richesse commerciale' ('ব্যবসা-বাণিজ্যিক ধনসম্পদ'), তাতে দেখা যায় তিনি অ্যাডাম স্মিথের শিষ্য এবং তাঁর ভাব-ধারণার প্রবক্তা।

বিখ্যাত ব্যাঙ্কার রাজনীতিক এবং ভাবুক নেকার আর তাঁর লেখিকা-সমাজকর্মী মেয়ে মাদাম দ্য স্তাল্‌কে ঘিরে ছিল বিদ্বজ্জন আর লেখকদের একটা মহল — তাতে সিস্‌মন্দি যোগ দেন। নেকার এবং মাদাম দ্য স্তালের জমিদারিতে থেকে সিস্‌মন্দি কাজ করেন দীর্ঘকাল; মাদামের সফরগুলিতে তিনি তাঁর সঙ্গে যেতেন। মাদাম দ্য স্তাল্‌ এবং তাঁর মহলের লেখক-লেখিকাদের সাহিত্যিক কল্পনাপ্রবণতার কিছুটা প্রভাব সিস্‌মন্দির উপর হয়ত পড়েছিল। তাঁর প্রধান সাধনা ছিল ইতিহাস। তিনি কয়েক খণ্ডে 'Histoire de la renaissance de la liberté en Italie' ('ইতালির প্রজাতন্ত্রগুলোর ইতিহাস') বই লেখেন আর কতকগুলি চমৎকার লেকচার দেন রোম্যান্স ভাষাগুলিতে সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে। ১৮১৩ সালে সিস্‌মন্দি প্যারিসে যান, তিনি দেখেন নেপোলিয়নের পতন, বুরবোঁ রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং 'শত দিবস'-এর নিদারুণ ঘটনাবলি। এইসব ঘটনার মধ্যে তিনি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধবাদী থেকে তাঁর সমর্থক হয়ে পড়েন সহসা: তিনি আশা করেছিলেন স্বাধীনতা আর সুখী জীবন সম্বন্ধে তাঁর কিছুটা অস্পষ্ট ধারণা বাস্তবে পরিণত হত নতুন সাম্রাজ্যে।

ওয়াটার্লু এবং ভিয়েনা কংগ্রেসের (১৮১৫) পরে সিস্‌মন্দি সুইজারল্যাণ্ডে ফিরে যান, তখন জেনেভা আবার এই দেশের অন্তর্ভুক্ত। ইংলণ্ডে এবং আরও কোন-কোন দেশেও তিনি গিয়েছিলেন। এই বছরগুলিতে গড়ে ওঠে তাঁর সামাজিক-আর্থনীতিক ভাব-ধারণাগুলি, সেসব তিনি বিবৃত করেন 'Nouveaux principes d'économie politique ou de la richesse dans ses rapports avec la population' ('অর্থশাস্ত্রের নতুন মূলসূত্রগুচ্ছ বা জনসংখ্যা এবং সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক প্রসঙ্গে') রচনায়। এটাই অর্থনীতি-বিজ্ঞান ক্ষেত্রে সিস্‌মন্দির প্রধান অবদান। এই বইখানার জন্যে অর্থনীতিবিদ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সারা ইউরোপে। ১৮২৭ সালে তিনি প্রকাশ করেন বইখানার দ্বিতীয় সংস্করণ, তাতে ইংলণ্ডের রিকার্ডো সম্প্রদায় এবং ফ্রান্সের সে'-সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর তর্কযুদ্ধ হয়ে

ওঠে আরও প্রচণ্ড। তাঁর বিবেচনায়, ১৮২৫ সালের আর্থনীতিক সংকটে প্রমাণিত হল তাঁর বক্তব্যই সঠিক, আর সর্বাত্মক অত্যুৎপাদন অসম্ভব এই মর্মে ধারণাটা ভ্রান্ত। এই সংস্করণের ভূমিকায় থাকে বিরুদ্ধবাদীদের উপর তাঁর বিজয়ের সুর। প্রসঙ্গত বলি, এটা সত্ত্বেও তিনি বরাবর খুবই সশ্রদ্ধ ছিলেন রিকার্ডোর প্রতি।

সিস্‌মন্দি লিখেছেন, এই বইখানা ততটা নয় অন্যান্য অর্থনীতিবিদদের রচনাগুলির বিস্তারিত বিচার-বিশ্লেষণের ফল, যতটা কিনা তাঁর যথার্থ পর্যবেক্ষণের ফল; এইসব পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি নিশ্চিত হন যে, একদিকে রিকার্ডো এবং অন্য দিকে সে' যে-আকারে স্মিথের মতবাদটিকে বিকশিত করেন সেই 'সনাতন' বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি ভুল।

আমাদের জানা আছে, রিকার্ডো সমস্ত সামাজিক ব্যাপার নিয়ে বিবেচনা করতেন উৎপাদনের স্বার্থের দিক থেকে, জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির সুবিধার দিক থেকে। আর সিস্‌মন্দি বললেন, উৎপাদন আপনাতেই কোন লক্ষ্য নয়, জাতীয় সম্পদ আসলে সত্যিকারের জাতীয় সম্পদ নয়, কেননা জনসমষ্টির বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ সেটা থেকে পায় শুধু কয়েকটা নগণ্য টুকরোটাকরা। তাঁর মতে, গুরু শিল্পের পথটা মানবজাতির পক্ষে বিপৎসংকুল। তিনি চাইলেন, অর্থশাস্ত্রকে সেটার বিমূর্ত ছকগুলোর পিছনে আসল মানুষটিকে লক্ষ্য করতে হবে।

একটি ইংরেজ তরুণীকে তিনি বিয়ে করেন ১৮১৯ সালে। তাঁদের কোন ছেলেপিলে হয় না। তাঁর বাদবাকি জীবনটা শান্তিতে কেটেছিল জেনেভার কাছে তাঁর ছোট তালুকে, সেখানে তিনি জাঁকাল 'Histoire des Français' ('ফরাসীদের ইতিহাস') লেখার কাজে ডুবে থাকতেন। এই ইতিহাসের ২৯টা খণ্ড সিস্‌মন্দি প্রকাশ করেন, কিন্তু তবু সেটা শেষ করে যেতে পারেন নি। ইতিহাস আর রাজনীতি প্রসঙ্গে আরও কিছু-কিছু রচনাও তিনি প্রকাশ করেন। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর এই সময়কার লেখাগুলি বড় একটা আগ্রহজনক নয়।

সিস্‌মন্দি ছিলেন দারুণ পরিশ্রমী। জীবনের একেবারে শেষ অবধি তাঁর দিনে আট ঘণ্টা কিংবা তারও বেশি সময় কাটত লেখার ডেস্কে। তাঁর সংগৃহীত রচনাবলি প্রকাশিত হয় ৭০ খণ্ডে! বেড়িয়ে আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ করে অবসর-বিনোদন করতে তাঁর ভাল লাগত; তাঁর বন্ধুবান্ধব ছিল বহু, তাঁরা সানন্দে যেতেন তাঁর অতিথিবৎসল বাড়িতে। জেনেভার এই

বিখ্যাত মানুষটির শেষ জীবন ছিল তাঁর শৈশব আর কৈশোরেরই মতো আনন্দময়। ৬৯ বছর বয়সে তিনি মারা যান ১৮৪২ সালে।

প্রতিকৃতিতে দেখা যায় সিস্‌মন্দি ছিলেন গাঁট্টাগোঁট্টা মানুষটি, তাঁর কাঁধ বেশ চওড়া। তাঁর একজন সমসাময়িক লিখেছেন, তরুণ বয়স থেকেই তিনি ছিলেন খুবই অপ্রতিভ আর আনাড়ি। বলা হয়, এর দরুন তিনি সামাজিক মেলামেশা তেমন করতেন না, একান্ত বিদ্যাচর্চায়ই ডুবে থাকতেন। তিনি ছিলেন খুবই শান্ত, সহৃদয়, সহানুভূতিশীল। মাদাম দ্য স্তালের মহলের বর্ণনা দিতে গিয়ে কেউ-কেউ 'ভাল মানুষ সিস্‌মন্দির' কথা বলেছেন। তিনি ছিলেন অবিচলিত বন্ধু, আদর্শ স্বামী, সুবিবেচক পুত্র এবং ভ্রাতা। এই বিনম্র স্বভাব সত্ত্বেও তিনি ছিলেন নীতিনিষ্ঠ, প্রয়োজন হলে তিনি মতে এবং কর্মে সাহসী এবং সুদৃঢ় হতে পারতেন। উল্লিখিত সমসাময়িক লিখেছেন: 'স্বভাবতই শান্তিবাদী হলেও তিনি একাধিক বার বন্ধুকে বিপদগ্রস্ত করার চেয়ে বরং আক্রমণের সম্মুখীন হবার অবস্থাই বেছে নেন। তিনি একটি বিখ্যাত পর্যালোচনা পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাতে প্রকাশিত একটা প্রবন্ধে আভিজাত্য সম্বন্ধে দাম্ভিক একজনের আঁতে ঘা পড়েছিল। সিস্‌মন্দিই প্রবন্ধটার লেখক বলে অভিযোগ তুলে ঐ লোকটি দাবি করেছিল সিস্‌মন্দি অভিযোগ স্বীকার করুন, নইলে আসল লেখকের নাম বলুন। সিস্‌মন্দি কোন উত্তর দিতে অস্বীকার করেন। তখন আসে দ্বন্দ্বযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ; সিস্‌মন্দি সেটা গ্রহণ করেন, প্রতিপক্ষকে গুলি ছুঁড়তে দেন নিজের উপর, আর নিজে পিস্তলের গুলি ছোঁড়েন শূন্যে, আর তারপর প্রথম বলেন প্রবন্ধটার লেখক তিনি নন। যুদ্ধে যা মেলে সেই সমস্ত সম্মানের সঙ্গে তিনি এই হাস্যকর সংঘাত থেকে সরে যান।'*

পুঁজিতন্ত্রের সমালোচনা

মুহূর্তের জন্যে আবার তোলা হচ্ছে আরিস্টটলের কথা। পাঠকের হয়ত মনে পড়বে অর্থনীতিবিদ্যা এবং অর্থমৃগয়াবিদ্যার মধ্যে বৈসাদৃশ্যটাকে তুলে ধরেছিলেন এই মহান গ্রীক। অর্থনীতি হল মানুষের প্রয়োজন

* A. Stevens, 'Madame de Staël, a Study of Her Life and Times: the First Revolution and the First Empire', Vol. II, London, 1881, p. 19.

মেটাবার উদ্দেশ্যে চালান স্বাভাবিক আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাপার। অগাধ ধন-সম্পদের জন্যে চেষ্টা, আর ভোগ-ব্যবহারের জন্যে নয়, ধন-সম্পদ রাশীকৃত করার জন্যেই চালান আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপ হল অর্থমৃগয়াবিদ্যা। আরিস্টটলের আমলের পরে এই ধারণাটায় যেসব পরিবর্তন ঘটে গেছে তা আমরা দেখেছি।

এটা হল পুঁজিতন্ত্রের যেকোন সমালোচনার স্বাভাবিক ভিত্তি, কেননা এই দৃষ্টিকোণ থেকে পুঁজিতন্ত্র হল বিশুদ্ধ অর্থমৃগয়াবিদ্যা। আধা-আদিম ধরনের দাস-মালিকানার অর্থনীতি নয় — সিস্‌মন্দির আদর্শস্থল ছিল স্বাধীন খামারী আর কারিগরদের প্যাট্রিয়ার্কাল অর্থনীতি। তাঁর দৃষ্টিতে অর্থমৃগয়াবিদ্যার মূর্ত প্রতীক নয় এথেন্সের বণিক আর মহাজনেরা, সেটা হল ইংরেজ কল-কারখানা মালিক, সওদাগর আর ব্যাঙ্কাররা, যাদের রীত-রেওয়াজ তখন গ্রাস করতে শুরু করেছিল তাঁর জন্মস্থান জেনেভা এবং প্রিয় ফ্রান্সকে।

পুঁজিতন্ত্র সম্বন্ধে সিস্‌মন্দির সমালোচনাটা পেটি-বুর্জোয়া ধরনের, কিন্তু এটাকে স্থূল অর্থে দেখা চলে না। দোকানদার কিংবা কারিগরদের তিনি উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা বলে মনে করতেন তা নয়, কিন্তু মানুষের উন্নততর ভবিষ্যতের জন্যে যেটার উপর ভরসা করা যেতে পারে এমন অন্য কোন শ্রেণী তাঁর জানা ছিল না। শিল্পক্ষেত্রের প্রলেতারিয়েতের কত কষ্ট সেটা সিস্‌মন্দি দেখেছিলেন, তাদের দুর্দশা সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেনও বিস্তর, কিন্তু তাঁর একেবারে কোন ধারণাই ছিল না প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে। তিনি যখন লেখেন সেই যুগে গড়ে উঠছিল ইউটোপীয় আর পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের ভাবধারাগুলি। তিনি নিজে সমাজতন্ত্রী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর অভিপ্রায় যা-ই হোক, পুঁজিতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনায় একটা সমাজতান্ত্রিক ধাঁজ এসেছিল তখনকার কালধর্ম থেকে। তিনি হয়ে দাঁড়ালেন পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা — প্রথমত ফ্রান্সে, কিছু পরিমাণে ইংলন্ডেও। মার্কস এবং এঙ্গেলস ১৮৪৮ সালে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে' সেটার উল্লেখ করেছিলেন।

পুঁজিতন্ত্রে সহজাত অর্থপূজার প্রতি সিস্‌মন্দির ঘৃণা ছিল স্বভাবসিদ্ধ। মাদাম দ্য স্তাল্‌ যখন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন (যাওয়াটা হয় না) তখন সিস্‌মন্দি সক্রোধে ঘৃণাভরে লিখেছিলেন সেখানে সবকিছু বিচারের মানদণ্ড হল অর্থ, কোন মার্কিন সংবাদপত্রের

একটা প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন তাতে নেকারের মেয়ে কত ধনী সেই সম্বন্ধেই শুধু বলা হয়, কিন্তু তাঁর প্রতিভা মানসিক শক্তি আর সাহিত্যিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে একটি কথাও নয়। পুঁজিতন্ত্র সম্বন্ধে সিস্‌মন্দির সমালোচনায় খুবই স্পষ্ট করে খুলে দেখান হয় পুঁজিতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বহু দ্বন্দ্ব-অসংগতি আর দোষ-ত্রুটি। নিজ তত্ত্বের কেন্দ্রস্থলে তিনি তুলে ধরেন বাজার কাটতি আর সংকট-সংক্রান্ত সমস্যাটাকে, আর সেটাকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট করেন বুর্জোয়া সমাজের শ্রেণীগত গঠন বিকাশের সঙ্গে, মেহনতী মানুষকে প্রলেতারিয়ানে পরিণত করার ধারাটার সঙ্গে। সেটা করতে গিয়ে তিনি আসল বিষয়টা লক্ষ্য করেন, তিনি ধরতে পারেন সেই অসংগতিটাকে যেটা ইতিহাসক্রমে বিকশিত হয়ে একটা ছোট্ট ঘা থেকে পুঁজিতন্ত্রের সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাধিতে পরিণত হচ্ছিল। অর্থশাস্ত্র বিষয়ে লেখা হাজার-হাজার, হয়ত অযুত-অযুত রচনার বিষয়বস্তু হয়েছে আর্থনীতিক সংকট-সংক্রান্ত সমস্যাটা, এটা কিছু অতিশয়োক্তি নয়। সেই পেল্লায় গাদাটার মধ্যে হারিয়ে যায় নি সিস্‌মন্দির লেখাগুলি। সংকট-সংক্রান্ত সমস্যাটার সমাধান তিনি করেন নি, তা ঠিকই, কিন্তু সমস্যাটাকে তিনি তুলে ধরলেন (১৮১৯ সালে!), এটা আপনাতেই হল তাঁর সমসাময়িকদের সঙ্গে তুলনায় একটা মস্ত অগ্রপদক্ষেপ। অর্থনীতি-বিজ্ঞানক্ষেত্রে সিস্‌মন্দির অবদানের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ভ. ই. লেনিন উল্লিখিত রচনায় লিখেছেন: 'সমসাময়িক প্রয়োজন যা সেটার সঙ্গে তুলনায় কোন্ অবদান ইতিহাস-বিশ্রুত ব্যক্তি **রাখলেন না** তা দিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক কৃতি বিচার করা হয় না, সেটা করা হয় পূর্বসূরিদের সঙ্গে তুলনায় **কোন্ নতুন-নতুন অবদান তিনি রাখলেন** সেটা দিয়ে।'*

রিকার্ডো এবং তাঁর অনুগামীদের বিবেচনায় আর্থনীতিক প্রক্রিয়াটা হল বিভিন্ন স্থিতি-অবস্থার অন্তহীন শ্রেণী, আর একটা থেকে অন্য স্থিতি-অবস্থায় উত্তরণ ঘটে নির্ঝঞ্ঝাটে — আপনা থেকে 'মানিয়ে নেবার' উপায়ে। এইসব স্থিতি অবস্থায়ই তাঁরা আগ্রহান্বিত ছিলেন, কিন্তু উত্তরণগুলোর ব্যাপারে তাঁরা বড় একটা মনোযোগ দেন নি। কিন্তু সিস্‌মন্দি বললেন, উত্তরণ ঘটে না নির্ঝঞ্ঝাটে, সেটা তীব্র সংকটের আকার ধারণ করে, এর ক্রিয়াধারাটা অর্থশাস্ত্রের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

---

* ভ. ই. লেনিন, 'সংগৃহীত রচনাবলি', ২ খণ্ড, মস্কো, ১৯৭১, ১৮৫-১৮৬ পৃঃ।

পুঁজিতন্ত্র সম্বন্ধে সিস্‌মন্দির ছকটা মোটামুটি দেওয়া হচ্ছে। উৎপাদনের চালকশক্তি আর লক্ষ্য হল লাভ, তাই শ্রমিকদের কাছ থেকে যথাসম্ভব বেশি পরিমাণ লাভ নিংড়ে নিতে চেষ্টা করে পুঁজিপতিরা। জননের স্বাভাবিক নিয়মাবলির দরুন (এতে সিস্‌মন্দি মূলত ম্যালথাসের অনুগামী) শ্রমের যোগান স্থায়িভাবেই চাহিদার চেয়ে বেশি, তার ফলে পুঁজিপতিরা মজুরি কমিয়ে রাখতে পারে ভুখার কিনারে। জীবনধারণের জন্যে শ্রমিকেরা দিনে ১২-১৪ ঘণ্টা খাটতে বাধ্য হয়, যা সিস্‌মন্দি বলেছিলেন। এইসব শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা অত্যন্ত কম, সেটা একেবারেই অপরিহার্য জীবনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারার চেয়ে বেশি নয়। তাদের শ্রম কিন্তু ক্রমেই আরও বেশি-বেশি পরিমাণ পণ্য উৎপন্ন করতে পারে। যন্ত্রপাতি চালু হবার ফলে অসামঞ্জস্যটা স্রেফ বেড়ে যায়: যন্ত্রপাতি শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ায়, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের বাড়তি করে ফেলে। তার অনিবার্য পরিণাম হল ধনীদের জন্যে বিলাসদ্রব্য উৎপাদনে ক্রমেই আরও বেশি-বেশি পরিমাণ সামাজিক শ্রম নিয়োগ। কিন্তু এইসব জিনিসের জন্যে তাদের চাহিদা সীমাবদ্ধ এবং অস্থায়ী। এইভাবে সিস্‌মন্দির যুক্তিধারায় আসে অত্যুৎপাদন সংকটের অনিবার্য উদ্ভব — তাতে কোন মধ্যবর্তী গ্রন্থি প্রায় নেই।

সেটা থেকেই আসে সিস্‌মন্দির ব্যবস্থাপত্রটাও। যে-সমাজে থাকে কমবেশি ‘বিশুদ্ধ’ পুঁজিতন্ত্র এবং প্রধানত দুটো শ্রেণী — পুঁজিপতিরা আর মজুরি-শ্রমিকেরা — সেখানে গুরুতর সংকট অনিবার্য। ম্যালথাসের মতো সিস্‌মন্দিও পরিত্রাণের উপায় হিসেবে দেখেন ‘তৃতীয় ব্যক্তিদের’ — বিভিন্ন মধ্য শ্রেণী আর বর্গ। তবে ম্যালথাসের মতো নয়, সিস্‌মন্দির বিবেচনায় তারা হল প্রধানত ক্ষুদ্র পরিসরে পণ্য-উৎপাদকেরা — কৃষক, হস্তশিল্পী, কারিগর। তার উপর, সিস্‌মন্দি ধরে নেন যে, বিস্তৃত বৈদেশিক বাজার ছাড়া পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রসার অসম্ভব, আর এই বাজারটাকে তিনি দেখেছিলেন একমুখো রাস্তা হিসেবে: অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশগুলিতে অপেক্ষাকৃত বেশি উন্নত দেশগুলির পণ্য বিক্রয়। তখনও সম্পদের ভারে ইংলণ্ডের শ্বাসরোধ হয় নি, তার কারণ হিসেবে তিনি দেখান বৈদেশিক বাজারের অস্তিত্ব।

অর্থনীতিক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ব্যাপক হস্তক্ষেপের দাবি করেন সিস্‌মন্দি। বিকাশের স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়ায় অবিরাম ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল যেসব স্বাভাবিক এবং

সুস্থ নিয়ম-নীতি সেগুলিকে আর্থনীতিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে শুধু রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে, এই ছিল তাঁর আশা। সিস্‌মন্দি কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব তুলেছিলেন, সেগুলিকে তখন মনে হত ভীষণ সমাজতান্ত্রিক, কিন্তু এখন পুঁজিপতিদের পক্ষে বেশ গ্রহণযোগ্য: শ্রমিকদের সমাজবিমা আর সামাজিক রক্ষণাবেক্ষণ, শিল্পায়তনের লাভে শ্রমিকদের অংশীদারি, ইত্যাদি।

তবে অনেক ব্যাপারে সিস্‌মন্দি তাকাতেন সামনের দিকে নয়, বরং পিছনে। তিনি মনে করতেন, সাবেকী রীত-রেওয়াজ কৃত্রিম উপায়ে বজায় রাখলে, অল্পকিছু লোকের হাতে সম্পদ জড়ো হওয়াটা রোধ করা হলে পুঁজিতন্ত্রের আপদ-বালাইগুলোর সুরাহা হয়ে যায়। মধ্যযুগে, সামন্ততন্ত্রে প্রত্যাবর্তন তিনি অবশ্য চান নি। কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের বর্বরোচিত অভিযান রোধ করার উপায় হিসেবে তিনি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন এমনসব প্রথা-প্রতিষ্ঠান যেগুলো বাহ্যত নতুনকিছু হলেও ফিরিয়ে আনে ‘খাসা সেই পুরন দিনগুলি’। শ্রমিকদের বৈষয়িক নিরাপত্তার জন্যে তিনি এমন একটা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন যার থেকে মনে আসে সাবেকী হস্তশিল্প গিল্ডের কথা। ইংলণ্ডে ছোট-ছোট জোত-জমা আবার চালু হলে তিনি খুশি হতেন। এই আর্থনীতিক কল্পনাবিলাসটা ছিল অলীক এবং মূলত প্রতিক্রিয়াশীল, কেননা এতে পুঁজিতন্ত্র বিকাশের প্রগতিশীল প্রকৃতিটাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, আর ভবিষ্যতের বদলে অতীতের মাঝে খোঁজা হয় প্রেরণার জন্যে। সিস্‌মন্দির তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে **প্রতিক্রিয়াশীল** আখ্যাটা প্রযোজ্য কেন সেটা স্পষ্ট করে তুলতে গিয়ে লেনিন লেখেন: ‘এই আখ্যাটা প্রয়োগ করা হয় **ঐতিহাসিক-দার্শনিক** অর্থে; যেসব তত্ত্ববিদ তাঁদের তত্ত্বের আদর্শরূপ গ্রহণ করেন কোন **অচলিত** সমাজ থেকে তাঁদের শুধু **ভ্রান্তিটাকে** তাতে বর্ণনা করা হয়। এইসব তত্ত্ববিদের ব্যক্তিগত গুণাগুণ কিংবা তাদের কর্মসূচি সম্বন্ধে সেটা মোটেই প্রযোজ্য নয়। সিস্‌মন্দি কিংবা প্রুধোঁ, এঁদের কেউই আখ্যাটার মামুলি অর্থে প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না তা তো জানে প্রত্যেকেই।’*

অনেক দিক থেকেই সিস্‌মন্দি ছিলেন ভাবুক এবং ব্যক্তি হিসেবে প্রগতিশীল। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটাকে তিনি কিভাবে বুঝতেন তাতে সেটা

* ভ. ই. লেনিন, ‘সংগৃহীত রচনাবলি’, ২ খণ্ড, মস্কো, ১৯৭১, ২১৭ পৃঃ।

দেখা যায় সর্বপ্রথমে: সেটা হল কম প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থার জায়গায় অপেক্ষাকৃত বেশি প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। পুঁজিতন্ত্রে ছাড়া সমাজ উন্নয়নের অন্য কোন সম্ভাবনা দেখতে পান নি রিকার্ডো এবং তাঁর অনুগামীরা — তাঁদের সঙ্গে তর্কের মধ্যে সিস্‌মন্দি বিরুদ্ধবাদীদের কাছে তোলেন এই প্রশ্নটা: '...পুঁজিতন্ত্র যেসব বিন্যাসের জায়গায় এসেছে সেগুলির চেয়ে সেটা প্রগতিশীল বলে সিদ্ধান্ত করা যায় কি আমরা এখন সত্যের নাগাল পেয়ে গেছি, মজুরি-শ্রম প্রথার যে-মৌলিক দোষ আমরা উদ্‌ঘাটিত করেছি দাসপ্রথা, সামন্ততন্ত্র আর গিল্ড কর্পোরেশন ব্যবস্থায় সেটা [পুঁজিতন্ত্রে] উদ্‌ঘাটিত হবে না। ...নিঃসংশয়ে বলা যায়, আমরা মেহনতী শ্রেণীগুলিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে দিলাম বলে আমাদের নাতিরা একদিন আমাদের ঠিক তেমনি বর্বর বলেই বিবেচনা করবে যেমনটা বর্বর বলে তারা বিবেচনা করবে এবং আমরা নিজেরাও বিবেচনা করি সেইসব জাতিকে যারা ঐ একই শ্রেণীগুলিকে দাস-দশাগ্রস্ত করেছিল, সেদিন আসবে।'* এই চমৎকার অংশটায় দেখা যায়, সিস্‌মন্দি বুঝতে পেরেছিলেন পুঁজিতন্ত্রের জায়গায় আসবে উন্নততর, অধিকতর মানবিক সমাজব্যবস্থা, যদিও সেটার বিশেষত্বগুলিকে তিনি তুলে ধরতে পারেন নি।

সংকট

'এইভাবে জাতিগুলি এমনসব বিপদে পড়ে যেগুলোকে মনে হয় পরস্পর-বিরোধী। বড় বেশি খরচ ক'রে এবং খুবই কম খরচ ক'রে সেগুলির সর্বনাশ হতে পারে সমানই।'** সিস্‌মন্দির এই উপলব্ধিটা একেবারেই আশ্চর্য। বিষয়টাকে এভাবে তুলে ধরার কথা স্মিথ কিংবা রিকার্ডোর মাথায় আসে নি! তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে, কোন ব্যক্তিরই মতো কোন জাতির সর্বনাশ ঘটতে পারে শুধু যখন সেটা আয়ের চেয়ে ব্যয় করে বেশি — 'পুঁজি খেয়ে ফেলে'। — কিন্তু খুবই কম ব্যয় করলে জাতির সর্বনাশ হতে পারে কেমন করে?

---

* J.-C.-L. Sismonde de Sismondi, 'Nouveaux principes d'économie politique, ou de la richesse dans ses rapports avec la population', t. 2, Paris, 1827, p. 435.

** ঐ, ১ খণ্ড, ১২৩ পৃঃ।

প্রকৃতপক্ষে সিস্‌মন্দির এই ধারণাটায় প্রচ্ছন্ন আছে বিস্তর সত্য, সমসাময়িক পুঁজিতন্ত্রের ক্ষেত্রে এটা খুবই প্রযোজ্য। কোন জাতি 'খুবই কম খরচ করছে' বলে সংকট লেগে যায় — এই কথাটা অনেকাংশে যথার্থ। যেসব পণ্য কেউ কেনে না সেগুলো গাদা-গাদা হয়ে জমে ওঠে গুদামে। উৎপাদন কমে যায়, কর্মে নিয়োগ আর বিভিন্ন আয় কমে। লোকে যাতে আরও বেশি কেনে সেইভাবে তাদের প্রবৃত্ত করাবার উদ্দেশ্যে আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র বিভিন্ন সংকট-নিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। কিংবা রাষ্ট্র নিজেই বেশি-বেশি খরচ করতে লাগে, তার বাবত অর্থ পায় রাষ্ট্রীয় ক্রেডিটের সাহায্যে। উৎপন্ন পণ্যরাশির কাটতি হবার মতো যথেষ্ট ক্রয়ক্ষম চাহিদা অর্থনীতিক্ষেত্রে না থাকলে এই চাহিদা চাগাতে হয় কিংবা সৃষ্টি করতে হয় কৃত্রিম উপায়েই। আধুনিক সংকট-নিরোধক কর্মনীতিতে এটা স্বতঃসিদ্ধ। সংকটের কারণ সম্বন্ধে তত্ত্বীয় বুঝ-সমঝ না হলেও এতে প্রকাশ পায় অভিজ্ঞতার ফলে এবং অভিজ্ঞতা সামান্যীকরণের ফলে উদ্ভূত ব্যবহারিক প্রণালী যা একটাকিছু চৌহদ্দির ভিতরে সংকটের মোকাবিলা করতে কার্যকর হতে পারে।

কিন্তু সিস্‌মন্দির তত্ত্বীয় তন্ত্রটায় ছিল কিছু-কিছু গুরুতর ভুল-ভ্রান্তি, যার থেকে শেষে আসে প্রতিক্রিয়াশীল আকাশকুসুম — প্যাট্রিয়ার্কাল ব্যবস্থা, অনগ্রসরতা আর কায়িক শ্রম সমর্থন। এর আগে সিস্‌মন্দির অভিমতটাকে তুলে ধরতে গিয়ে সর্বক্ষণ বলা হয়েছে ব্যক্তিগত ভোগ-ব্যবহার এবং তার বস্তুগুলোর কথা। এটা আপতিক নয়। স্মিথের মতো সিস্‌মন্দিও শ্রমফলকে লাভ খাজনা আর মজুরি এইসব আয়ের সমষ্টিতে পর্যবসিত করেন। এর থেকে পয়দা হয় একটা অদ্ভুত ধারণা, যেটাকে মার্কস বলেন **স্মিথের বাণী**, সেটা এই যে, কোন জাতির বার্ষিক উৎপাদকে সেটার আদি আকারে ভোগ্যপণ্যরাশি হিসেবে ধরা যেতে পারে। আয় তো ব্যয় করা হয় প্রধানত ভোগ-ব্যবহারের জন্যেই। জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে আর যা উৎপন্ন হয় সেই সবকিছুকে 'বিশুদ্ধ বিশ্লেষণের' বেলায় উপেক্ষা করা যেতে পারে। এই 'বাণী'টার একটা বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়ে সিস্‌মন্দি সেটাকে করেন আর্থনীতিক সংকটের কারণ সম্বন্ধে তাঁর ভাব-ধারণার ভিত্তি।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, কোন সমাজের বার্ষিক উৎপাদ তো ভোগ্যপণ্যের সমষ্টিটাই শুধু নয়, তার মধ্যে আরও থাকে উৎপাদনের উপকরণ: যন্ত্রপাতি আর পরিবহনের সাজ-সরঞ্জাম, কয়লা, ধাতু, অন্যান্য মালমশলা। এগুলোর

একাংশ পরে ভোগ্যপণ্যের অঙ্গীভূত হয়ে যায় তা ঠিক। কিন্তু তা হতে পারে পরের বছর কিংবা আরও পরে। তার উপর, কোন একটা বছরের চৌহদ্দির মধ্যেও ধরা যাক শুধু কাপড়ের কাটতির কথা বলা চলে না, যা থেকে কাপড়টা তৈরি হল সেই তুলোর কাটতির কথাও বলা চাই, ইত্যাদি। নতুন কোন পুঁজি বিনিয়োজিত না হয়ে থাকলেও অচলিত যন্ত্র বদলাবার জন্যে নতুন যন্ত্র তৈরি করা তো দরকার, জীর্ণ ঘর-বাড়ির জায়গায় নতুন ঘর-বাড়ি তৈরি করা চাই। সরল পুনরুৎপাদন নয়, সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনই পুঁজিতন্ত্রের বিশেষক, তাতে সবসময়ে নতুন পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়।

উৎপাদনে জটিলতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, নতুন-নতুন শাখা দেখা দেবার ফলে, যন্ত্রসজ্জা বাড়ার দরুন বার্ষিক উৎপাদে উৎপাদনের উপকরণের হিস্সাটা কোন একটা পরিমাণে বাড়ে। সঞ্চয়নের হার যখন চড়া, অর্থাৎ উৎপাদের সঙ্গে তুলনায় পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ যখন চড়া, তখন ঐ হিস্সাটা বিশেষত চড়া। উৎপাদনের উপকরণের জন্যে অর্থনীতিক্ষেত্রে চাহিদা থেকে দেখা দেয় একটা বিশেষ ধরনের বাজার, সেটা সমাজের ভোগ-ব্যবহারের ক্ষমতার অনপেক্ষ বহুলাংশে। এই কারণেই সংকট নিরবচ্ছিন্ন হতে পারে না, সেটা সবসময়েই পর্যাবৃত্ত। পুঁজির পরিচলন যেন একটা বদ্ধ বৃত্তাকারে, তাই সেটা কিছু পরিমাণে স্বয়ম্ভর। কয়লা কেটে তোলা হয় খনি থেকে, কিন্তু সেটা ব্যবহৃত হয় ব্ল্যাস্ট ফার্নেসে, লোকের ঘরে তাপনের জন্যে নয়। ধাতু বিগলন করা হয়, কিন্তু ছুরি-কাঁটা তৈরি করার জন্যে নয়, সেটা থেকে খনি-শিল্পের যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা হয়। পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রকৃতিটা স্বতঃস্ফূর্ত, তাই কয়লা ধাতু কিংবা যন্ত্রপাতির উৎপাদন অতিরিক্ত হয়ে যেতে থাকলে সেটা সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ে না।

জনসমষ্টির বিপুল অংশটার গরিবির দরুন ভোগ্যপণ্যের জন্যে তাদের ক্রয়ক্ষম চাহিদা সৃষ্টি হতে পারে না, কিন্তু সংকটের কারণটাকে শুধু এই গরিবির মধ্যেই খুঁজতে গেলে ভুল হবে। তত্ত্ব আর চলিতকর্ম উভয়ত দেখা যায় জীবনযাত্রার মান খুবই নিচু হলেও উৎপাদন অনেকটা বাড়তে পারে। অর্থনীতিক্ষেত্রে উৎপাদনের চাহিদার সঙ্গে বেশকিছুটা সামরিক চাহিদা যুক্ত হলে সেটা বিশেষত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শেষে, স্মরণ করা যেতে পারে, কোন সংকট ছিল না পুঁজিতন্ত্রের আগে, যদিও জনসমষ্টির বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ উনিশ শতকে যেমনটা তেমনি গরিবই ছিল তখন, এর চেয়ে কম নয়।

উৎপাদন আর ব্যবহারের মধ্যে অসংগতি পুঁজিতন্ত্রে সহজাত, সেটাও আর্থনীতিক সংকটের ব্যাপারে থাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। কিন্তু সিস্মন্দির যা অভিমত তেমনটা নয় ব্যাপারটা — ওখানেই সেটার শেষ নয়। মার্কস দেখিয়েছেন, এই অসংগতিটা আপনিই আরও ব্যাপক ধরনের একটা অসংগতির অভিব্যক্তি, সেটা হল **উৎপাদনের সামাজিক ধরন এবং উৎপাদন-ফল আত্মসাৎ করার ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক ধরনের মধ্যে অসংগতি।** এই অসংগতিটার অর্থ এই যে, পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদন চলে সামাজিক পরিসরে, অর্থাৎ প্রধানত বড়-বড় বিশেষ-কৃতিকুশল শিল্পায়তনে, যেখানে উৎপাদন করা হয় বিস্তৃত বাজারের জন্যে; কিন্তু সমাজের লক্ষ্য আর স্বার্থের বশবর্তী না হয়ে এই উৎপাদন শিল্পায়তনগুলোর মালিক পুঁজিপতিদের লাভের বশবর্তী। বৃহদায়তনে সামাজিক উৎপাদনের বিকাশ ঘটে সেটার নিজস্ব নিয়মাবলি অনুসারে; পুঁজিপতিরা উৎপাদনকে একটা লক্ষ্য হিসেবে দেখে না, তারা এটাকে দেখে শুধু টাকা করার একটা উপায় হিসেবে, বলা যেতে পারে। এই বিরোধটারই নিষ্পত্তি হয় সংকটের মধ্যে।

প্রত্যেকটি পুঁজিপতি নিজ কারখানায় উৎপাদন বাড়াতে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব নিচু মাত্রায় মজুরি নামিয়ে দিতে চেষ্টা করে। অন্য দিকে, সংশ্লিষ্ট শাখায় এবং অন্যান্য শাখায় সমগ্র পরিস্থিতির কথাটা বিবেচনায় না রেখে সে নিজ পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে থাকে। ফলে (ক্রয়ক্ষম চাহিদার সঙ্গে তুলনায়) আপেক্ষিক অতিরিক্ত পরিমাণে পণ্য উৎপন্ন হয় এবং অর্থনীতি উন্নয়নের জন্যে আবশ্যক অনুপাতগুলো লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিতে পৃথক-পৃথক শিল্পোদ্যোগীরা কোন সহযোজন ছাড়াই এবং নিজ-নিজ খুশিমতো পুঁজি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়, এই ব্যাপারটা ক্রমেই বেশি তাৎপর্যসম্পন্ন হয়ে ওঠে শিল্পে বদ্ধ পুঁজির ভূমিকা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। প্রাপ্তিসাধ্য সমস্ত সংগতি-সংস্থানের সদ্ব্যবহার হবার পক্ষে যথেষ্ট পুঁজি বিনিয়োগ তারা করবে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা থাকে না।

সংকট হল পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির চলনের স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য ধরন: একটা থেকে অন্য একটা সাময়িক স্থিতি-অবস্থায় উত্তরণের ধরন। সাইবারনেটিক্স-এর ভাষায় বলা যায়, পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি হল একটা স্বয়ং-অনুক্রমায়ণ ব্যবস্থা যাতে 'ফীড্‌ব্যাক্‌টা' খুবই জটিল, কোন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ নেই। (আলোচ্য সময়ের পক্ষে) সর্বোপযোগী অবস্থায় এই ব্যবস্থাটার অনুক্রমায়ণ করা হয় 'পরখ-ভুলে'র ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায়। সংকটগুলো

হল — নরম করে বললে — ঐসব ‘পরখ-ভুলে’র প্রক্রিয়া, কিন্তু তাতে আর্থনীতিক আর সামাজিক দিক দিয়ে সমাজের ক্ষতি হয় প্রচণ্ড। সেটার পরিমাপ করা যায় বিভিন্ন পণ্য কত কম উৎপন্ন হল, কাজেই কত কম ব্যবহৃত হল তার পরিমাণ দিয়ে, খোয়া-যাওয়া কর্ম-বর্ষের সংখ্যা দিয়ে, আর সামাজিক বিচারে — মেহনতী জনসাধারণের দারিদ্র্যবৃদ্ধি দিয়ে।

সিস্‌মন্দিবাদের ইতিহাসক্রমিক নিয়তি

উনিশ শতকের শেষ দশকে রাশিয়ায় উদারপন্থী জনবাদীদের [নারোদ্‌নিক] বিরুদ্ধে বিপ্লবী মার্কসবাদীদের সংগ্রামের কেন্দ্রস্থলে ছিল সিস্‌মন্দির নামটি এবং তাঁর ভাব-ধারণা। প্রগাঢ় আর্থনীতিক চিন্তাবীর এবং দেদীপ্যমান তার্কিক হিসেবে ভ. ই. লেনিনের প্রতিভা নির্দিষ্ট আকার পায় এই সংগ্রামের মধ্যে। রাশিয়ায় বৈপ্লবিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির বিকাশের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিল এই সংগ্রাম। জনবাদীরা বলতেন, রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্র বিকাশের ভিত্তি নেই, কেননা কাটতির সমস্যার সমাধান তাতে হতে পারে না: মানুষ এতই গরিব যাতে বৃহদায়তনের পুঁজিতান্ত্রিক শিল্প যে-পণ্যরাশি উৎপাদন করতে পারে তা তারা কিনতে পারে না। অন্যান্য যেসব দেশ আগেই উন্নয়নের পুঁজিতান্ত্রিক পথ ধরেছিল সেগুলির মতো নয় রাশিয়ার অবস্থা — রাশিয়া বৈদেশিক বাজার পাবার ভরসা করতে পারে না, সেসব বাজার দখল হয়ে যায় অনেক আগেই। রাশিয়ার উন্নয়নের একটা ‘বিশেষ’ পন্থার ওকালতি করতেন জনবাদীরা: পুঁজিতন্ত্রের পাশ কাটিয়ে গিয়ে কৃষক-সাম্প্রদায়িক ‘সমাজতন্ত্রে’র পথ। ভ. ই. লেনিন দেখিয়ে দিলেন, সিস্‌মন্দির খুবই কাছাকাছি তত্ত্বীয় বিবেচনাধারাই এই পেটি-বুর্জোয়া রামরাজ্যের ভিত্তি, — সিস্‌মন্দিও ‘উন-পরিভোগে’র দরুন পুঁজিতন্ত্রের পতনের ভবিষদ্বাণী ক’রে ভরসা করেছিলেন কারিগর আর কৃষকদের উপর।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পুঁজিতন্ত্রের একচেটে পর্বের নিয়মাবলি হল মার্কসবাদের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বীয় প্রশ্ন। এই প্রশ্নটার কাঠামের ভিতরে দেখা দেয় পুঁজি সঞ্চয়নের নতুন-নতুন আকার আর ধারা-সংক্রান্ত প্রশ্ন এবং সাম্রাজ্যবাদের আমলে এই প্রক্রিয়াটার অসংগতিগুলো সংক্রান্ত প্রশ্ন। ১৯১৩ সালে বেরয় জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অন্যতমা

নেত্রী রোজা লুক্সেমবুর্গের বই ‘Die Akkumulation des Kapitals’ (‘পুঁজি সঞ্চয়ন’)। ভাবুকদের মধ্যে সর্বপ্রথমে সিস্‌মন্দিই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন আর সঞ্চয়নের সম্ভাবনা আর চৌহদ্দি লক্ষ্য করেছিলেন, তাই তাঁর ভাব-ধারণার বিশ্লেষণকে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয় এই বইখানায়। সে’-সম্প্রদায় আর রিকার্ডো সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিতর্কে সিস্‌মন্দির জোরাল যুক্তিগুলিকে চমৎকার তুলে ধরেন রোজা লুক্সেমবুর্গ।

রোজা লুক্সেমবুর্গ নিজ তত্ত্বীয় প্রতীতিতে কিন্তু ‘বিশুদ্ধ পুঁজিতান্ত্রিক’ সমাজে পুঁজি সঞ্চয়ন এবং উৎপাদনের প্রসার অসম্ভব এই মর্মে সিস্‌মন্দির উপস্থাপনা মেনে নেন। সামাজিক উৎপাদের কাটতি সম্বন্ধে মার্কসের ছকের যা ভিত্তি সেই বিমূর্তায়নটাকে তিনি বললেন ‘রক্তাল্পতাগ্রস্ত তত্ত্বীয় কল্পকথা’। তাঁর মতে, মার্কসের বিশ্লেষণ থেকে প্রতিপন্ন হয় আর্থনীতিক সংকট অসম্ভব। সিস্‌মন্দির মতো রোজা লুক্সেমবুর্গেরও মতটা আসলে ছিল এই যে, প্রাক্‌-পুঁজিতান্ত্রিক আকারের আর্থনীতিক বিন্যাসগুলো ভেঙে পড়লে শুধু তবেই পুঁজিতন্ত্রের প্রসার সম্ভব। এই প্রক্রিয়াটা সমাধা হলে পুঁজিতন্ত্রের ‘শ্বাসরোধের’ বিপদ দেখা দেয়। এর ফলে তিনি বিশেষত সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে ভুয়ো ব্যাখ্যা দেন। রোজা লুক্সেমবুর্গ প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদকে স্রেফ উপনিবেশ গ্রাসের কর্মনীতিতে পর্যবসিত করেন, তাতে তিনি মনে করেন, শুধু দেশীয় বাজার সঙ্কুচিত হবার ফলে এবং কাটতির সমস্যা প্রকোপিত হবার দরুনই এই কর্মনীতি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

পুঁজিতন্ত্রের আর্থনীতিক প্রসারের সুযোগ-সম্ভাবনা আর ভবিষ্য পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে গিয়ে মার্কসীয় চিন্তন নতুন-নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের মূলকৌশল আর কর্মকৌশলের পক্ষে এইরকমের সঠিক মূল্যায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। সিস্‌মন্দি আর রোজা লুক্সেমবুর্গের মতো ভাবুকেরা শুভেচ্ছা-প্রণোদিতই ছিলেন, কিন্তু পুঁজিতন্ত্র সেটার ভিতরকার শক্তি আর সংগতি-সংস্থানের সাহায্যে ‘গভীরে’ উন্নয়ন ঘটাতে পারে, এই বাস্তব সম্ভাবনাটাকে তাঁরা খাটো করে দেখান — তাঁদের বিবেচনাধারা ঐ প্রসঙ্গে ইতিহাসক্রমিক তাৎপর্যসম্পন্ন শুধু তাই নয়। সোভিয়েত আকাদমিশিয়ন ন. ন. ইনজেম্‌ৎসেভ বলেন: ‘পুঁজিতান্ত্রিক আর্থনীতিক উন্নয়নের পরিসর আর সম্ভাব্য হার-সংক্রান্ত প্রশ্নে বিভিন্ন ভুয়ো ভাবধারা বেশ বহুবিস্তৃত

হয়ে ওঠে পঞ্চম দশকের শেষ এবং ষষ্ঠ দশকের গোড়ার দিকে। একটা প্রগতির দিকে, আর-একটা প্রতীপগতির দিকে, এই দুটো ধারার মধ্যে বিরোধ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে বিশেষক, আর এই ধারা-দুটোর দ্বিতীয়টা রয়েছে বলে পুঁজিতন্ত্রের আগে যা ছিল তার চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি রহিত হয়ে যায় না কোনক্রমেই, এই মর্মে লেনিনের বক্তব্যটিকে প্রকৃতপক্ষে উপেক্ষা করছেন ঐসব ধারণার প্রবক্তারা। ...পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-শক্তিগুলোর 'আপনা থেকে ছিপি এ'টে যাবার' দিকে, ১৯২৯-১৯৩৩ সালের ধরনের প্রচণ্ড বিশ্ব আর্থনীতিক সংকটের দিকে মনোযোগ ঘুরিয়ে দেবার ফলে যা ঘটল তা এই যে, বিশ শতকের পঞ্চম দশক নাগাদ যে-নতুন পরিস্থিতি দেখা দেয় তাতে বিশ্ব রঙ্গভূমিতে শ্রেণীশক্তিগুলির পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভুয়ো মূল্যায়ন করা হল বস্তুত। ...তাতে একটাকিছু নিষ্ক্রিয়তা সমর্থন করা হল; বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার আরও সার্থক বিকাশের জন্যে আবশ্যক পরিবেশ হিসেবে কোন-কোন অসাধারণ উপপ্লব চাই বলে বোধ করে সেটার প্রত্যাশায় বসে থাকাটাকে তাতে সঠিক বলে তুলে ধরা হল।'*

পুঁজিতন্ত্রের বিনাশ ইতিহাসনির্দিষ্ট, সেটার আর বিকাশ ঘটতে পারে না বলে নয়, তার কারণটা হল এই যে, এই বিকাশের মধ্যে উদ্ভূত হয় একগুচ্ছ দ্বন্দ্ব-অসংগতি, যেগুলোর ফলে স্বাভাবিক এবং অনিবার্য ভাবে সৃষ্টি হয় বৈপ্লবিক উপায়ে পুঁজিতন্ত্রের জায়গায় উন্নততর সমাজব্যবস্থা — সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে আবশ্যক বৈষয়িক আর রাজনীতিক পরিস্থিতি।

আধুনিক বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে কোন-কোন ধারা বুঝবার জন্যেও সিস্‌মন্দির ভাব-ধারণা সম্বন্ধে অবগতি সহায়ক। উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের গোড়ার দিককার বিভিন্ন সনাতনী মতবাদ থেকে যাঁরা 'বিরুদ্ধবিশ্বাসী' হয়ে দাঁড়ান এমন অনেকের লেখায় দেখা যায় তাঁর অভিমতের কিছু-কিছু ছাপ, বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যাপার বিচার-বিশ্লেষণের কিছুটা 'সমধর্মী' ধরন। এইসব 'বিরুদ্ধবিশ্বাস' দু'রকমের: কোন-কোনটাতে ছিল বুর্জোয়া ব্যবস্থাটারই কমবেশি তীব্র সামাজিক সমালোচনা; আর অন্য কোন-কোনটা আর্থনীতিক সংকটের ব্যাপারে 'নয়া-ক্ল্যাসিকাল' সম্প্রদায়ের আত্মসন্তুষ্টির সমালোচনায় গণ্ডিবদ্ধ

---

* 'সমসাময়িক একচেটে পুঁজিতন্ত্রের অর্থশাস্ত্র', ২ খণ্ড, মস্কো, ১৯৭০, ৩৭৩-৩৭৫ পৃঃ (রুশ ভাষায়)।

থেকে এই প্রশ্নটাকে সামনে তুলে ধরা হয়। এই দুটো দিককে সংযুক্ত করা হয় আরও কোন-কোনটায়। জন হবসনের আর্থনীতিক তত্ত্বই বোধহয় এই দূর-সাদৃশ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত।

বুর্জোয়া বিশ্ববীক্ষার চৌহদ্দির ভিতরে থেকেই হবসন উনিশ-বিশ শতকের বাঁকের পুঁজিতন্ত্রের এবং তদানীন্তন অফিশিয়াল অর্থশাস্ত্রের, বিশেষত ইংলণ্ডে অর্থশাস্ত্রের গুরুতর সমালোচনা করেন। সিস্‌মন্দির মতো হবসন বলেন, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন কোনক্রমেই জনকল্যাণ উন্নীত করার লক্ষ্যসাধনে নিয়োজিত নয়, সেটা বরং বাড়ায় সেই সম্পদ, সেই ফল, যা ঐ জনগণ উপভোগ করতে পায় না। উৎপাদন আর সম্পদের মূল্যায়ন করা হোক 'মানুষের উপযোগে'র দৃষ্টিকোণ থেকে, এটাই তিনি চেয়েছিলেন। হবসন একটা সমাজ-সংস্কার কর্মসূচি উত্থাপন করেন, তাতে বাঁধা ন্যূনকল্প মজুরি এবং পুঁজিপতিদের উপর চড়া হারের বৃদ্ধিশীল করাধানের সঙ্গে ছিল একচেটেগুলোর উপর কড়া রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের দাবি। তিনি লেখেন: '...আমাদের শিল্পগুলির সাধারণ-স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত লাভসন্ধানী প্রবর্তনার বদলে সরাসর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করাটা সমাজ পুনর্গঠনের যেকোন পোক্ত পরিকল্পনার পক্ষে অপরিহার্য।'*

সিস্‌মন্দির ভাব-ধারণার সঙ্গে কিছুটা সম্বন্ধ দেখা যায় হবসনের সংকট তত্ত্বেও, এতে তিনি 'সে'-র নিয়মে'র তীব্র সমালোচনা করেন এবং নিশ্চয় করে বলেন যে, পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ব্যাপক অত্যুৎপাদন সংকট সম্ভব শুধু তাই নয়, সেটা অনিবার্যও বটে। তাঁর দৃষ্টিতে সংকটের কারণ হল অত্যধিক সঞ্চয়নের জন্যে নিরন্তর চেষ্টা — যেটা কিনা বুর্জোয়া সমাজের সামাজিক গঠনেরই একটা ফল — আর জনসমষ্টির ক্রয়ক্ষমতা সমানই নিরন্তর পিছিয়ে পড়ে থাকার অবস্থাটা। ফলে পুঁজির আধিক্য ঘটে, আর পুঁজি বিনিয়োগ এবং ভোগ্যপণ্য দুয়েরই জন্যে দেশীয় চাহিদার কমতি দেখা দেয়: হবসনের বিবেচনায় এটা হল উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির বৃহৎ পুঁজির বিদেশে আর্থনীতিক সম্প্রসারণের প্রধান কারণ; তিনি এইসব দেশের 'আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদে'র নিন্দা করেন।

সঞ্চয়ন আর সংকট-সংক্রান্ত তত্ত্বক্ষেত্রে কেইন্স হবসনকে গণ্য করতেন

---

* Ben B. Seligman, 'Main Currents in Modern Economics', New York, 1963 p. 238 থেকে উদ্ধৃত।

তাঁর খুবই কাছাকাছি পূর্বসূরিদের একজন বলে। কেইন্স আর সিস্‌মন্দির মধ্যে ভাবাদর্শগত যোগসূত্র রয়েছে বলে বহু বুর্জোয়া লেখক বলাবলি করে থাকেন এই প্রসঙ্গে। তবে, যেটাকে বলা হয় ভোগ-ব্যবহারের গরিষ্ঠ প্রবণতা সেটার কর্মতটা হল সম্ভাব্য বাড়তি সঞ্চয় এবং ক্রয়ক্ষম চাহিদা ঘাটতির একটা কারণ — কেইন্সের এই বিবেচনাতেই মনে হয় ঐ যোগসূত্রটা সীমাবদ্ধ। কোন বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হলে, আর্থনীতিক সংকট-সংক্রান্ত যেসব তত্ত্বে ব্যক্তিগত ভোগ-ব্যবহার আর ব্যবহারকের চাহিদা-সংক্রান্ত প্রশ্নের কোন ভূমিকা আছে তার প্রায় সবগুলিতেই দেখা যেতে পারে সিস্‌মন্দির 'প্রভাব'। সিস্‌মন্দি এবং বিশ শতকের গোড়ার দিককার বিশিষ্ট ফরাসী অর্থনীতিবিদ আ. আফ্‌তালিয়োঁর মধ্যে যোগসূত্র দেখান অনেকে — ইনি ত্বরণ-সংক্রান্ত মূলসূত্রের আবিষ্কর্তা বলে গণ্য; এই মূলসূত্রটা হল এই যে, ভোগ্যপণ্যের চাহিদা আর উৎপাদনে পরিবর্তন ঘটলে পুঁজি বিনিয়োগে এবং যন্ত্রপাতি উৎপাদনে আপেক্ষাকৃত প্রবল পরিবর্তন ঘটে, কাজেই সংকটের ব্যাপারে সেটা আসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। এই ত্বরণ মূলসূত্রে কিছু-কিছু যুক্তিসম্মত উপাদান আছে, তাতে প্রকাশ পায় আর্থনীতিক কালচক্রে সামাজিক উৎপাদনের উপ-বিভাগগুলির মধ্যে সম্পর্কের প্রসার।

বিস্তৃত পরিসরে ধরলে, গত কয়েক দশকে বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের বিষয়গতভাবে নির্ধারিত ক্রমবিকাশ এমন অভিমুখে চলছে যার কোন-কোন বিশেষত্ব ধরা পড়েছিল সিস্‌মন্দির স্বচ্ছদৃষ্টিতে। জাম্‌সের লেখা থেকে একটা উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে: 'আর নয় অণু-অর্থনীতি, এটা হল দীর্ঘায়ত অর্থনীতি, আর্থনীতিক ব্যাপারগুলোকে গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করার তাগিদ, অস্থিতির পৌনঃপুন্য আর 'স্বাভাবিকতা' সম্বন্ধে বিশ্বাস, laissez faire [অবাধ-নীতি] বর্জন এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ-সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণার উদ্ভব যেগুলি হল ১৯০০ সালের সঙ্গে তুলনায় ১৯৫০ সালের প্রধান-প্রধান বিশেষত্ব।'* আগেই দেখা গেছে, সিস্‌মন্দির রচনায় প্রাথমিক অবস্থায় দেখা যায় এর প্রত্যেকটা উপাদান (ভিন্ন ধরনে এবং অনেক ক্ষেত্রে সেটা থেকে সিদ্ধান্ত পৃথক)। তাঁর তত্ত্বীয় চিন্তনের ফলপ্রদ প্রকৃতিটা দেখা যায় এই সবকিছু থেকে।

* E. James, 'Histoire de la pensée économique au XX-e siécle', Paris, 1955, p. 15.

তবে তিনি যা রেখে গেছেন, আর তাঁর যা ঐতিহাসিক তাৎপর্য সেটা এখানেই শেষ নয়। একচেটে পুঁজিতন্ত্রকে সমর্থন করাই এখনকার বুর্জোয়া অর্থনীতি-বিজ্ঞানের প্রধান ভাবাদর্শগত কর্ম, — সিস্‌মন্দির রচনায় রয়েছে যে-সামাজিক প্রতিবাদ সেটার মূলভাবটাকে এই বিজ্ঞান গ্রহণ করে নি, গ্রহণ করতে পারতও না। তিনি ছিলেন পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে মেহনতী মানুষের দৃঢ় সমর্থক, শোষণ আর উৎপীড়নের বিরুদ্ধবাদী, বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে সাফাইদারী মতধারাগুলোর সমালোচক, বিশিষ্ট চিন্তাবীর, মানবতাবাদী।

প্রুধোঁ

ফ্রান্সের পিয়ের জোসেফ প্রুধোঁর নামের সঙ্গে সিস্‌মন্দির নামটিকে সংশ্লিষ্ট করা হয়ে থাকে, সেটা আপতিক নয়। সিস্‌মন্দির মতো প্রুধোঁও পুঁজিতন্ত্রের সমালোচনা করতেন পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিকোণ থেকে। ভিত্তিটাকে বিধ্বস্ত না করেই পুঁজিতন্ত্রের 'অমঙ্গলগুলো' দূর করাতেই তিনি সমাধান খুঁজতেন সিস্‌মন্দিরই মতো। কিন্তু তিনি লিখছিলেন সিস্‌মন্দির কুড়ি থেকে চল্লিশ বছর পরে, যখন শ্রেণীসংগ্রামের প্রসারের ফলে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক মতধারার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল ইতোমধ্যে। অর্থশাস্ত্র আর সমাজবিদ্যার ইতিহাসে প্রুধোঁই **পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের মুখ্য** প্রবক্তা বলে গণ্য।

বুর্জোয়াদের সম্বন্ধে সাহসিক সমালোচনা, অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি এবং প্রবন্ধকার হিসেবে বিশেষ প্রতিভার জন্যে মার্কস প্রুধোঁ সম্বন্ধে সপ্রশংস ছিলেন। তবে প্রুধোঁর পেটি-বুর্জোয়া কল্পনাবিলাসটা হানিকর এবং বিপজ্জনক ছিল নবীন শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে। মার্কস তখন ব্রাসেল্‌সে, — প্রুধোঁর সদ্য-প্রকাশিত 'আর্থনীতিক অসংগতিতন্ত্র বা দৈন্যের দর্শন' বইখানার তিনি তীব্র সমালোচনা করেন 'দর্শনের দৈন্য' নামে রচনায় (১৮৪৭)। প্রুধোঁ সম্বন্ধে সমালোচনাই শুধু নয়, এই বইখানার তাৎপর্য সেটা ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত: এতে রয়েছে মার্কসের অর্থনীতি তত্ত্বের প্রধান-প্রধান মূলসূত্রগুলি।

প্রুধোঁ গরিব পরিবারের মানুষ। তরুণ বয়সে তিনি ছিলেন রাখাল এবং ছাপাখানার কম্পোজিটর, পরে হন একটা ছোট ছাপাখানার অংশীদার

মালিক, তারপর আপিস কর্মচারী। তিনি রীতিমত শিক্ষা পান নি, তিনি শিক্ষালাভ করেন নিজের চেষ্টায়, তাতে তিনি হন প্রতিভাশালী। তাঁর জীবনটা ছিল কঠিন, তাতে অজস্র কষ্ট, অভাব-অনটন, কঠোর প্রচেষ্টা, নির্যাতন। রাজা লুই ফিলিপের আমলে তাঁকে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়েছিল তাঁর সাহসিক রচনাগুলির জন্যে, আর ডিক্টেটর-রাষ্ট্রপতি লুই নেপোলিয়নের আমলে তিনি তিন বছর কারারুদ্ধ থাকেন এবং পরে বাধ্য হয়ে দেশান্তরী হন। ব্রাসেল্সে একটা ক্রুদ্ধ জনতা তাঁকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল, তারা মনে করেছিল তিনি লুই নেপোলিয়ন (তখন সম্রাট ৩য় নেপোলিয়ন)-এর গুপ্তচর।

প্রুধোঁর জীবন এবং ক্রিয়াকলাপ অসংগতিতে ঠাসা। জ্ঞানবিজ্ঞান আর সাহিত্যক্ষেত্রে, বিশেষত অর্থবিদ্যাক্ষেত্রে তিনি বুর্জোয়া এবং তাদের ভাবাদর্শবিদদের বিরুদ্ধে লড়েন, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রবল কমিউনিজম-বিরোধিতা করেন। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন সুবিধাবাদী: একদিন ৩য় নেপোলিয়নের তীব্র সমালোচনা করলেন, আর অনুতাপ প্রকাশ করে এবং তাঁর প্রশস্তি গেয়ে চিঠি লিখলেন পরদিন। তিনি সমস্ত রকমের উৎপীড়ন আর অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়েন, কিন্তু সমাজে নারীর অধম অবস্থাটাকে স্বাভাবিক বলে মনে করেন এবং সেটাকে নিজ পরিবারে চালু করেন কিছু পরিমাণে। একটা রচনায় তিনি লিখেছিলেন, নারীর শারীরিক ক্ষমতা এবং মানসিক ক্ষমতাও পুরুষের সঙ্গে তুলনায় দুই-তৃতীয়াংশ বলে ধর্তব্য।

প্রুধোঁর ব্যক্তিসত্তায় যেন প্রকাশ পেয়েছিল শ্রেণী হিসেবে পেটি বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্ব-অসংগতিগুলো — পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের প্রধান শ্রেণী-দুটোর মাঝখানে পেটি বুর্জোয়াদের মাঝামাঝি ধরনের এবং অস্থির অবস্থানটা।

তিনি সমাজতন্ত্রী হন ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের জোয়ারের মধ্যে; এই বিপ্লব সহসা তাঁকে ফেলে দেয় রাজনীতিক ঘটনাবলির আবর্তে, তাতে তিনি সমাজ আর অর্থনীতি সম্বন্ধে মত স্পষ্ট প্রকাশ করতে বাধ্য হন। ভাব-ধারণায় যাবতীয় অসামঞ্জস্য এবং তালগোল পাকান অবস্থা থাকলেও প্রুধোঁ ছিলেন সৎ এবং সাহসী। প্যারিসের শ্রমিকদের জুন অভ্যুত্থান দমন হবার পরে তিনি সংবিধান-সভার সদস্য হন, — জনগণের মুষ্টিমেয় সমর্থকদের একজন হিসেবে তিনি নির্বাচিত হন। ১৮৪৮ সালের ৩১ জুলাইয়ের বক্তৃতায় তিনি শাসক শ্রেণীগুলোর নিন্দা করে মেহনতী মানুষের গরিবি উপশম করার ব্যবস্থা দাবি করেন — এটাকে মার্কস বলেন 'মস্ত সাহসের কাজ'। কিন্তু এটাই ছিল প্রুধোঁর ক্রিয়াকলাপের সর্বোচ্চ মাত্রা। জেলে থাকার সময়ে (১৮৪৯-১৮৫২) তিনি স্পষ্টতই দক্ষিণপন্থা ধরেন — মোটামুটি নিষ্ক্রিয় নৈরাজ্যবাদের মতাবস্থানে চলে যান। তাঁর শেষ বয়সের রচনাগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক উপাদান ক্রমেই কমে-কমে যায়।

প্রুধোঁর রচনাশৈলী জোরাল, স্পষ্ট; তিনি প্রয়োগ করতেন সাহসিক কূটাভাস আর জোরাল প্রবচন। এটা ছিল তাঁর জনপ্রিয়তার একটা গোপনকথা। বিখ্যাত কূটাভাস-রচনা 'মালিকানা হল চৌর্য'-র লেখক হিসেবে তিনি অমর হয়ে রয়েছেন সাহিত্যক্ষেত্রে; আর 'অধিকারই শক্তি' নামে আর-একটা নির্ভীক কূটাভাস-রচনা দিয়ে শেষ হয় তাঁর ক্রিয়াকলাপ। বুর্জোয়া সমাজের পক্ষে দুইই কিছু পরিমাণে যথার্থ।

অর্থনীতি বিষয়ে প্রুধোঁর প্রধান রচনাগুলি প্রকাশিত হয় ১৮৪৬-১৮৫০ সালে। এগুলিতে সিস্‌মন্দিরই মতো পুঁজিতন্ত্রের সমালোচনা, আর তা ছাড়া এইসব রচনার মুখ্য আলোচ্য বিষয়টা হল **জনসাধারণের বিনিময় ব্যাঙ্ক** সংক্রান্ত ধারণাটা। ১৮৪৯ সালে তিনি এই ধারণাটাকে কার্যে পরিণত করতে গিয়ে অকৃতকার্য হন।

প্রুধোঁ লেখেন, বুর্জোয়া সমাজে পণ্যের মূল্য স্থির করা হয় স্বতঃস্ফূর্ত এবং অন্যায্য ভাবে। অর্থ ছাড়া এই মূল্য উসুল হবার কথা কল্পনা করা যায় না, তার থেকে আসে তাবৎ আপদ-বালাই: দামের ঝপাঝপ ওঠা-নামা, গলাকাটা প্রতিযোগিতা, সংকট, দ্রব্য-সামগ্রীর অন্যায্য বণ্টন। পুঁজিতান্ত্রিক পণ্য-অর্থনীতির ভিত্তিটাকে অক্ষত রেখেই, শ্রমব্যয় অনুসারে সরাসরি সামাজিক উপায়ে **মূল্য ধার্য করার** ক্রিয়াধারা গড়ে ঐ সমস্ত আপদ-বালাই দূর করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থায় মূল্য ধার্য করে প্রুধোঁর প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক এই উৎপাদকদের কাছ থেকে অবাধে পণ্য নিয়ে তাদের দেয় তাদের যা দরকার সেইসব পণ্য পেয়ে তার বিনিময়ে দেবার জন্যে চেক্ গোছের একটাকিছু। প্রুধোঁ মনে করতেন, এই কেন্দ্রীকৃত অর্থছাড়া বিনিময় ব্যবস্থা নির্ঝঞ্ঝাটে এবং অনায়াসে চালু থাকতে পারে, তাতে প্রত্যেকে তার শ্রম বাবত পেতে পারে ন্যায্য পারিতোষিক।

এই আকাশকুসুম ছকটা কাটা হয়েছিল স্পষ্টতই ক্ষুদ্রায়তনে পণ্য-

উৎপাদক মালিকদের কথা মনে রেখে। কিন্তু কেমন করে ন্যায্য লেন-দেন ঘটান যায় পুঁজিপতি আর মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যে? এই প্রশ্নেও প্রুধোঁর উত্তরটা ছিল অতি-সরল এবং অস্পষ্ট। তিনি মনে করতেন, পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের মর্মটা থাকে ঋণের সুদে। অর্থ লোপ করা হলে পুঁজিপতিদের সুদ পাবার সুযোগ আর থাকে না। অন্য দিকে, ব্যাঙ্ক থেকে শ্রমিকেরা বিনা সুদে ক্রেডিট পাবে (বস্তু হিসেবে?) তাতে 'তাদের শ্রমের পূর্ণ ফল'প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।

প্রকৃতপক্ষে, শিল্পক্ষেত্রের পুঁজিতন্ত্রের আমলে মানুষের সামনে যেসব সামাজিক আর আর্থনীতিক সমস্যা সেগুলো মীমাংসার কোন উপায় প্রুধোঁর জানা ছিল না। কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের বহু দোষ-ত্রুটির স্পষ্ট চিত্র তিনি তুলে ধরেন, আর নিজের আত্মবিরোধগুলো দিয়েই তিনি প্রদর্শন করেন এইসব সমস্যার যথার্থ সমাজতান্ত্রিক মীমাংসার আবশ্যকতা। এদিক থেকে দেখলে, তিনি হলেন বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের পূর্বসূরি। মস্কোয় ক্রেমলিনের প্রাকার-সংলগ্ন আলেক্সান্দ্রভ্স্কি উদ্যানে একটি স্তম্ভে সমাজতন্ত্র রচয়িতাদের নামগুলি শোভা পাচ্ছে ১৯১৮ সাল থেকে, সেগুলির মধ্যে ন্যায়তঃই স্থান পেয়েছে প্রুধোঁর নামটি।

সে'-সম্প্রদায় এবং কুর্নোর অবদান

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ফ্রান্সে অফিশিয়াল অর্থনীতি-বিজ্ঞানের প্রবক্তা ছিল সে'-সম্প্রদায়। এই বুর্জোয়া সম্প্রদায়ে সামন্ততন্ত্রবিরোধী ধারাটা গোড়ায় প্রবল ছিল। কিন্তু বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম প্রকোপিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অফিশিয়াল অর্থনীতি-বিজ্ঞানক্ষেত্রে ভাবাদর্শ ক্রমে আরও বেশি-বেশি মাত্রায় চালিত হচ্ছিল শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে, সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। সে'-সম্প্রদায়টি ঝুঁকিদার উদ্যোগী-পুঁজিপতির গুণগান করছিল, বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের সমন্বয় প্রচার করছিল, দাঁড়িয়েছিল শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে। আর্থনীতিক কর্মনীতিক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়টির মুখ্য মূলসূত্র ছিল laissez faire [অবাধ-নীতি]।

সে'-র সাফাইদারী মতে পুঁজিপতির লাভ পয়দা হয় শ্রমিক শোষণ না করে পুঁজির সাহায্যেই — এটার সমালোচনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব গড়ে তোলার ব্যাপারে। সামাজিক উৎপাদ কার্টতির ক্রিয়াধারা-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটাকে বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রে যেভাবে তুলে ধরা হয় সেটা সে'-র নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অত্যুৎপাদন সংকটের অবশ্যম্ভাবিতা সে' অস্বীকার করেছিলেন, তাই কার্টতির ব্যাপারে সে'-র সমালোচনা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় এসেছিল মার্কসীয় আর্থনীতিক মতবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে।

ফ্রান্সে আর ইংলণ্ডে অর্থনীতি-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিশেষিত ক্ষেত্রে বিস্তর অগ্রগতি ঘটেছিল। আর্থনীতিক তত্ত্বক্ষেত্রে বিশ্লেষণের গাণিতিক প্রণালী প্রয়োগের জন্যে কুর্নোর চেষ্টা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভবিষ্যতের জন্যে।

১৭৮৯ — ফরাসী বিপ্লবের সূচনা। ১৭৯৯-১৮১৫ — নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কনসুলাৎ এবং সাম্রাজ্য। ১৮১৫ — বুরবোঁ রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ১৮৩০ — জুলাই বিপ্লব, বুরবোঁদের উচ্ছেদ, লুই ফিলিপের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। ১৮৪৮ — ফেব্রুয়ারি বিপ্লব এবং প্রজাতন্ত্রের বিঘোষণ। ১৮৫১ — প্রতিবৈপ্লবিক বোনাপার্টীয় ক্যুদেতা। ১৮৫২ — দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

ফ্রান্সের ইতিহাসের আলোচ্য যুগের মস্ত-মস্ত ঘটনাগুলি এমনি। কিন্তু এগুলি হল শুধু বাহ্য পরিলেখন, সমাজের রাজনীতিক উপরকাঠামের পরিবর্তনগুলো। আর্থনীতিক ভিত্তিতে পরিবর্তনগুলিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রান্সে ঐ সময়ে শিল্প-বিপ্লব জোরদার হয়ে ওঠে, গড়ে উঠতে থাকে যন্ত্রচালিত শিল্প। পুঁজিপতি আর মজুরি-শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্কই হয়ে ওঠে সামাজিক সম্পর্কের প্রধান আকার — সেটা প্রধানত শহরে, তবে গ্রামাঞ্চলেও কিছু পরিমাণে। সমাজে অর্থনীতি আর রাজনীতির দিক থেকে শাসক শ্রেণী হিসেবে অভিজাতকুলের জায়গায় এল বুর্জোয়ারা।

এই যুগের শিল্পোত্তীর্ণ প্রতিফলন ঘটে বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা ফরাসী ঔপন্যাসিক বালজাকের 'La comédie humaine' ('মানব-কমেডি')-তে। সমস্ত মহা লেখকের মতো বালজাকের আগ্রহস্থল হল মানুষ। তবে, মানুষ সবসময়েই থাকে শুধু একটা নির্দিষ্ট যুগ আর স্পষ্ট আকারের সামাজিক বর্গের কাঠামের ভিতরে, এই মূলসূত্রটাকে তিনি নিজ রচনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করেন শুধু তাই নয়, এটাকে তিনি সচেতনভাবেই করে তোলেন এই শ্রেষ্ঠ অবদানের ভিত্তি। বালজাক লেখেন, 'মানব-কমেডি' হল একাধারে মানব-হৃদয়ের ইতিহাস এবং সামাজিক সম্পর্কতন্ত্রের ইতিহাস।

ফরাসী অর্থনীতিবিদেরা মোটামুটি হিসাব কষে দেখেছেন ১৮১৫ থেকে ১৮৫৩ সালের মধ্যে ফ্রান্সের জাতীয় সম্পদ বেড়ে যায় প্রায় তিনগুণ। এই বছরগুলির মধ্যে দেশটিতে সুতী-কাপড় শিল্পে টাকুর সংখ্যা বাড়ে চারগুণের বেশি। তুলো প্রোসেস করার বার্ষিক পরিমাণ বেড়েছিল আরও দ্রুত, যদিও শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও পরিমাণটা ছিল ইংলণ্ডে যা তার পঞ্চমাংশ। এক্ষেত্রে এবং আরও অনেক দিক দিয়ে (বিশেষত যন্ত্র ব্যবহারে)

ইংলণ্ডের চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও ফ্রান্স শিল্প-বিপ্লবের প্রধান পর্বগুলি পার হয়েছিল দ্রুত। ১৮১৫ থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে ফ্রান্সের রপ্তানির মূল্যের পরিমাণ বাড়ে প্রায় চারগুণ। ফ্রান্সের রেশমী কাপড়, প্যারিসের পোশাক আর বিলাসদ্রব্য, কাচের জিনিস এবং আরও কতকগুলি শিল্পজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হত বহু দেশে। প্যারিস হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র এবং আর্থ কেন্দ্র। জয়েন্ট-স্টক কম্পানির সংখ্যা আর স্টক এক্সচেঞ্জে লেন-দেনের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল, ব্যাঙ্কগুলো গড়ে উঠেছিল, দেখা দিয়েছিল সেভিংস ব্যাঙ্কগুলো।

রাজনীতিক আর ভাবাদর্শগত ক্রিয়াকলাপের একটা প্রাণচঞ্চল কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল প্যারিস। প্যারিসের পত্র-পত্রিকাগুলির পাঠক ছিল ইউরোপের সর্বত্র। জার্মানি, পোল্যান্ড, রাশিয়া আর ইতালি থেকে দেশান্তরীরা ছিল প্যারিসের বুদ্ধিজীবিকুলের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-উপাদান। অন্যান্য দেশের উপর ফ্রান্সের বুদ্ধিবৃত্তিগত প্রভাব ছিল প্রবল। প্যারিসে উদ্ভূত ধ্যান-ধারণা ইউরোপে আর আমেরিকায় গৃহীত হত প্যারিসের ফ্যাশনগুলি যেমন তেমনি সাগ্রহে এবং সসম্মানে। সে'-সম্প্রদায়ের ভাব-ধারণাও তেমনি ছড়িয়ে পড়েছিল ফ্রান্সের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে বহু দূরে-দূরে, — সেগুলিকে অনেক ক্ষেত্রে বিবৃত করেছিলেন সুযোগ্য প্রবন্ধকারেরা।

মানুষ এবং বিদ্বান হিসেবে সে'

জাঁ বাতিস্ত সে'-র জন্ম হয় ১৭৬৭ সালে লিয়োঁতে। তিনি একটি বুর্জোয়া হিউগেনট পরিবারের মানুষ। ছেলেবেলায় তিনি উত্তম শিক্ষালাভ করেন, কিন্তু একটা সওদাগরী আপিসে কাজ ধরেন অল্প বয়সেই। জ্ঞান বাড়াবার জন্যে তিনি পড়তেন বিস্তর। অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে পড়তে গিয়ে সে' মনোযোগ নিবদ্ধ করেন সর্বোপরি স্মিথের 'জাতিসমূহের সম্পদ'-এ।

বিপ্লবটাকে তিনি গ্রহণ করেন সোৎসাহে। ইউরোপের রাজতন্ত্রগুলির বিরুদ্ধে লড়ে যে-বৈপ্লবিক বাহিনী তাতে তিনি স্বেচ্ছাসৈনিক হন: যথেষ্ট প্রবল ছিল তাঁর দেশপ্রেমের উদ্দীপনা। কিন্তু জ্যাকবিন একনায়কত্ব তাঁর সহ্য হয় নি — তিনি ফৌজ ছেড়ে প্যারিসে ফিরে একটা সম্ভ্রান্ত পত্রিকার সম্পাদক হন। জ্যাকবিনদের পতনের পরবর্তী বছরগুলিতে ক্ষমতাসীন হয়

রক্ষণপন্থী বুর্জোয়ারা, তাদের শাসন সে'-র পক্ষে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হলেও তিনি এই সরকারের বহু ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা করতেন।

বোনাপার্টের কনসুলাৎ-এর আমলে সে'-র আরও পদোন্নতি হয়েছিল গোড়ায়। তিনি ফিন্যান্স কমিটির ট্রিবিউনালের একজন সদস্যের পদ পান। তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একখানা প্রকান্ড বই লিখতে থাকেন, সেটা ১৮০৩ সালে প্রকাশিত হয় এই নামে — 'Traité d'économie politique ou simple exposition de la maniére dont se forment, se distibuent et se consomment les richess' ('অর্থশাস্ত্র প্রসঙ্গে নিবন্ধ বা সম্পদের উদ্ভব, বণ্টন আর ভোগ-ব্যবহার প্রণালীর সরল বিবরণ')। বইখানাকে তিনি কয়েক বার পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত করেন নতুন-নতুন সংস্করণের জন্যে (পাঁচটা সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল লেখকের জীবনকালে) — এটাই তাঁর সর্বপ্রধান রচনা।

সে'-র এই 'নিবন্ধ' হল স্মিথের সরলীকৃত ব্যাখ্যান, সেটাকে তিনি ছক বেঁধে দেন এবং — তিনি নিজে যা মনে করেন — অপ্রয়োজনীয় বিমূর্তন আর জটিলতাগুলো অপসারিত করেন। পুরোপুরি অবিচলিতভাবে না হলেও স্মিথ চলেছিলেন যে শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্ব অনুসারে সেটার জায়গায় সে' ঢোকালেন একটা 'নানাতত্ত্ববাদী' ব্যাখ্যা, তাতে মূল্যকে করা হল কয়েকটা কারক উপাদানের সাপেক্ষ: পণ্যের বিষয়ীগত উপযোগ, উৎপাদন-পরিব্যয়, যোগান আর চাহিদা। মজুরি-শ্রমের উপর পুঁজির শোষণ সম্বন্ধে স্মিথের ধারণা (অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বের বিভিন্ন উপাদান) সে'-র রচনায় স্থান পেল না, তার জায়গায় এল উৎপাদনের কারক উপাদান তত্ত্ব (সে-সম্বন্ধে আলোচনা পরে)। সে' হলেন স্মিথের আর্থনীতিক উদারপন্থার অনুগামী। তিনি চেয়েছিলেন 'সস্তার রাষ্ট্র'; তিনি অর্থনীতিক্ষেত্রে ন্যূনকল্প রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের জন্যে ওকালতি করেন। এদিক থেকে সে' ফিজিওক্র্যাটিক ঐতিহ্যের কাছাকাছি। বইখানা এবং সেটার লেখকের যা পরিণতি ঘটে তাতে বিশেষ তাৎপর্যসম্পন্ন ছিল তাঁর আর্থনীতিক উদারনীতি।

কনসুলাৎ আর সাম্রাজ্যের আর্থনীতিক কর্মনীতির প্রকৃতিটা সাধারণভাবে বুর্জোয়া হলেও সেটা ছিল স্মিথের অবাধ বাণিজ্যের ঘোর বিরোধী। নেপোলিয়নের শিল্প দরকার ছিল তাঁর যুদ্ধগুলোর জন্যে, ইংলন্ডের সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদের জন্যে, কিন্তু তিনি মনে করতেন, কঠোর সংরক্ষণনীতি আর অর্থনীতিতে সর্বাঙ্গীণ নিয়মনের সাহায্যেই শিল্পোন্নয়ন

হবে আরও দ্রুত। আমলাতান্ত্রিকতা আর স্বজনপোষণের পথ খুলে গিয়েছিল এর ফলে। অর্থনীতি ফিন্যান্স আর বাণিজ্যকে নেপোলিয়ন ধরেছিলেন স্রেফ দেশজয় কর্মনীতির হাতিয়ার হিসেবে। যেটা ন্যায্য প্রতিপন্ন করবে, সমর্থন করবে তাঁর কর্মনীতিটাকে, শুধু তেমনি আর্থনীতিক তত্ত্বটাই তাঁর দরকার ছিল।

সে'-র বইখানা সাধারণের নজরে পড়েছিল, নেপোলিয়নও বইখানা লক্ষ্য করেছিলেন। এই অধস্তন কর্মকর্তাটিকে তলব করা হয়েছিল তাঁর বইখানায় বিবেচিত বিষয়গুলো নিয়ে পহেলা কন্সালের সঙ্গে আলোচনার জন্যে। সে'-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, কর্তৃপক্ষের সুনজর চাইলে তাঁকে নেপোলিয়নের অভিমত আর কর্মনীতির সঙ্গে মানিয়ে-মিলিয়ে পরিবর্তিত করতে হবে 'নিবন্ধ' বইখানাকে। কিন্তু তা করতে তিনি অস্বীকার করেন; তাঁকে চাকরি থেকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়।

সে' ছিলেন কর্মিষ্ঠ, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন, উদ্যমী মানুষ; তাঁর পক্ষে যা নতুন, কাজ-কারবারের এমন একটা ক্ষেত্রে গিয়ে তিনি একটা টেক্সটাইল মিল্-এর শেয়ার কিনলেন। ধনী হলেন তিনি। জ্ঞান-বিজ্ঞান আর রচনাক্ষেত্রে তাঁর সমগ্র ক্রিয়াকলাপের উপর সেটার প্রভাব পড়ে। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী মাত্র নন, তখন তিনি চলিতকর্মে বুর্জোয়া, নিজ শ্রেণীর স্পষ্ট-নির্দিষ্ট প্রয়োজন আর চাহিদাগুলো সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। বিমূর্তন সম্বন্ধে তাঁর বিরাগ হয়ে ওঠে আরও প্রবল। তিনি ক্রমেই আরও বেশি-বেশি ক'রে মনে করতে থাকেন যে, অর্থনীতি-বিজ্ঞান হল ঝুঁকিদার বুর্জোয়া কারবারির বিষয়বুদ্ধির একটা আকর। অর্থশাস্ত্রকে তিনি তখন উৎপাদন আর বিক্রির সংগঠন এবং কারবার ব্যবস্থাপনের প্রশ্নে পর্যবসিত করতে লেগে যান। তিনি পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেন ঝুঁকিদার কারবারিকে, — তিনি বলেন সে হল সাহসী নবপ্রবর্তক, উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় পুঁজি আর শ্রমকে সবচেয়ে ফলপ্রদ ধরনে সমন্বিত করতে পটু।

১৮১২ সালে সে' মিল্-এর শেয়ারগুলো বিক্রি করে দিয়ে প্যারিসে চলে যান, তখন তিনি ধনী — বিভিন্ন কাজ-কারবারে টাকা খাটান। নেপোলিয়নের পতন ঘটে, বুরবোঁ রাজবংশ আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি 'নিবন্ধ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পারেন অবশেষে। ফ্রান্সের সবচেয়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বলে তিনি তখন খ্যাতনামা হন। তিনি নতুন সরকারের সুনজরে পড়েন। তরুণ বয়সের প্রজাতান্ত্রিকতা অনায়াসেই

বর্জন করে সে' হন বুরবোঁ রাজবংশের বিশ্বাসী খিদমতগার: কেননা তখন বুর্জোয়াদের ক্ষমতা বজায় রইল, আর আর্থনীতিক কর্মনীতি ঝুঁকতে থাকল অবাধ বাণিজ্যের দিকে।

সে' ছিলেন হাড়ে-হাড়ে তৃতীয় বর্গের মানুষ, — ফ্রান্সের সেই বুর্জোয়া তৃতীয় বর্গ, যারা বিপ্লব ঘটিয়ে পরে সেটা থেকে সভয়ে গুটিয়ে গিয়ে বেপরোয়া হয়ে ছুটে চলে গেল জেনারেল নেপোলিয়নের কোলে, আর তারপর সম্রাট নেপোলিয়ন যখন বুর্জোয়াদের আশা-ভরসার অনুযায়ী ধারায় চললেন না তখন তারা তাঁকে ছেড়ে গেল। ফরাসী বুর্জোয়াদের মনোভাবের এই ইতিহাসক্রমিক এবং শ্রেণীগত পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় সে'-র ব্যক্তিগত জীবনের পরিণতিতে।

সে' ছিলেন স্থিরমস্তিষ্ক কাণ্ডজ্ঞান আর কারবারী বিচক্ষণতার পূজারী, — তিনি ছিলেন বুর্জোয়ারা যখন নিজেদের অবস্থান মজবুত করে নিয়েছিল সেই যুগেরই উপযোগী মানুষ। তিনি অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে সাধারণ্যে লেকচার দিতে শুরু করেন। জাতীয় শিল্পকলা এবং বৃত্তি শিক্ষায়তনে তিনি ‘শ্রমশিল্প অর্থনীতি’ বিভাগের ‘চেয়ার’ পান ১৮১৯ সালে। তাঁর লেকচারগুলি ছিল খুবই জনপ্রিয়। যেমন লেখায়, তেমনি লেকচারেও তিনি অর্থশাস্ত্রের প্রশ্নগুলিকে সরল আকারে হাজির করতেন, সেগুলিকে এনে ফেলতেন সাধারণ মানুষের বুঝ-সমঝের নাগালের মধ্যে। তিনি ছিলেন প্রশ্নগুলোকে প্রণালীবদ্ধ এবং জনবোধ্য করতে পটু — তিনি সবকিছুকে শ্রোতাদের পক্ষে স্পষ্ট এবং সহজ-সরল করে তোলার ভাব সৃষ্টি করতে পারতেন। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে অর্থশাস্ত্র ফ্রান্সে ছিল প্রায় ইংলণ্ডেরই মতো জনপ্রিয়, এই কারণে এই বিজ্ঞান প্রথমত সে'-র কাছেই ঋণী। সে'-র রচনাগুলি তরজমা হয়েছিল রুশী সমেত বহু ভাষায়। তিনি ছিলেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গ বিজ্ঞান আকাদমির একজন বৈদেশিক সদস্য।

১৮২৮-১৮৩০ সালে প্রকাশিত হয় সে'-র ছয়-খণ্ডে ‘Cours complet d'économie politique’ (‘ব্যবহারিক অর্থশাস্ত্রের পূর্ণ পাঠ্যধারা’), তবে তত্ত্বের দিক থেকে দেখলে, ‘নিবন্ধ’-এ যা ছিল তার থেকে নতুন কিছু তাতে ছিল না। ‘Collège de France’ (‘ফরাসী কলেজ’)-এ বিশেষভাবে তাঁরই জন্যে সৃষ্টি-করা অর্থশাস্ত্র ‘চেয়ার’-এ তিনি অধিষ্ঠিত হন। তিনি মারা যান ১৮৩২ সালের নভেম্বর মাসে প্যারিসে।

শেষ বয়সে সে' তেমন অমায়িক ছিলেন না। যশে আত্মহারা হয়ে তিনি

আর নতুন কিছুর জন্যে অনুসন্ধান করতেন না, স্রেফ পুরন ভাব-ধারণাগুলো নিয়েই নাড়াচাড়া করতেন। বড়াই আর অবিনয় ছিল তাঁর ছাপা রচনাগুলোর বৈশিষ্ট্য, আর তর্ক-বিতর্কে তিনি অসংগত উপায় অবলম্বন করতেন, ধরনধারন ছিল রূঢ়।

মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে সে' হলেন প্রথমত উনিশ শতকের ইতর অর্থশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। স্মিথের দোষ-ত্রুটিগুলো কাজে লাগিয়ে এবং রিকার্ডোর সঙ্গে সরাসরি তর্কে নেমে তিনি পুঁজিতন্ত্রের মূল নিয়মগুলোর প্রগাঢ় বিশ্লেষণের জন্যে তাঁদের প্রচেষ্টার জায়গায় আমদানি করেছিলেন আর্থনীতিক ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে ভাসাভাসা বিচার-বিবেচনা। তবু (এবং কিছু পরিমাণে তারই দরুন) বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্যার ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছেন সে'। উৎপাদের মূল্য পয়দা করতে শ্রম পুঁজি আর ভূমি এই উৎপাদনের কারক উপাদানগুলোর সমান-সমান ভূমিকা-সংক্রান্ত ধারণাটাকে স্পষ্ট আকারে ব্যক্ত করেন সর্বপ্রথমে তিনিই। আরও অনেকের রচনায় এই ধারণাটা বিকশিত হবার পরে উনিশ শতকের অষ্টম থেকে শেষ দশক অবধি অর্থনীতিবিদদের কাজ শুধু এমন একক মূলসূত্র তত্ত্ব গড়ে তোলা যাতে প্রত্যেকটা কারক উপাদানের ‘খিদমত’ বাবত পারিতোষিক দেওয়া হয়। এইভাবে সে' হলেন বণ্টন সম্বন্ধে বুর্জোয়া সাফাইদারী তত্ত্বের জনক।

উৎপাদনের কারক উপাদানগুলি এবং বিভিন্ন আয়

শ্রম — মজুরি, পুঁজি — লাভ, ভূমি — খাজনা: আর একবার তোলা হচ্ছে এই ত্রয়ী বা একাধারে-তিনের সূত্র, যেটার এতই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রে।

স্মিথ আর রিকার্ডো দুজনেই যে-মূল প্রশ্নটার মীমাংসা করতে শ্রমস্বীকার করে চেষ্টা করেন সেটার উত্তর দেবার চেষ্টা হল সে'-র উৎপাদনের কারক উপাদান তত্ত্ব। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক সম্পদ ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে উৎপন্ন হতে থাকে একটা বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর মালিকানাধীন উৎপাদনের উপকরণ দিয়ে। কাজেই পণ্যের মূল্যের মধ্যে কোন-না-কোন ভাবে থাকা চাই পুঁজিপতি শ্রেণীর মালিকানাধীন একটা হিস্সা। কিভাবে দেখা দেয় এই হিস্সাটা, আর সেটাকে নির্ধারণ করা যায় কিভাবে?

স্মিথ আর রিকার্ডোর (এবং, যা আমরা দেখেছি, একেবারে জুনিয়র মিল অবধি রিকার্ডোপন্থীদেরও) বিবেচনায় এটা ছিল একই সঙ্গে মূল্য আর বণ্টন-সংক্রান্ত প্রশ্ন। সে'র বিবেচনায় এটা তার চেয়ে অনেক সহজ-সরল। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বণ্টন তত্ত্বটা মূল্য-তত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন, আর এই মূল্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বড় একটা আগ্রহান্বিত নন। ফলে উৎপাদন-প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে বাকি থাকে শুধু একটা দিক — উপযোগ পয়দা করা, উপযোগ-মূল্য পয়দা করা। বিষয়টাকে এইভাবে ধরলে এটা তো স্পষ্টই যে, যেকোন উৎপাদনের জন্যে চাই প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রমের উপকরণ আর হাতিয়ার এবং শ্রমশক্তি, অর্থাৎ ভূমি পুঁজি আর শ্রমের সংযোগ। এই স্পষ্টপ্রতীয়মান ব্যাপারটার উপরই সে' জোর দিয়েছেন।

কথা উঠতে পারে, এটা তো যাবতীয় উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সাধারণ অঙ্গ-উপাদান, কাজেই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের বিশেষ ধরন সম্পর্কে ব্যাখ্যা এতে হতে পারে না। কিন্তু সে'র মনে আসে নি এই আপত্তিটা, কেননা তাঁর বিবেচনায় পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালী হল — স্মিথের বিবেচনায় যা তার চেয়েও বেশি পরিমাণে — একমাত্র উৎপাদন-প্রণালী যা কল্পনা করা যেতে পারে, যেটা চিরন্তন, আদর্শস্বরূপ। সে' মনে করতেন পুঁজিপতি আর ভূস্বামীদের অস্তিত্ব হল সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তেরই মতো একরকমের প্রাকৃতিক নিয়ম।

সে'র তত্ত্ব অনুসারে লাভ হল পুঁজি থেকে স্বাভাবিক ফল, আর ভূমি থেকে স্বাভাবিক ফল হল খাজনা। সমাজব্যবস্থা, শ্রেণীগত গঠন এবং মালিকানার ধরনের উপর একটুও নির্ভর করে না ঐ দুটোর কোনটাই। পুঁজি থেকে লাভ আসে ঠিক যেমন আম-জাম পড়ে আম-জাম গাছ থেকে।

এই ধারণাটা হল শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্ব এবং উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বের ঠিক বিপরীত। মেহনতী জনের উপর পুঁজিপতি আর ভূস্বামীদের শোষণ এতে অস্বীকার করা হয়, আর আর্থনীতিক প্রক্রিয়াটাকে দেখান হয় উৎপাদনের সমান-সমান কারক উপাদানগুলোর সুসমঞ্জস সহযোগ হিসেবে। সে'র অনুগামীদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে সুবিদিত সেই ফ্রিডরিখ বাস্তিয়ার মুখ্য রচনাটার নামটাই 'Les harmonies économiques' ('আর্থনীতিক সামঞ্জস্য')।

উৎপাদনের কারক উপাদান তত্ত্বটাকে যে-আকারে বিবৃত করেন সে'

এবং তাঁর শিষ্যরা সেটা অতি-সরলীকরণ এবং ভাসাভাসা বলে আখ্যা পেয়েছে বুর্জোয়া অর্থবিদ্যাক্ষেত্রেও।

বাস্তবিকই, নিজ আমলের মূল আর্থনীতিক প্রশ্নগুলোর যে-উত্তর দেন সে' তাতে বিবেচ্য বিষয়টাকে এড়িয়ে যাওয়া হয় অনেকাংশে। শেষে গিয়ে মূল্য গড়ে ওঠে কিভাবে, পণ্যের দাম নির্ধারিত হয় কী দিয়ে? পয়দা-করা মূল্য — উৎপাদনের প্রত্যেকটা কারক উপাদানের প্রতিষঙ্গী আয় বণ্টনের অনুপাতগুলোর গঠন নির্ধারিত হয় কিভাবে? এ সম্বন্ধে কার্যত কোন বক্তব্যই নেই সে' এবং তাঁর অনুগামীদের। বস্তাপচা আর মামুলি কথা বলে তাঁরা বিষয়টাকে এড়িয়ে গেছেন।

বিভিন্ন রচনায় সে' প্রত্যেকটা রকমের আয় পৃথক-পৃথক করে ধরে বিবেচনা করেন; তবে শুধু লাভ সম্বন্ধে তাঁর বিচার-বিবেচনাটাই আগ্রহের বিষয়। আগেই দেখা গেছে, ঋণ বাবত সুদ আর কারবারের আয় — এই দুই ভাগে ধরা হয় লাভটাকে। প্রথমটাকে পুঁজিপতি আত্মসাৎ করে পুঁজির মালিক হিসেবে, আর কারবারের পরিচালক হিসেবে সে পকেটে পোরে দ্বিতীয়টাকে। সে'র বিবেচনায় কারবারী আয়টা স্রেফ এমন একটা মাইনে নয় যা পেতে পারে মাইনেদার ম্যানেজারও। এটা হল একটা বিশেষ ধরনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্ম বাবত পারিতোষিক, — উৎপাদনের কারক উপাদান তিনটের যুক্তিসম্মত সমন্বয় হল ঐ কর্মটার সারমর্ম। সে' লিখেছেন, কারবারির আয়টা হল তার 'শিল্প-দক্ষতা, অর্থাৎ কিনা তার বিচারবুদ্ধি, তার স্বাভাবিক আর অর্জিত কর্মক্ষমতা, তার ক্রিয়াকলাপ এবং শৃংখলা আর আচরণবিধি সম্বন্ধে তার বোধশক্তি'*-র জন্যে পারিতোষিক।

কারবারির সংগঠনী ভূমিকার দিক থেকে কারবারী আয়ের এই ব্যাখ্যাটাকে গ্রহণ করেন মার্শাল। শুম্পিটার কাজে লাগান সে'র অন্য একটা দফা: নবপ্রবর্তক হিসেবে, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির বাহক হিসেবে কারবারির ভূমিকা। শেষে, আমেরিকার ফ্র্যাঙ্ক নাইট লিখেছেন, কারবারি বহন করে 'অনিশ্চয়তার বোঝা', আরও সহজ ভাষায় সেটা হল ঝুঁকি, বিশেষত যেজন্যে পারিতোষিক তার প্রাপ্য। সে'-ও তেমনি ইঙ্গিত করেন।

---

* J.-B. Say, 'Traité d'économie politique...', Paris, 1841, pp. 368-69

উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির উপাদান, মূর্ত শ্রম আর তাজা শ্রম সংযুক্ত করার প্রশ্নটাকে সে'-সম্প্রদায় যে-সাফাইদারী ধরনে বিবেচনা করেছে, যেভাবে সেটা এখনও বিবেচিত হচ্ছে বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রে, তার থেকে অনপেক্ষভাবেও রয়েছে প্রশ্নটা। এটা শুধু সামাজিক প্রশ্ন নয়, — খুবই গুরুত্বপূর্ণ টেকনিকাল-আর্থনীতিক প্রশ্নও বটে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, গম ফসল ৫০ শতাংশ বাড়াবার লক্ষ্যটা হাসিল হতে পারে কয়েকটা উপায়ে: ফসলটা ফলাবার জমির আয়তন বাড়িয়ে কিংবা একই আয়তনের জমিতে প্রযুক্ত শ্রমের পরিমাণ এবং বৈষয়িক ব্যয় (পুঁজি) বাড়িয়ে, শ্রমের পরিমাণ একই রেখে পুঁজি বাড়িয়ে কিংবা আরও শ্রম লাগিয়ে। স্বভাবতই বাস্তব জীবনে কাজটা হাসিল করা হয় বিভিন্ন দফার (কারক উপাদানগুলির) বৃদ্ধি সংযুক্ত করে। কিন্তু সেগুলিকে সংযুক্ত করার সর্বোত্তম অনুপাতগুলো কী? সংশ্লিষ্ট দেশে কিংবা এলাকায় নির্দিষ্ট অবস্থাটা, বিশেষত বিভিন্ন রকমের সংগতি-সংস্থানের ঘাটতির পরিমাণ কিভাবে বিবেচনায় থাকা চাই? প্রচুর পরিমাণ জমি অব্যবহৃত পড়ে থাকাটা এক-জিনিস, আর বাড়তি জমি না-থাকাটা এবং বেকার শ্রম থাকাটা তো অন্য ব্যাপার, ইত্যাদি। এই সবই অর্থনীতিবিদদের সামনে কার্যক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, সেটা তো স্পষ্টই। এইসব প্রশ্ন দেখা দিতে পারে পৃথক-পৃথক কারবারের ক্ষেত্রে (অণু-আর্থনীতিক পর্যায়ে) কিংবা গোটা দেশের ক্ষেত্রে (সার্ব-আর্থনীতিক পর্যায়ে)।

কোন দেশে কোন এক-বছরে উৎপন্ন মোট উপযোগ-মূল্যকে দেশটির জাতীয় আয় বা সামাজিক উৎপাদ বলে ধরা যেতে পারে। সিমেণ্ট আর প্যাণ্ট, মোটরগাড়ি আর চিনি, ইত্যাদি, ইত্যাদি অসংখ্য জিনিসের সমষ্টির মোট পরিমাণটাকে একক মানদণ্ড দিয়ে পরিমাপের একটা উপায় হল অর্থের হিসাবে ঐ সমস্ত পণ্যের মূল্যায়ন।... সেগুলিতে যেসব পরিবর্তন ঘটে তাতে প্রকাশ পায় উৎপাদনের পরিমাণবৃদ্ধি, অর্থাৎ সম্পদবৃদ্ধি, সমৃদ্ধি। বিষয়টাকে এইভাবে ধরলে, উৎপাদনে যেসব কারক উপাদান অংশগ্রহণ করে তার প্রত্যেকটাতে জাতীয় আয়ের (বা উৎপাদের) কতটা হিস্‌সা প্রদেয় তৎসংক্রান্ত প্রশ্নটা এবং প্রত্যেকটা কারক উপাদানের বৃদ্ধি দিয়ে পয়দা-করা ঐসব পরিমাণের বৃদ্ধির অংশ-সংক্রান্ত প্রশ্নটা সম্পূর্ণতই ন্যায্য। কারক উপাদানগুলোর ব্যয়ের মধ্যে কার্মিক সাপেক্ষতা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করাটা অর্থনীতির ফলপ্রদতাবৃদ্ধির পক্ষে মস্ত তাৎপর্যসম্পন্ন। (বিভিন্ন উপযোগ-মূল্যের সাকল্য হিসেবে) উৎপাদগুলোকে পয়দা করায় প্রত্যেকটা কারক উপাদানের অনন্যসাপেক্ষতা এবং এইসব কারক উপাদানের বিভাজ্যতা, ইত্যাদি ধরে নেওয়াটা স্বভাবতই অতি-সরলীকৃত অনুমান। তবে এই কথাটা মনে রাখলে এবং বাস্তব পরিস্থিতির দরুন বিশ্লেষণ করায় যেসব সীমাবদ্ধতা আছে সেগুলো বিবেচনায় থাকলে উৎপাদনের 'কারক উপাদান' বিশ্লেষণটাকে প্রয়োগ করে কিছুটা ফল পাওয়া যায়। এই বিশ্লেষণ বর্তমানে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়, তার একটা প্রণালী হল বিভিন্ন উৎপাদন-অপেক্ষক কর্মের প্রণালী।* সাধারণভাবে বললে এর অর্থটা দাঁড়ায়

* এই প্রণালীটার ইতিহাসক্রমিক উদ্ভবটা বণ্টন সম্বন্ধে বুর্জোয়া সাফাইদারী তত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট — এই তত্ত্বটা দাঁড় করিয়েছিলেন সে'। তবে পরে পুঁজিতান্ত্রিক

এই যে, (কোন একটা কারবারে কিংবা কোন একটা দেশে, ইত্যাদিতে কোন একটা পণ্যের কিংবা কতকগুলো পণ্যের) উৎপাদনের পরিমাণ হল কতকগুলো বিষম রাশির অপেক্ষক — ঐ রাশিগুলোর সংখ্যা হতে পারে যতখুশি। গাণিতিক সঙ্কেতে সেটাকে তুলে ধরা যায় এইভাবে:

$$Y = F(x_1, x_2 \dots x_n),$$

যাতে Y হল উৎপাদ, আর $x_1, x_2 \dots x_n$ হল বিভিন্ন কারক উপাদান — যেমন শ্রমিকসংখ্যা, তাদের যোগ্যতার মান, যন্ত্রপাতির পরিমাণ, কাঁচামালের গুণাগুণ, ইত্যাদি।

যুক্তি-তর্কের বিভিন্ন সংযোগ দিয়ে এই অপেক্ষকের বহু রকমফের তুলে ধরা হয়েছে। বিশ শতকের তৃতীয় দশকের দু'জন মার্কিন বিজ্ঞানীর নাম অনুসারে কব্‌-ডাগলাস অপেক্ষকটা সবচেয়ে সুবিদিত, সেটা এই:

$$Y = AK^{\alpha}L^{\beta},$$

এতে ধরে নেওয়া হয় যে, উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করে দুটো প্রধান কারক উপাদান: K (নিয়োজিত পুঁজি অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণের পরিমাণ) এবং L (শ্রমের পরিমাণ)। অন্য কারক উপাদান অপরিবর্তিত রেখে পুঁজি আর শ্রমের পরিমাণ ১ শতাংশ করে বাড়ালে উৎপাদন যা বাড়বে সেটা দেখাচ্ছে α আর β এই ঘাত-সূচক দুটো। A হল অনুপাত-গুণাঙ্ক; পুঁজি আর শ্রমের পরিমাণের মধ্যে যা প্রকাশ পায় নি উৎপাদনের এমন সমস্ত গুণীয় কারক উপাদান বিবেচনায় রাখা হল বলেও এটাকে ধরা যেতে পারে।

কব্‌-ডাগলাস অপেক্ষকটাকে বিকশিত এবং উন্নীত করতে, এতে গতীয় উপাদান, বিশেষত প্রযুক্তিগত অগ্রগতি উপাদানটা ঢোকাতে চেষ্টা করেছেন বহু অর্থনীতিবিদ। এই প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল ওলন্দাজ অর্থনীতিবিদ ইয়ান্‌ তিন্‌বের্গেনের কাজ, — অর্থনীতিবিদ্যা বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পান তিনিই প্রথম, ১৯৬৯ সালে। উৎপাদনবৃদ্ধিতে ('প্রযুক্তিগত অগ্রগতি' কারক উপাদানটা সমেত) প্রধান-প্রধান কারক উপাদানগুলির মাত্রিক হিস্‌সা সম্বন্ধে কমবেশি সম্ভাব্য হিসাব দেওয়া হয়েছে কোন-কোন পরিসাংখ্যিক-গাণিতিক বিচার-বিশ্লেষণে।

অর্থনীতির কার্যক্ষেত্রের প্রয়োজন অনুসারে এটা প্রয়োগ করা হয়েছিল গণিত আর পরিসংখ্যানের সাহায্যে টেকনিকাল-আর্থনীতিক ধরনের বিভিন্ন নির্দিষ্ট ব্যাপারের নিষ্পত্তির জন্যে। উৎপাদন-অপেক্ষক কর্মের প্রণালী এবং বণ্টন সংক্রান্ত তত্ত্ব হিসেবে উৎপাদনের কারক উপাদান তত্ত্বের মধ্যে আদি সংযোগ থেকে মোটেই এমনটা বোঝায় না যে, উৎপাদন-কর্মগুলোর বাস্তব ক্রিয়াধারাটাকেও বাতিল করা দরকার, — এইসব ক্রিয়াধারাকে বুর্জোয়া ভিত্তিটা থেকে পৃথক করে নিয়ে উপযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় — উৎপাদনবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর বিশ্লেষণের জন্যে ব্যবহার করা যায়।

সে'-র 'বাজারী নিয়ম' বা স্রেফ 'সে'-র নিয়ম' আমরা ইতোমধ্যে পেয়েছি কয়েক বার। এটার বিচার্য বিষয় — কাটতি আর সংকট-সংক্রান্ত প্রশ্ন — পুঁজিতন্ত্র আর অর্থশাস্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে একটা মস্ত ভূমিকায় থেকেছে। 'সে'-র নিয়মে'র ইতিহাসটা কিছু পরিমাণে ম্যালথাসের 'জনসংখ্যা নিয়মে'র কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়। 'নিবন্ধ'-র প্রথম সংস্করণে (১৮০৩) সে' চার পৃষ্ঠা দিয়েছেন পণ্য বিক্রি সম্বন্ধে। জিনিসপত্রের ব্যাপক অত্যুৎপাদন এবং ব্যাপক আর্থনীতিক সংকট মূলত অসম্ভব, এই মর্মে ধারণাটাকে তাতে ব্যক্ত করা হয় খুবই অনির্দিষ্ট আকারে। উৎপাদন আপনিই পয়দা করে বিভিন্ন আয়, যেগুলো দিয়ে তদনুযায়ী মূল্যের পণ্য কেনা হবেই। অর্থনীতিক্ষেত্রে মোট চাহিদা সবসময়েই মোট যোগানের সমান। দেখা দিতে পারে শুধু আংশিক অসামঞ্জস্য: একটা পণ্যের অত্যুৎপাদন, অন্য একটার উন-উৎপাদন। কিন্তু সাধারণ সংকট ছাড়াই সেটার নিরাকরণ হয়ে যায়। ম্যালথাসের মূল ধারণার মতো এই সহজ-সরল উপস্থাপনাটাকে স্বতঃপ্রমাণিত মনে হতে পারে। কিন্তু এটা স্পষ্টতই অতি-বিমূর্ত; এতে সে'-র ধারণাটা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

'সে'-র নিয়ম'টা (এই জাঁকাল নামটা তখন ছিল না) নিয়ে গরম-গরম তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল অচিরে। তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন তখনকার সবচেয়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদেরা, তাঁদের মধ্যে রিকার্ডো, সিস্‌মন্দি, ম্যালথাস, জেম্‌স মিল। নিজ ধারণাটাকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় সে' তাঁর 'নিবন্ধ'-র প্রত্যেকটা নতুন সংস্করণে এই 'নিয়মে'র ব্যাখ্যানটাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলেছিলেন, কিন্তু সেটা একটুও স্পষ্ট-নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে নি।

বর্তমানে পশ্চিমে 'সে'-র নিয়ম' নিয়ে অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্কটা প্রধানত তথাকথিত নয়া-ক্ল্যাসিকাল আর কেইন্সীয় মতধারার সমর্থকদের মধ্যে। নয়া-ক্ল্যাসিকাল মতধারার সমর্থকেরা ঐ 'নিয়ম'টার নাম না করলেও তাঁদের মতাবস্থানটা কার্যত সে'-র মতোই। তাঁদের মতে, দাম মজুরি এবং অন্যান্য মূল উপাদান নমনীয় হলে অর্থনীতি আপনা থেকেই গুরুতর সংকট এড়িয়ে চলতে পারে। কাজেই অর্থনীতিক্ষেত্রে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ব্যাপক হস্তক্ষেপের তাঁরা বিরোধিতা করেন সাধারণত। আর্থনীতিক কর্মনীতি

সম্বন্ধে অভিমতের ব্যাপারে তাঁরা প্রায়ই ঝোঁকেন 'নয়া-উদারনীতি'র দিকে।

অন্য দিকে, অবাধে উন্নয়নশীল পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সংকট অনিবার্য বলে যুক্তি দেখান কেইন্স এবং তাঁর অনুগামীরা, তাঁরা 'সে'-র নিয়মে'র সমালোচনা করেন। কেইন্স লিখেছেন, বাস্তব জীবনে যা খণ্ডিত হয়ে গেছে সেই 'নিয়ম'টার প্রতি কোন-কোন পেশাদার অর্থনীতিবিদের আনুগত্যের ফলে সাধারণ মানুষের মনোভাবটা ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যাতে 'যেসব বর্গের বিজ্ঞানীদের তত্ত্বীয় ফলাফল বাস্তব অবস্থায় প্রয়োগ করা হলে পর্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রতিপন্ন হয় তাঁদের প্রতি সে যেমন সশ্রদ্ধ সেই পরিমাণে অর্থনীতিবিদদের শ্রদ্ধা করতে' সে অনিচ্ছুক।* অর্থনীতিক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ব্যাপক হস্তক্ষেপ সমর্থন করেন কেইন্সীয় মতধারার সমর্থকেরা।

আলোচ্য কালপর্যায়ে, অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে 'সে'-র নিয়ম' বা তখন এটাকে যেভাবে বোঝা হত সেটার ছিল দ্বৈত ভূমিকা। একদিকে এতে প্রকাশ পেয়েছিল বুর্জোয়া সমাজে আর অর্থনীতিতে পূর্ব-নির্ধারিত সমন্বয় সম্বন্ধে সে'-সম্প্রদায়ের ধরে-নেওয়া বিশ্বাস। যেসব দ্বন্দ্ব-অসংগতির ফলে অত্যুৎপাদন সংকট অবশ্যম্ভাবী সেগুলোকে লক্ষ্য করতে পারে নি কিংবা লক্ষ্য করতে চায় নি এই সম্প্রদায়। 'সে'-র নিয়মে' ধরে নেওয়া হয় যে, পণ্য পয়দা করা হয় এবং বিনিময় করা হয় স্রেফ লোকের চাহিদা মেটাবার জন্যে — এই বিনিময়ে অর্থের ভূমিকাটা একেবারেই নিষ্ক্রিয়। প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে এটার অবশ্য কোন সংস্রব নেই। তবে তখনকার দিনের পক্ষে প্রগতিশীল একটা দিক ছিল 'সে'-র নিয়মে'। পুঁজিতন্ত্রের ক্রমাগত উন্নয়ন অসম্ভব, এই মর্মে সিস্‌মন্দির বক্তব্যের বিরুদ্ধে এটা চালিত হয়েছিল। পুঁজিতন্ত্র সেটার উন্নয়নের প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজ বাজার গড়ে তোলে, কাটতির সমস্যা সমাধানের জন্যে ম্যালথাস আর সিস্‌মন্দির কুখ্যাত 'তৃতীয় পক্ষে'র দরকার হয় না — এই কথাটাকে তাতে তুলে ধরা হয়েছিল, যদিও খুবই অনির্দিষ্ট আকারে। সে'-র যুক্তি ব্যবহার ক'রে বুর্জোয়ারা অবাধ কারবার আর অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র ছেঁটে ফেলার প্রগতিশীল দাবি তুলেছিল। রিকার্ডো কেন সে'-র বাজারী তত্ত্ব মেনে নিয়েছিলেন তার কারণ কিছুটা বোঝা যায় এর থেকে।

* J. M. Keynes, 'The General Theory of Employment, Interest and Money', London, 1946, p. 33.

১৮৭৩ সালে 'পুঁজি'-র প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় মার্কস উনিশ শতকে বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের বিকাশ সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। ঐ শতকের গোড়ার দিকে ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের সাধনসাফল্য এবং তৃতীয় দশকের গরম-গরম তর্ক-বিতর্কের কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন: '১৮৩০ সালের সঙ্গে এল চরম সংকট।

'ফ্রান্সে আর ইংলণ্ডে রাজনীতিক ক্ষমতা জয় করে নিয়েছিল বুর্জোয়ারা। শ্রেণীসংগ্রাম তখন থেকে কার্যক্ষেত্রে এবং তত্ত্বীয় বিচারেও ক্রমেই অধিকতর সুস্পষ্ট এবং বিপজ্জনক আকার ধারণ করে। বুর্জোয়া অর্থনীতি-বিজ্ঞানের অন্ত হবার সংকেত পাওয়া গেল। তখন থেকে প্রশ্নটা আর নয় অমুক কিংবা অমুক তত্ত্ব যথার্থ কিনা, প্রশ্নটা হল সেটা পুঁজির পক্ষে হিতকর কিংবা হানিকর, উপযোগী কিংবা অনুপযোগী, রাজনীতিক দিক থেকে বিপজ্জনক কিংবা তা নয়। অনাসক্ত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদের জায়গায় এল ভাড়াটিয়া অনুগ্রহপ্রার্থীরা; সাচ্চা বৈজ্ঞানিক গবেষণার জায়গায় এল সাফাইদারির পক্ষপাতদুষ্ট বিবেচনা আর কুমতলব।'*

কথাটা সর্বোপরি সে'-বাস্তিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রযোজ্য। মার্কস আরও লিখলেন, ১৮৪৮ সালের পরে ইতর অর্থনীতিবিদ্যায় নতুন-নতুন পরিবর্তন ঘটে, তার ফলে 'হিসেবী বিষয়বুদ্ধিমান লোকেরা ভিড় করে গেল বাস্তিয়ার পতাকাতলে, যে-বাস্তিয়া হলেন সাফাইদারী ইতর অর্থনীতিবিদ্যার সবচেয়ে খেলো, তাই সবচেয়ে উপযোগী প্রবক্তা'।**

বুর্জোয়া চালিতকর্মের খিদমতে তন্ময় সে'-সম্প্রদায় আর্থনীতিক তত্ত্ব বিকাশের জন্যে কার্যত কিছুই করল না। মার্কসবাদীরাই শুধু নন — অর্থনীতি চিন্তনের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত গুরুমনা বুর্জোয়া ইতিহাসকারেরাও — বিশেষত শুম্পিটার — সেটার উল্লেখ করেছেন।

উনিশ শতকের প্রায় শেষ অবধিই এই সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকেন্দ্র ছিল কলেজ দ্য ফ্রান্স-এ অর্থশাস্ত্র 'চেয়ার', যাতে সে' অধিষ্ঠিত ছিলেন শেষ বয়সে। তাঁর একজন অনুগামী ছিলেন কিছুটা সুপরিচিত অর্থনীতিবিদ

---

* কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ১ খণ্ড, মস্কো, ১৯৭২, ২৪-২৫ পৃঃ।

** ঐ, ২৫ পৃঃ।

মিশেল্ শেভালে, যিনি বাস্তিয়ার সঙ্গে একত্রে ছিলেন ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা; আর্থনীতিক কর্মনীতিক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একটা সক্রিয় ভূমিকায়। এই সম্প্রদায়ের অর্থনীতিবিদেরা অর্থশাস্ত্র বিষয়ে যেসব বই প্রকাশ করেন সেগুলি সে'-র ভাব-ধারণার অনুযায়ী — সে'-র ধরনে লেখা। তখনকার দিনে সেগুলি জনপ্রিয় হয়েছিল, তবে অর্থনীতি-বিজ্ঞানক্ষেত্রে সেগুলি বিশেষ কোন ছাপ রেখে যেতে পারে নি।

বিপ্লবী, ইউটোপীয় কমিউনিস্ট লুই অগ্যুস্ত ব্লাঙ্কির ভাই জেরোম আদল্ফ ব্লাঙ্কিকে এই সম্প্রদায়ের একজন বলে ধরা যেতে পারে। অর্থনীতিবিদ ব্লাঙ্কি ছিলেন একজন খুবই সম্ভ্রান্ত বুর্জোয়া প্রফেসর। 'Histoire de l'économie politique en Europe' ('ইউরোপে অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস') (১৮৩৯) বইখানা দিয়েই তিনি প্রধানত পরিচিত। অর্থনীতি চিন্তন বিষয়ে প্রথম-প্রথম বিস্তারিত ইতিহাসগুলির মধ্যে এই বইখানা দীর্ঘকাল যাবত আদর্শস্থানীয় বলে বিবেচিত হয়েছিল, এটার তরজমা হয়েছিল রুশ ভাষা সমেত বহু ভাষায়।

শার্ল দ্যুনুয়ার নাম উল্লেখ করা দরকার — ইনি ছিলেন আর-একজন 'আশাবাদী', 'আর্থনীতিক স্বাধীনতা'র পতাকী, যাবতীয় সমালোচনার বিরুদ্ধে বিদ্যমান পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থক। অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে মানীয় আর মূর্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে উল্লিখিত পার্থক্যের উত্তম উদাহরণ হলেন দ্যুনুয়া। পুঁজিতন্ত্রের নিহিত শক্তিতে তাঁর প্রবল আস্থা ছিল, অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন — তিনি (সিস্মন্দির থেকে ভিন্ন ধারায়) মূর্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক হলেন, এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। এই বিষয়ে তিনি মতপ্রকাশ করেছিলেন প্রবাদ-বাক্যের ঢঙে: 'Je n'impose rien; je ne propose même rien; j'expose' ('আমি কিছুই চাপিয়ে দিই না; আমি এমনকি কিছু প্রস্তাবও করি না; আমি ব্যাখ্যান দিই')।

আরও অনেক নাম বলা যায়: আগেই যা বলা হয়েছে, অফিশিয়াল অর্থনীতিবিদ্যাক্ষেত্রে সে'-সম্প্রদায় ছিল প্রাধান্যশালী, আর ফরাসী অর্থনীতিবিদদের ছিল নিজস্ব বিজ্ঞান সমিতি এবং পত্রিকা। তবে নাম বলা হয়েছে যথেষ্ট। আসল যে-কথাটা জোর দিয়ে বলা দরকার তা এই: ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক ভাব-ধারণার ব্যাপক প্রসার ঘটছিল, তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্যে উনিশ শতকের চতুর্থ-পঞ্চম দশকে গড়ে উঠেছিল

সে'-সম্প্রদায় এবং সেটার অভিমত। অনেকাংশে এটাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল এই সম্প্রদায়ের প্রলক্ষণগুলোকে। প্রুধোঁর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড তর্কযুদ্ধ চালিয়েছিলেন বিশেষত বাস্তিয়া। ১৮ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হবে মহান ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী সাঁ-সিমোঁ এবং ফুরিয়ের আর্থনীতিক মতবাদ সম্বন্ধে; তাঁদের শিষ্য এবং অনুগামীরা ছিলেন সে'-সম্প্রদায়ের প্রধান ভাবাদর্শগত প্রতিপক্ষ।

কুর্নো: তাঁর জীবন এবং কর্ম

বহু আর্থনীতিক ব্যাপার আর প্রক্রিয়া সেগুলোর স্বধর্ম অনুসারেই মাত্রিক। বিভিন্ন আর্থনীতিক উপাদানের মধ্যে সাধারণত থাকে কোন মাত্রিক সম্পর্ক: একটা পরিবর্তিত হলে সেটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যটা কিংবা অন্যগুলিও পরিবর্তিত হয় কোন-না-কোন নিয়ম অনুসারে। যেমন, কোন একটা পণ্যের দাম চড়লে সেটার জন্যে চাহিদা কিছুটা কমে যাবে খুব সম্ভব। এই সাপেক্ষতার ধরনটাকে সাধারণত প্রকাশ করা যায় কোন একটা অপেক্ষক নিয়ে। এইরকমের বিচারধারা থেকেই কোন-কোন তত্ত্বজিজ্ঞাসু চিন্তাবীর অনেক আগেই, আঠার শতকে ভাবতে শুরু করেছিলেন আর্থনীতিক ব্যাপারের বিচার-বিশ্লেষণ করতে গণিত প্রয়োগ করা যায় কিনা। সেইভাবে চেষ্টাও করা হয়েছিল। তবে তত্ত্বীয় অর্থনীতিবিদ্যা বিকাশের ফলে কোন-কোন মূল আর্থনীতিক প্রশ্নকে গাণিতিক-সূত্রবদ্ধ করা গিয়েছিল শুধু উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে।

আর্থনীতিক গবেষণায় গাণিতিক প্রণালী পরিকল্পিতভাবে এবং রীতিক্রমে সর্বপ্রথমে প্রয়োগ করেন ফরাসী অর্থনীতিবিদ আঁতোয়াঁ অগাস্তিন কুর্নো। যে-রচনাটার জন্যে কুর্নো পরে বিখ্যাত হন সেটা প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ সালে, সেটার নাম — 'Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses' ('সম্পদ তত্ত্বক্ষেত্রে গাণিতিক মূলসূত্র নিয়ে গবেষণা')। রচনাটা তাঁর জীবনকালে তেমন কোন আগ্রহ সৃষ্টি করে না, তাই অর্থনীতি চিন্তনের ইতিহাসগুলিতে কুর্নো সম্বন্ধে প্রতিভাশালী অনুত্তীর্ণ, 'বিজ্ঞানক্ষেত্রে শহিদ', ইত্যাদি লেখাটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সেটা খুব সঠিক নয়। কলেজের প্রফেসর এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে কুর্নোর জীবনটা ছিল

শান্ত-সাদাসিধে এবং পয়মন্ত। গণিত বিষয়ে তাঁর কতকগুলি রচনা সেই আমলে সার্থক হয়েছিল। তাঁর দীর্ঘ জীবনকালে ফ্রান্সে একটার পরে একটা যত রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই সবগুলিরই সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল; তাঁর একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল অফিশিয়াল বিজ্ঞানক্ষেত্রে এবং রাজকার্যে।

তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও ঠিক যে, ঢের বেশি প্রগাঢ় অর্থে তাঁর বিজ্ঞানসেবা তেমন স্বীকৃতি পেল না বলে তিনি মর্মপীড়িত ছিলেন। গণিত আর দর্শনের সাহায্যে প্রকৃতি-বিজ্ঞান আর সমাজবিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটাতে তিনি চেষ্টা করছিলেন। জীবনের শেষ দুই দশকে তাঁর লেখাগুলি ছিল প্রধানত প্রকৃতি-বিজ্ঞানগুলি সম্বন্ধে তত্ত্বজিজ্ঞাসা। উনিশ শতকের সপ্তম আর অষ্টম দশকে প্রকাশিত দুটো রচনায় কুর্নো কোন সূত্র ব্যবহার না করে আবার অর্থনীতি-বিজ্ঞান চর্চা করেন, কিন্তু তাতেও জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। তাঁর প্রথম বইখানার মতো মৌলিকতা ছিল না এই রচনা-দুটিতে, তাই প্রথম বইখানার মতো হল না — লাইব্রেরির তাকে থেকে গায়ে ধুলো জমানোই হল এই রচনা-দুটোর পরিণতি। কুর্নোর জীবনীকার লিখেছেন: 'তাঁর অফিশিয়াল কর্মজীবন চমৎকার আর বিজ্ঞানী হিসেবে জীবনকালে একেবারে কোন স্বীকৃতিই তাঁর জুটল না — এই দুয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্যটা জ্বলজ্বলে। ...নিজ স্মৃতিকথায় তিনি দুঃখ করে এবং সক্ষোভে লিখেছেন তাঁর রচনাগুলির কাটতি বিশেষত ফ্রান্সে যত খারাপই হোক, তবু সেগুলিতে কমবেশি নতুন কিছু-কিছু ভাব-ধারণা আছে যা বিভিন্ন বিজ্ঞানের সাধারণ তন্ত্রটাকে আগের চেয়ে ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে।'*

কুর্নোর জন্ম হয় ১৮০১ সালে পূর্ব ফ্রান্সে গ্রে নামে ছোট শহরের একটি ধনী পেটি-বুর্জোয়া পরিবারে, তাতে কেউ-কেউ ছিলেন সুশিক্ষিত। তাঁর ঠাকুরদা ছিলেন একজন নোটারি পাবলিক, ছেলেটিকে মানুষ করে তোলার ব্যাপারে তাঁর মস্ত প্রভাব পড়েছিল। কুর্নো ছিলেন খুবই শান্ত এবং অধ্যবসায়ী ছেলে, পড়তে এবং চিন্তা করতে তিনি ভালবাসতেন। এতে হয়ত আনুকূল্য করেছিল তাঁর অল্প বয়সেই হওয়া অদূরবদ্ধ দৃষ্টি। তিনি বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন পনর বছর বয়স অবধি, তারপর প্রায় চার বছর তিনি পড়াশুনো করেছিলেন এবং নিজেই শিক্ষালাভ করেছিলেন বাড়িতে,

---

* H. Reichardt, 'Augustin A. Cournot. Sein Beitrag zur exacten Wirtschaftswissenschaft', Tübingen, 1954, S. 8 থেকে উদ্ধৃত।

তখন মাঝে-মাঝে যেতেন বেজানসোঁ-র কলেজে। ১৮২১ সালে তিনি প্যারিসে উচ্চ শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়ে প্রকৃতি-বিজ্ঞান অধ্যয়ন আরম্ভ করেন, সেখানে পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায় গণিত সম্বন্ধে তাঁর প্রবল আগ্রহ। কিন্তু পড়ুয়াদের রাজতন্ত্রবিরোধী মনোভাবের কারণে সরকার বিদ্যালয়টিকে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয় অল্পকাল পরেই; কুর্নো রাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীন হলেও তিনিও অন্যান্য পড়ুয়াদের মতো পুলিসের কুদৃষ্টিতে পড়েন কিছুকালের জন্যে।

১৮২৩ থেকে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত কুর্নো ছিলেন মার্শাল সাঁ-সির্-এর পরিবারে, এখানে তিনি ছিলেন মার্শালের ছেলের গৃহশিক্ষক এবং মার্শালের সচিব, মার্শাল তখন সাম্রাজ্যিক কালপর্যায় সম্বন্ধে স্মৃতিকথা লিখছিলেন। বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে অধ্যয়নে এবং বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে লেকচার শুনে কুর্নোর বিস্তর সময় কাটত এই সময়ে। তাঁর কয়েকটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গণিত বিষয়ে কাজের জন্যে তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রি পান ১৮২৯ সালে। তাঁর আলাপ-পরিচয় হয় বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে, বিশেষত গণিতবেত্তা পুয়াসোঁর সঙ্গে, ইনি কুর্নোকে দেখতেন তাঁর সবচেয়ে প্রতিভাশালী শিষ্যদের মধ্যে, ইনি কুর্নোর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আজীবন। পুয়াসোঁর পৃষ্ঠপোষকতার কল্যাণে কুর্নো লিয়োঁতে প্রফেসরের পদে নিযুক্ত হন, সেখানে তিনি ছিলেন অগ্রসর গণিতের শিক্ষক। এক বছর পরে তিনি গ্রেনোবল আকাদমির (বিশ্ববিদ্যালয়ের) রেক্টরের পদ পান, এখানে তিনি পরিচালক হিসেবে সুদক্ষতার পরিচয় দেন। ১৮৩৮ সালে তিনি পান আরও উঁচু পদ: শিক্ষায়তনসমূহের ইনস্পেক্টর-জেনারেল। গণিত বিষয়ে তাঁর প্রধান-প্রধান রচনাগুলিও প্রকাশিত হয় উনিশ শতকের পঞ্চম দশকের গোড়ার দিকে।

কুর্নোর অতি বিভিন্ন ধরনের রচনাগুলির মধ্যে এমন সহসা এবং অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর রচনা দেখা দিল কিভাবে সেটা তাঁর জীবনীকারের কাছে কিছুটা রহস্যজনক। অর্থশাস্ত্র বিষয়ে তার আগে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল বলে যাতে মনে হতে পারে এমনকিছু এখনও প্রকাশ পায় নি। তবে এটা মনে রাখা দরকার যে, কুর্নোর জ্ঞান ছিল বহুধাবিস্তৃত, তাঁর আগ্রহ ছিল বহুমুখী। সে'-র রচনাগুলি তখন ছিল সাধারণ্যে সুবিদিত, — সেগুলিও হয়ত পড়েছিলেন কুর্নো। সম্ভবত স্মিথ আর রিকার্ডোর রচনা সম্বন্ধে তিনি অবগত হয়েছিলেন সে'-র মারফত। আর

তার সঙ্গে ধরা চাই কান্ডজ্ঞান আর আর্থনীতিক সহজজ্ঞান, যা কুর্নোর বইয়ে খুবই স্পষ্টপ্রতীয়মান। অর্থনীতি-বিজ্ঞানের উপস্থাপনাগুলি যথাযথ নয়, অস্পষ্ট, অসমঞ্জস বলে বিরক্তি বোধ করে তিনি তাতে প্রয়োগ করতে চান যথাযথ যুক্তি আর গাণিতিক প্রণালী। কুর্নো ছিলেন খুবই রীতিবদ্ধ মানুষ, তাঁর ধরাকাট করায় বাড়াবাড়িই ছিল — তাঁর পক্ষে এবং অর্থনীতি-বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অভিনব এই কাজটায় উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি সেটাকে চালিয়ে গিয়ে একসময়ে বিবেচনা করলেন সেটাকে প্রকাশ করা যেতে পারে। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন বইখানায় লোকে মনোযোগ দেবে এবং এটা অন্যান্য বিদ্বানব্যক্তির চিন্তার খোরাক যোগাবে। কিন্তু এতে তাঁকে হতাশ হতে হয়েছিল।

কুর্নোর কৃতকার্য অফিশিয়াল কর্মজীবন চলেছিল ১৮৬২ সাল অবধি। 'দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রে'র আমলে (১৮৪৮-১৮৫১) তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষা কমিশনের একজন সদস্য, আর শিক্ষা-সংক্রান্ত সাম্রাজ্যিক পরিষদের সদস্য ছিলেন 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যে'। আট বছর ধরে তিনি ছিলেন দিজোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর — সেখানে তিনি নিজ নীতিনিষ্ঠা আর বহুমুখী জ্ঞানের জন্যে ছাত্র আর অধ্যাপক সবারই শ্রদ্ধাভাজন হন। এই সময়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক আগ্রহস্থল বিশুদ্ধ আর ফলিত গণিত থেকে সরে যায় দর্শনক্ষেত্রে। অবসর নেবার পরে তিনি বসবাস করতে থাকেন প্যারিসে। শেষ দিনটি অবধি তাঁর জীবন ছিল কঠোর-নিয়মাধীন: শুতে যেতেন এবং উঠতেন নির্দিষ্ট সময়ে, সকালটা কাটত পড়াশুনোয়, তাতে কখনও অন্যথা হত না। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে মনে হত ধরাকাট-করা কঠোর মানুষ, কিন্তু বন্ধুবান্ধব আর ঘনিষ্ঠ পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি ছিলেন মিশুক আলাপী, তাঁর রসবোধও ছিল। ১৮৭৭ সালে কুর্নো মারা যান প্যারিসে।

কুর্নোর অবদান

কুর্নোর আর্থনীতিক-গাণিতিক বইখানা লেখা হয়েছিল কাদের উদ্দেশে, এই প্রশ্নটা খুবই আগ্রহজনক। তাঁর আশঙ্কা ছিল সাধারণ পাঠকদের পক্ষে এটা বড় বেশি জটিল মনে হতে পারে, আর পেশাদার গণিতজ্ঞদের মনোযোগ আকর্ষণ করতেও অপারক হবে। তবে, তিনি লিখেছিলেন, 'রয়েছেন...

এমন বহু লোক যাঁরা গণিতবিজ্ঞানক্ষেত্রে কিছু-কিছু উন্নত অধ্যয়ন চালাবার পরে সমাজ যাতে বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত এমনসব বিজ্ঞান (হয়ত তাঁর মনে ছিল প্রযুক্তিবিদ্যা আর বিভিন্ন প্রকৃতি-বিজ্ঞান। — **আ. আ.**) প্রয়োগ করার জন্যে প্রচেষ্টা চালিত করেছেন। সামাজিক সম্পদ-সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্বের দিকে তাঁরা নিশ্চয়ই মনোযোগ দেবেন। সেগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁরাও নিশ্চয় আমারই মতো মনে করবেন, দৈনন্দিন জীবনের ভাষা থেকে যা পাওয়া যায় তাতেই গণ্ডিবদ্ধ থাকাটা যাঁরা ঠিক মনে করেছেন সেইসব লেখকের রচনায় যা এতই অস্পষ্ট এবং অনেক সময়ে এতই দুর্বোধ্য সেই বিশ্লেষণটাকে তাঁদের [গোড়ায় যে-'বহু লোকে'র কথা বলা হয়েছে। — অনুঃ] কাছে সুপরিচিত সংকেতগুলির সাহায্যে আরও স্পষ্ট করে তোলা দরকার।'*

তখনকার দিনের পক্ষে নমুনাসই যে-ধরনের গণিতজ্ঞ, ইঞ্জিনিয়র আর প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা সমাজবিজ্ঞানের আকর্ষণীয় এবং বিতর্কমূলক প্রশ্নগুলিতে আগ্রহান্বিত হয়ে তাতে গণিতের ভাষা প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেন তাঁদের মধ্যে কুর্নোই মনে হয় সর্বপ্রথম। তাঁর পরবর্তী আরও বহু গণিতবেত্তার মতো তিনিও বিদ্যমান রচনাগুলিতে যেমনটা পাওয়া গিয়েছিল মূলত সেইভাবেই ধরেছিলেন অর্থনীতি-বিজ্ঞান এবং সেটার কাজগুলিকে। তবে কুর্নোর বিশেষত্ব হল এই যে, বিদ্যমান সম্প্রদায়গুলির গোঁড়ামি আর সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টায় তিনি প্রধান প্রশ্নগুলিতে, বিশেষত মূল্য-সংক্রান্ত প্রশ্নে বিষয়গত এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অর্থনীতিবিদ-গণিতজ্ঞদের ক্ষেত্রে বিশেষক ছিল বিষয়ীগত-মনোগত দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁদের থেকে কুর্নোকে স্বতন্ত্র করে লক্ষ্য করা যায় সেটা দিয়ে। যেমন, রবিনসনকাণ্ডটাকে একেবারে শুরুতেই তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং যে-সমাজে গড়ে উঠেছে উন্নত পণ্য-উৎপাদন আর বিনিময় সেটা প্রসঙ্গে রচনা করেন নিজস্ব তত্ত্ব।

কুর্নো তাঁর রচনায় মূলত একটা মস্ত প্রশ্ন নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেন: পণ্যের দাম, এবং পৃথক-পৃথক বাজারী পরিস্থিতিতে — অর্থাৎ ক্রেতা আর

---

* A. Cournot, 'Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses', Paris, 1838, p. X.

বিক্রেতাদের ক্ষমতা-বিন্যাসের পৃথক-পৃথক অবস্থায় — পণ্যের চাহিদার মধ্যে পরস্পর-সাপেক্ষতা। এটা করতে গিয়ে তিনি আর্থনীতিক বিচার-বিশ্লেষণে গণিত প্রয়োগের ধরনধারন এবং সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে প্রখর বোধশক্তির পরিচয় দেন। গণিতের সাহায্যে মূল সামাজিক-আর্থনীতিক প্রশ্নগুলি নিয়ে অনুশীলন করার দাবিদার তিনি হন নি; গাণিতিক-সূত্রবদ্ধ করার প্রণালী যেসব কাজে কমবেশি উপযোগী সেগুলির চৌহদ্দির ভিতরেই তিনি থেকেছেন।

চাহিদা আর দামের মধ্যে সম্পর্ক-সংক্রান্ত প্রশ্নটা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে গিয়ে কুর্নো **চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা**-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণাটা চালু করেন অর্থনীতি-বিজ্ঞানে। যা আগেই বলা হয়েছে, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, কোন একটা পণ্যের দাম চড়লে সেটার চাহিদা নেমে যায়, আর তেমনি হয় তার উলটোটা। এই 'চাহিদা নিয়ম'টাকে কুর্নো প্রকাশ করেন নিম্নলিখিত অপেক্ষকের আকারে (তাতে D হল চাহিদা, আর দাম — p):

$$D = F(p)$$

কুর্নো বলেন, এই সাপেক্ষতা ভিন্ন-ভিন্ন পণ্যের বেলায় বিভিন্ন। দামের অপেক্ষাকৃত সামান্য তারতম্য হয়ে চাহিদা বদলে যেতে পারে অনেকটা — এটা হল চাহিদার উঁচু মাত্রায় স্থিতিস্থাপকতার ব্যাপার। উলটোটাও ঘটতে পারে — দাম বদলে গেল, কিন্তু চাহিদার উপর তার ক্রিয়াফল হল সামান্যই; এটা চাহিদার নিচু মাত্রার স্থিতিস্থাপকতার ব্যাপার। কুর্নো আরও বলেন, শেষেরটা অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু যেমন কোন-কোন বিলাসদ্রব্যের ক্ষেত্রে, তেমনি অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। যেমন, বেহালা কিংবা জ্যোতির্বিদ্যার দূরবীনের দাম অর্ধেক কমে গেলেও চাহিদার বিশেষ কোন বৃদ্ধি ঘটবে না: এক্ষেত্রে চাহিদাটা সংকীর্ণ অনুরাগী মহলেই সীমাবদ্ধ, তাদের কাছে দামটা প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়। অন্য দিকে, জালানি কাঠের দাম দ্বিগুণ হয়ে গেলেও চাহিদা নিশ্চয়ই একই পরিমাণে কমে যাবে না, কেননা (শীতপ্রধান দেশে) লোকে ঘর তাপনের জন্যে অন্যান্য খরচ কমাতে প্রস্তুত। এইভাবে চাহিদা-সংক্রান্ত অপেক্ষকের আকার বিভিন্ন হতে পারে, কাজেই সেটা দেখাবার গ্রাফ্ হবে বিভিন্ন। অপেক্ষাকৃত কম প্রতীয়মান কিন্তু গাণিতিক বিচারে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হল কুর্নোর এই বক্তব্য: অপেক্ষকটা অপরিবর্তনীয়, অর্থাৎ দামে যেকোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তন চাহিদার কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তনের প্রতিষঙ্গী। তাঁর এই বক্তব্যটাও ভিত্তিহীন নয়: বাজার যতই বিস্তৃত, আর ব্যবহারকদের মধ্যে প্রয়োজন, ক্রয়ক্ষমতা, এমনকি খেয়ালখুশিরও সম্ভাব্য সংযোগ যতই বেশি রকমের, আর্থনীতিক দিক থেকে এই মূলসূত্রটা বাস্তবে পরিণত হয় ততই বেশি পরিমাণে। অপেক্ষকটা অপরিবর্তনীয়, তার অর্থ হল এই যে, এটাকে

ডিফারেনশিয়েট করা যায়: চাহিদা বিশ্লেষণ করতে অন্তরকলন আর সমাকলন ব্যবহার করা সম্ভব হয়।*

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি অনুসারে এগলে, কোন একটা পণ্যের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বিক্রি থেকে থোক প্রাপ্তিটাকে প্রকাশ করা যায় এই গুণফলটা দিয়ে — pD বা pF(p)। কুর্নো এই অপেক্ষকটাকে ডিফারেনশিয়েট ক'রে এর গরিষ্ঠ মাত্রাটা খোঁজেন, তাতে তিনি ধরে নেন যে, যেকোন পণ্য-উৎপাদক 'হিসেবী মানুষ' বলে সে নিজ আয়টাকে তুলতে চায় সর্বোচ্চ মাত্রায়। তার থেকে বিভিন্ন রূপান্তরের সাহায্যে কুর্নো বের করেন গরিষ্ঠ থোক প্রাপ্তির (আয়ের) অনুযায়ী দাম।

এই দাম নির্ভর করে চাহিদা অপেক্ষকের ধরনের উপর, অর্থাৎ সেটার স্থিতিস্থাপকতার মাত্রার উপর। এটাও স্পষ্ট যে, গরিষ্ঠ লাভ পয়দা হয় না সর্বোচ্চ দাম থেকে, সেটা পয়দা হয় একটা নির্দিষ্ট দাম থেকে, যেটাকে বিক্রেতা ধার্য করে পরখ-আর-ভুলের প্রক্রিয়ায়। কুর্নো যেটাকে মনে করেন সবচেয়ে সরল পরিস্থিতি — স্বাভাবিক একচেটে — সেটা দিয়ে তিনি শুরু করেন বিশ্লেষণ। তিনি বলেন, ধরা যাক কেউ যেন একটা খনিজ প্রস্রবণের মালিক, সেই জলটার আছে কোন-কোন ধর্ম যা অন্যত্র মেলে না। গরিষ্ঠ আয় নিশ্চিত করার জন্যে তার জলটার দাম ধার্য করতে হবে কত? প্রশ্নটার উত্তর দিতে গিয়ে তিনি অপেক্ষাকৃত জটিল পরিস্থিতি ধরেন, আমদানি করেন নতুন-নতুন উপাদান (উৎপাদন-পরিব্যয়, প্রতিযোগিতা, অন্যান্য সীমাবদ্ধতা)। প্রতিযোগী দুটো একচেটে কারবার, সীমাবদ্ধ কয়েকটা প্রতিযোগী এবং অবাধ প্রতিযোগিতার পরিস্থিতি তিনি বিচার-বিশ্লেষণ করেন। এইভাবে কুর্নোর ছকটা হল উনিশ শতকের যথার্থ ঐতিহাসিক বিকাশ-প্রক্রিয়ার বিপরীতক্রমে, — উনিশ শতকে ধারাটা ছিল অবাধ প্রতিযোগিতা থেকে একচেটে।

---

* গণিতের এইসব শাখার (বৈশ্লেষিক জ্যামিতি-সমেত) প্রয়োগ করাটা ছিল উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের গোড়ার দিকটা অবধি সমগ্র গাণিতিক অর্থনীতিবিদ্যার বিশেষক। ইতালীয় অর্থনীতিবিদ বারোনে ১৯০৮ সালে লেখেন, অর্থনীতি-তত্ত্ববিদদের পক্ষে গণিত প্রয়োজন হয়ে উঠতে থাকলেও গণিত থেকে যা নেওয়া দরকার সেটা যেকোন সাধারণ-স্বাভাবিক এবং যুক্তিসম্মত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অবসর-সময়ে মাস-ছয়েক অধ্যয়ন করেই আয়ত্ত করতে পারেন। আর্থনীতিক গবেষণার গাণিতিক যন্ত্রটা এখন ঢের বেশি জটিল। দু'জন সোভিয়েত বিজ্ঞানী (তাঁদের মধ্যে একজন হলেন খুবই বিশিষ্ট গণিতবেত্তা এবং অর্থনীতিবিদ) বলেন, 'গাণিতিক পদার্থবিদ্যা আর তত্ত্বীয় বলবিদ্যার প্রশ্নাবলি প্রসঙ্গে গড়ে ওঠে যে-গাণিতিক যন্ত্র সেটাও ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন আর্থনীতিক কাজের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান আর নিষ্পত্তির জন্যে। স্বাভাবতই এটা কেজো ছিল শুধু গোড়ার দিককার পর্বগুলিতে। আর্থনীতিক বিশ্লেষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলির পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী বিভিন্ন গাণিতিক প্রণালী সৃষ্টি করার প্রয়োজন দেখা দেয় পরে' (ল. ভ. কান্তরোভিচ এবং আ. ব. গর্স্তকো, 'অর্থনীতিবিদ্যায় গাণিতিক সর্বোপযোগী অনুক্রমায়ন', মস্কো, ১৯৬৮, ৬ পৃঃ (রুশ ভাষায়)।

চাহিদা-সংক্রান্ত অপেক্ষকগুলির আকার বিভিন্ন হয় বাজারী পরিস্থিতি অনুসারে — ঐসব অপেক্ষকের গরিষ্ঠ মানগুলি নির্ধারণ করার একক প্রণালীর প্রয়োগই কুর্নোর সমগ্র বিশ্লেষণের ভিত্তি। এই বিচার-বিশ্লেষণের গাণিতিক যথাযথতা আর যুক্তিসম্মত ধরনটা খুবই লক্ষণীয়। কুর্নোর রচনা তখনকার দিনের বুর্জোয়া আর্থনীতিক চিন্তাধারার অন্যান্য বিশিষ্ট প্রবক্তাদের থেকে খুবই পৃথক। তাঁর ভাষা ছিল তাঁদের কাছে একেবারেই অচেনা এবং ভিনদেশী। তাঁকে কেউ বুঝল না, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কুর্নোর ধারণায় কিছু-কিছু মৌলিক দোষ-ত্রুটি ছিল। খুবই সাধারণ অর্থে এটাকে বুর্জোয়া সাফাইদারী বলেই গণ্য করতে হয়: শ্রমের উপর পুঁজির শোষণ, সংকট এবং পুঁজিতন্ত্রের অন্যান্য মূল নিয়ম তিনি তুচ্ছ করেন। নিজ ছকটায় যা নিয়ে তিনি সরাসর বিচার-বিশ্লেষণ করেন সেটা হল শুধু দাম, আর তাঁর বিবেচনায় দাম গড়ে ওঠে পরিচলন ক্ষেত্রে, সেটা যেন উৎপাদনের সঙ্গে প্রায় নিঃসম্পর্ক। একচেটে আর প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি প্রকৃত পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির বহু গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের অপব্যাখ্যা দেন।* যাতে পুঁজিতন্ত্রের দ্বন্দ্ব-অসংগতিগুলোকে উপেক্ষা করা হয় কুর্নোর সেই 'বিশুদ্ধ অর্থশাস্ত্র' হল বিষয়ীগত সম্প্রদায়ের একটা আকর। এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্রেরাই কুর্নো মারা যাবার পরে তাঁকে 'নতুন করে' আবিষ্কার ক'রে তাঁকে বলেন নিজেদের পূর্বসূরি। একটা কিছু পরিমাণে তাইই বটে। তবে কুর্নোর বিবেচনাধারার স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতাটা এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়, সেটা হল বিভিন্ন নির্দিষ্ট আর্থনীতিক প্রশ্ন বিচার-বিশ্লেষণের জন্যে তাঁর গড়ে-তোলা সুপ্রণালী। এদিক থেকে তিনি অর্থনীতি-বিজ্ঞানক্ষেত্রে নতুন পথ চিহ্নিত করে দিয়ে সত্যিকারের পথিকৃৎ।

কুর্নো বুঝেছিলেন তাঁর গাণিতিক ছকটার সঙ্গে যদি আর্থনীতিক বাস্তবতা যাতে প্রকাশ পায় এমন প্রয়োগজ মালমশলা সংযোজিত হয় সাংখ্যিক আকারে তাহলে সেটা হবে অবধারণার জন্যে আরও মূল্যবান হাতিয়ার।

---

* কুর্নোর পূর্ণাঙ্গ মার্কসীয় সমালোচনা করেছেন ব্লিউমিন (দ্রষ্টব্য — ই. গ. ব্লিউমিন, 'বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র পর্যালোচনা', ১ খণ্ড, 'বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে বিষয়ীগত সম্প্রদায়', মস্কো, ১৯৬২, ৪৯১-৫৩২ পৃঃ (রুশ ভাষায়)।

এই ধারণাটা তিনি ব্যক্তই করেছিলেন শুধু; এটাকে উপযুক্ত ধরনে কার্যে পরিণত করা হয় প্রায় এক-শ' বছর পরে।

তবে কুর্নোর প্রায় সমকালেই (এমনকি একটু আগেই) জার্মানির জোহান হেইনরিখ ফন তুনেন রচনা করেন আর-একটা আর্থনীতিক ছক; কুর্নো যা করতে চেয়েছিলেন তার কিছুটা তিনি হাসিল করেন — সেটাতে সংযোজিত করেন প্রয়োগজ মালমশলা। তুনেন ছিলেন উত্তর জার্মানির একজন জমিদার, ছোট জমিদারিতে শান্তিতে কৃষিকাজে কাটে তাঁর সারা জীবন। তবে ইনি ছিলেন স্বভাব-চিন্তাশীল। একটা ভিন্ন রকমের আর্থনীতিক প্রশ্ন মীমাংসার চেষ্টা করছিলেন তিনি। তিনি ধরে নিয়েছিলেন রয়েছে যেন একটা বৃত্তাকারের বিচ্ছিন্ন আর্থনীতিক এলাকা, তাতে সর্বত্র সমরূপ উর্বর জমি, আর কেন্দ্রস্থলে একটা শহর (যেটা হল কৃষিজাতদ্রব্যের জন্যে চাহিদার স্বাভাবিক উৎপত্তিস্থল)। এই মডেলটা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি একটা আগ্রহজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছন: কৃষির বিভিন্ন শাখাগুলিকে ক্রম-উন-উৎপাদী বিভিন্ন এককেন্দ্রী বৃত্তাকারে সাজালে ফল হয় সর্বোপযোগী। দশ বছর ধরে তুনেন তাঁর কৃষিকাজে খরচ-খরচা আর ফলাফলের হিসাব রেখেছিলেন আশ্চর্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে এবং খুবই নিখুঁতভাবে। বিশেষত তিনি হিসাব করেছিলেন বাঁধা দামের কোন একটা কৃষিজাতদ্রব্য শহরটা থেকে কতটা দূরে উৎপন্ন হলে চালানের খরচ পড়ে নীট লাভের (উৎপাদন-পরিব্যয় বাদ দিলে থোক আগমের যা থাকে সেটার) সমান, কাজেই উৎপাদনটা হয় অলাভজনক। কুর্নোর বইখানা যদি হয় বিমূর্ত গাণিতিক অর্থনীতিবিদ্যার সূচনা, সেইভাবে কখনও-কখনও তুনেনের হিসাবটাকে বলা হয় আর্থনীতিক-মাপন তত্ত্বের আদিরূপ: গাণিতিক অর্থবিদ্যা, যার মধ্যে পড়ে পরিসাংখ্যিক তথ্য এবং বিভিন্ন মূর্ত-নির্দিষ্ট উপাদানের ভিত্তিতে গড়া প্রয়োগজ মডেল।

তুনেনের রচনা একটামাত্র, সেটা হল 'Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie' ('কৃষি আর জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিষয়ে')। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮২৬ সালে, আর ১৮৫০ সালে — দ্বিতীয় খণ্ডের একাংশ; দ্বিতীয় খণ্ডের বাদবাকিটা এবং তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় তিনি মারা যাবার পরে, ১৮৬৩ সালে। তুনেনের সমসাময়িকেরা তাঁকে বড় একটা লক্ষ্যই করেন নি, আর তাঁর কদর করেন নি একটুও বললেই হয়। আধুনিক বুর্জোয়া অর্থনীতি-বিজ্ঞানক্ষেত্রে বিশেষত মার্জিনালিজমের পথিকৃৎ বলে তাঁকে

মান্য করা হয়। শ্রমঘটিত মূল্য এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বণ্টন সম্বন্ধে রিকার্ডোর তত্ত্বের বিপরীতে তুনেন মনে করতেন, উৎপাদের মূল্যটাকে পয়দা করে শ্রম আর পুঁজি; এই দুয়ের মধ্যে স্বাভাবিক বণ্টনের অনুপাত তিনি স্থির করতে চেষ্টা করেন মার্জিনাল মূলসূত্র অনুসারে। শ্রম আর পুঁজির আয় নির্ধারিত হয় আগেরটা আর পরেরটার মার্জিনাল উৎপাদনশীলতা দিয়ে, অর্থাৎ উৎপাদনে যে-শেষ ইউনিটটার ব্যবহার সুবিধাজনক সেটার উৎপাদনশীলতা দিয়ে। বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রে এইসব ধারণা বিস্তারিত করা হয় শুধু বছর-পঞ্চাশেক পরে।

অর্থনীতিবিদ্যায় গাণিতিক প্রণালী

অর্থনীতিবিদ্যায় গাণিতিক প্রণালীর ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা চলে আসছে অন্তত এক-শ' বছর ধরে। 'গণিতবিরোধী তমসাবাদ' থেকে গণিত ছাড়া আদৌ কোন অর্থনীতিবিদ্যা হয় না এই মর্মে নানা উক্তি অবধি সম্ভাব্য সমস্ত রকমের বিবেচনাধারা তাতে বিবৃত হয়েছে। এমন কোন চরম মতাবস্থানে এখনকার দিনে কেউ বড় একটা আমল দেবে না। তবে আর্থনীতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণিতের ভূমিকা, সেটার আকার আর চৌহদ্দি নিয়ে আলোচনা এখনও চলছে, চলতে থাকবেও নিশ্চয়ই। মূলত, অন্য যেকোন বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের মতো অর্থনীতিবিদ্যায় গাণিতিক প্রণালী-সংক্রান্ত প্রশ্নটারও নিষ্পত্তি হচ্ছে সর্বোপরি চলিতকর্মের মানদণ্ড অনুসারে অর্থাৎ সাদাসিধে ভাষায়, বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে। উন্নয়নের কোন একটা পর্বে অর্থনীতির বিষয়গত প্রয়োজনে অর্থনীতিবিদ্যায় গণিতযোজনের আবশ্যকতা দেখা দেয়। মূল উৎপাদন ইউনিট যখন ছিল ছোট কারবার তখন পরিচালকদের কাছ থেকে চাওয়া হত শুধু করণকৌশল। কিন্তু কোন আধুনিক বৃহদায়তনের প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন, বিক্রি আর আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থাপন হল একেবারে অন্য ব্যাপার। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান ছাড়া চলে না, আর বহুলাংশে এই বিজ্ঞান হল আর্থনীতিক সাইবারনেটিক্স, অর্থাৎ বিভিন্ন আর্থনীতিক কর্ম-বন্দোবস্তে বিভিন্ন সংযোগ, পরিচালন আর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে গণিতের যে-শাখাটা। কোন-এক শ্রেণীর আর্থনীতিক কাজ হাসিল করার নতুন-নতুন গাণিতিক প্রণালী সৃষ্টি হয়েছে সরাসর আর্থনীতিক প্রয়োজনের তাগিদেও। উৎপাদন, পুঁজি বিনিয়োগ, মালমশলার যোগান, ইত্যাদির জন্যে সর্বোপযোগী, সবচেয়ে

যুক্তিসম্মত ধরনের অনুক্রম বেছে নেওয়াটাই প্রধান আর্থনীতিক কাজগুলোর একটা। আর্থনীতিক-গাণিতিক প্রণালীর ভিত্তিতে এইসব কাজ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিষ্পন্ন করা সম্ভব হয়ে উঠছে শুধু আধুনিক ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সাহায্যে। এটা হয়ে উঠছে যেন অর্থনীতিতন্ত্রের তৃতীয় অঙ্গ-উপাদান: অর্থনীতিবিদ্যা — গণিত — কম্পিউটার; আর্থনীতিক ফলপ্রদতা বাড়াতে কম্পিউটার ইতোমধ্যে এসে গেছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়, বেড়েই চলবে এটার তাৎপর্য।

পৃথক-পৃথক শিল্পায়তনের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে, পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে আধুনিক কারবারগুলোর বৃহদায়তনের উৎপাদন আর ফিনান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন জোটেরও চৌহদ্দি পর্যন্ত ছাড়িয়ে বিভিন্ন আর্থনীতিক-গাণিতিক প্রণালী প্রয়োগ করা হচ্ছে ইতোমধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ। রাষ্ট্রীয়-একচেটে পুঁজিতন্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা জাতীয় অর্থনীতি চালু রাখার গাণিতিক মডেল (মহা-মডেল) রচনা করছেন। এমনসব মডেল রচনা আর বিচার-বিশ্লেষণের কাজ যাঁরা করছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সাম্প্রতিক দশকগুলির সবচেয়ে বিশিষ্ট পশ্চিমী অর্থনীতিবিদেরা, এটা লক্ষণীয়। এইসব বিভিন্ন কাজের মধ্যে অভিন্ন উপাদান আছে: একদিকে, ব্যবহৃত হয় বুর্জোয়া রাজনীতিক-আর্থনীতিক সুপ্রণালী; আর অন্য দিকে, ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয় গণিত — সবচেয়ে সাদাসিধে প্রতীক আর বীজগণিত থেকে বিভিন্ন যৌগিক আধুনিক প্রণালী। এইসব কাজ সাধারণত আর্থনীতিক-পরিমাপন ধরনের, অর্থাৎ তাতে মডেলের সঙ্গে পরিসংখ্যান সংযোজিত থাকে কিংবা তা সংযোজিত হবে বলে ধরে নেওয়া হয়। বিভিন্ন শাখার মধ্যে স্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মার্কিন বিজ্ঞানী ডাব্লিউ. লিয়নটিয়েফের কাজের বৈজ্ঞানিক এবং ব্যবহারিক গুরুত্ব বিরাট। প্রসঙ্গত বলি, তার আগে সোভিয়েত পরিকল্পন সংস্থাগুলিতে একটা অনুরূপ প্রণালী স্থির করা হয়েছিল তৃতীয় দশকে। এই প্রণালীর সারমর্মটা হল — এক শাখা থেকে অন্য শাখায় মাল আর সার্ভিস চালান করা যাতে চলে এমন মাত্রিক সম্পর্ক দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কমবেশি সমষ্টিকৃত (অর্থাৎ সংযুক্ত সমরূপ উৎপাদন) শাখাগুলোর সাকল্য হিসেবে জাতীয় অর্থনীতির সারণীবদ্ধ উপস্থাপনা।

অর্থনীতির উন্নয়ন বিষয়ে পূর্বসংকেতের ব্যাপারে গাণিতিক মডেলের ক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ; পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে পূর্বসংকেতের ধুম

আপতিক কিংবা বর্তমান পরিস্থিতির বিশেষত্ব নয়। অর্থনীতিক্ষেত্রে কর্মসূচি এবং সেগুলোতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ চালু করা হচ্ছে — এই পরিবর্তনটা বলবৎ করা হচ্ছে গাণিতিক প্রণালী আর মডেলের সাহায্যে। অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রসারের বর্ধিত হার এবং সর্বোপযোগী অনুপাত স্থির করাটা উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ; পরিকল্পন আর ব্যবস্থাপনের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী সম্বন্ধে এইসব দেশ খুবই আগ্রহান্বিত।

গাণিতিক মডেল আর প্রণালীর সাহায্যে পরিচালনার বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী সবচেয়ে কার্যকর এবং ফলপ্রদ ধারায় প্রয়োগ করা যায় সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনীতিক্ষেত্রে, তাতে কোন সংশয় নেই। এক্ষেত্রে সোভিয়েত পরিকল্পন সংস্থাগুলির হাতে বিস্তর অভিজ্ঞতা জমেছে; বিশেষত সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নতুন-নতুন প্রণালী চালু করা হয়েছে আরও অনেক বেশি। পরিকল্পনের তত্ত্ব আর চলিতকর্ম বিস্তারিত করার কাজ চালাচ্ছেন অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিশেষজ্ঞেরা — তাঁদের অবদানও বিস্তর। আর্থনীতিক-গাণিতিক প্রণালীর বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং প্রচারক ছিলেন সোভিয়েত আকাদমিশিয়ন ভ. স. নেমচিনভ এবং পোল্যাণ্ডের অর্থনীতিজ্ঞানী ও. লাঙ্গে।

পশ্চিমী অর্থনীতিবিদদের আর্থনীতিক-গাণিতিক কাজগুলি বিচার-বিশ্লেষণের দিকে খুবই মনোযোগ দেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। পশ্চিমের এইসব কাজে অনেক সময়ে প্রধান হয়ে ওঠে বুর্জোয়া অর্থনীতি-বিজ্ঞানের **বিষয়গত-সংবেদী** এবং **ব্যবহারিক** কর্ম, আর এটা চলে আর-একটা প্রধান কর্ম — **ভাবাদর্শগত আর সাফাইদারী** কর্মের পাশাপাশি। আধুনিক বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের এই দুটো কর্মের মধ্যে পার্থক্যটাকে প্রথমে তুলে ধরেন সোভিয়েত বিজ্ঞানী ল.ব. আল্‌তের, এখন বেশির ভাগ মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ সেটা গ্রহণ করেছেন। এটা অবশ্য আর্থনীতিক-গাণিতিক কাজগুলি প্রসঙ্গেই শুধু নয়, তবে সেই বিষয়ে বিচার-বিবেচনার জন্যে বিশেষভাবে কার্যকর।*

* বিভিন্ন ধরনের আর্থনীতিক-গাণিতিক রচনা সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করতে গিয়ে কেউ-কেউ বলেন, গাণিতিক প্রণালী কাজে লাগাতে বুর্জোয়া অর্থনীতি-বিজ্ঞানে থাকে তিনটে কর্ম: ভাবাদর্শগত, অর্থাৎ তত্ত্বীয় উপায়ে পুঁজিতন্ত্র সমর্থন করার কর্ম; বিষয়গত সংবেদ এবং সরকারী আর্থনীতিক কর্মনীতি প্রতিপন্ন করার কর্ম; আর বিভিন্ন নির্দিষ্ট কাজ হাসিল করা এবং পৃথক-পৃথক কারবার আর শিল্পায়তনের খিদমত করার

আর্থনীতিক-গাণিতিক রচনাগুলিতে ভাবাদর্শগত কর্মটা যেভাবে প্রকাশ পায় সেটা লক্ষণীয়। একদিকে, আর্থনীতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কাজগুলির পরিবেশটাকে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যাতে বুর্জোয়া সমাজের শ্রেণীগত বিশেষত্বগুলো মিলিয়ে যায়। কোন ব্যক্তি যে-শ্রেণীর মানুষ সেটা থেকে অনপেক্ষভাবে বিবেচনা করা হয় তার অর্থনীতিগত আচরণ; মালিকের আর্থনীতিক সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় উৎপাদনের উপকরণে মালিকানার আকারের বিষয়টা অগ্রাহ্য করে; বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয় এই রাষ্ট্রের শ্রেণীগত সারমর্ম নির্বিশেষে। (আমরা দেখেছি, এমনসব উপাদান — অনেক আগেই — ছিল কুর্নোর বিশেষক।) অন্য দিকে, অর্থনীতির উন্নয়ন পরিচালনা করায় রাষ্ট্রের সামর্থ্য কার্যত অপরিসীম, এই মর্মে ভিত্তিহীন বক্তব্যের ভিত্তিতে সেটাকে দাঁড় করান হয় অনেক সময়ে, আর অর্থনীতিক্ষেত্রের স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিগুলোকে খাটো করে দেখান হয়। বুর্জোয়া আর্থনীতিক-গাণিতিক রচনাগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বিষয়টার এই দিকটা বিবেচনায় রেখে ঐসব রচনার সাফাইদারী উপাদানগুলোকে খুলে ধরে সমালোচনা করেন।

পুঁজিতন্ত্রই হোক, আর সমাজতন্ত্রই হোক, কোন একটা সমাজব্যবস্থার মূল গুণীয়, সামাজিক-আর্থনীতিক নিয়মাবলি বের করাই যেখানে লক্ষ্য সেক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে তত্ত্বীয় বিচার-বিশ্লেষণে গণিতের প্রয়োগ-সংক্রান্ত প্রশ্নটাই আর্থনীতিক-গাণিতিক প্রণালী ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিতর্কমূলক। যুক্তিবিদ্যা, বিমূর্তন কিংবা পরীক্ষা যেমন, তেমনি গণিতও জ্ঞান আহরণের একটা প্রণালী, হাতিয়ার। আপনাতে এটা অপক্ষপাতী, যেমনটা অপক্ষপাতী ধরা যাক ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। যাবতীয় তত্ত্বীয় আর্থনীতিক গবেষণার মূলে থাকে একটা বিস্তৃত বিবেচনাধারা যেটা গণিতের যেকোন রকম প্রয়োগের পূর্ববর্তী গুণীয় বিশ্লেষণটাকে নির্ধারণ করে এবং নির্দিষ্ট আকারে তুলে ধরে কাজটার পরিবেশ আর চৌহদ্দি। অ-মার্কসীয় গবেষণার সঙ্গে মার্কসীয় গবেষণার পার্থক্যটা এর একটাতে কিংবা অন্যটাতে গণিত ব্যবহৃত হল কিনা তার উপর নির্ভর করে না। গণিত

প্রধানত টেকনিকাল কর্ম (দ্রষ্টব্য — স. আভ্‌দুর্স্কি, 'আর্থনীতিক-পরিমাপন তত্ত্ব এবং আধুনিক পুঁজিতন্ত্র', 'অর্থনীতিবিদ্যা এবং গাণিতিক প্রণালী', ৫ নং, ১৯৬৯, ৬৪৬ পৃঃ [রুশ ভাষায়])।

ব্যবহার করার প্রশ্নটার নিষ্পত্তি হয় বৈজ্ঞানিক উপযোগিতা অনুসারে। রীতিমতো-গাণিতিক কায়দা ছাড়াই গুরুত্বপূর্ণ ফল পাওয়া যেতে পারে কোন-কোন ক্ষেত্রে। আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে সেটা কার্যকর, এমনকি অপরিহার্য। রীতিমত-গাণিতিক প্রণালী ব্যবহার করাটা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের বিশুদ্ধতার পক্ষে হানিকর বলে যাঁদের আশঙ্কা ছিল তাঁদের সমালোচনা ক'রে ভ. স. নেমচিনভ লেখেন: 'গণিতের অপব্যবহারের সম্ভাবনার কথাটা অনেক সময়ে বলা হয়ে থাকে। এমন অপব্যবহার নিশ্চয়ই সম্ভব। কিন্তু আলোচ্য আর্থনীতিক ব্যাপারটার উপযুক্ত প্রাথমিক গুণীয় বিশ্লেষণ করা হলে সম্ভাবনাটা মিলিয়ে যেতে পারে।'*

মনে পড়তে পারে, আর্থনীতিক তত্ত্বক্ষেত্রে গণিতের প্রয়োগটাকে মার্কস সম্ভব এবং উপযোগী বলেই মনে করতেন। মার্কসের তত্ত্বে বহু মাত্রিক নিয়ম তুলে ধরা হয়েছে বীজগণিতের সূত্রের সাহায্যে, এইসব সূত্রে অনেক সময়ে রয়েছে সাক্ষাৎ এবং ব্যস্ত অনুপাত। পল লাফার্গ জানান মার্কসের একটি সুবিদিত মন্তব্য, তাতে তিনি বলেন, কোন বিজ্ঞান যতক্ষণ গণিত ব্যবহার করতে সক্ষম নয় ততক্ষণ সেটা যথোচিত উন্নত নয়।** ১৮৭৩ সালে এঙ্গেলসের কাছে লেখা একখানা চিঠিতে মার্কস বলেছিলেন, তিনি মনে করেন, আর্থনীতিক কালচক্র সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য পরিসাংখ্যিক মালমশলার গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে 'সংকটের প্রধান নিয়মগুলো... বের করা' সম্ভব।*** এখানে তিনি অবশ্য সংকটের কারণ সম্বন্ধে বলেন নি, বলেছেন সংকটের গতিধারার নিয়মের কথা।

জ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রে গণিতযোজনের এবং সাইবারনেটিক্স, প্রণালীবদ্ধ-তথ্য দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের অবশ্যম্ভাবী বিরাট প্রভাব পড়ছে অর্থনীতি-বিজ্ঞানের উপর।

* ভ. স. নেমচিনভ, 'আর্থনীতিক-গাণিতিক প্রণালী এবং মডেল', ১২ পৃঃ।

** Paul Lafargue et Wilhelm Liebknecht, 'Souvenirs de Marx', Paris, 1935, p. 9.

*** Karl Marx, Friedrich Engels, 'Werke', Bd. 33, Berlin, 1966, S. 82.

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আর্থনীতিক জাতীয়তাবাদ
ফ্রিডরিখ লিস্ট

লিস্ট এবং জার্মান ইতিহাস

জার্মান অর্থশাস্ত্র আঠার শতকের কাছ থেকে পায় কামেরালিস্টিক্স (cameralistics): সমস্ত সমাজবিজ্ঞানের বর্ণনামূলক ব্যাখ্যানের এই প্রণালীটা দেখা দিয়েছিল মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, এতে জোরটা দেওয়া হত রাষ্ট্র প্রশাসনের তত্ত্ব আর চলিতকর্মের উপর। সরকারী আর্থনীতিক মতবাদ ছিল বণিকতন্ত্র — যদিও ইংলণ্ডে আর ফ্রান্সে সেটা দেহত্যাগ করেছিল বহুকাল আগেই। স্মিথের ভাব-ধারণা জার্মানিতে শিকড় গাড়তে শুরু করেছিল উনিশ শতকের গোড়ার দিকে, তার ফলটা হয়েছিল স্মিথের মতবাদ আর সাবেক ঢঙের কামেরালিস্টিক্স-এর অদ্ভুত জগাখিচুড়ি।

দুর্দান্ত রাজনীতিক ঘটনাবলি আর প্রচণ্ড আর্থনীতিক রূপান্তরের যুগ। নেপোলিয়নের রাজ্যজয়গুলোর সঙ্গে সঙ্গে জার্মানির অঙ্গ-রাজত্ব আর রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলোয় সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক ভেঙে পড়ছিল। ভূমিদাসদের ব্যক্তিগত অধীনদশা লোপ পেল। ভেঙে গেল বৃত্তিভিত্তিক শহুরে গিল্ডগুলো। কতকগুলি জার্মান রাজ্যে, বিশেষত সবচেয়ে পরাক্রমশালী প্রাশিয়ায় ক্ষমতাসীন হল বুর্জোয়া-সংস্কারসাধকেরা — তারা কোন-কোন দিক থেকে ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে প্রস্তুত। তবে নেপোলিয়নীয় যুদ্ধবিগ্রহগুলোর পরও জার্মানি থেকে যায় অর্থনীতিক্ষেত্রে অনগ্রসর এবং রাজনীতিক দিক থেকে খণ্ড-বিখণ্ড। বহিরাক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দেশপ্রেমের জোয়ারটাকে রাজন্য আর ভূস্বামীরা কাজে লাগায় নিজেদের মতলব হাসিল করার জন্যে।

বিজয়ী হয় প্রতিক্রিয়াশীলতার শক্তি, সেটা অপরাজিতই ছিল ১৮৪৮ সালের দুরন্ত ঘটনাবলি অবধি, তাতে কেঁপে ওঠে জার্মানি, যেমন সারা ইউরোপও।

আর্থনীতিক উন্নয়নের মাত্রার দিক থেকে জার্মানি ছিল ইংলণ্ড আর ফ্রান্স থেকে অনেক পিছনে। ১৮৪০ সাল নাগাদ দেশটির জনসংখ্যা ছিল মোটামুটি ইংলণ্ডের সমান (প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ), কিন্তু ইংলণ্ডের সঙ্গে তুলনায় জার্মানিতে উৎপন্ন হত কয়লা ১৪ ভাগের ১ ভাগ, লোহা অষ্টমাংশ আর তুলো ব্যবহৃত হত ১৬ ভাগের ১ ভাগ।* তবু জার্মানির শিল্পোন্নয়ন চলছিল বেশ দ্রুতই, বিশেষত ১৮৩৪ সালে জার্মান রাজ্যগুলির শুল্ক সম্মিলনী চুক্তি সম্পাদিত হবার পরে।

জার্মানিতে শিল্প দেখা দিয়েছিল ইতোমধ্যে, সেটা তখনও সামন্ততান্ত্রিক এবং প্যাট্রিয়ার্কাল বাধা-নিষেধ ছুড়ে ফেলে নি। ১৮৪৪ সালে সাইলেসিয়ার তাঁতিদের প্রবল অভ্যুত্থানে শাসক শ্রেণীগুলো দেখল শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান পরাক্রম। প্রগতিশীল শ্রেণী হিসেবে, নতুন-নতুন, দুঃসাহসী ধ্যান-ধারণার বাহক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি জার্মান বুর্জোয়ারা, তারা ভূস্বামী এবং সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে জোট বেঁধে ফেলেছিল চটপট। কাইজার জার্মানি অচিরে পয়দা হয় এই জোটটা থেকেই।

উনিশ শতকের তৃতীয় থেকে পঞ্চম দশকে জার্মানিতে অর্থশাস্ত্র ছিল প্রুশীয় রাজতন্ত্র আর জার্মান রাজন্যদের সেবাদাসী। কামেরালিস্টিক্স সম্প্রদায় থেকে আগত অর্থনীতিবিদদের লেখা পাঠ্যপুস্তকগুলি ছিল জার্মান-রাজভক্তির বাচনে ইঙ্গ-ফরাসী আদর্শ-পুস্তকের অক্ষম নকল, তাতে যা জ্ঞান থাকত সেটা সিভিল সার্ভিসের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পক্ষেই শুধু যথেষ্ট।

কিন্তু নতুন যুগে তখন নতুন কর্মনীতি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ফ্রিডরিখ লিস্ট মস্ত তত্ত্ববিদ ছিলেন না কোনক্রমেই, কিন্তু তিনি ছিলেন চমৎকার লেখক এবং সাধারণ্যে সুপরিচিত, তিনি প্রবলভাবে প্রকাশ করেছিলেন জার্মান বুর্জোয়াদের প্রচেষ্টা — এই প্রচেষ্টা ছিল যে-পরিমাণে সেটা সংশ্লিষ্ট ছিল জার্মানির অখণ্ডতা আর শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে; আর সেটাকে হাসিল করার ব্যাপারটাকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সাপেক্ষ

---

* ল. আ. মেন্দেলসন, 'আর্থনীতিক সংকট আর কালচক্রের তত্ত্ব এবং ইতিহাস', ২ খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৯, ৫২৩ পৃঃ (রুশ ভাষায়)।

করা হয়েছিল, এটা ছিল তাদের প্রতীপগতি। তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর সিভিল সার্ভিসে প্রয়োজনীয় পান্ডিত্যের সাধারণ মান ছাড়িয়ে লিস্ট উঠতে পেরেছিলেন বহু প্রশ্নে। ইংরেজ মনীষীরাও ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের প্রবক্তা, কিন্তু সেটা ভিন্ন ঐতিহাসিক এবং সামাজিক-আর্থনীতিক পরিবেশে — তাঁদের থেকে ভিন্ন পথ ধরেছিলেন লিস্ট।

সরকারী চাকরি, জেল, প্রবসন

দক্ষিণ জার্মানির ভ্যুর্টেমবের্গের রেইট্‌লিঙ্গেন শহরে ফ্রিডরিখ লিস্টের জন্ম হয় ১৭৮৯ সালে। তাঁর বাবা ছিলেন ধনী কারিগর — চামড়া পাকা করার কারিগর। পরিবারটি শহরের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল না, তবে সেটার পুরুষানুক্রমিক সম্মানের স্থান ছিল মধ্য বর্গে। লিস্টের পড়াশুনো শেষ হয়ে গিয়েছিল পনর বছর বয়সে, তারপর তিনি দু'বছর ধরে বাবাকে সাহায্য করেন তাঁর কর্মশালায়। সেখানে শিক্ষানবিসরা বলতে শুরু করে — ও কুঁড়ে, শুধু স্বপ্ন দেখে। তখন পারিবারিক সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁকে কেরানিগিরির শিক্ষানবিসি ধরানো হয়। তরুণ লিস্টের খুব উন্নতি হয় এই কাজে — তিনি সরকারী চাকরির মই বেয়ে উঠতে থাকেন ভ্যুর্টেমবের্গ রাজ্যে, সেটা ফরাসী সাম্রাজ্যের অধীন ছিল ১৮১৪ সাল অবধি। দশ বছরের চাকরিতে তিনি অনেক রকম পদে কাজ করেন: আঠার মাস আইন অধ্যয়ন করেন টিউবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে; ভ্যুর্টেমবের্গের রাজধানী স্টুটগার্টে রেখুংস্রাট্-এর পদে তাঁর সরকারী চাকরির জীবন শেষ হয়। উদারপন্থী মন্ত্রী ভাঙ্গেনহেইমের সুপারিশের কল্যাণে তিনি তিউবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাষ্ট্র প্রশাসনকার্যে'র অধ্যাপক হন।

চমৎকার উন্নতি! ২৮ বছর বয়সে লিস্ট এমন উঁচু পদ পেলেন, এটা আপতিক নয়। ততদিনে তিনি সুযোগ্য নির্বাহক হিসেবেই শুধু নয়, বিশিষ্ট উদারপন্থী প্রবন্ধকার হিসেবেও সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। ফরাসী বিপ্লব এবং জার্মান মুক্তি-আন্দোলনের আদর্শ অনুসারে তিনি মানুষ হন, তাই তিনি হয়ে ওঠেন আমূল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কারের দৃঢ় সমর্থক।

তাঁর রাজনীতিক উদ্দীপনা, চিন্তার বলিষ্ঠতা আর স্বচ্ছতা, ঝলমলে

ভাষা আর প্রখর ব্যঙ্গ — তাঁর পাকা লেখার এই সমস্ত বিশেষক উপাদান দেখা যায় তাঁর গোড়ার দিককার প্রবন্ধগুলিতে। স্বভাবতই তিনি ছিলেন সূক্ষ্মবুদ্ধি, অকপট, অসাধারণ উদ্যমী, প্রত্যয়ী এবং মঙ্গলবাদী। ভ্যুর্টেমবের্গে রাজনীতিক সংগ্রাম না ছেড়েই, আর লেখা এবং পেশার কাজ চালাবার মধ্যেই লিস্ট একটা নতুন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন ১৮১৯ সালে — এবার দেশজোড়া পরিসরে। বণিক আর শিল্পপতিদের একটা সমিতি তিনি স্থাপন করেন; জার্মানির আর্থনীতিক অখন্ডতার জন্যে, আরও নির্দিষ্ট করে বললে, অন্তঃশুল্ক লোপের জন্যে লড়াইটা ছিল এই সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য।

কিন্তু ঐ বছরই তাঁর মাথার উপর ঘনিয়ে আসে বিপদের মেঘ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপকেরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটেন, — 'বিপজ্জনক রাজনীতিক ঝোঁকে'র মানুষ বলে তাঁর নামে অভিযোগ করা হয় কর্তৃপক্ষের কাছে। ভাঙ্গেনহেইম লিস্টকে আর রক্ষা করতে পারলেন না: তিনি তখন অবসর নিয়েছেন, আর ভ্যুর্টেমবের্গে তখন প্রতিক্রিয়াশীল মহলগুলো ক্ষমতাসীন। উল্লিখিত সমিতির কাজকর্মের জন্যে লিস্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল: রাষ্ট্রের কর্মচারী হিসেবে তাঁর এ বিষয়ে আগে আলোচনা করা উচিত ছিল উপরওয়ালাদের সঙ্গে। তার জবাবে লিস্ট আত্মাভিমান এবং আত্মমর্যাদার সঙ্গে জানিয়ে দেন তিনি পদত্যাগ করবেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। রেইট্‌লিঙ্গেনের নাগরিকেরা ইতোমধ্যে তাঁকে নির্বাচিত করেছিল নতুন ভ্যুর্টেমবের্গ পার্লামেন্টের নিম্নতর চেম্বারে। এই নির্বাচনটাকে সরকার বাতিল করিয়ে দিয়েছিল, তাতে যুক্তিটা ছিল এই যে, যিনি নির্বাচিত হন তাঁর বয়স তিরিশের কম, সংবিধানে বয়স-সংক্রান্ত শর্তের সঙ্গে সেটা মেলে না। কিন্তু লিস্ট আবার নির্বাচিত হন ছ'মাস পরে!

তাঁর পার্লামেন্টারী ক্রিয়াকলাপ ছিল সংক্ষিপ্ত এবং উত্তেজনাপূর্ণ। নির্বাচিত হবার স্বল্পকাল পরেই তিনি চেম্বারে পেশ করেন রেইট্‌লিঙ্গেনের নাগরিকদের একখানা আবেদনপত্র, লিস্টই সেটার মুসাবিদা করেন, তাতে উত্থাপন করা হয় বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংস্কারের একটা কর্মসূচি। বিদ্রোহীর সংগ্রামী ভাষায় লেখা এই দলিলখানার দরুন তিনি রাজরোষভাজন হন। তাঁকে 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উসকানি'র দায়ে অভিযুক্ত করা হয়, ডেপুটি হিসেবে তাঁর ম্যান্ডেট বাতিল হয়, আর তাঁর উপর কারাদন্ডাদেশ হয় দশ মাসের জন্যে। গ্রেপ্তার হবার আগেই তিনি পালিয়ে দেশ ছেড়ে যান;

প্রতিবেশী পশ্চিম-ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে ঘুরে-ঘুরে তাঁর কাটে দু'বছরের বেশি।

তারপর তিনি রাজক্ষমা পাবার আশায় ভ্যুর্টেমবের্গে ফেরেন, কিন্তু তাঁকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হয়। এই প্রবল রাজনীতিক বিরুদ্ধবাদীর হাত থেকে রেহাই পাওয়াটাকেই সরকার শ্রেয় মনে করে — তখন তিনি সারা জার্মানিতে সুবিদিত। আমেরিকায় প্রবসিত হতে রাজি হয়ে লিস্ট মেয়াদ শেষ হবার আগেই ছাড়া পান। স্ত্রী আর ছেলেপিলেদের নিয়ে লিস্ট নিউ ইয়র্কে পৌঁছন ১৮২৫ সালের জুন মাসে। প্রথমে তিনি ধরেছিলেন কৃষিকাজ, তারপর একটা জার্মান পত্রিকার সম্পাদক, আর শেষে শিল্পোদ্যোগী। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় থাকেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে একটা আর্থনীতিক কর্মসূচি রচনা করেন — সেটার ভিত্তি ছিল সংরক্ষণ নীতি। তিনি মনে করতেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর জার্মানির অবস্থা ছিল অনুরূপ: শিল্পোন্নয়ন ক্ষেত্রে উভয় দেশের সামনে পড়েছিল ইংলন্ডের প্রতিযোগিতা।

১৮৩২ সালে লিস্ট ইউরোপে যান মার্কিন নাগরিক হিসেবে; তিনি হন লাইপজিগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কন্সাল। সেটা ছিল সারা পশ্চিম ইউরোপে রেলপথ নির্মাণের হিড়িকের কালপর্যায়। লিস্ট দীর্ঘকাল ছিলেন এই নতুন উদ্যোগের সোৎসাহ সমর্থক; এটাকে তিনি মনে করতেন আর্থনীতিক অগ্রগতির খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা উপায় এবং — শুধু তাই নয় — যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটা গ্যারান্টি। লাইপজিগ থেকে ড্রেসডেন অবধি রেলপথ নির্মাণের জন্যে তিনি একটা জয়েন্ট-স্টক কম্পানি সংগঠিত করেন; এটা ছিল জার্মানিতে সর্বপ্রথম রেলপথগুলোর একটা। নানা রাজনীতিক চক্রান্ত এবং আর্থিক কান্ডকারখানায় জড়িয়ে প'ড়ে লিস্ট গ্রিউন্ডের-এর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে মোহভঙ্গ হয়ে প্যারিসে চলে যান ১৮৩৭ সালে। প্রসঙ্গত বলি, রেলপথের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর আস্থা বজায় ছিল জীবনের শেষ দিনটা অবধি।

'জাতীয় ব্যবস্থা'। লিস্টের শেষ বয়স

লিস্ট তিন বছর ছিলেন প্যারিসে — এটা তাঁর তৃতীয় এবং শেষ প্রবসন। স্বভাবসিদ্ধ আবেগ আর উদ্যমের সঙ্গে তিনি অর্থশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনো করতে লাগেন এবং নিজের পূর্ণ-বিকশিত অভিমত বিবৃত করতে শুরু করেন। তাঁর এইসব খাটা-খাটনির ফল হল প্রথমে 'Das natürliche System der politischen Ökonomie' ('অর্থশাস্ত্রের স্বাভাবিক ব্যবস্থা')* নামে প্রকান্ড পান্ডুলিপি — এটা তিনি লিখেছিলেন ফরাসী আকাদমির আয়োজিত একটা প্রতিযোগিতার জন্যে; আর তারপর আসে ১৮৪১ সালের গোড়ার দিকে অগসবুর্গে প্রকাশিত তাঁর প্রধান রচনা — 'Das nationale System der politischen Ökonomie' ('অর্থশাস্ত্রের জাতীয় ব্যবস্থা')।

এই বইখানাকে লিস্ট ধরেছিলেন একটা প্রকান্ড রচনার প্রথম খন্ড হিসেবে — এই বৃহত্তর রচনায় থাকত অর্থশাস্ত্রের সমস্ত প্রশ্ন। তাই এটার উপশিরনাম হল — 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বাণিজ্যিক কর্মনীতি এবং জার্মানির শুল্ক সম্মিলনী চুক্তি'। কিন্তু তাঁর জাঁকাল পরিকল্পনা অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল; অর্থনীতি-বিজ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকাটা প্রধানত এই বইখানাকেই অবলম্বন ক'রে। 'জাতীয় ব্যবস্থা' বইখানা বেশ সাফল্যলাভ করে; অল্প সময় পরে-পরে প্রকাশিত হয় আরও দুটো সংস্করণ। জার্মানির আর্থনীতিক উন্নয়ন এবং বাণিজ্যিক কর্মনীতি নিয়ে গরম-গরম আলোচনায় এটা এসেছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়; জার্মান আর্থনীতিক চিন্তাধারার উপর বইখানার বিস্তর প্রভাব পড়ে।

লিস্ট গড়ে তোলেন তাঁর এই প্রিয় ধারণাটা: জার্মানির সমৃদ্ধ আর সম্মিলিত হবার পথটা গেছে শিল্প প্রসারের ভিতর দিয়ে, আর চড়া আমদানি শুল্ক এবং বাণিজ্যিক কর্মনীতির অন্যান্য হাতিয়ারের সাহায্যে প্রবল বৈদেশিক প্রতিযোগিতা থেকে জার্মান শিল্পের সংরক্ষণ চাই। ধারণাটা সবচেয়ে বেশি উপযোগী ছিল পশ্চিম আর দক্ষিণ জার্মানির শিল্পক্ষেত্রের বাড়ন্ত বুর্জোয়াদের পক্ষে। লিস্টের বইখানা সমাদৃত হয়েছিল গণতান্ত্রিক

* এটা প্রকাশিত হয় বিশ শতকের তৃতীয় দশকে।

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও। রাজতান্ত্রিকতা সত্ত্বেও, অভিজাতদের উদ্দেশে লিস্টের প্রণতি সত্ত্বেও প্রগতিশীল বুর্জোয়া সংস্কারই ছিল বইখানার মূলভাব। তাঁর প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি ছিল সাবধানী এবং আপসের ব্যাপার, কিন্তু উনিশ শতকের পঞ্চম দশকে জার্মানির বদ্ধ আবহাওয়ায় এইসব ভাব-ধারণা শুনতে ছিল প্রায় বৈপ্লবিক ধাঁচের।

বইখানা সেটার শত্রুদেরও চিহ্নিত করে নির্ভুলভাবে। লিস্টের ধ্যান-ধারণা আঘাত করেছিল প্রুশীয় যুঙ্কারদের সংকীর্ণ স্বার্থে, — তারা শস্য রপ্তানি করত ইংলন্ডে, তাই সেটা অবাধে করতে পারার বিনিময়ে তারা ইংলন্ডের শিল্পজাত দ্রব্য বিনা শুল্কে জার্মানিতে আমদানি হওয়ায় রাজি ছিল সাগ্রহে। উত্তর জার্মানির শহরগুলির সাবেক বর্গের ব্যাপারী বুর্জোয়াদেরও স্বার্থ ছিল 'অবাধ বাণিজ্যে'। লিস্টের জীবনের শেষ বছরগুলিতে এইসব মহল তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা মানহানি আর অনামী পত্রে হুমকি দেবার অভিযান চালিয়েছিল। তাছাড়া, লিস্টের বেশকিছু শত্রু দেখা দিয়েছিল রেলপথ নির্মাণে তাঁর ক্রিয়াকলাপের ফলে এবং তাঁর শানানো প্রচারমূলক লেখাগুলির দরুন, এইসব লেখায় তিনি খোঁচা মারতেন ভূস্বামীদের, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের, যাজকমন্ডলীকে, কখনও-কখনও কর্তৃপক্ষকেও। তাঁর তরুণ বয়সের 'পাপ'গুলোও বিস্মৃত হয়ে যায় না।

জার্মানিতে ফিরে লিস্ট থাকতেন প্রধানত অগসবুর্গে ; সাংবাদিকতা আর গবেষণার কাজ করতেন। এই সময়েই তিনি লেখেন সেইসব রচনা যেগুলির জন্যে পরে তাঁকে বৃহৎ-শক্তিদম্ভী শোভিনিস্ট এবং জার্মান সাম্রাজ্যবাদের অগ্রদূত বলে প্রতিপন্ন করা হয়। লিস্ট মনে করতেন জনসংখ্যাধিক্যের কারণে জার্মানির উপনিবেশন আবশ্যক দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের (হাঙ্গেরি যুগোস্লাভিয়া রুমানিয়া আর স্লোভাকিয়ার এখনকার রাজ্যক্ষেত্র)* 'খালি' ভূভাগগুলিতে। তিনি লিখেছিলেন, জার্মান মহাজাতির অবলম্বন, বিশেষত সামরিক অবলম্বন হওয়া চাই স্বাধীন মাঝারি কৃষকেরা।

এইসব ভাব-ধারণার সূত্রে লিস্ট এমনকি ইংলন্ড সম্বন্ধে মনোভাব পরিবর্তন করেছিলেন — যে-ইংলন্ডকে তিনি বরাবর মনে করতেন জার্মানির অখন্ডতা আর শিল্পোন্নয়নের প্রধান পরিপন্থী। পরে তিনি মনে করতেন,

---

* ঐ সময়ে এইসব রাজ্যক্ষেত্রের একাংশ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির এবং অন্য অংশ তুরস্কের শাসনাধীন ছিল।

ইউরোপের মূলভূমিতে পরাক্রমশালী প্রতিবেশী ফ্রান্স আর রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানিকে সমর্থন করতে পারে ইংলন্ড। এমন মিলজুলের ভিত্তি আছে কিনা সেটা ইংরেজ রাজনীতিকদের সঙ্গে আলাপ করে বুঝবার জন্যেই তিনি ইংলন্ডে গিয়েছিলেন ১৮৪৬ সালে। একেবারেই বিফল হয়েছিল তাঁর এই যাত্রাটা।

লিস্টের স্বাস্থ্য বরাবর বেশ ভাল ছিল, কিন্তু ইতোমধ্যে তাতে গড়বড় দেখা দিতে থাকে। পরিবার প্রতিপালনের আর্থিক সংগতিও অকুলন হয়ে ওঠে। তিনি অবিরাম লড়াই চালাতেন, অক্লান্ত ক্রিয়াকলাপে অভ্যস্ত ছিলেন— তেমনটা করার মতো শক্তি আর রইল না। বিশ্রামের জন্যে এবং নানা চিন্তা-ভাবনা অশান্তি আর হতাশা থেকে মনটাকে একটু সরিয়ে নেবার জন্যে তিনি ইতালি যাবার জন্যে রওনা হন ১৮৪৬ সালের শরৎকালে। কিন্তু পৌঁছলেন না সেখানে। টিরোল অঞ্চলে কুফস্টেইন নামে ছোট শহরে নিজেই মাথায় গুলি চালিয়ে দেন ফ্রিডরিখ লিস্ট।

জাতির শিল্প-শিক্ষা

অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে লিস্ট ছিলেন ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের সমালোচক — তাঁর দৃষ্টিতে এই সম্প্রদায়ের মূর্ত প্রতীক হলেন অ্যাডাম স্মিথ। কিন্তু ক্ল্যাসিকাল মতবাদের যা ভিত্তি সেই মূল্য আর আয়-সংক্রান্ত তত্ত্বটা তাঁর সমালোচনার মধ্যে আসে নি প্রকৃতপক্ষে। আর্থনীতিক তত্ত্বের এইসব ক্ষেত্রে লিস্টের বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না। তাঁর সমস্ত আগ্রহ নিবদ্ধ ছিল আর্থনীতিক কর্মনীতি-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিতে, সর্বোপরি বহির্বাণিজ্য কর্মনীতি-সংক্রান্ত প্রশ্নে।

মোটের উপর, স্মিথ এবং তাঁর অনুগামীদের সমালোচক হিসেবে লিস্ট বিশেষ কোন দাগ কাটতে পারেন নি। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের সাধারণ নিয়মাবলি তুলে ধরে বিচার-বিশ্লেষণ করার ব্যাপারটা তাঁর দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে মোটের উপর বাদ গেছে। এইসব নিয়মের সন্ধান এবং বুর্জোয়া সমাজের শ্রেণীগত গঠনের বিশ্লেষণ হল স্মিথ-রিকার্ডো সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব। লিস্ট কিন্তু এটা লক্ষ্য না করে থেকে গেছেন ব্যাপারগুলোর উপরিভাগে। তবে পুঁজিতান্ত্রিক উন্নয়নের পরিবেশ আর প্রয়োজন পূর্বসূরি মনীষীরা যেভাবে প্রকাশ করেন সেটা থেকে পৃথকভাবে নিজ অভিমতে

প্রকাশ ক'রে লিস্ট কতকগুলো প্রশ্ন বিচার করেন নতুন ধরনে — এটা ফলপ্রদ হয় কিছু পরিমাণে।

অর্থশাস্ত্রের স্মিথীয় তন্ত্রটাকে লিস্ট বলেন কস্‌মোপলিটান। তিনি দোষারোপ করে বলেন, পৃথক-পৃথক দেশে আর্থনীতিক উন্নয়নের জাতীয় বিশেষত্বগুলিকে এই তন্ত্রে তুচ্ছ করা হয়, আর গোঁড়ামির বশবর্তী হয়ে সমস্ত দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় অভিন্ন একক 'স্বাভাবিক' নিয়মাবলি এবং আর্থনীতিক কর্মনীতির একক বিধি-ব্যবস্থা। তিনি লেখেন: 'আমার প্রস্তাবিত তন্ত্রের বিশেষক প্রভেদ হিসেবে আমি বলতে চাই সেটা হল জাতিসত্তা। ব্যক্তি আর বিশ্বজনের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে জাতিসত্তার স্বধর্মের ভিত্তিতে গড়া হয়েছে আমার গোটা সৌধটা।'*

লিস্ট বলেন, বিভিন্ন জাতি রয়েছে উন্নয়নের বিভিন্ন পর্বে। জাতিগুলির মধ্যে বাণিজ্যের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকলে, বিনিময়-মূল্যের দিক থেকে অর্থাৎ শ্রমব্যয়ের দিক থেকে দেখলে সমগ্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতির একটাকিছু বিমূর্ত উপকার হতে পারে, কিন্তু অনগ্রসর দেশগুলির উৎপাদন-শক্তির বিকাশ তাতে ব্যাহত হয়। নিজ ধারণাটাকে তিনি কখনও-কখনও স্মিথের 'বিনিময়-মূল্য তত্ত্ব' থেকে উলটো করে বলতেন উৎপাদন-শক্তি তত্ত্ব। এখানে মনে রাখা দরকার, উৎপাদন-শক্তি অভিধাটার যে-অর্থ মার্কস দেন পরে তার থেকে ভিন্ন কিছু বলে সেটাকে বুঝতেন লিস্ট। লিস্টের দৃষ্টিতে উৎপাদন-শক্তি হল স্রেফ যা না হলে 'জাতির সম্পদ' হতে পারে না সেইসব সামাজিক পরিবেশের সমগ্র সাকল্য।

অব্যবহৃত সম্বল-সংগতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে লাগাবার জন্যে এবং অনগ্রসরতা অতিক্রম করার জন্যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে যেসব শাখায় শ্রমের উৎপাদনশীলতা বিদেশের চেয়ে কম সেগুলির উন্নয়ন চলতে পারে, সেটা এমনকি অত্যাবশ্যক। লিস্ট লিখলেন: 'কাজেই এইসব মূল্যহানিকে দেখতে হবে শুধু 'জাতির শিল্প-শিক্ষার খরচ হিসেবে'।'** লিস্টের মতবাদ শিল্পোন্নয়ন দিয়ে শুরু, আর তাতেই সেটার শেষ। তিনি লিখেছেন, কোন জাতি শুধু কৃষিকাজেই ব্যাপৃত থাকলে সেটা যেন এমন একটা লোক যার

---

* Friedrich List, 'Schriften. Reden. Briefe', Bd. VI, Berlin, 1930, S. 34.

** ঐ, উল্লিখিত রচনা, ৩৪ পৃঃ।

হাত আছে শুধু একখানা। তিনি বলেন, শিল্পের প্রসার ঠেলে বাড়ান চাই 'শিক্ষাপ্রদ' সংরক্ষণ নীতির সাহায্যে: এটা হল জাতীয় শিল্প নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বিদেশীদের সঙ্গে 'সমকক্ষ হয়ে' প্রতিযোগিতা চালাতে পারা অবধি এই শিল্পকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করার জন্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। অবাধ বাণিজ্য চালু করার ব্যাপারটাকে তিনি ঠেলে দেন বেশ সুদূর ভবিষ্যতের মাঝে, যখন সমস্ত প্রধান জাতিগুলি এসে যাবে উন্নয়নের মোটামুটি একই মাত্রায়।

বর্তমান পরিস্থিতি এবং আধুনিক অভিমতের কথা বিবেচনায় থাকলে লিস্টের দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত উক্তিটি খুবই আগ্রহজনক: 'একটা নিয়ম হিসেবেই এটা ধরে নেওয়া যায় যে, কোন জাতি যত বেশি শিল্পজাতদ্রব্য রপ্তানি করে, আমদানি করে যত বেশি কাঁচামাল, আর গ্রীষ্মমণ্ডলের উৎপাদ ব্যবহার করে যত বেশি, ততই বেশি ধনী এবং পরাক্রমশালী সেই জাতি।'* কথাটা জাপানের প্রসঙ্গে আগ্রহজনক; এই দেশটির রয়েছে ঠিক এই ধরনের বহির্বাণিজ্য, আর দ্রুত আর্থনীতিক প্রসারের ফলে দেশটি পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে দ্বিতীয় শিল্পোন্নত শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যেকোন আর্থনীতিক সিদ্ধান্তকে, যেমন উৎপাদনের একটা নতুন শাখা খোলা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তকে দেখা চাই সাক্ষাৎ ফলপ্রদতার (এটা সাধারণত লাভজনকতার সমতুল) বিবেচনা থেকেই শুধু নয়, সেটার দীর্ঘমেয়াদী এবং পরোক্ষ ফলাফলের বিবেচনা থেকেও বটে — এই মর্মে লিস্টের ধারণাটা পরে আসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। এমনসব পরিস্থিতি খুবই সুপরিচিত অর্থনীতিবিদদের কাছে, আর শুধু তাঁদের কাছেই নয়। যেমন, কোন একটা জায়গায় একটা নতুন কারখানা নির্মাণ করা হলে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনের লাভজনকতার হিসাব করার সময়ে যা সরাসরি বিবেচনায় ধরা হয় নি এমন কোন-কোন গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত আর্থনীতিক বিবেচ্য বিষয় দেখা দিতে পারে: জনসমষ্টির কর্মস্থল আর বাসস্থানের অবস্থার উন্নতি, জায়গাটায় শ্রমিকদের গড় যোগ্যতা বাড়ান, আগে যা ব্যবহার করা যায় নি সেইসব প্রাকৃতিক সম্পদ আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এনে ফেলা, ইত্যাদি।

বিশেষজ্ঞদের হিসাবে দেখান হয়েছিল ভারতের নিজস্ব জাহাজ-নির্মাণ

---

* ঐ, ৫৪ পৃঃ।

শিল্প আর বাণিজ্য-নাবী না গড়ে ভাড়া-করা পরদেশী জাহাজে বহির্বাণিজ্যের মাল চলাচল করানোই দেশটির পক্ষে বেশি লাভজনক। কিন্তু বহু গুরুত্বপূর্ণ আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক বিবেচনা অনুসারে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত হয় যে, দীর্ঘমেয়াদী পরিস্থিতি বিবেচনায় থাকলে নিজস্ব বাণিজ্য-নাবী গড়াই দেশটির পক্ষে লাভজনক এবং অবশ্যকরণীয়।

স্বভাবতই, যা অনির্দিষ্ট কিংবা যেটার উপযোগ সুদূরের ব্যাপার এমন ব্যবস্থা বলবৎ করার ফলে অর্থনীতিক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসর্বস্বতা দেখা দিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিছক মর্যাদা কিংবা সংকীর্ণ বিবেচনা অনুসারে স্পষ্টতই বেহিসাবী প্রতিষ্ঠান গড়া হতে পারে তার দরুন। দেশজোড়া পরিসরে দেখলে, 'লিস্টের মূলসূত্রে'র অপব্যবহার হলে আসে দেশের আর্থনীতিক বিচ্ছিন্নতা, তাতে আর্থনীতিক বিচারে অসমর্থনীয় এবং মূলত অলাভজনক স্বয়ম্ভরতা আসে, শ্রমবিভাগ আর উৎপাদনে বিশেষীকরণের সুবিধাগুলো বর্জন করা হয়।

কোন একটা আর্থনীতিক সিদ্ধান্ত থেকে আসে আর্থনীতিক আর সামাজিক ধরনের যেসব পরোক্ষ সুবিধা সেগুলোকে 'আপাত সাশ্রয়' (external economies) বলা হয় মার্শালের আমল থেকে। কোন একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পরোক্ষ লোকসানও হয় কখনও-কখনও — এই বিপরীত ক্রিয়াফলটাকে বলা হয় 'আপাত অসাশ্রয়' (external diseconomies)। লর্ড রবিন্স তাঁর 'অর্থনীতি চিন্তনের ইতিহাসে আর্থনীতিক উন্নয়ন তত্ত্ব' নামে প্রামাণিক রচনায় বলেছেন, এইরকমের ক্রিয়াফল '...মার্শালের অনেক আগেই ছিল উৎপাদন-শক্তি উন্নয়ন প্রসঙ্গে লিস্টের বিভিন্ন প্রবন্ধের কেন্দ্রবিন্দু। লিস্ট ছিলেন দুর্দান্ত, ট্র্যাজিক চরিত্র, তাঁর ছিল হরেক রকমের উচ্ছ্বসিত বদ্ধধারণা এবং উদ্ভট অতিরঞ্জনের প্রবণতা; বুদ্ধিবৃত্তিক্ষেত্রে প্রতিপক্ষীয়দের, বিশেষত অ্যাডাম স্মিথ সম্বন্ধে তিনি যে-অপব্যাখ্যা দেন সেটা অযথাযথতার দরুন প্রায় কমিক। তবে অসার তর্জন-গর্জনগুলো বাদ দিলে, কোন-কোন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে কোন-কোন শিল্পের উন্নতি ঘটান হলে উৎপাদন-সম্ভাব্যতার এমন বৃদ্ধি সেটার মধ্যে থাকতে পারে যার পরিমাপ স্রেফ পৃথক-পৃথক উৎপাদের মূল্য কিংবা পুঁজি-মূল্যের বৃদ্ধি দিয়ে করা যায় না, এই মর্মে তাঁর বক্তব্যটায় যাথার্থ্যের একটা সার-ভাগ থেকে যায় নিশ্চয়ই। আমার বিবেচনায়, তাঁর অতিরঞ্জন আর অপব্যাখ্যাগুলোর প্রভাবে বিস্তর ক্ষতি হয়েছে, বিশেষত যে-পরিমাণে সেটা

ইউরোপে সংকীর্ণ আর্থনীতিক জাতীয়তাবাদবৃদ্ধির আনুকূল্য করেছে। কিন্তু সেটা তাঁর মূল বক্তব্যের কিছু পরিমাণ বৈশ্লেষিক সারবত্তা অস্বীকার করার কারণ হতে পারে না।'*

খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা হল লিস্টের তত্ত্ব। প্রশ্নটা এই: ইতিহাস আর অর্থনীতির কারণে যেসব দেশ 'বিশ্ব-সমাজে' পিছনের সারিতে পড়ে গেছে সেগুলির আর্থনীতিক অনগ্রসরতা ঘোচানো যায় কেমন করে পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামের ভিতরে। আরও অনেক আর্থনীতিক ধারণার মতো এটাও ব্যবহৃত হতে পারত এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল আর প্রগতিশীল উভয় উদ্দেশ্যে। আজকাল উন্নয়নশীল দেশগুলিতে লিস্ট সম্বন্ধে আগ্রহ আবার দেখা দিয়েছে, — বিশ্ব-বাজারে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির একচেটেগুলোর আধিপত্যের পরিস্থিতিতে জাতীয় শিল্পোন্নয়নের কাজ পড়েছে এইসব দেশের সামনে।

লিস্টের মৌলিকতা আর বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব এই নয় যে, তিনি আর্থনীতিক তত্ত্বের বিকাশ ঘটান; সেটা এই যে, তিনি সযত্নে বিস্তারিত করে তোলেন একক আর্থনীতিক-রাজনীতিক প্রশ্ন — কম-উন্নত দেশগুলিতে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের বাধা-বিঘ্ন আর কারক উপাদানগুলি।

সংরক্ষণ নীতি এবং অবাধ বাণিজ্য

পুঁজি সেটার স্বধর্ম অনুসারেই কস্‌মোপলিটান। কিন্তু এই উপাদানটা সক্রিয় থাকে উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সমন্বয়ের মাঝে, — উগ্র জাতীয়তাবাদও পুঁজিতে নিহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে। যেমন গ্যোটে বলেছেন, 'আঃ, দুটো সত্তা বাসা বেঁধেছে আমার বুকের মধ্যে!' পুঁজিতন্ত্রের সমগ্র বিকাশের নিত্যসহচর এই সমন্বয় আর দ্বন্দ্ব। আধুনিক পরিবেশেও সে-দুটো সক্রিয়। পুঁজির প্রথম প্রবণতাটাকে খুবই জোরের সঙ্গে তুলে ধরেন পূর্বসূরি মনীষীরা, আর লিস্ট তুলে ধরেছেন দ্বিতীয়টাকে, তাতেও জোর কিছু কম নয়।

---

* L. Robbins, 'The Theory of Economic Development in the History of Economic Thought', London, 1968, p. 116. অর্থনীতিবিদ্যাক্ষেত্রে তাঁর কেইন্সের মতো লায়নেল রবিন্সকেও পিয়ার করা হয়েছিল অবদানের জন্যে।

কার্ল মার্কস তাঁর 'অর্থশাস্ত্র পর্যালোচনা নিবন্ধ'-র ভূমিকায় বলেছেন তিনি ১৮৪২ থেকে ১৮৪৩ সালে 'Rheinische Zeitung'-এর সম্পাদক থাকার সময়ে কী অবস্থায় তাঁকে আর্থনীতিক প্রশ্নাবলি নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত হতে হয়েছিল। যেসব ঘটনা প্রথমে তাঁকে অর্থনীতি বিষয়ে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করিয়েছিল সেগুলির মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন অবাধ বাণিজ্য আর সংরক্ষণ নীতি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক।* নিঃসন্দেহে বলা যায়, তরুণ মার্কসের এইসব অধ্যয়ন সংশ্লিষ্ট ছিল ১৮৪১ সালে প্রকাশিত লিস্টের বইখানা পড়ার সঙ্গে — এই বইখানার লেখক তখন ছিলেন বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনার একেবারে কেন্দ্রস্থলে।

পরে মার্কস এবং এঙ্গেলসকে তাঁদের কার্যক্ষেত্রে এবং লেখার কাজে অবাধ বাণিজ্য আর সংরক্ষণ নীতি বিষয়ে আলোচনা করতে হয়েছিল বারবার। সেটা করতে গিয়ে তাঁরা লিস্টের ভাব-ধারণারও বিচার-বিশ্লেষণ করেন। তত্ত্ববিদ হিসেবে লিস্টকে তাঁরা তেমন কদর করতেন না, তাঁর মতবাদের বুর্জোয়া-সাফাইদারী মর্মটার তাঁরা সমালোচনা করতেন, তবু মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতাদ্বয় মনে করতেন লিস্ট ছিলেন তখনকার দিনের সবচেয়ে বিশিষ্ট জার্মান অর্থনীতিবিদ।

বুর্জোয়া শ্রেণীর ভিতরে এবং পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির বুর্জোয়াদের মধ্যে লড়ালড়িটা প্রকাশ পায় অবাধ বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনায়। বাণিজ্যের স্বাধীনতা আর সংরক্ষণ নীতি হল শ্রেণীগত কর্মনীতির দুটো আকার ছাড়া কিছু নয় — দুটোরই একই লক্ষ্য হল মেহনতী মানুষের উপর শোষণ চালিয়ে পুঁজিপতিদের লাভ বাড়ানো। কিন্তু তার থেকে এমনটা বোঝায় না যে, প্রলেতারিয়েত আর তাদের পার্টিগুলি প্রশ্নটাকে তুচ্ছ করে ছেড়ে রাখতে পারে শুধু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ আর রাজনীতিকদের হাতে। দেশে-দেশে শিল্পোন্নয়ন হবে কেমন হারে এবং কোন আকারে সেটা বিভিন্ন দেশে শ্রমিক শ্রেণীর গরজের বিষয়। আর শিল্পোন্নয়ন তো অনেকাংশে নির্ভর করে বাণিজ্যিক কর্মনীতির উপর।

অবাধ বাণিজ্যের কোন কর্মনীতি যে-পরিমাণে পৃথিবীজোড়া পরিসরে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশে, উৎপাদন-শক্তির প্রসারে আনুকূল্য করত সেই পরিমাণে

---

* Karl Marx, 'A Contribution to the Critique of Political Economy', London, 1971, p. 20.

সেটা প্রগতিশীল ছিল শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে। সর্বোপরি সেটা কোন-কোন পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণীর বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সহায়ক হতে পারত। কিন্তু সবকিছু বিবেচনা করে দেখলে, পুঁজিতন্ত্রের ত্বরিত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় সেটার দ্বন্দ্ব-অসংগতিগুলো, উৎপাদন-শক্তি আর উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্বটা ওঠে উচ্চতর মাত্রায়, আর তার ফলে একটা ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিতন্ত্রের পতনের পরিস্থিতি পেকে ওঠে। ১৮৪৭ সালে মার্কস বলেন: '...আমরা অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে, তার কারণ অবাধ বাণিজ্যের অবস্থায়, অতি বিস্ময়কর দ্বন্দ্ব-অসংগতি যাতে রয়েছে সেইসব আর্থনীতিক নিয়ম সক্রিয় হবে ব্যাপকতর পরিসরে, সারা পৃথিবী জুড়ে; [আমরা অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে] তার আরও কারণ এই যে, এই সমস্ত দ্বন্দ্ব-অসংগতি পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে জট পাকিয়ে যাবার ফলে সৃষ্টি হবে সেই সংগ্রাম যেটা থেকে ঘটবে প্রলেতারিয়েতের মুক্তি।*

তবে অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে দাঁড়াবার নীতিটা যেকোন পরিস্থিতিতে এবং নির্দিষ্ট যেকোন অবস্থায় প্রযোজ্য, তাতে কোন ব্যতিক্রম থাকতে পারে না, এমনটা মনে করা চলে না কিছুতেই। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জার্মানিতে অবাধ বাণিজ্য দেশটির অনগ্রসরতাই দীর্ঘস্থায়ী করত শুধু, আর সামন্ততন্ত্রের অবশেষগুলোকে জিইয়ে রাখতে মদত দিত। পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ ত্বরিত করা এবং সামন্ততান্ত্রিক রীত-রেওয়াজ অতিক্রম করার একটা উপায় হিসেবে সংরক্ষণ নীতি শ্রমিক শ্রেণীর কাজে লাগতে পারত অবশেষে। মার্কস জোর দিয়ে বলেছিলেন, লিস্ট এবং তাঁর অনুগামীরা সংরক্ষণ চাইছিলেন ক্ষুদ্রায়তনের কুটিরশিল্পের জন্যে নয়, সেটা তাঁরা চাইছিলেন বৃহদায়তনের পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পের জন্যে, যে শিল্পে কায়িক শ্রম হটিয়ে আসছিল যন্ত্র, আর আধুনিক উৎপাদন আসছিল প্যাট্রিয়ার্কাল উৎপাদনের জায়গায়। তবে এই পথের শেষে মার্কস দেখেছিলেন প্রবল জার্মান পুঁজির বিজয় নয় — সমাজ-বিপ্লব। কিছুকাল পরে অনুরূপ কারণে এঙ্গেলস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংরক্ষণপন্থী বাণিজ্যিক কর্মনীতিটাকে মূলনীতির দিক থেকে প্রগতিশীল বলে বিবেচনা করেছিলেন।

আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের 'উদারপন্থী' এবং সংরক্ষণপন্থী ধারার মূল্যায়নের

---

* Karl Marx, Friedrich Engels, 'Werke', Bd. 4, Berlin, 1969, S. 308.

জন্যে এবং GATT, বারোয়ারী বাজার এবং কেনেডি আর নিক্সন দফার আলোচনার* এই আমলে শ্রমিক শ্রেণী এবং তার পার্টিগুলির মনোভাব স্থির করার ব্যাপারে এইসব মূলসূত্র গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিহাসভিত্তিক সম্প্রদায়

জাতীয় বিশেষত্ব, জাতীয় প্রকৃতি, জাতীয় নিয়তি — এইসব এবং অনুরূপ অন্যান্য ধারণা ছিল আঠার শতকের শেষের দিকে এবং উনিশ শতকে জার্মানিতে সমগ্র সমাজ চিন্তন জুড়ে। **ইতিহাসের** চেয়ে বেশি জাতীয় হতে পারে আর কী? পূর্ববর্তী শতাব্দীর যুক্তিবাদী বিবেচনাধারায় সেটার আগে যা ছিল সেই সবকিছুকে, অর্থাৎ সামন্ততন্ত্র এবং সেটার প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদিকে মনে করা হত অজ্ঞতাপ্রসূত, সভ্যতা-ভব্যতার অভাবের ফলে উদ্ভূত অস্বাভাবিক ব্যাপার, সেই বিবেচনাধারার একরকমের প্রতিক্রিয়াও ছিল ইতিহাস সম্বন্ধে ভাবাতিশয্য।

জার্মানিতে অর্থশাস্ত্রের ইতিহাসভিত্তিক সম্প্রদায়ের উপর লিস্টের প্রবল প্রভাব পড়েছিল তিনটে দিক থেকে: ১) যেমন লিস্ট তেমনি এই 'ইতিহাসওয়ালারা' অর্থশাস্ত্রকে আর্থনীতিক উন্নয়নের সাধারণ নিয়মাবলি সংক্রান্ত বিজ্ঞান হিসেবে গণ্য না করে সেটাকে ধরতেন জাতীয় অর্থনীতি-সংক্রান্ত বিজ্ঞান হিসেবে, আর জোর দিতেন রাষ্ট্রের নিষ্পত্তিকর ভূমিকার উপর; ২) ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায় এবং সেটার অনুগামীদের সম্বন্ধে সমালোচনার মনোভাব অনুসারে তাঁরা বিশেষত ওঁদের তত্ত্বের কস্‌মোপলিটান আর বিমূর্ত প্রকৃতিটার উপর আক্রমণ চালাতেন; ৩) কোন দেশের আর্থনীতিক উন্নয়নের নির্দিষ্ট পর্বটা থেকে তাঁরা বিচার-বিবেচনা শুরু করতেন।

---

* GATT হল ১৯৪৭ সালে সম্পাদিত 'শুল্ক আর বাণিজ্য-সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি'; বহির্বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা এবং বাধা-নিষেধ দূর করাই ছিল এই চুক্তির উদ্দেশ্য। বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যে বহিঃশুল্কের পারস্পরিক হ্রাস সম্বন্ধে GATT-এর কাঠামের মধ্যে বিভিন্ন দফার আলোচনা ঐ দুজন মার্কিন রাষ্ট্রপতির নামে পরিচিত।

তবে অর্থশাস্ত্রের একটা বিশেষ ধরনের **ঐতিহাসিক প্রণালী** পয়দা করে তাঁরা লিস্টকে ছাড়িয়ে এগিয়েছিলেন; বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর জার্মানিতে অর্থনীতি-বিজ্ঞানের পরবর্তী বিকাশের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় এসেছিল এই প্রণালীটা। ইংলণ্ডে বুর্জোয়া রিকার্ডোপন্থীদের এবং ফ্রান্সে সে'-সম্প্রদায়ের বিবৃত অর্থশাস্ত্রের মূল দোষ-ত্রুটিগুলোর কথা বিবেচনায় থাকলে ইতিহাসভিত্তিক সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারণা বোঝা যায় আরও সহজে। মূল্য আর আয় সম্বন্ধে ওঁদের তত্ত্বকে মনে হতে পারে চূড়ান্ত মাত্রায় তালগোল পাকান কিংবা অর্থহীন অতিসরলীকরণ। সমাজের আর্থনীতিক উন্নয়ন একটা ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া — এই ধারণাটা ওঁরা মানেন নি। মানুষ হল হিসেবী, যুক্তিযুক্ত আত্মপরায়ণ মানুষ, সত্যিকারের অধিষ্ঠিত গুণগুলো বর্জিত মানুষ — ওঁদের এই বিমূর্ত অভিমত প্রত্যয়জনক ছিল না। এইসব অর্থনীতিবিদের, বিশেষত ইংরেজ অর্থনীতিবিদদের 'কস্‌মোপলিটানিজমে' প্রকাশ পেত বিশ্ব-বাজারে ইংলণ্ডের প্রাধান্যের ভূমিকাটা। যৌগিক মানসতা আর নীতিবোধ এবং জাতীয় এবং ঐতিহাসিক বিশেষত্বগুলি নিয়ে মূর্ত মানুষটিকে অর্থনীতি-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন 'ইতিহাসওয়ালারা'।

কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমার্ধের সামন্ততান্ত্রিক-বুর্জোয়া জার্মানিতে, প্রুশীয় প্রফেসরদের কলমে ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের সমালোচনাটা (একদিকে স্মিথ, আর অন্য দিকে সিনিয়র আর সে'-র মধ্যে তাঁরা কোন পার্থক্য ধরেন নি) হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রতিক্রিয়াশীল।

বৈজ্ঞানিক বিমূর্তন প্রণালী হল অর্থশাস্ত্রক্ষেত্রে বিচার-বিশ্লেষণের মূল প্রণালী — এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল ইতিহাসভিত্তিক সম্প্রদায়। জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনন্যসাপেক্ষ মূলসূত্র হিসেবে তুলে ধরে সমাজ বিকাশের সর্বব্যাপী বিষয়গত নিয়মগুলিকেও প্রত্যাখ্যান করে এই সম্প্রদায়। অর্থনীতি-বিজ্ঞানের পক্ষে বিশেষক বিশ্লেষণ-প্রণালীর জায়গায় তাঁরা আমদানি করেন অস্পষ্ট আর অনিশ্চিত ক্ষেত্র, যার মধ্যে পড়ে ইতিহাস, নীতিবিদ্যা, আইন, মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি, জাতিবিদ্যা।

অর্থনীতি-বিজ্ঞানের ইতিহাসে আছে নিজস্ব বিভিন্ন ধরতাই বুলি। ইতিহাসভিত্তিক সম্প্রদায়টিকে সাধারণত দেখান হয় রোশের, হিল্‌ডেব্রান্ড আর ক্লিস্‌কে নিয়ে ত্রয়ী রূপে। কিন্তু আরও গুরুত্ব দিয়ে বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যায় এটা কোন 'সম্প্রদায়ে'র ব্যাপার নয়, এই তিন জনের মধ্যে

পার্থক্য বিস্তর, এ'দের মধ্যে কোন ব্যাক্তিগত কিংবা সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল না, এ'রা ছাড়াও আরও বহু অর্থনীতিবিদ কাজ করেছিলেন ঐ একই মতধারা অনুসারে। এককথায় সাধারণত যা হয়ে থাকে — পাঠ্যপুস্তকে যেভাবে দেখান হয়, ব্যাপারটা তার চেয়ে ঢের বেশি জটিল। রোশের্ আর হিলডেব্রাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করেন বিশেষত ক্নিস্।

তবু তত্ত্ব-সংক্রান্ত প্রধান প্রশ্নগুলিতে এই তিন জন প্রফেসর ধরেন একই সাধারণ লাইন, আর তাঁরা ছিলেন সেটার সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রবক্তা। ভিলহেল্ম রোশের্ তাঁর গোড়ার দিককার (১৮৪৩ সাল) 'Ansichten der Volkswirtschaft aus dem geschichtlichen Standpunkt' ('ঐতিহাসিক প্রণালীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অর্থশাস্ত্র বিষয়ে নিবন্ধ') রচনায় ভবিষ্য ঐতিহাসিক প্রণালীর কোন-কোন মূলসূত্র বিবৃত করেন। তবে নিজ যুক্তির সঙ্গে মানানসই বহু বক্তব্য তিনি গ্রহণ করেন ক্ল্যাসিকাল এবং ফরাসী অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে। ফলটা দাঁড়ায় একটা জগাখিচুড়ি, যেটার কোন সত্যিকারের কেন্দ্রী উপাদান নেই। তাঁর পরবর্তী রচনাগুলিও ঐ একই রকমের।

মার্কসের বিবেচনায় রোশেরের রচনাগুলি হল সারগ্রাহিতা আর বুর্জোয়া সাফাইদারির মডেল: 'শেষের ধরনটা (সাফাইদারি — **আ. আ.**) হল **অধ্যাপকী ধরন**, সেটা এগোয় 'ইতিহাসক্রমে', আর বিচক্ষণ সংযমের সঙ্গে তাতে 'সবার সেরাটা' চয়ন করা হয় সমস্ত আকর থেকে, সেটা করতে গিয়ে অসংগতি থাকলে কিছু এসে-যায় না; উলটে বরং বিবেচনীয় হল সর্বব্যাপিতা। এইভাবে সমস্ত তন্ত্রকে করে ফেলা হয় অসার, সেগুলোর ধার নষ্ট করে ফেলা হয়, সেগুলিকে নির্ঝঞ্ঝাটে মিলিয়ে প্রস্তুত করা হয় জগাখিচুড়ি। সাফাইদারির উগ্রতাটাকে এতে প্রশমিত করা হয় পাণ্ডিত্য দিয়ে, তাতে অর্থনীতি-চিন্তাবীরদের অতিরঞ্জনগুলিকে প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখা হয়, সেগুলিকে ভাসতে দেওয়া হয় মাঝারি ধরনের মণ্ডের উপর স্রেফ অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিস হিসেবে। ...এমনধারা ব্যাপারে প্রফেসর **রোশের্** পারদর্শী, তিনি সবিনয়ে বলেছেন তিনি হলেন অর্থশাস্ত্রের থুসিডাইডিস।'*

রোশেরের দীর্ঘ জীবনে লেখা বইগুলি দিয়ে একটা লাইব্রেরি ভরতি

---

* কার্ল মার্কস, 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব', ৩য় ভাগ, ৫০২ পৃঃ। রোশের-এর 'জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি' নামে বইয়ের ভূমিকায় আছে বিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসকার থুসিডাইডিসের নাম উল্লেখ করে এই বড়াইয়ের উক্তিটা।

হয়ে যেতে পারে; এইসব বইয়ের মধ্যে বড়-বড় দু'খানা হল অর্থনীতি চিন্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে, তাতে বৈজ্ঞানিক যথাযথতা লক্ষণীয়। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি প্রফেসর ছিলেন লাইপজিগে, সেখানে তিনি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন কর্তৃপক্ষ এবং অধ্যাপক মহলে।

ব্রুনো হিল্‌ডেব্রাণ্ডের জীবনটার গোড়ার দিকে ছিল ঝড়-ঝাপ্টা। হেসেন-এর প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের নির্যাতনের দরুন তিনি বাধ্য হয়ে পালিয়ে যান সুইজারল্যাণ্ডে, সেখানে তিনি অধ্যাপনা করেন জুরিখ আর বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সুইজারল্যাণ্ডের প্রথম পরিসংখ্যান কৃত্যক স্থাপন করেন হিল্‌ডেব্রাণ্ড। ১৮৬১ সালে জার্মানিতে ফিরে তিনি ইয়েনায় অধ্যাপনা করেন জীবনের শেষ অবধি। ইতিহাসভিত্তিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর প্রধান যোগসূত্র হল ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Die Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft' ('আজকের এবং ভবিষ্য জাতীয় অর্থনীতি') নামে বইখানা। হিল্‌ডেব্রাণ্ড ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের সমালোচনা করেছিলেন রোশেরের চেয়ে তীব্রভাবে এবং প্রণালীবদ্ধ ধরনে, আর ঐতিহাসিক প্রণালীটাকে তিনি চালু করেছিলেন বেশি তেজীয়ান ধারায়। ইতিহাসভিত্তিক সম্প্রদায়ের পরবর্তী বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর মস্ত প্রভাব পড়েছিল।

কার্ল ক্নিসের ক্রিয়াকলাপ ছিল আলোচ্য কালপর্যায় অনেকটা ছাড়িয়ে: তাঁর কর্মকাল উনিশ শতকের সপ্তম থেকে শেষ দশক অবধি। তবে ইতিহাসভিত্তিক সম্প্রদায়ের মূলভাবের অনুযায়ী তাঁর প্রধান রচনা 'Die politische Ökonomie vom Standpunkte der geschichtlichen Methode' ('ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থশাস্ত্র') প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ সালে। ক্নিস্ হাইডেলবের্গে প্রফেসর ছিলেন তিরিশ বছরের বেশি কাল। উনিশ শতকের অষ্টম দশকে গুস্টাভ শ্মোলেরের পরিচালনায় নবীন পুরুষ-পর্যায়ের একদল জার্মান পণ্ডিত প্রতিষ্ঠা করেন যেটাকে বলা হয় নতুন ইতিহাসভিত্তিক সম্প্রদায়। বিষয়ীগত সম্প্রদায় ('নয়া-ক্ল্যাসিকালপন্থা') কিংবা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যা সংশ্লিষ্ট নয় এমন তৃতীয় পন্থা যাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের আকৃষ্ট করেন ক্নিস্ আর শ্মোলার। এ'দের বেশকিছু অনুগামী ছিল অ্যাংলো-স্যাক্সন দেশগুলিতেও। স্পষ্ট-নির্দিষ্ট আর্থনীতিক গবেষণাক্ষেত্রে বিস্তর কাজ করেন ইতিহাসভিত্তিক সম্প্রদায়ের সদস্যরা। এই কাজে তাঁরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন ঐতিহাসিক আর পরিসাংখ্যিক মালমশলা। বর্ণনাবাহুল্য, প্রয়োগবাদের বাড়াবাড়ি এবং উপর-উপর বিচার-বিবেচনার

ধরন ছিল তাঁদের দোষ। ইতিহাসভিত্তিক সম্প্রদায়টা সমস্ত রকমের সমাজতান্ত্রিক মতবাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল একেবারে শুরু থেকেই। জার্মান সাম্রাজ্যের অফিশিয়াল মতধারা হয়ে এটা হিংস্র আক্রমণ চালায় মার্কসবাদের উপর — তখন মার্কসবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল সারা জার্মানিতে।

রড্‌বের্টুস: একটা বিশেষ উদাহরণ

জেলারের কাছে কার্ল রড্‌বের্টুসের লেখা একখানা চিঠি থেকে একাংশ: 'লক্ষ্য করবেন এটাকে' (এতে তুলে-ধরা চিন্তাধারাটাকে) 'চমৎকার কাজে লাগিয়েছেন... মার্কস, যদিও আমার কৃতিত্ব স্বীকার না ক'রে।'* আর একখানা চিঠিতে রড্‌বের্টুস বলেন, উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপত্তির ব্যাখ্যা তিনি দেন মার্কসের আগে, আর সেটা তিনি দেন অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে এবং স্পষ্ট করে। চিঠি দুখানা প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৭৯ এবং ১৮৮১ সালে, অর্থাৎ রড্‌বের্টুস মারা যাবার পরে — মার্কস তখনও জীবিত।

অর্থাৎ কিনা, ইনি হলেন এমন একজন যিনি মার্কসকে বলেছেন কুম্ভিলক। শুধু তাই নয়, — মার্কস নাকি ওঁর কাছ থেকে নিয়ে নিজের বলে চালিয়েছেন তুচ্ছ কিছু নয়, একেবারে উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বটাই, যা হল মার্কসীয় আর্থনীতিক মতবাদের ভিত্তি। মার্কস মারা যাবার দু'বছর পরে, ১৮৮৫ সালে 'পুঁজি'-র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করার সময়ে ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস তার ভূমিকা লেখেন প্রধানত রড্‌বের্টুসের এবং আরও বেশি পরিমাণে তাঁর অনুগামী জার্মান ক্যাথিডার সমাজতন্ত্রীদের (Katheder Sozialisten)** আজগবি মিথ্যাকথন খণ্ডন করার বিষয়ে। এই উত্তরটা পূর্ণাঙ্গ এবং চূড়ান্ত।***

---

* কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ২ খণ্ড, ৬ পৃঃ।

** উনিশ শতকের অষ্টম-নবম দশকে প্রথম ব্যবহৃত এই কথাটা প্রয়োগ করা হত বিশ্ববিদ্যালয়ে 'চেয়ারে' অধিষ্ঠিত সেইসব বুর্জোয়া প্রফেসর সম্বন্ধে যাঁরা পৌঁছে গিয়েছিলেন 'রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রে', অর্থাৎ জবরদস্ত রাজতন্ত্রের অধীনে শ্রেণীতে-শ্রেণীতে মিলজুল আর সহযোগ।

*** মার্কসবাদের বিরুদ্ধবাদী, কিন্তু গুরুমনা পাণ্ডিতব্যক্তি শুম্পিটার এই প্রসঙ্গে বলেন: 'মার্কস রড্‌বের্টুসের ধারণা 'নিজের বলে চালিয়েছিলেন' এমন বক্তব্যটাকে এঙ্গেলস যেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন তাতে আপত্তি তোলার মতো কোন জোরাল কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না'। (J. Schumpeter, 'History of Economic Analysis', p. 506.)

(বিশেষত এঙ্গেলস প্রত্যয়জনক প্রমাণ দেন যে, অর্থনীতি বিষয়ে রড্‌বের্টুসের কোন রচনার কথা মার্কসের জানা ছিল না ১৮৫৯ সালের আগে।)

কে এই রড্‌বের্টুস?

উত্তর জার্মানির গ্রেইফস্‌ভাল্ডে তাঁর জন্ম হয় ১৮০৫ সালে, তিনি আইন অধ্যয়ন করেন হটিঙ্গেন আর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে, চাকরি করেন সিভিল সার্ভিসে। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে এবং ইউরোপ সফর করে ১৮৩৬ সালে তিনি বসবাস শুরু করেন পোমেরানিয়ায় তাঁর কেনা ইয়াগেট্‌সভ তালুকে, জীবনের শেষ অবধি তিনি সেখানে ছিলেন, তাতে প্রায় কোন ছেদ পড়ে নি। ১৮৮৩ সালে লেখা একখানা চিঠিতে এঙ্গেলস রড্‌বের্টুস সম্বন্ধে বলেন: 'একবার এই মানুষটি আর-একটু হলে উদ্বৃত্ত মূল্য আবিষ্কার করে ফেলতেন। সেটা করায় বাধা হল পোমেরানিয়ায় তাঁর তালুকটা।'* কোন ভূস্বামীকে তার নিজ শ্রেণী ভাবাদর্শ ব্যক্ত করতে হবেই, এমন কোন কথা নেই নিশ্চয়ই। তবে ভূস্বামী হবার পরে রড্‌বের্টুস দক্ষিণে সরে গিয়েছিলেন বটে, তাঁর সামাজিক মর্যাদার প্রভাব পড়েছিল তাঁর অভিমতের উপর।

১৮৪২ সালে প্রকাশিত 'Zur Erkenntniss unser Staatswirtschaftlichen Zustände' ('আমাদের রাষ্ট্রীয়-আর্থনীতিক ব্যবস্থা সংবেদ প্রসঙ্গে') নামে বইখানাতেই তিনি 'আর-একটু হলে আবিষ্কার করে ফেলতেন' উদ্বৃত্ত মূল্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ এতে তিনি লেখেন: 'শ্রমের উৎপাদনশীলতা যদি এত বেশি হয় যাতে সেটা শ্রমিকের জীবনধারণের উপকরণ ছাড়াও পয়দা করতে পারে আরও বৈষয়িক সম্পদ, তাহলে এই উদ্বৃত্তটা হয় খাজনা, অর্থাৎ এটা অন্যে আত্মসাৎ করে শ্রম না ক'রে — যদি ভূমিতে আর পুঁজিতে থাকে ব্যক্তিগত মালিকানা। অর্থাৎ কিনা, খাজনা পাবার মূলসূত্র হল ভূমিতে আর পুঁজিতে ব্যক্তিগত মালিকানা।'**

---

* 'মার্কস-এঙ্গেলস দলিলপত্র', ১ খণ্ড, ৩৩৮ পৃঃ (রুশ ভাষায়)।

** Rodbertus-Jagetzow, 'Zur Erkenntniss unser Staatswirtschaftlichen Zustände', Berlin, 1842, S. 42.

রড্‌বের্টুসকে তাঁর প্রাপ্য দিয়ে বলতে হয় — কথাটা তিনি বেশ বলেছেন। কিন্তু এর থেকে যা দেখা যাচ্ছে সেটা বড়জোর এই যে, স্মিথ আর রিকার্ডোর রচনা তিনি অধিগত করেছিলেন এবং তাঁদের কতকগুলি বিজ্ঞানসম্মত, প্রগাঢ় অভিমত আয়ত্ত করেন। সেটা করতে গিয়ে তিনি অবশ্য ইতিহাসভিত্তিক সম্প্রদায়ের প্রবক্তাদের থেকে এবং তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য জার্মান অর্থনীতিবিদদের থেকে অনেকটা পৃথক হয়ে দাঁড়ান।

রড্‌বের্টুসের রচনায় দেখা যায় ইংরেজ মনীষীদের রচনা থেকে বেছে-নেওয়া পৃথক-পৃথক ইঁট (যদিও কাজের), আর মার্কস সেখানে স্মিথ আর রিকার্ডো থেকে এগিয়ে গড়ে তুললেন প্রলেতারিয়ান অর্থশাস্ত্রের আমূল নতুন সুঠাম সৌধটি।

লাভ আর ভূমি-খাজনাকে মেহনতী মানুষের মাগনা শ্রমের ফল বলে বিবেচনা করাটা উদ্বৃত্ত মূল্য সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গড়ার শামিল নয়। ১৯ পরিচ্ছেদে দেখা যাবে রিকার্ডোপন্থী ইংরেজ সমাজতন্ত্রীরা এই প্রশ্নে রড্‌বের্টুসকে ছাড়িয়ে যান, কিন্তু গড়তে পারেন নি এমন তত্ত্ব। 'খাজনা'-কে রড্‌বের্টুস পুঁজিতন্ত্রের আমলে উদ্বৃত্ত উৎপাদের সাধারণ আকার হিসেবে ধরেন নি। শ্রমশক্তি কেনা-বেচার বিশেষ প্রকৃতিটার ব্যাখ্যা তিনি দেন নি। 'খাজনা'টাকে শোষণজনিত আয় হিসেবে ধরার ব্যাপারে তিনি বড়ই সাবধানী। শেষে, গড় লাভ-সংক্রান্ত প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটার মীমাংসা হয় মার্কসের উৎপাদন-পরিব্যয় তত্ত্বের সাহায্যে — এই প্রশ্নটা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে গিয়ে রড্‌বের্টুস প্রকৃতপক্ষে রিকার্ডো থেকে একটুও এগোন নি।

রড্‌বের্টুসকে সামনে এনে ফেলে ১৮৪৮ সালের বৈপ্লবিক ঘটনাবলি। তিনি প্রাশিয়ার পার্লামেন্টের সদস্য হন; তিনি ছিলেন 'সংস্কার পার্টির' অন্যতম সংগঠক, অল্প কিছুকালের জন্যে প্রাশিয়ার উদারপন্থী হান্‌জেমান সরকারে একজন মন্ত্রী। বিপ্লব, বিশেষত শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের উদ্ভব যাতে রোধ করা যেতে পারে এমনসব সংস্কার বের করাই ছিল রড্‌বের্টুসের ক্রিয়াকলাপের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রতিবিপ্লবের তখনকার বিজয়ের পরিস্থিতিতে তিনি বড় বেশি উদারপন্থী প্রতিপন্ন হলেন — তিনি সরে চলে গেলেন পোমেরানিয়ার তালুকে। এর পরে তিনি রাজনীতিক জীবনে সক্রিয় ভূমিকায় আর থাকেন নি, যদিও যেমনটা মার্কস বলেন সেই 'মন্ত্রীগিরির টান' তিনি বোধ করতেন মাঝে-মাঝে; একবার তিনি বিসমার্কের আস্থাভাজন হতে চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৭৫ সালে ইয়াগেট্‌সভে মারা যান রড্‌বের্টুস।

উল্লিখিত রচনা ছাড়াও রড্‌বের্টুসের ধ্যান-ধারণা বিবৃত করা হয় প্রধানত 'Sociale Briefe an von Kirchmann' ('ফন কির্খ্‌মানের কাছে সামাজিক পত্র') চারখানায়, সেগুলি একত্রে একখানা মোটা বইয়ের মতো। প্রথম চিঠি দুখানা প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সালে, তৃতীয়খানা ১৮৫১ সালে, আর শেষের খানা তিনি মারা যাবার পরে।

রড্‌বের্টুস রাজনীতিক কার্যক্ষেত্রে যাতে অপারক হন সেটাই তিনি চালিয়ে যান নিজ রচনাগুলিতে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন পুঁজিতন্ত্রের কয়েকটা নেতিবাচক দিক, বিশেষত জনসাধারণের প্রধান অংশটাকে গরিবির দশায় ফেলে রাখার ব্যাপারটা। তিনি নিজেই লিখেছিলেন, 'পুঁজিকে সেটার... আপন হাত থেকেই রক্ষা করার'* উপায় বের করাটা অত্যাবশ্যক। শ্রমের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা থেকে পয়দা-হওয়া ফলের একটা হিস্‌সা শ্রমিক শ্রেণীকে দেবার জন্যে তিনি পুঁজিপতিদের তাগিদ দিতেন। 'শ্রম এবং ভূমি আর পুঁজির মালিকানার মধ্যে একটা আপসে' পেঁছন তাহলে সম্ভব হয়। পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে এখন কাজ চলে যে তথাকথিত আয় কর্মনীতি অনুসারে সেই মতের পূর্বাভাস কিছুটা লক্ষ্য করা যেতে পারে রড্‌বের্টুসের অভিমতের মধ্যে। তাঁর 'আমাদের রাষ্ট্রীয়-আর্থনীতিক ব্যবস্থা সংবেদ প্রসঙ্গে' নামে বইখানার অনুবাদের সোভিয়েত সংস্করণের ভূমিকা-প্রবন্ধে ঠিকই বলা হয়েছে যে, 'প্রলেতারিয়ান সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে পুঁজিতন্ত্রকে আক্রমণ করাটা ছিল না রড্‌বের্টুসের জীবনের ব্রত। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত বিপদগুলো লক্ষ্য করে যিনি পুঁজিতন্ত্রে নিহিত কোন-কোন গুরুতর দ্বন্দ্ব-অসংগতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এমন একজন দূরদর্শী তত্ত্ববিদ হিসেবে পুঁজিতন্ত্রকে রক্ষা করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রতটা...'**

---

* Dr. Rodbertus-Jagetzow, 'Briefe und Socialpolitische Aufsätze', Berlin, Bd. I, S. III.

** K. Rodbertus, 'Zur Erkenntniss...', p. 25, তাতে ভ. সেরেব্রিয়াকোভের লেখা ভূমিকা (রুশ ভাষায়)।

রামরাজ্য স্বপ্নদর্শীদের অপরূপ জগৎ

সাঁ-সিমোঁ এবং ফুরিয়ে

বিশ্বজনের উন্নততর জীবনের জন্যে, সমুচিত সমাজব্যবস্থার জন্যে স্বপ্ন-দেখা মানুষ কত দেখা দিয়েছেন সর্বকালে। অনেক সময়ে তাঁদের লড়তে হয়েছে বিদ্যমান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে, তাঁরা হয়েছেন বীর-নায়ক, শহিদ। নিজেদের সমসাময়িক সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ আর সমালোচনা করতে গিয়ে এ'রা আরও ন্যায়পর, আরও মানবোচিত ব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরে সেটাকে যুক্তিসম্মত প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেন। অর্থশাস্ত্রের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে গেছে তাঁদের ধ্যান-ধারণা, তবু সেগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থেকেছে এই বিজ্ঞানক্ষেত্রে।

সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট ভাব-ধারণা তুলে ধরা হয়েছিল ষোল থেকে আঠার শতকের বহু রচনায়। বিজ্ঞান আর সাহিত্যের মানদণ্ডে বিভিন্ন সেগুলির যোগ্যতা, বিভিন্ন সেগুলির পরিণতি কিন্তু সেটা হল **ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রের** প্রাক্-ইতিহাস মাত্র। এই সমাজতন্ত্রের ক্ল্যাসিকাল আমল আসে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে।

বুর্জোয়া সম্পর্কতন্ত্রের বিকাশ যা ইতোমধ্যে ঘটে সেটা পুঁজিতন্ত্রের সম্যক এবং প্রগাঢ় সমালোচনা দেখা দেবার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছিল। তার সঙ্গে সঙ্গে, বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে শ্রেণীবিরোধ তখনও পূর্ণ-প্রকটিত নয়, তখন অবধি সেটা দেখা দিয়েছিল সমৃদ্ধি আর গরিবির মধ্যে, স্রেফ গায়ের জোর আর অধিকারহীনতার মধ্যে অপেক্ষাকৃত সাধারণ ধরনের বিরোধের আকারে। বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের পরিবেশ তখনও আসে নি,— এতে প্রতিপন্ন করা হয় প্রলেতারিয়েতের ইতিহাসনির্দিষ্ট কার্যভার। তবে

মার্ক্স এবং এঙ্গেলসের মতবাদের একটা আকর হল ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র, যে-ধ্যান-ধারণার পরম উৎকর্ষ ঘটেছিল সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে, রবার্ট ওয়েন এইসব বিশিষ্ট চিন্তাবীরদের রচনাগুলিতে।

কাউণ্ট হলেন ফাকির

'আমি শার্লেমেন্-এর বংশধর, আমার বাবাকে বলা হত কাউণ্ট রুভ্রুয়া সাঁ-সিমোঁ, আর আমি ছিলাম ডিউক সাঁ-সিমোঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।'*— কথাটা শুনতে যেন স্রেফ নাক-উ'চানো বড়াইয়ের মতো, যদি জানা না থাকে এটা সাঁ-সিমোঁর উক্তি। ১৮০৮ সালে লেখা তাঁর আত্মজীবনী-প্রবন্ধটি এই কথাটা দিয়ে শুরু; এই প্রাক্তন কাউণ্ট তখন সাধারণ নাগরিক, তাঁর ভরণপোষণ করে তাঁর ভৃত্য। এই অসাধারণ মানুষটির জীবন তাঁর শিক্ষারই মতো জটিলতা আর দ্বন্দ্ব-অসংগতিতে ভরা। এই জীবনে ছিল বিপুল ধন-দৌলত আর দারিদ্র্য, সামরিক সম্মান আর কারাবাস, লোকহিতৈষীর উদ্দীপনা আর তার মধ্যে একবার আত্মহত্যার চেষ্টা, বন্ধুবান্ধবের বেইমানি আর শিষ্যদের দৃঢ় আস্থা।

ক্লদ্ আঁরি সাঁ-সিমোঁ দ্য রুভ্রুয়ার জন্ম হয় প্যারিসে ১৭৬০ সালে; উত্তর ফ্রান্সে পারিবারিক প্রাসাদ-দুর্গে তিনি মানুষ হন। তিনি চমৎকার শিক্ষালাভ করেন বাড়িতেই। এই অভিজাতটির কৈশোরেই প্রকাশ পায় স্বাধীনতাপ্রিয়তা আর চরিত্রের দৃঢ়তা। তের বছর বয়সে তিনি প্রথম কমিউনিয়ন অস্বীকার করেন, তাতে তিনি কারণ দেখান যে, তিনি স্যাক্রামেণ্টে বিশ্বাস করেন না, তাই ভান করতে রাজি নন। অচিরেই তাঁর আচরণে দেখা দেয় আর-একটি উপাদান, যাতে বিস্তর বিস্ময় জাগে পরিবারে: সেটা হল নিজের সুউচ্চ সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস। কথিত আছে, পনর বছর বয়সের সাঁ-সিমোঁ ভৃত্যকে হুকুম দিয়েছিলেন প্রতিদিন তাঁকে

---

* 'Oeuvres de Saint-Simon', publ. in 1832, by Olinde Rodrigues, Paris, 1848, p. XV. এই উদ্ধৃতিতে বলা হচ্ছে বিখ্যাত স্মৃতিকথা-লেখক ডিউক অভ্ সাঁ-সিমোঁর কথা, তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে চতুর্থ আর পঞ্চম পরিচ্ছেদে বুয়াগিইবের এবং লো-র জীবনী প্রসঙ্গে।

জাগাবার সময়ে বলতে হবে এই কথা: 'গাত্রোত্থান করুন, হে প্রভু, মস্ত-মস্ত ব্যাপার সম্মুখে আপনার!'

কিন্তু ঐসব মস্ত-মস্ত ব্যাপার তখন বহুদূরে; পারিবারিক রেওয়াজ অনুসারে সাঁ-সিমোঁ আপাতত ধরেন সামরিক বৃত্তি, গ্যারিসনের একঘেয়ে জীবনে তাঁর কাটে তিন বছর। তরুণ অফিসারটি এই জীবন থেকে অব্যাহতি পান যখন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মার্কিন উপনিবেশগুলিকে সাহায্য করতে পাঠানো ফরাসী অভিযাত্রী বাহিনীতে স্বেচ্ছাসৈনিক হয়ে তিনি যান আমেরিকায়। বীরপুরুষের সম্মান পেয়ে ফ্রান্সে ফিরে তিনি অচিরেই একটা রেজিমেণ্টের নায়ক হিসেবে নিযুক্ত হন। তরুণ কাউণ্টটির সামনে তখন দেদীপ্যমান কর্মজীবনের সম্ভাবনা। কিন্তু অসার জীবনটা তাঁর পক্ষে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে অচিরে। তিনি হল্যাণ্ডে যান, তারপর স্পেনে — তার মধ্যে দেখা যায় সাঁ-সিমোঁর একটা নতুন দিক: অ্যাডভেঞ্চার-কামনা আর নানা অদ্ভুত-অদ্ভুত প্রকল্প উদ্ভাবনের ঝোঁক। মনে হয়, তাঁর অক্লান্ত কর্মোদ্যম আর উদ্ভাবনপ্রবণ মানস তখনও আসল ক্ষেত্রটা না পেয়ে নির্গম-পথ খুঁজছিল ঐসব উদ্ভট প্রকল্পের মাঝে। ইংরেজদের হাত থেকে ভারত জয় করে নেবার জন্যে তিনি তালিম দিয়ে একটা নৌ-অভিযান সংগঠিত করেন হল্যাণ্ডে। স্পেনে থাকার সময়ে তিনি মাদ্রিদকে সমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করার একটা জলপথের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন, আর সংগঠিত করেন একটা ডাক এবং যাত্রি-পরিবহন কম্পানি, এটা সার্থক হয়েছিল।

এনসাইক্লোপেডিস্টদের আদর্শ এবং আমেরিকান বিপ্লবের অভিজ্ঞতায় লালিত সাঁ-সিমোঁ ১৭৮৯ সালের ঘটনাবলিকে সাদরে গ্রহণ করেন পরম উৎসাহভরে। বিপ্লবে তিনি মোটামুটি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন, যদিও সেটা শুধু 'স্থানীয় পরিসরে': প্রাক্তন পারিবারিক জমিদারির কাছে একটা ছোট শহরে তখন তিনি বাস করছিলেন। জমিদারি খোয়া যাওয়াতে তাঁর দুঃখ ছিল না; পদবি আর প্রাচীন পারিবারিক নাম সরকারিভাবেই বর্জন ক'রে তিনি নিজেকে বলেন নাগরিক বোনোম (Bonhomme — সাধারণ লোক)।

'সাধারণ লোক'টির জীবনে সহসা এবং আপাতদৃষ্টিতে অপ্রত্যাশিত একটা পরিবর্তন ঘটে ১৭৯১ সালে। প্যারিসে গিয়ে তিনি জমির ফটকাবাজিতে নামেন; অভিজাতদের আর গির্জার কাছ থেকে রাষ্ট্রের বাজেয়াপ্ত-করা সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছিল বলে এই কারবার তখন ফলাও হয়ে

উঠেছিল। এতে তিনি অংশীদার করে নেন জার্মান কূটনীতিক ব্যারন রেডের্ন্‌কে, এঁর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল স্পেনে। তাঁদের সাফল্য হয় আশাতীত। ১৭৯৪ সাল নাগাদ সাঁ-সিমোঁ হন একজন মস্ত ধনী, কিন্তু তারপর তিনি পড়েন জ্যাকোবিন বিপ্লবের কঠোর কবলে। প্রতিবৈপ্লবিক থার্মিডর ক্যু এসে বন্দীটিকে রক্ষা করে গিলোটিন থেকে। প্রায় এক বছর জেলে কাটার পরে তিনি খালাস পান এবং আবার ধরেন মুনাফাখোরি, কারবারটা তখন আর বিপজ্জনক ছিল না। ১৭৯৬ সালে সাঁ-সিমোঁ আর রেডের্নের যৌথ ধন-দৌলতের পরিমাণ দাঁড়ায় চল্লিশ লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক।

তবে পয়মন্ত মুনাফাবাজিতে ইতি পড়ে এই সময়ে। সন্ত্রাসের রাজত্বকালে ব্যারন রেডের্ন্‌ বুদ্ধি খাটিয়ে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তিনি প্যারিসে ফিরে যৌথ বিত্ত-সম্পদের সবটাই নিজের বলে দাবি করেন, কেননা কারবারটা চালান হত তাঁর নামে। সাঁ-সিমোঁর ঝানু শয়তানি আর শিশুর মতো সরলতার এই অদ্ভুত মিশ্রণটা কিছুতেই বোধগম্য নয়! দীর্ঘ বাদ-বিসংবাদের পরে তিনি বাধ্য হয়ে রেডের্নের কাছ থেকে দেড় লাখ ফ্র্যাঙ্ক খেসারত পেয়ে ব্যাপারটা চুকিয়ে দেন।

সৈনিক এবং ভাগ্যান্বেষী, দেশভক্ত এবং ফটকাবাজ সাঁ-সিমোঁ হয়ে উঠলেন বিদ্যানুরাগী। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের মস্ত-মস্ত আবিষ্কারগুলিতে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে তিনি স্বভাবসিদ্ধ উদ্দীপনা আর উদ্যোগ সহকারে অধ্যয়ন আরম্ভ করলেন। কারবারের বিত্ত থেকে যা অবশিষ্ট ছিল সেটা তিনি খরচ করতে থাকলেন অতিথিবৎসল বাড়িটির পিছনে, সেখানে জড়ো হতেন প্যারিসের সবচেয়ে বিশিষ্ট বিদ্বানেরা। তারপর সাঁ-সিমোঁ ইউরোপ সফর করে কাটান কয়েক বছর। ১৮০৫ সাল নাগাদ একেবারেই স্পষ্ট হয়ে যায় তাঁর টাকা আর নেই, তিনি প্রায় কপর্দকশূন্য।

পরে নিজ জীবনক্ষেত্রে পিছনে তাকিয়ে সাঁ-সিমোঁ মনে করতে চেয়েছিলেন তাঁর উত্থান-পতনগুলি ছিল সমাজসংস্কারক হিসেবে আসল ক্রিয়াকলাপের প্রস্তুতির জন্যে সচেতনভাবে চালান একগুচ্ছ পরীক্ষা। এটা অবশ্য একটা বিভ্রম। তাঁর জীবনধারা চলেছিল সাধারণ নিয়ম অনুসারেই, সেটা ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি যা নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেই কাল এবং তৎকালীন ঘটনাবলি দিয়ে, আর এই ব্যক্তিত্ব ছিল মৌলিক এবং প্রতিভাশালী কিন্তু দ্বন্দ্ব-অসংগতিসঙ্কুলও বটে। উদ্ভট এবং অমিতাচারী বলে তাঁর নামে কথা রটেছিল সেই সময়েই। মধ্যম গোছের অবস্থাটা সমাজে অনেক সময়ে

মাফিকসই বলে গণ্য, আর প্রতিভাটাকে মনে হতে পারে বাড়াবাড়ি, প্রতিভাশালী ব্যক্তি কখনও-কখনও সন্দেহভাজন হয়েও দাঁড়াতে পারে।

সাঁ-সিমোঁর প্রথম ছাপা লেখাটা 'Lettres d'un habitant de Genève à ses contemporains' ('সমসাময়িকদের কাছে জেনেভার বাসিন্দার চিঠিপত্র')-এও (১৮০৩) রয়েছে বিস্তর মৌলিকতার ছাপ। এই প্রথম রচনাতেই দেখা যায় সমাজ পুনর্গঠনের ইউটোপিয়ান পরিকল্পনা, যদিও সেটা বিবৃত হয় অস্পষ্ট প্রাথমিক আকারে। দুটো লক্ষণীয় উপাদান রয়েছে এই সংক্ষিপ্ত রচনাটিতে। এক, সাঁ-সিমোঁর বিবরণে ফরাসী বিপ্লব হল অভিজাত, বুর্জোয়া আর গরিব (প্রলেতারিয়েত) এই প্রধান তিনটে শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম। এঙ্গেলস এটাকে বলেছেন 'মহা তাৎপর্যসম্পন্ন আবিষ্কার'।* দুই, সমাজের রূপান্তরসাধনে বিজ্ঞানের ভূমিকার স্পষ্ট রূপরেখা তিনি তুলে ধরেন।

সাঁ-সিমোঁর রচনাশৈলী জোরাল, আবেগচঞ্চল, কখনও-কখনও উচ্ছ্বসিত। বিশ্বমানবের ভাগ্যের জন্যে মহা উৎকণ্ঠিত মানুষটির চিত্র ফুটে ওঠে তার মধ্যে।

গুরু

ক্লেশ, সংগ্রাম আর প্রবল সৃজনী ক্রিয়াকলাপে ভরা সাঁ-সিমোঁর জীবনের শেষের কুড়িটা বছর। কপর্দকশূন্য হয়ে পড়ে তিনি রোজগারের যেকোন উপায়ের সন্ধানে লাগেন, একসময়ে তিনি একটা বন্ধকী দোকানে কেরানিগিরি করেছিলেন। ১৮০৫ সালে তাঁর দেখা হয়ে যায় তাঁর আগেকার চাকরের সঙ্গে, ইনি কিছু টাকা জমিয়েছিলেন সাঁ-সিমোঁর খিদমত করার সময়ে। সাঁ-সিমোঁ এঁর কাছে থাকেন দু'বছর, এঁর সাহায্যে তাঁর চলত। এই অদ্ভুত জুটিতে যেন পুনরাবৃত্ত হল ডন্ কুইক্সোট আর সাংকো পাঞ্জার কাহিনী! প্রাক্তন ভৃত্যের টাকায় সাঁ-সিমোঁ ১৮০৮ সালে প্রকাশ করেন তাঁর দ্বিতীয় বই — 'Introduction aux travaux scientifiques du XIX-e siècle' ('উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিক রচনাবলির মুখবন্ধ')। এটা এবং আরও কয়েকটা রচনা একটা ক্ষুদ্র সংস্করণে ছেপে তিনি পাঠিয়ে দেন বিশিষ্ট মনীষী আর

* ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, 'অ্যান্টি-ড্যুরিং', ৩০৭ পৃঃ।

রাজনীতিকদের কাছে, তাতে তিনি নিজ কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে তাঁদের সমালোচনা এবং আনুকূল্য প্রার্থনা করেন। তাতে কেউই সাড়া দেন না।

১৮১০-১৮১২ সালে সাঁ-সিমোঁর কেটেছিল নিদারুণ গরিবি দশায়। তিনি লিখেছেন, তখন তিনি বিক্রি করে দেন যা ছিল সম্বল, মায় কাপড়চোপড়, খেতে জুটত শুধু রুটি আর জল, ছিল না জ্বালানি কিংবা বাতি। কিন্তু অবস্থা যতই কঠিন হয়ে উঠেছিল ততই বেশি তিনি খাটতেন। সমাজ সম্বন্ধে তাঁর বিবেচনাধারা চূড়ান্ত আকারে দানা বেঁধে ওঠে এই সময়েই: ১৮১৪ সাল থেকে শুরু করে প্রকাশিত কয়েকখানা সুপরিণত রচনায় তিনি সেটা বিবৃত করেন। ইউরোপের যুদ্ধোত্তর গঠন সম্বন্ধে পুস্তিকাখানা প্রকাশিত হবার পরে সাঁ-সিমোঁ সাধারণের নজরে পড়েন। এতেই তিনি চালু করেন এই জনপ্রিয় এবং সুবিদিত কথাটা: 'বিশ্বজনের স্বর্ণযুগ আসছে, সেটা কেটে যায় নি।' এই বক্তব্যটাকে যুক্তি দিয়ে প্রতিপন্ন করা এবং 'স্বর্ণযুগে' পেঁছবার উপায়াদি সবিস্তারে তুলে ধরাই ছিল তাঁর পরবর্তী ক্রিয়াকলাপের বিষয়বস্তু।

বয়স যখন ষাটের কাছাকাছি তখন সাঁ-সিমোঁর জীবনটা চলতে থাকে স্বচ্ছন্দে। তখন তাঁর ছিলেন শিষ্যরা, অনুগামীরা। সমাজের স্বাভাবিক, শিক্ষিত 'নেতৃবৃন্দ' — ব্যাঙ্কার, শিল্পপতি আর বণিকদের উদ্দেশে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজের রূপান্তর সম্বন্ধে সাঁ-সিমোঁর প্রচার ঐ শ্রেণীর কিছু লোকের নজরে পড়ে। তাঁর রচনা প্রকাশনের সুযোগ দেওয়া হয়; বেশ বিস্তৃত সাধারণ্যে সেগুলি বিদিত হয়। তিনি যাতে স্বচ্ছন্দ জীবনে খেটে কাজ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করেন তাঁর ধনী অনুগামীরা।

জীবনেও এবং রচনাগুলিতেও সাঁ-সিমোঁ কিন্তু থেকে গেলেন সেই বিদ্রোহী, উৎসাহী-উদ্যমী — আবেগচঞ্চল সেই কল্পলোকের মানুষটি। একদল ব্যাঙ্কার আর ধনপতি তাঁর একখানা বই প্রকাশনের খরচ যুগিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সংস্রব প্রকাশ্যে কাটান-ছিঁড়েন করে বললেন তিনি তাঁদের ভুল বুঝিয়েছিলেন, তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। অল্প কিছুকাল পরেই তিনি রাজমর্যাদাহানির দায়ে আদালতে অভিযুক্ত হন: প্রকাশিত একটা রূপক-রচনায় তিনি বলেছিলেন, অভিজাতকুল, সর্বোচ্চ আমলারা, যাজকমণ্ডলী, ইত্যাদি সমেত রাজ-পরিবারের লোকেরা যদি কোন অলৌকিক উপায়ে অন্তর্হিত হয়, তাদের কোন নামগন্ধ অবশিষ্ট থাকে না, তাতে ফ্রান্সের কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু

মস্ত ক্ষতি হবে ফ্রান্সের যদি মিলিয়ে যায় সেরা-সেরা পণ্ডিত, শিল্পী, হস্তশিল্পী আর কারিগরেরা। এটাকে স্রেফ মজাদার কূটাভাস বলে বিবেচনা ক'রে জুরি তাঁকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে।

সাঁ-সিমোঁর জীবনে এটা কিছুটা ট্র্যাজিকমিক কাহিনী, কিন্তু বাস্তবিক মর্মান্তিক ঘটনা হল ১৮২৩ সালের মার্চ মাসে তাঁর আত্মহত্যার চেষ্টা। তিনি পিস্তলের গুলি চালিয়ে দিয়েছিলেন মাথায়, তবে বেঁচে যান, কিন্তু নষ্ট হয় একটা চোখ। একজন বন্ধুর কাছে চিরবিদায় নিয়ে লেখা চিঠিতে তিনি বলেছিলেন তাঁর ভাব-ধারণা সম্বন্ধে সাধারণ্যে আগ্রহের অভাব লক্ষ্য করে তিনি জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েন। তবে আঘাতটা থেকে সেরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি খেটে কাজ করতে লেগে যান এবং ১৮২৩-১৮২৪ সালে প্রকাশ করেন তাঁর সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ এবং মার্জিত রচনা — 'Catéchisme des industriels' ('শ্রমশিল্পকর্মীদের সারগ্রন্থ')। ১৮২৪ সালে সারা বছর উঠে-প'ড়ে কাজ করে তিনি লেখেন শেষ বই 'নয়া খ্রিস্টধর্ম', এতে তিনি ভবিষ্য 'শ্রমশিল্পকর্মীদের সমাজের' জন্যে একটা নতুন ধর্ম তুলে ধরতে চেষ্টা করেন, তাতে তিনি খ্রিস্টধর্ম থেকে নেন শুধু সেটার আদি মানবিকতা। এই বইখানা প্রকাশিত হবার কয়েক সপ্তাহ পরে ১৮২৫ সালে মে মাসে মারা যান ক্লদ্ আঁরি সাঁ-সিমোঁ।

সাঁ-সিমোঁবাদ

বলা যেতে পারে বিকাশের চারটে পর্ব পার হয় সাঁ-সিমোঁবাদ। ১৮১৪-১৮১৫ সাল অবধি সাঁ-সিমোঁর রচনাগুলিতে তার **প্রথম** পর্বটা। এই কালপর্যায়ে সেটার প্রধান-প্রধান উপাদান ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান আর বিদ্বজ্জনের মহিমা-প্রচার এবং বেশকিছুটা বিমূর্ত মানবিকতা। সাঁ-সিমোঁবাদের সামাজিক-আর্থনীতিক ধ্যান-ধারণা তাতে ছিল শুধু প্রাথমিক আকারে।

দ্বিতীয় পর্বটা প্রকাশ পায় তাঁর জীবনের শেষ দশ বছরের পরিণত রচনাগুলিতে। পুঁজিতন্ত্রকে স্বাভাবিক এবং চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে সাঁ-সিমোঁ এইসব রচনায় তুলে ধরেন এই বক্তব্যটা: সাধারণ নিয়ম অনুসারেই পুঁজিতন্ত্রের জায়গায় আসবে নতুন সমাজব্যবস্থা, তাতে মানুষে-মানুষে বিরোধ আর প্রতিযোগিতার জায়গায় আসবে সহযোগ। শান্তিপূর্ণ উপায়ে 'শ্রমশিল্পকর্মীদের সমাজ' গড়ে ওঠার

ফলে সেটা বলবৎ হবে — এই সমাজে সামন্ত মনিব আর পরজীবী বুর্জোয়া মালিকদের আর্থনীতিক আর রাজনীতিক ক্ষমতা লোপ পাবে, যদিও বজায় থাকবে ব্যক্তিগত মালিকানা। সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে উৎপীড়িত শ্রেণীর স্বার্থের সপক্ষে সাঁ-সিমোঁ দাঁড়ান ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে। মার্কস লিখেছেন, 'শেষ রচনা 'নয়া খ্রিস্টধর্ম'-তে সাঁ-সিমোঁ সরাসরি শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে দাঁড়িয়ে বলেন তাদের মুক্তিই তাঁর প্রচেষ্টার লক্ষ্য।'*

সাঁ-সিমোঁর বিবেচনায়, তাঁর আমলের সমাজটা ছিল দুটো প্রধান শ্রেণী নিয়ে — নিষ্কর্মা মালিকেরা এবং মেহনতী শ্রমশিল্পকর্মীরা। সামন্ততান্ত্রিক এবং বুর্জোয়া সমাজের শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব-অসংগতির অদ্ভুত জড়াজড়ি রয়েছে এই ধারণাটায়। তাঁর প্রথম শ্রেণীটার মধ্যে পড়ে বড়-বড় ভূস্বামী আর লভ্যাংশভোগী পুঁজিপতিরা যারা আর্থনীতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রাহী নয়, এবং সামরিক আর বিচার-বিভাগীয় আমলারা যাদের উন্নতি হয়েছিল বিপ্লব আর সাম্রাজ্যের আমলে। আর শ্রমশিল্পকর্মীরা হল বাদবাকি সবাই, যারা তাদের পরিবার-পরিজন মিলিয়ে সাঁ-সিমোঁর মতে ছিল তখনকার দিনের ফরাসী সমাজের জনসমষ্টির ৯৬ শতাংশ অবধি। সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় যেকোন কাজ যারা করে তারা পড়ে এদের মধ্যে: কৃষক আর মজুরি-করা লোক, কারিগর আর কল-কারখানা মালিক, বণিক আর ব্যাঙ্কার, বিদ্বজ্জন আর শিল্পী। তাঁর বিবেচনায়, মালিকদের আয় পরজীবী, আর শ্রমশিল্পকর্মীদের আয় ন্যায্য। অর্থশাস্ত্রের বর্গ হিসেবে দেখলে, তিনি ভূমি-খাজনা আর ঋণ বাবত সুদকে ধরেন পূর্বোক্তদের আয় হিসেবে আর শেষোক্তদের আয় বলে মিলিয়ে ধরেন কারবারী আয় (বা সমস্ত লাভ) এবং মজুরি। এইভাবে, বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে শ্রেণীবিরোধটাকে সাঁ-সিমোঁ লক্ষ্য করেন নি কিংবা সেটাকে বড় একটা তাৎপর্যসম্পন্ন মনে করেন নি। এর কারণ হল কিছু পরিমাণে এই যে, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রকৃতি ছিল উন-বিকশিত, আর কিছু পরিমাণে এই যে, নিজ তত্ত্বটাকে তিনি নিয়োগ করতে চান একক লক্ষ্যসাধনের জন্যে, সেটা হল সমাজের শান্তিপূর্ণ এবং ক্রম রূপান্তরের উদ্দেশ্যে জাতির বিপুল সংখ্যাগুরু অংশকে ঐক্যবদ্ধ করা। সাঁ-সিমোঁ কোন নীতি হিসেবে ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধিতা করেন নি, তিনি বিরোধিতা

* কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ৩ খণ্ড, ৬০৫ পৃঃ।

করেন বলা যেতে পারে স্রেফ সেটার অপব্যবহারের; কোন ভবিষ্য সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ পাবে বলেও তিনি ভাবেন নি, তবে মনে করেছিলেন সমাজের একটা কিছু নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হতে পারে সেটার উপর। উদ্যোগী কারবারি পুঁজিপতিরা উৎপাদনের স্বাভাবিক সংগঠক, সমাজকল্যাণের জন্যে অপরিহার্য — তাঁর এই মতটার মিল আছে সে'-র বক্তব্যের সঙ্গে।

সাঁ-সিমোঁ মারা যাবার সময় থেকে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত সময়ে তাঁর শিষ্যদের লেখা, প্রচার আর ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ হল সাঁ-সিমোঁবাদের **তৃতীয় পর্ব**, প্রকৃতপক্ষে স্ফুটনের পর্ব। সাঁ-সিমোঁবাদে দাবি করা হয় উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ, শ্রম আর সামর্থ্য অনুসারে উৎপাদের বণ্টন, উৎপাদনের সামাজিক সংগঠন আর পরিকল্পন — এই দিক থেকে সেটা সত্যিকারের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ। ১৮২৮-১৮২৯ সালে প্যারিসে সাঁ-সিমোঁর দু'জন নিকটতম শিষ্য স. আ. বাজার এবং ব. প. আনফান্তেনের সাধারণ্যে লেকচারগুলিতে খুবই পূর্ণ আকারে প্রণালীবদ্ধভাবে বিবৃত করা হয় এইসব ধ্যান-ধারণা। 'Doctrine de Saint-Simon: Exposition' ('সাঁ-সিমোঁর মতবাদের ব্যাখ্যা-বিবরণ')-শীর্ষক রচনায় পরে প্রকাশিত হয় এইসব লেকচার।

শ্রেণী আর মালিকানা সম্বন্ধে সাঁ-সিমোঁর অভিমতটাতে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট সমাজতান্ত্রিক ঝোঁক আনেন তাঁর শিষ্যরা। শ্রমশিল্পকর্মীদের তাঁরা আর একক, সমরূপ শ্রেণী হিসেবে দেখেন নি; তাঁদের মতে, এদের উপর মালিকদের শোষণের বোঝাটা পুরোপুরিই পড়ে শ্রমিকদের উপর। তাঁরা লেখেন, 'একসময়ে দাস যেমনটা ছিল সেইভাবে বৈষয়িক মানসিক এবং নৈতিক শোষণ চলে' শ্রমিকদের উপর। এই বক্তব্যে উদ্যোগী পুঁজিপতি শিল্প-মালিকেরা 'শোষণের বিশেষ অধিকারে অংশগ্রাহী'।

সাঁ-সিমোঁবাদীরা শোষণটাকে সংশ্লিষ্ট করেন ব্যক্তিগত মালিকানা প্রথাটার সঙ্গে। এই বিবেচনাধারায়, ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে স্থাপিত সমাজব্যবস্থার দোষ-ত্রুটিগুলোই পুঁজিতন্ত্রের অন্তর্নিহিত সংকট এবং উৎপাদনে অরাজকতার প্রধান কারণ। সংকটের ক্রিয়াধারার বিশ্লেষণ দিয়ে ঐ প্রগাঢ় ধারণাটাকে প্রতিপন্ন করা হয় নি তা ঠিক, তবু উত্তরলব্ধির অধিকার লোপ করে ব্যক্তিগত মালিকানা বহুলাংশে সীমাবদ্ধ করার জন্যে তাঁদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবিটার একটা ভিত্তি ছিল ঐ ধারণা। রাষ্ট্রই হওয়া চাই একমাত্র উত্তরাধিকারী: রাষ্ট্র তখন উৎপাদন-সম্বল যেন ভাড়া

দেবে উদ্যোগী শিল্প-মালিকদের কাছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালকরা তখন হয়ে দাঁড়াবে সমাজের এজেন্ট। ব্যক্তিগত মালিকানা এইভাবে ক্রমে হয়ে দাঁড়াবে সাধারণের মালিকানা।

সাঁ-সিমোঁবাদীরা ভবিষ্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তি খুঁজেছিলেন সাবেক সমাজেরই গর্ভে — এটা তাঁদের একটা নতুন অবদান। তাঁরা মনে করতেন সমাজতন্ত্র দেখা দেবে উৎপাদন-শক্তি উন্নয়নের সাধারণ নিয়মেরই ক্রিয়াফলে। তেমনি, পুঁজিতান্ত্রিক ক্রেডিট-ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাটাকে তাঁরা বিবেচনা করেছিলেন সমাজের স্বার্থে উৎপাদনের ভবিষ্য পরিকল্পিত সংগঠনের প্রারম্ভিক আকার হিসেবে। সাঁ-সিমোঁবাদের এইসব প্রগাঢ় ধারণা পরে পেটি-বুর্জোয়া কিংবা খোলাখুলি বুর্জোয়া ধরনের 'ক্রেডিট মরীচিকা'য় পর্যবসিত হয়েছিল বটে। তবু পুঁজিতন্ত্রের পয়দা-করা বড়-বড় ব্যাঙ্কের কর্ম-বন্দোবস্তটাকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবহার করতে পারে অর্থনীতিক্ষেত্রে সামাজিক হিসাবরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ আর ব্যবস্থাপনের জন্যে — আপনাতে এই ধারণাটাকেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা একটা চমৎকার উপলব্ধি বলে বিবেচনা করেন।

সাঁ-সিমোঁর মতো তাঁর শিষ্যরাও সমাজের বিকাশ আর রূপান্তরের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ভূমিকাটার প্রতি বিস্তর মনোযোগ দেন। জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা এবং সবচেয়ে কর্মদক্ষ কারবারিরা সমাজের রাজনীতিক আর আর্থনীতিক পরিচালনের ভার নেবেন। রাজনীতিক পরিচালন ক্রমে নাস্তি হয়ে পড়বে, কেননা ভবিষ্য সমাজে 'মানুষ পরিচালনে'র প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে, থাকবে শুধু 'জিনিস পরিচালনা', অর্থাৎ উৎপাদন পরিচালনা। তখনকার দিনে সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান আর জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের অবস্থারও তীব্র সমালোচনা করেছিলেন সাঁ-সিমোঁবাদীরা।

অর্থশাস্ত্রের প্রধান-প্রধান ধারণামৌল সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিচার-বিশ্লেষণ দেখা যায় না সাঁ-সিমোঁ এবং তাঁর শিষ্যদের রচনাগুলিতে। মূল্য পয়দা হওয়া এবং সেটার বণ্টন সম্বন্ধে কিংবা মজুরি লাভ আর ভূমি-খাজনার নিয়ম তাঁরা বিশ্লেষণ করেন নি। তখনকার আমলের বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের স্বীকৃত ধারণাগুলি নিয়েই তাঁরা একরকম সন্তুষ্ট ছিলেন। তবে আসল কথাটা এই যে, তাঁদের চিন্তাধারা এগিয়েছিল একেবারে ভিন্ন অভিমুখে, আর তাতে তুলে ধরা হয়েছিল অন্য রকমের কাজ। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা স্বাভাবিক এবং স্থায়ী, এই মর্মে বড়-বড় বুর্জোয়া পণ্ডিতদের এবং 'সে'-সম্প্রদায়ের'

মূল বক্তব্যটার তাঁরা বিরোধিতা করেন — এটাই অর্থনীতি-বিজ্ঞানক্ষেত্রে তাঁদের অবদান। তাই এই ব্যবস্থাটার আর্থনীতিক নিয়মাবলি-সংক্রান্ত প্রশ্নটাকে ধরা হয়েছিল একেবারে ভিন্ন পর্যায়ে। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীটার উদ্ভব আর বিকাশের ইতিহাসক্রমিক ধারাটা কী, সেটার দ্বন্দ্ব-অসংগতিগুলো কী, এটার জায়গায় সমাজতন্ত্র আসবেই তা অবধারিত কেন এবং কিভাবে — এসব দেখাবার নতুন কাজটাকে ধরা হল অর্থশাস্ত্রের সামনে। সাঁ-সিমোঁবাদীরা এই কাজটা সম্পাদন করতে পারেন নি, কিন্তু এটাকে তুলে ধরাটাই হল একটা মস্ত কৃতিত্ব।

অর্থশাস্ত্রকে একটা বিশেষ বিজ্ঞান হিসেবে তুলে ধরে সে' সেটাকে রাজনীতি থেকে পৃথক করে নেন বলে সাঁ-সিমোঁ তারিফ করেছিলেন। এই প্রশ্নটা উত্থাপন না করেই সাঁ-সিমোঁর শিষ্যরা সে' এবং তাঁর অনুগামীদের শাণিত সমালোচনা করে তাঁদের মতবাদের সাফাইদারী প্রকৃতিটাকে স্পষ্ট খুলে ধরেন। বিদ্যমান মালিকানা সম্পর্ক কিভাবে দেখা দিল সেটা ঐসব অর্থনীতিবিদ দেখাবার চেষ্টা করেন নি, এটা উল্লেখ করে সাঁ-সিমোঁবাদীরা বলেন: 'তাঁরা বলতে চান তাঁরা দেখিয়েছেন সম্পদ কিভাবে পয়দা হয়, বণ্টিত এবং ব্যবহৃত হয়, তা ঠিক; কিন্তু শ্রমের পয়দা-করা এই সম্পদ চিরকাল বংশানুক্রমে বণ্টিত হবে এবং বহুলাংশে নিষ্কর্মাদের পরিভোগে যাবে কিনা সেটা নির্ধারণ করার গরজ তাঁদের নেই।'*

১৮৩১ সাল থেকে কালপর্যায়টা হল সাঁ-সিমোঁবাদের **চতুর্থ** এবং অধঃপতনের পর্ব। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কোন দৃঢ় অবলম্বন না থাকায় সাঁ-সিমোঁবাদীরা ফ্রান্সের প্রলেতারিয়েতের প্রথম-প্রথম বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ দেখে থতমত খেয়ে গেলেন। এই সময়ে সাঁ-সিমোঁবাদে ধর্মীয়, সংকীর্ণতাবাদী ছোপ ধরার ফলে সাঁ-সিমোঁবাদ শ্রমিক শ্রেণী থেকে, এমনকি গণতন্ত্রী ছাত্রদের থেকেও আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সাঁ-সিমোঁবাদী সেক্ট-এর প্রধান হলেন আনফান্তেন, স্থাপিত হল একটা অদ্ভুত ধর্মসম্প্রদায়, চালু হল সেটার বিশেষ ধরনের পোশাক, তাতে ওয়েস্টকোটের বোতাম পিছন দিকে। এই আন্দোলনের ভিতরে সাঁ-সিমোঁর অনুগামীদের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিল। নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক এবং এই সম্প্রদায়ে

* 'Doctrine de Saint-Simon: Exposition', Bruxelles, 1831, p. 235.

নারীর স্থান-সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে দেখা দিল বিরোধ। ১৮৩১ সালে নভেম্বর মাসে বাজার একদল সমর্থক সঙ্গে নিয়ে এই সেক্ট থেকে বেরিয়ে যান। ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবের পরে ক্ষমতাসীন হয়েছিল অর্লিয়েন্স সরকার, সেটা অল্প কিছুকাল পরেই আনফান্তেন এবং তাঁর গ্রুপের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে, তাতে ব্যভিচার আর বিপজ্জনক ভাব-ধারণা প্রচারের অভিযোগ থাকে। আনফান্তেনের উপর এক বছরের কারাদণ্ডাদেশ হয়। সংগঠনের দিক থেকে আন্দোলনটা খতম হয়ে গেল। তার মধ্য থেকে কেউ-কেউ সাঁ-সিমোঁবাদের প্রচার চালাতে থাকলেন নিজে-নিজে, তাতে কোন ফল হচ্ছিল না; কেউ-কেউ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক মতধারায় শামিল হন, আর অন্যান্যরা সম্ভ্রান্ত বুর্জোয়া নাগরিক বনে যান।

যা-ই হোক, ফ্রান্সে এবং কিছু পরিমাণে অন্যান্য দেশেও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার ভবিষ্য বিকাশের ক্ষেত্রে সাঁ-সিমোঁবাদের প্রভাব পড়েছিল বিপুল। তাঁদের ধর্মটার দোষ-ত্রুটিগুলো সত্ত্বেও সাঁ-সিমোঁবাদীদের ছিল বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বলিষ্ঠ অবিচলিত কর্মসূচি, এতেই ছিল তাঁদের বল।

শার্ল ফুরিয়েের কঠিন জীবন

'সাঁ-সিমোঁর ক্ষেত্রে যেখানে দেখা যায় দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক প্রসার, যার ফলে পরবর্তী সমাজতন্ত্রীদের যেসব ভাব-ধারণা যথাযথভাবে আর্থনীতিক নয় সেগুলির প্রায় সবই তাঁর মাঝে দেখা যায় প্রাথমিক আকারে,' লিখেছেন এঙ্গেলস, 'সেখানে ফুরিয়েের বেলায় দেখা যায় সমাজের বিদ্যমান অবস্থার সমালোচনা, যেটা খাঁটি ফরাসী এবং কৌতুকী, কিন্তু তাই বলে একটুও কম পূর্ণাঙ্গ নয়। ...ফুরিয়ে সমালোচকই শুধু নন; অবিচলিত শান্ত-সমাহিত প্রকৃতির ফলে তিনি ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক — সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-সাহিত্যিকদের একজন নিঃসন্দেহে।'* ভবিষ্য সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংগঠন সম্বন্ধে বহু চমৎকার ভাব-ধারণারও প্রণেতা হলেন ফুরিয়ে। গোড়ার দিককার একটা প্রবন্ধে এঙ্গেলস লিখেছিলেন, ফুরিয়ে সম্প্রদায়ের 'বিজ্ঞানসম্মত বিচার-বিশ্লেষণ, ধীর-স্থির বদ্ধধারণামুক্ত প্রণালীবদ্ধ চিন্তন, এককথায়

* কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, তিন-খণ্ডে 'নির্বাচিত রচনাবলি', ৩ খণ্ড, মস্কো, ১৯৭৩, ১২১-১২২ পৃঃ।

সমাজ-দর্শনের'* জন্যেই সেটা মূল্যবান। মার্কস এবং এঙ্গেলসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অগ্রদূত এই সমাজ-দর্শনই অর্থশাস্ত্র-বিজ্ঞানক্ষেত্রে ফুরিয়ের প্রধান অবদান।

সমাজবিদ্যা বিষয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে ফুরিয়ের রচনাগুলির অনন্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি পান্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধই শুধু নয়, অধিকন্তু ঝলমলে প্রচার-পুস্তিকা এবং আশ্চর্য প্রতিভাদীপ্ত কল্পনাচিত্র। অদ্ভুত প্রহেলিকার সঙ্গে ঝলমলে ব্যঙ্গ-কৌতুক, প্রায় অর্থহীন গল্পগাছার সঙ্গে ভাববাণী ধরনের দূরদর্শিতা, ভবিষ্য সমাজে জীবনের একঘেয়ে নিয়মনের সঙ্গে বিচক্ষণ সামান্যীকরণের মেশামিশি এইসব রচনায়। ফুরিয়ের প্রধান রচনাগুলি বেরবার পরে কেটে গেছে দেড়-শ' বছর। ফুরিয়ের রচনায় মানব-সমাজের রূপান্তর সম্বন্ধে যথার্থই দেদীপ্যমান ধ্যান-ধারণাগুলি থেকে রহস্য আর অমূলক কল্পকথা পৃথক করে দিয়েছে জীবন আপনিই।

শার্ল ফুরিয়ের জন্ম হয় ১৭৭২ সালে বেজানসোঁ-তে। ছেলেটির বয়স যখন ন'বছর তখন বাবা মারা যান, তিনি ছিলেন ধনী ব্যাপারী। পরিবারে একমাত্র ছেলে বলে বাবার বিত্ত-সম্পত্তি আর কারবারের একটা মোটা অংশের দায়াদ হতেন তিনিই। কিন্তু পরিবেশ আর পরিবারের সঙ্গে শার্ল ফুরিয়ের বিরোধ বাধে খুব অল্প বয়সেই। ব্যবসা-ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত প্রতারণা-জুয়াচুরি দেখে তাঁর ঘৃণা হয়েছিল ছেলেবেলায়ই।

ফুরিয়ে শিক্ষালাভ করেন বেজানসোঁ জেসুইট কলেজে। বিজ্ঞান সাহিত্য আর সংগীতে তিনি বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন। কলেজে পড়া শেষ হলে তিনি সামরিক ইঞ্জিনিয়রিং স্কুলে ভরতি হতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা পারেন নি। তখন থেকে ফুরিয়ের জ্ঞানের প্রসার ঘটাবার একমাত্র উপায় ছিল নিজে পড়া। কিছু-কিছু গুরুতর ফাঁক থেকে গিয়েছিল তাঁর শিক্ষায়, সেটা প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর রচনায়। বিশেষত, ইংরেজ আর ফরাসী অর্থনীতিবিদদের রচনা তিনি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন নি। তাঁদের ভাব-ধারণা সম্বন্ধে তিনি জানতে পেরেছিলেন বেশকিছুটা পরে, তাও অন্যান্যের মারফত — পত্র-পত্রিকার প্রবন্ধাদি এবং আলাপ-আলোচনা থেকে। বিভিন্ন আর্থনীতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার চেষ্টাও তিনি করেন নি, সেগুলোর

* Karl Marx und Friedrich Engels, 'Werke', Bd. I, Berlin, 1969, S. 483.

মূলভাবটাকেই তিনি স্রেফ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; তাঁর বিবেচনায় সেটা ছিল নোংরা 'সভ্যতা-ব্যবস্থা'র অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রের ডাহা সাফাই-গাওনা।

দীর্ঘ ঝগড়াঝাঁটি এবং অবাধ্য হবার চেষ্টার পরে আঠার বছর বয়সে ফুরিয়ে পরিবারের চাপে নতিস্বীকার করে লিয়োঁতে একটা প্রকান্ড বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিসি শুরু করেন। তাঁর জীবনের বেশ কিছুকাল কেটেছিল এই শিল্পসমৃদ্ধ শহরটিতে; প্রধানত লিয়োঁর সামাজিক সম্পর্কতন্ত্র পর্যবেক্ষণ করা থেকেই গড়ে উঠেছিল তাঁর সামাজিক-আর্থনীতিক ধ্যান-ধারণা। বাবার সম্পত্তির একাংশ উত্তরাধিকারসূত্রে পাবার পরে ফুরিয়ে খুলেছিলেন নিজের বাণিজ্য কারবার।

ফুরিয়ের তরুণ বয়সে আসে বিপ্লব। মস্ত-মস্ত ঐতিহাসিক ঘটনায় যেন তাঁর বড় একটা আগ্রহ ছিল না তার আগে, কিন্তু ১৭৯৩ সালের প্রচন্ড ঘটনাবলি মস্ত আলোড়ন জাগাল এই তরুণ ব্যাপারীর জীবনে। জ্যাকবিন কনভেন্টের বিরুদ্ধে লিয়োঁর অভ্যুত্থানের সময়ে ফুরিয়ে ছিলেন বিদ্রোহীদের কাতারে, আর তাদের আত্মসমর্পণের পরে — জেলে। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। তিনি জেল থেকে বেরতে পেরেছিলেন, তখন ফিরে যান জন্মস্থান বেসানসোঁ-তে। মনে হয় তরুণ ফুরিয়ে প্রতিবিপ্লবে শামিল হন প্রত্যয় অনুসারে নয়, পরিস্থিতির ফেরে। বিদ্রোহীদের বাহিনীতে যোগ দিতে তাঁকে সম্ভবত বাধ্য করা হয়েছিল। অচিরেই বৈপ্লবিক বাহিনীতে শামিল হয়ে তিনি প্রজাতন্ত্রের খিদমত করেছিলেন আঠার মাস ধরে। স্বাস্থ্যের কারণে সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে (স্বাস্থ্য তাঁর খারাপ ছিল সারা জীবন) তিনি একটা বাণিজ্য কারবারে ক্যানভ্যাসারের কাজ পান, আর পরে হন লিয়োঁতে একটি খুদে বাণিজ্য-দালাল। এই সময়ে তিনি ফ্রান্সের সর্বত্র বিস্তর সফর করেন এবং ডিরেক্টরি আর কনসুলাৎ-এর আমলের দেশের আর্থনীতিক আর রাজনীতিক জীবন পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। তিনি দেখতে পান সামাজিক মইখানার উপর-ধাপে অভিজাতদের জায়গায় এল নতুন বড়লোকেরা — ফৌজে যোগানদার, ফটকাবাজ, শেয়ারের দালাল, ব্যাঙ্কার, ইত্যাদিরা। 'সভ্যতা-ব্যবস্থা' যে-নতুন পর্বে প্রবেশ করল তাতে জনসমষ্টির সবচেয়ে বড় অংশটার জন্যে নতুন-নতুন ক্লেশ আর বঞ্চনাই পয়দা হল শুধু।

ফুরিয়ের বয়স যখন তিরিশ তখন তিনি এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত করেন যে,

সমাজ-সংস্কারই তাঁর জীবনের কর্মব্রত। তিনি বলেন, যেসব অসম্ভব-আজগবি আর্থনীতিক ব্যাপার তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন সেগুলো নিয়ে ভাবতে গিয়েই তাঁর ঐ প্রত্যয় জন্মে সরাসরি। ১৮০৩ সালে ডিসেম্বর মাসে লিয়োঁতে একটা পত্রিকায় প্রকাশিত 'সর্বব্যাপী সমন্বয়'-শীর্ষক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তিনি নিজের 'আশ্চর্য আবিষ্কার'টার কথা বলেন। তিনি লেখেন, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রণালীগুলির ভিত্তিতে তিনি উদ্‌ঘাটন করবেন (কিংবা ইতোমধ্যে উদ্‌ঘাটন করেছিলেন) 'সামাজিক গতির নিয়মাবলি', যেমন কিনা অন্যান্য বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছিলেন 'ভৌত গতির নিয়মাবলি'। ১৮০৮ সালে লিয়োঁতে 'Théories des quatre mouvements et des destinées générales' ('চার গতি এবং সাধারণ নিয়তি')* নামে প্রকাশিত অনামী লেখা বইয়ে ফুরিয়ের ধ্যান-ধারণা বিবৃত হয় আরও পুরোপুরি।

এই রচনার ধরনটা অদ্ভুত হলেও এতেই ছিল ফুরিয়ের 'সমাজবদ্ধতা (societary) পরিকল্পনা'র মূল উপাদানগুলি; এটা ছিল বুর্জোয়া সমাজকে ভবিষ্য 'সমন্বিত বর্গ'-তে রূপান্তরিত করার জন্যে ফুরিয়ের পরিকল্পনা। পুঁজিতন্ত্রকে যাঁরা মানবজাতির স্বাভাবিক এবং চিরস্থায়ী অবস্থা বলে বিবেচনা করতেন সেইসব দার্শনিক আর অর্থনীতিবিদ তাঁদের পালটা অবস্থান থেকে ফুরিয়ে বললেন: 'অন্তর্বর্তীকালে, এই যে-সভ্যতা সঙ্গে নিয়ে এসেছে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট এটার চেয়ে ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে আর কোন্‌টা? এটার আবশ্যকতা এবং ভবিষ্য চিরস্থায়িত্বের চেয়ে অনিশ্চিত হতে পারে আর কিছু? সম্ভাবনীয় তো এমনই যে, এটা হল সমাজ-বিকাশের একটা পর্ব মাত্র?'** 'সমাজবদ্ধতার বর্গ... আসবে সভ্য অসম্বদ্ধতার পরে।'***

ফুরিয়ের বইখানা বড় একটা কারও নজরে পড়ল না, কিন্তু তাতে তিনি

---

* ফুরিয়ে মনে করতেন, প্রকৃতি আর মানবজাতির নিয়মাবলির ব্যাখ্যা দিতে হলে ভৌত, জৈব, প্রাণী এবং সামাজিক এই চার রকমের গতি বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই রকমের নানা অস্পষ্ট প্রণালীবদ্ধতা এবং শ্রেণীবিভাগে প্রবৃত্ত হতে ফুরিয়ের খুব ভাল লাগত, তার অনুরূপ অন্যান্য দৃষ্টান্ত রয়েছে তাঁর রচনাগুলি জুড়ে।

** 'Oeuvres complètes de Charles Fourier', t. I, Paris, 1846. p. 4.

*** ঐ, ৯ পৃঃ।

দমে গেলেন না। ভাব-ধারণাগুলিকে তিনি বিস্তারিত করতেই থাকলেন। ১৮১১ সালে তিনি একটা সরকারী চাকরি পান, আর মায়ের উইল অনুসারে অল্প পরিমাণের একটা ভাতা পান ১৮১২ সালে — তাই তাঁর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। ১৮১৬-১৮২২ সালে তিনি থাকতেন লিয়োঁ থেকে অনতিদূরে মফস্বলে। তাঁর অনুগামী জুটতে থাকে। জীবনে সেই প্রথম তিনি কিছুটা শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় অধ্যয়নের সুযোগ পান। এই অধ্যয়নের ফল হল ১৮২২ সালে প্যারিসে প্রকাশিত তাঁর বিস্তৃত রচনা — 'Traité de l'association domestique et agricole' ('আবাস এবং কৃষি পরিমেল সম্পর্কে নিবন্ধ')। ফুরিয়ের মারা যাবার পরে প্রকাশিত তাঁর সংগৃহীত রচনাবলিতে এই বইখানার নাম 'Théorie de l'unité universelle' ('সর্বজনীন ঐক্যতত্ত্ব')।

বিভিন্ন কর্মি-পরিমেলের সংগঠন কেমন হবে সেটা সবিস্তারে তুলে ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন ফুরিয়ে; তিনি এই পরিমেলের নাম রাখেন **ফ্যালাংক্স** (phalanx)। এক-একটা ফ্যালাংক্স যে-বাড়িতে থাকবে, কাজ করবে, অবসর-বিনোদন করবে তার নাম তিনি দেন **ফ্যালেন্‌স্তেরি** (phalanstere)। ফুরিয়ের আশা ছিল বিভিন্ন পরীক্ষামূলক ফ্যালাংক্স স্থাপিত হবে অবিলম্বে — বিদ্যমান সমাজব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন ছাড়াই। যখন তিনি প্যারিসে থাকতেন তখন তিনি প্রতিদিন বাড়িতে থাকতেন একটা ঘোষিত সময়ে; তিনি অতি-সরলমনে ভাবতেন ধনী দাতারা ঐ সময়ে গিয়ে টাকা দেবেন, তাই দিয়ে তৈরি করা হবে ফ্যালেন্‌স্তেরি। অমন কোন ধনী দাতা অবশ্য দেখা দেয় নি।

রুজি-রোজগারের জন্যে ফুরিয়েকে আবার আপিসের চাকরি করতে হয় প্যারিসে আর লিয়োঁতে। বন্ধুবান্ধব এবং অনুগামীদের সাহায্যের কল্যাণে তিনি এই বিরক্তিকর অবলম্বন থেকে নিষ্কৃতি পান শুধু ১৮২৮ সালে। বেসানসোঁতে চলে গিয়ে তিনি একখানা বই লেখা শেষ করেন; এই বইখানা নিয়ে তিনি খাটছিলেন কয়েক বছর ধরে। 'Neouveau Monde industriel et sociétaire' ('নতুন শিল্প-সমাজ জগৎ') (১৮২৯) নামে এই বইখানা তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। তাঁর প্রথম-প্রথম সাহিত্যিক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল তার বছর-পঁচিশেক আগে। পুঁজিতন্ত্র বিকাশের ধারায় বিপুল পরিমাণ নতুন মালমশলা জুটেছিল তাঁর সমালোচনার জন্যে। তার সঙ্গে সঙ্গে, ভবিষ্য সমাজ সম্বন্ধে ফুরিয়ের অভিমতও বিকশিত হয়েছিল, সেটাকে

তিনি বিবৃত করেছিলেন আরও জনবোধ্য আকারে, আগেকার হেঁয়ালি তাতে ছিল না।

ফুরিয়ের জীবনের শেষ বছরগুলি কাটে প্যারিসে। তাঁর খেটে কাজ করা চলতেই থাকে; খুঁতখুঁতে গুরুমশাইয়ের মতো তাঁর দৈনিক কোটা-পূরণ চলতে থাকে। এই খাটুনির ফল হল আর-একখানা বড় বই, বিভিন্ন ফুরিয়েপন্থী পত্র-পত্রিকায় একগুচ্ছ প্রবন্ধ এবং বহু পান্ডুলিপি যেগুলি প্রকাশিত হয় তিনি মারা যাবার পরে। সামাজিক, আর্থনীতিক, নৈতিক, শিক্ষা, ইত্যাদি বহু প্রশ্ন নিয়ে তিনি বিচার-বিবেচনা করেন এইসব রচনায়। স্বাস্থ্য অনেকটা খারাপ হয়ে পড়লেও তাঁর মন কাজ করে চলছিল অবিরাম, তাতে সৃজনী কর্মশক্তি ছিল বিপুল। ১৮৩৭ সালে অক্টোবর মাসে প্যারিসে মারা যান শার্ল ফুরিয়ে।

১৮৩০ সালের পর বেশ প্রবল ফুরিয়েপন্থী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, কিন্তু শেষের দিককার বছরগুলিতে ফুরিয়ে নিজে হয়ে পড়েছিলেন অত্যন্ত নিঃসঙ্গ। শিষ্যদের অনেকের কাছ থেকে তিনি ক্রমেই বেশি-বেশি পরিমাণে দূরে সরে গিয়েছিলেন — তাঁরা বলিষ্ঠ মতবাদটিকে জলো করে নিস্তেজ সংস্কারবাদে পর্যবসিত করতে চেষ্টা করেন। তাঁর প্রকৃতিটাকে বরদাস্ত করা অনেকের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছিল: বার্ধক্য আর অসুস্থতার দরুন তাঁর সন্দিগ্ধ এবং একগুঁয়ে হবার ঝোঁকটা আরও প্রবল হয়ে উঠেছিল।

বুর্জোয়া কান্ডজ্ঞানের বিবেচনাধারায় ফুরিয়ে অবশ্য ছিলেন সাঁ-সিমোঁর মতো প্রায় উন্মাদ। কোন-কোন রসিকব্যক্তি মহান দু'জন ইউটোপিয়ানের নামের ভিন্নার্থ ব্যবহার করে কৌতুক করেছিলেন (saint — পুণ্যাত্মা, fou — উন্মাদ ব্যক্তি)। কিন্তু তিনি ছিলেন এমন একজন উন্মাদ যাঁর সম্বন্ধে বেরাঁঝে বলেছিলেন: 'মহাশয়গণ! পবিত্র সত্যের পথ সন্ধানে দুনিয়া যদি অক্ষম হয়, তাহলে মানবজাতির সোনালী ঘুম ভাঙ্গাতে পারবে যে উন্মাদ সে-ই সম্মানিত জন!'*

শার্ল ফুরিয়ের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে উন্মত্ত ছিল সেই জগৎটা যেখানে তাঁর বাস এবং কাজ।

---

* P.-J. Beranger, 'Oeuvres choisies', Moscou, 1956, p. 136.

মানব-সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক সাধারণ নিয়মটাকে তুলে ধরার প্রতিভাদীপ্ত চেষ্টা করেন ফুরিয়ে। মানবজাতি পৃথিবীতে দেখা দেবার সময় থেকে ভবিষ্য সমন্বিত সমাজ অবধি মানবজাতির ইতিহাসটাকে তিনি দেখেছিলেন এইভাবে*:

উৎপাদন ক্রিয়াকলাপের পূর্ববর্তী বিভিন্ন কালপর্যায়	১। আদিম, যেটাকে বলা হয় ইডেন ২। বন্য জীবন বা জড়তা
খন্ড-বিখন্ড, অসৎ, অপ্রীতিকর উৎপাদন	৩। প্যাট্রিয়ার্কাট, ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদন ৪। বর্বর অবস্থা, মাঝারি আয়তনের উৎপাদন ৫। সভ্যতা, বৃহদায়তনের উৎপাদন
সোসাইটারি, আদত, প্রীতিকর উৎপাদন	৬। গ্যারাণ্টিজম, আধা-পরিমেল ৭। সোশ্যাণ্টিজম, সরল পরিমেল ৮। সমন্বয়বাদ, যৌগিক পরিমেল

সভ্যতার কালপর্যায়টাকে ফুরিয়ে ভাগ করেছেন চারটে পর্বে। প্রথম দুটো হল মোটামুটি দাস-মালিকানা আর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, আর ফুরিয়ের আমলের অবাধ প্রতিযোগিতার পুঁজিতন্ত্র হল তৃতীয়টা।

দেখা যাচ্ছে, মানব-সমাজ বিকাশের প্রধান পর্বগুলিকে ফুরিয়ে স্পষ্ট তুলে ধরেছেন শুধু তাই নয়, অধিকন্তু প্রত্যেকটাকে সংশ্লিষ্ট করেছেন সেটায় উৎপাদনের অবস্থার সঙ্গে। সেটা করতে গিয়ে তিনি সামাজিক-আর্থনীতিক বিন্যাস সম্বন্ধে মার্কসের প্রবর্তিত ধারণার পথ প্রস্তুত করেন। এঙ্গেলস

---

* 'Oeuvres complètes de Charles Fourier', t. 6, Paris, 1848, p. XI.

লিখেছেন, সমাজের ইতিহাসটাকে বুঝেছিলেন ফুরিয়ে, এতেই সবচেয়ে স্পষ্ট প্রকাশ পায় তিনি ছিলেন কত বড়।

সভ্যতার চতুর্থ পর্ব নিয়ে বিচার-বিবেচনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সবচেয়ে চমৎকার একটা পূর্ব-সংকেত: পুঁজিতন্ত্র থেকে সেটার একচেটে পর্বে উত্তরণটা পূর্বদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, যদিও কিছুটা অদ্ভুত আকারে, সেটাকে তিনি বলেন বানিয়া সামন্ততন্ত্র। ফুরিয়ে দেখান যে, অবাধ বাণিজ্য সাধারণ নিয়ম অনুসারেই সেটার বিপরীতটায় পরিণত হয়, আসে একচেটে, এটাকে তিনি চিত্রিত করেন প্রধানত 'নব্য সামন্ত মনিবদের' হাতে বাণিজ্য আর ব্যাঙ্কিংয়ের একচেটে আকারে — এতে তিনি দ্বান্দ্বিক চিন্তনের লক্ষণীয় ক্ষমতার পরিচয় দেন।

পুঁজিতন্ত্রকে ফুরিয়ে বলেন 'ভিতর-বার ওলটানো দুনিয়া', সেটার বিরুদ্ধে তিনি হাজির করেন অভিযোগপত্র; সাহস আর প্রগাঢ়তার দিক থেকে সেটার জুড়ি ছিল না তখনকার দিনে, আমাদের একালে অবধি সেটার তাৎপর্য বজায় রয়েছে অংশত। কিন্তু এতে ছিল যেমন তাঁর বল তেমনি দুর্বলতাও। পুঁজিতন্ত্রের দুষ্ক্রিয়াগুলো বিবৃত করতে গিয়ে তিনি সেগুলোর জড় বের করতে পারেন নি, কেননা বুর্জোয়া সমাজের উৎপাদন-সম্পর্কতন্ত্র এবং শ্রেণীগত গঠন সম্বন্ধে স্পষ্ট উপলব্ধি তাঁর ছিল না। সাঁ-সিমোঁর মতো ফুরিয়েও মনে করতেন উদ্যোগী শিল্পপতিরা আর মজুরি-করা লোকেরা একই মেহনতী শ্রেণীর মানুষ।* তার থেকে আসে তাঁর এই অতি-সরল ভাববাদী বিশ্বাসটা: বিচারবুদ্ধির কল্যাণে, বিশেষত কর্তৃপক্ষ তাঁর মতবাদ গ্রহণ করার ফলে সমাজের শান্তিপূর্ণ রূপান্তর সম্ভব।

রুজি রোজগারের জন্যে বাধ্য হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে কাজ করে পুঁজিতান্ত্রিক বাণিজ্য সম্বন্ধে নিদারুণ ঘৃণা জন্মেছিল ফুরিয়ের মনে। বাণিজ্য আর ব্যাপারী-বণিকদের দুষ্কর্ম, ঠকামি আর নীচতা খুলে ধরে তিনি শত-শত পৃষ্ঠা লিখেছেন তাঁর রচনাগুলিতে। তিনি মনে করতেন বাণিজ্য পুঁজি আর অর্থ-পুঁজিই বুর্জোয়া সমাজে শোষণ আর পরজীবিবৃত্তির প্রধান কারণ। ফুরিয়ে লক্ষ্য করেন নি যে, বাণিজ্য পুঁজি

* ঠিক বটে কল-কারখানা মালিকদের তিনি ধরেছিলেন 'সমাজদেহে পরজীবী'দের বর্গে, তবে সেটা শুধু এই দিক থেকে যে, তাদের 'একেবারে অর্ধেকেই' নিরেস মাল তৈরি করে এবং সমাজ আর রাষ্ট্রকে ফাঁকি দেয়।

হল শিল্পক্ষেত্রের পুঁজিরই একটা রকমফের; সেটার স্বাধীনতা আর গুরুত্ব যা-ই হোক, পুঁজিতন্ত্রের আমলে সেটার ভূমিকা গৌণ, এটা অবধারিত।

ফুরিয়ে বলেছেন, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন হল সমাজবিরোধী, অসংলগ্ন, খন্ড-বিখন্ড। সেটা কোন্ দিক থেকে? বুর্জোয়া উৎপাদনের একমাত্র এবং গোটা লক্ষ্য হল উদ্যোগী মালিকের লাভ — সমাজের প্রয়োজন মেটানো নয়। কাজেই পৃথক-পৃথক পণ্য-উৎপাদক এবং সমাজের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত হল পুঁজিতন্ত্রের একটা নিত্য-উপাদান। অর্থনীতিবিদেরা যা বলেন তা নয়, — শিল্প-মালিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সমাজের স্বার্থের আনুকূল্য করে না, বরং উৎপাদনে অরাজকতা, বিশৃংখলা আর যার-যার তার-তার আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে সমাজের সর্বনাশই করে। মুনাফামৃগয়া আর প্রতিযোগিতার ফলে মজুরি-শ্রমিকদের উপর বিকট শোষণ দেখা দেয়। ইংলন্ডের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় কোথায় যাচ্ছে পুঁজিতন্ত্র, — সেখানে প্রকান্ড-প্রকান্ড কল-কারখানায় খেটে প্রাপ্তবয়স্ক আর অপ্রাপ্তবয়স্ক মজুরেরা পায় মুষ্টিভিক্ষার মতো যৎকিঞ্চিৎ।

ফুরিয়ে দেখলেন ধন-দৌলত আর দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে-চলা ব্যবধান, আর প্রাচুর্যের মাঝে নিঃস্বতা হল অবাধ প্রতিযোগিতা নীতির পতাকী বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের নিয়তিনির্দিষ্ট পতনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। তিনি লিখেছেন, সিস্মন্দি এইসব তথ্য অন্তত স্বীকার করেছিলেন এবং সেটা করতে গিয়ে 'স্পষ্টাস্পষ্টি বিশ্লেষণের দিকে প্রথম পদক্ষেপ' করেন, কিন্তু তিনি 'আধা-স্বীকৃতি' থেকে আর এগন নি। সে' কিন্তু তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে অর্থশাস্ত্রের প্রামাণিকতা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা পেরে ওঠেন নি। অর্থনীতিবিদদের সম্বন্ধে ফুরিয়ের বহু শাণিত উক্তির একটা এই: 'অর্থনীতিবিদদের থেকে শুরু করে আরও কত পরজীবী আছে কুতার্কিকদের মধ্যে যারা যে-পরজীবিবর্গের ধ্বজী সেটার বিরুদ্ধে গলাবাজি করে।'*

সমাজের গঠন আর কল্যাণ আখেরে নির্ধারণ করে শ্রম, শ্রম-সংগঠন এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা। এটা বুঝে ফুরিয়ে একখানা আশ্চর্য ছবির মতো বর্ণনা করেছেন কিভাবে শ্রম লুণ্ঠিত হয়, শ্রমকে দাসদশাগ্রস্ত করা হয় পুঁজিতন্ত্রের আমলে। শ্রমকে মানুষের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ থেকে, আনন্দের একটা আকর থেকে বালাই আর অভিশাপে পরিণত করেছে

* Charles Fourier, 'Oeuvres choisis', Paris, 1890, pp. 64-65.

'সভ্যতা ব্যবস্থা'। এই সমাজে যাদের সাধ্যে কুলোয় তারা কাজ এড়িয়ে চলে সংগত-অসংগত যেকোন উপায়ে। খুদে মালিকদের — কৃষক, কারিগর, এমনকি শিল্প-মালিকদেরও — শ্রম হল প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম, নিরাপত্তার অভাব, পরমুখাপেক্ষিতা। কিন্তু ঢের-ঢের বেশি দুঃসাধ্য হল মজুরি-শ্রমিকের শ্রম, বাধ্য হয়ে করা শ্রম, যা মানুষকে কোন আত্মপ্রসাদ দিতে পারে না। উৎপাদন প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, বৃহৎ পুঁজির হাতে উৎপাদন কেন্দ্রীভূত এবং বশীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই ব্যাপকতর হয়ে ওঠে এই ধরনের শ্রম।

গোড়ার দিককার কয়েকটি রচনায় মার্কস পরকীয়তা-সংক্রান্ত ধারণাটাকে বিবৃত করেছিলেন। এটা হল পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে মানুষের শ্রমফল থেকে এবং সমাজের নিয়তি থেকে মানুষের পরকীয়তা; যাতে মানুষ হয়ে পড়ে শিল্প দানবের তুচ্ছ উপাঙ্গ। ফুরিয়ের ধারণার ছাপ এখানে স্পষ্টই; তাছাড়া এক জায়গায় মার্কস পরকীয়তা-সংক্রান্ত প্রশ্নটাকে সরাসরি ফুরিয়ের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেন।*

ফুরিয়ে পুঁজিতন্ত্রের শুধু আর্থনীতিক দোষ-ত্রুটিগুলোর কঠোর সমালোচনা করেন তা নয় মোটেই; তিনি পুঁজিতন্ত্রের রাজনীতি, নৈতিকতা, সংস্কৃতি এবং শিক্ষাব্যবস্থারও কঠোর সমালোচনা করেন। পুঁজিতন্ত্র কিভাবে নারী-পুরুষের মধ্যকার স্বাভাবিক, মনুষ্যোচিত সম্পর্কটাকে বিকৃত করে ফেলে এবং অধস্তন, উৎপীড়িত দশায় ফেলে দেয় নারীকে, সে-সম্বন্ধে তিনি লেখেন বিশেষত বিস্তর এবং কঠোর ভাষায়।

সমাজ বিকাশের বিভিন্ন কালপর্যায় ফুরিয়ে যেভাবে লক্ষ্য করেছিলেন তৎসংক্রান্ত ছকটার কথা আবার তোলা হচ্ছে। সভ্যতা আর সমন্বয়বাদের মাঝখানে দুটো উত্তরণ-কালপর্যায় ধরে তিনি নাম দিয়েছেন, **গ্যারাণ্টিজম** আর **সোশ্যাণ্টিজম**। তিনি বহু বার বলেছেন, সভ্যতা-ব্যবস্থার কয়েকটা আংশিক সংস্কার মাত্র নয় — এই ব্যবস্থাটাকে খতম করে মূলভিত্তির দিক থেকেই ভিন্ন সমাজ গড়াই তাঁর লক্ষ্য। তবু যেহেতু উত্তরণের বৈপ্লবিক পন্থাটাকে তিনি বাদ দিয়ে রাখেন এবং ঐ পন্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপুল দুষ্করতার কথা বিবেচনায় রাখেন, তাই তিনি আপসে সম্মত হন এবং

* কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, 'সংগৃহীত রচনাবলি', ৩ খণ্ড, ২৯৩-২৯৪ পৃঃ।

ধরে নেন যে, সমন্বয়বাদ গড়তে সভ্যতা-ব্যবস্থার মানুষের লাগবে কমবেশি দীর্ঘকাল।

প্রথম উত্তরণ-কালপর্যায় গ্যারাণ্টিজমের মূল উপাদানগুলিকে ফুরিয়ে যেভাবে ভেবেছিলেন সেটা এখানে দেওয়া হচ্ছে। ব্যক্তিগত মালিকানায় বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটবে না, কিন্তু সেটাকে সমষ্টিগত স্বার্থ আর নিয়ন্ত্রণের অধীন করা হবে। যৌথ কাজের জন্যে এবং আহার, অবসর-বিনোদন, ইত্যাদির জন্যেও দেখা দেবে বিভিন্ন পরিবার-সমষ্টি মিলিয়ে গড়া পৃথক-পৃথক পরিমেল। এইসব পরিমেলে শ্রম থেকে পুঁজিতান্ত্রিক মজুরি-শ্রমের ধরনধারনগুলো মিলিয়ে যাবে ক্রমে-ক্রমে। আর্থনীতিক অসমতা থাকবে। সমাজের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিযোগিতা হয়ে উঠবে সাধু এবং সরল। মস্ত-মস্ত সামাজিক প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে, বিশেষত বস্তি লোপ করার কাজ; নতুন করে নির্মিত হবে শহরগুলি। ফুরিয়ের সমস্ত ইউটোপিয়ায় যেমন তেমনি গ্যারাণ্টিজমেও রাজনীতিক কাঠামে বিস্তৃত পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। নিরঙ্কুশ কিংবা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে, প্রজাতন্ত্রে, কিংবা অন্য যেকোন ব্যবস্থায় সেটা শুরু হতে পারে।

ফুরিয়ে মনে করতেন গ্যারাণ্টিজমের কোন-কোন পূর্বশর্ত গড়ে উঠছিল সভ্যতা-ব্যবস্থার ভিতরেই — 'সভ্যতা-ব্যবস্থার মূলভাবটা'র গতি সেই দিকেই ছিল। গ্যারাণ্টিজমে উত্তরণটাকে রোধ করছিল শুধু লোকের নানা বিভ্রান্তি, বিশেষত বুর্জোয়া সমাজবিদ্যার প্রভাব। অন্য দিকে, গ্যারাণ্টিজম প্রতিষ্ঠিত হলে বিশ্বমানব এই নতুন সমাজব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হবে অচিরে, আর গ্যারাণ্টিজম বিশ্বজনকে প্রস্তুত করবে পূর্ণ পরিমেলের জন্যে।

তবে ফুরিয়ের গ্যারাণ্টিজমকে দেখা যেতে পারে অন্যভাবেও: পুঁজিতন্ত্র লোপ করার প্রস্তুতি হিসেবে নয়, — উন্নতি ঘটিয়ে পুঁজিতন্ত্রকে 'চলনসই' করে তোলার সংস্কার-সমষ্টি হিসেবে। সেক্ষেত্রে ফুরিয়ের মতবাদটা হয়ে দাঁড়ায় মামুলি সংস্কারবাদ, আর সেটা স্থান পায় যেন সেইসব ধ্যান-ধারণার পাশে যার থেকে পয়দা হয় বুর্জোয়া 'কল্যাণ-রাষ্ট্রের' আধুনিক ধারণা আর চলিতকর্ম। ফুরিয়ের ভাব-ধারণার এমন ব্যাখ্যায় প্রতিবাদ তুলতেন তিনি নিজে — তবে সেই ব্যাখ্যাই দেন তাঁর অনুগামীদের অনেকে।

উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে এবং তার চেয়ে একটু কম পরিমাণে পঞ্চম দশকে ফুরিয়েবাদ ছিল ফ্রান্সে প্রধান সমাজতান্ত্রিক মতধারা। সাঁ-সিমোঁবাদের

চেয়ে এটার জীবনীশক্তি বেশি প্রতিপন্ন হল, কেননা এতে ছিল না অন্যটার ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িক প্রকৃতি, আর এটা তুলে ধরেছিল অপেক্ষাকৃত আশু এবং বাস্তবতাসম্মত বিভিন্ন আদর্শ — বিশেষত ফ্যালাংক্স আকারের উৎপাদক-ব্যবহারক সমবায় সমিতি। তবে ফুরিয়ের মতবাদ ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সমর্থন পেয়েছিল ক্ষীণ, আর বহুবিস্তৃত হয়েছিল প্রধানত তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে।

১৮৪৮ সালের বিপ্লব ফুরিয়েপন্থীদের এনে ফেলে রাজনীতিক কর্মক্ষেত্রে, সেখানে তাঁরা দাঁড়ান পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাছাকাছি অবস্থানে। জুনের জন-অভ্যুত্থান তাঁরা সমর্থন করলেন না; এক বছর পরে তাঁরা লুই বোনাপার্টের সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, কিন্তু তাঁদের দমন করা হয় সহজেই। যে অল্প কয়েক জন ফুরিয়েপন্থী ফ্রান্সে ছিলেন তাঁরা পরে লাগেন সমবায়ের ক্রিয়াকলাপে। ফুরিয়েবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা নিঃশেষ হয়ে গেল। অজানতে হলেও বহু ক্ষেত্রে ফুরিয়ে ছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রবক্তা, কিন্তু খুদে আর মাঝারি বুর্জোয়াদের মতাবস্থানে দাঁড়ান তাঁর অনুগামীরা।

'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' ঘোষণা করল ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে দেখা দিয়েছে বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজম, নতুন বৈপ্লবিক বিশ্ববীক্ষা আর প্রলেতারিয়ান পার্টি, তার সঙ্গে সঙ্গে তাতে করে রায় জারি হয়ে গেল ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, বিশেষত ফুরিয়েবাদের বিরুদ্ধে। মার্কস এবং এঙ্গেলস লিখলেন: 'বৈচারিক-ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজমের তাৎপর্যটা ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে বিপরীত-অনুপাতী। যে-অনুপাতে আধুনিক শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে উঠে নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে, সেইভাবে এই সংগ্রাম থেকে সরে থাকার উদ্ভট ব্যাপারটার, এই সংগ্রামের উপর উদ্ভট বাক্-হামলাগুলোর যাবতীয় ব্যবহারিক তাৎপর্য এবং যাবতীয় তত্ত্বীয় যৌক্তিকতা লোপ পেয়ে যায়। তাই, এইসব তন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারা যেখানে অনেক দিক থেকেই ছিলেন বিপ্লবী, তাঁদের শিষ্যরা সর্বক্ষেত্রেই গড়েন স্রেফ প্রতিক্রিয়াশীল সেক্ট। পরবর্তীকালে প্রলেতারিয়েতের ইতিহাসক্রমিক বিকাশটাকে অগ্রাহ্য ক'রে এ'রা আঁকড়ে ধরে থাকেন গুরুদের সাবেকী বিবেচনাধারা। তাই তাঁরা চেষ্টা করেন, সমানে চেষ্টা করতে থাকেন শ্রেণীসংগ্রামটাকে ভোঁতা করে দেবার জন্যে এবং শ্রেণীবিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্যে। তখনও তাঁরা তাঁদের সামাজিক ইউটোপিয়ার পরীক্ষামূলক বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখেন, এখানে-ওখানে বিচ্ছিন্ন 'ফ্যালেন্স্তের' স্থাপনের স্বপ্ন দেখেন, আর শূন্যে এইসমস্ত সৌধ নির্মাণের জন্যে তাঁরা বাধ্য হয়ে আবেদন জানান বুর্জোয়াদের সহানুভূতি আর টাকার থলের উদ্দেশে।'*

ভবিষ্য চিত্র

সাঁ-সিমোঁ রেখে গেলেন ভবিষ্য সমাজব্যবস্থার চমৎকার সাধারণ রূপরেখা, আর সবকিছু নজরে রেখে সবিস্তারে আগামী সমাজের চিত্র ফুটিয়ে তুললেন ফুরিয়ে। ইউটোপিয়া-দুটি অনেক দিক থেকেই পৃথক-পৃথক, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান দুয়েতেই অভিন্ন: তাঁদের চিত্রিত সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং না-খেটে-করা আয় বিদ্যমান। তবে উভয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার রকমটা আমূল বদলে গিয়ে সেটা সমষ্টির স্বার্থের অধীন হচ্ছে, আর না-খেটে-করা আয়ে ক্রমে দেখা দিচ্ছে হকের আয়ের বিভিন্ন উপাদান।

সাঁ-সিমোঁ এবং ফুরিয়ের ইউটোপিয়া-দুটি এখনকার কালে নিজ-নিজ ধরনে মূল্যবান। কেন্দ্র থেকে পরিকল্পিত জাতীয় অর্থনীতি এবং সমষ্টিগত নীতি অনুসারে সেটার ব্যবস্থাপন-সংক্রান্ত ধারণাটা সাঁ-সিমোঁ এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে লক্ষণীয়, আর ফুরিয়ের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হল সমাজতান্ত্রিক সমাজের পৃথক-পৃথক সেল্-এ শ্রম আর জীবনযাত্রা সংগঠনের বিশ্লেষণ।

ফুরিয়ের ইউটোপিয়ার আর্থনীতিক দিকটা নিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। তাঁর ফ্যালাংক্স হল উৎপাদক-ব্যবহারক সমিতি, তাতে সাধারণ জয়েন্ট-স্টক কম্পানির বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে কমিউনের বিভিন্ন উপাদান। ফুরিয়ে ধরেছিলেন, বিভিন্ন কাজে ব্যাপৃত এক-একটা ফ্যালাংক্সে থাকবে কর্মীদের ছেলে-মেয়েরা সমেত মোট ১৫০০ থেকে ২০০০ জন। তিনি মনে করতেন, লোকের ঝোঁক আর উপযোগী ফল বিবেচনায় রেখে সর্বোপযোগী শ্রমবিভাগের জন্যে যা আবশ্যক এমনসব যোগ্যতার মানুষ থাকবে এমন সমষ্টিতে। কৃষি-উৎপাদন আর শিল্পোৎপাদন দুইই হবে ফ্যালাংক্সে, প্রথমটা হবে প্রধান। শিল্প বলতে ফুরিয়ে বুঝেছিলেন অপেক্ষাকৃত ছোট-ছোট কিন্তু খুবই উৎপাদী কর্মশালাগুলির জোট। সভ্যতা-ব্যবস্থার ফল হিসেবে কারখানা ব্যবস্থাটাকে তিনি একেবারেই প্রত্যাখ্যান করেন।

---

* কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, তিন খণ্ডে 'নির্বাচিত রচনাবলি', ১ খণ্ড, ১৩৫-১৩৬ পৃঃ।

ফ্যালাংক্সের উৎপাদনের উপকরণের প্রারম্ভিক তহবিলটা আসবে শেয়ারহোল্ডারদের চাঁদা থেকে। কাজেই ফ্যালাংক্সে পর্ুঁজিপতিদের থাকা চাই। গরিব মানর্ষও ফ্যালাংক্সের সদস্য হতে পারে, গোড়ায় তার শেয়ারহোল্ডার হবার দরকার নেই, সেক্ষেত্রে তার চাঁদা হবে শ্রম। শেয়ারের মালিকানা ব্যক্তিগত। ফ্যালাংক্সে মালিকানা অসম। কোন পর্ুঁজিপতি সদস্য হলে সে আর পর্ুঁজিপতি থাকে না সাবেকী অর্থে। সৃজনী শ্রমের সর্বাত্মক পরিবেশ তাকে টেনে নেয় সাক্ষাৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়ার মধ্যে। পরিচালক, ইঞ্জিনিয়র কিংবা বিজ্ঞানী হিসেবে যোগ্যতা থাকলে সমাজ তাকে সেই কাজে লাগিয়ে ব্যবহার করবে তার শ্রম। নইলে সে কাজ করবে নিজের পছন্দসই কোন 'সিরিজে' (ব্রিগেডে)। তবে বড়লোক আর গরিবদের সন্তানসন্ততি একই সর্স্থ পরিবেশে মানর্ষ হবে বলে পরবর্তী পর্রর্ষ-পর্যায়গর্লিতে মর্ছে যাবে এইসব পার্থক্য। ফ্যালাংক্স পরিচালনায় বড়-বড় শেয়ারহোল্ডারদের কিছর্-কিছর্ বিশেষ সর্যোগ থাকবে, কিন্তু পরিচালক-সংস্থায় তারা সংখ্যাগর্রর্ হতে পারে না, তাছাড়া, যা-ই হোক, খর্বই গণ্ডিবদ্ধ হবে এই সংস্থাটার ভূমিকা।

সামাজিক শ্রম সংগঠনের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেন ফুরিয়ে। তিনি আশা করেছিলেন একরকম শ্রম থেকে অন্য রকম শ্রমে অবিরাম লোক চালানের সাহায্যে পর্ুঁজিতান্ত্রিক শ্রম-বণ্টনের নেতিবাচক দিকগর্লো দর্র করা যাবে। একটাকিছর্ ন্যূনকল্প পরিমাণ জীবনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রত্যেকের জন্যে নিশ্চিত থাকবে, তার ফলে কারও শ্রম আর বাধ্যতামূলক থাকবে না — শ্রম হবে অবাধ ক্রিয়াকলাপের অভিব্যক্তি। শ্রমে প্রবর্তনা হবে একেবারে নতুন-নতুন রকমের: প্রতিযোগিতা, সামাজিক স্বীকৃতি, সৃজনের আনন্দ।

দ্রর্ত বেড়ে চলবে সমাজের সম্পদ আর আয় — সেটা প্রধানত শ্রমের উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধির কল্যাণে। তাছাড়া, পরজীবিবৃত্তি থাকবে না, কাজ করবে প্রত্যেকে। শেষে, সাবেকী সমাজে যা অপরিহার্য এমন বহর্ ক্ষয়-ক্ষতি আর অনর্ৎপাদী ব্যয় ফ্যালাংক্স এড়িয়ে চলবে। ফুরিয়ের বিবেচনায় এই ভবিষ্য সমাজ সত্যিকারের প্রাচুর্যের সমাজ, তেমনি সর্স্থ স্বাভাবিক আনন্দময় সমাজ। ভবিষ্য সমাজ-সংক্রান্ত ধারণাগর্লি প্রায়ই কৃচ্ছ্রতাসাধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকত, কিন্তু ফুরিয়ের কাছে সেটা ছিল একেবারেই পরকীয়।

মজর্রি-শ্রম এবং মজর্রির স্থান নেই ফ্যালাংক্সে। শ্রম পর্ুঁজি আর প্রতিভা অনর্সারে ফ্যালাংক্সের সদস্যদের দেওয়া হয় একটা বিশেষ ধরনের

ডিভিডেণ্ড (সেটা টাকায়) — এইভাবে চলে শ্রমফল বণ্টন। মোট নীট্ আয় বিভক্ত হয় তিন ভাগে: 'শ্রমে সক্রিয় অংশগ্রাহীরা' — ৫/১২, শেয়ারের মালিকেরা — ৪/১২, 'তত্ত্বীয় আর ব্যবহারিক জ্ঞান' যাদের আছে — ৩/১২। যেহেতু ফ্যালাংক্সের প্রত্যেকটি সদস্য সাধারণত এর দর্টো বর্গে থাকে, কেউ-কেউ তিনটেতেই, তাই তাদের আয় হয় বিভিন্ন আকার মিলিয়ে। কাজটার সামাজিক মর্ল্য অনর্সারে, কাজটা প্রীতিকর না অপ্রীতিকর তদনর্সারে ফ্যালাংক্সের প্রত্যেকটি সদস্যের শ্রম বাবত পারিশ্রমিক ভিন্ন-ভিন্ন। তবে সদস্যরা বিভিন্ন 'শ্রম সিরিজে' থাকে বলে সাধারণ (প্রধানত কায়িক) শ্রম বাবত পারিশ্রমিক মোটামর্টি সমান: যেমন, মালী হিসেবে কেউ গড় পরিমাণের চেয়ে কম পেলে সে সহিস কিংবা শর্য়োর চরাবার কাজে পায় গড়ের চেয়ে বেশি।

ফুরিয়ে ভেবেছিলেন বিভিন্ন রকমের শেয়ার বাবত বিষম ডিভিডেণ্ড চালর্ করে পর্ুঁজির হিস্সা কমিয়ে বণ্টনে শ্রমের আসল হিস্সাটা বাড়ান যাবে। ক্ষর্দ্র-ক্ষর্দ্র সঞ্চয় থেকে 'শ্রমিকদের শেয়ার' কেনা হবে সীমাবদ্ধ পরিমাণে: ফুরিয়ে বলেছিলেন এই শেয়ার বাবত ডিভিডেণ্ডের হার চড়া করা যেতে পারে, আর সেটা অনেক কম করা যেতে পারে পর্ুঁজিপতিদের সাধারণ শেয়ারগর্লো বাবত। ফুরিয়ে মনে করতেন অসমতার নীতির সাহায্যে সমাজের দ্রর্ত উন্নয়ন আর সমৃদ্ধি ঘটবে; তেমনি সর্বব্যাপী সমৃদ্ধি এবং হকের আয়ের পর্ববিতার আদর্শও ছিল তাঁর সমানই বাঞ্ছিত: এই দর্টোকে তিনি খাপ খাওয়াতে চেয়েছিলেন ঐসব প্রণালীতে। ব্যক্তিগত মালিকানা তিনি লোপ করতে চান নি, তিনি চেয়েছিলেন সমাজের সবাইকেই মালিকে পরিণত করতে, যাতে ব্যক্তিগত মালিকানার শোষণকর স্বধর্মটা এবং সর্বনাশা সামাজিক পরিণতি দর্র হয়। তিনি আশা করেছিলেন এইভাবে শ্রেণীবিরোধ মিলিয়ে যাবে অচিরে, আর বিভিন্ন শ্রেণী কাছাকাছি গিয়ে শেষে একত্রে মিলেমিশে যাবে।

ফ্যালাংক্স সদস্যদের আর্থিক আয় আদায় হবে বাণিজ্য মারফত জিনিসপত্র আর সার্ভিস দিয়ে — এই বাণিজ্য অবশ্য পর্রোপর্রিই থাকবে সমিতিগর্লির হাতে। ফ্যালাংক্সের তরফে কাজ ক'রে এই সংগঠন বাণিজ্য করবে অন্যান্য ফ্যালাংক্সের সঙ্গেও। পণ্য বিক্রির খর্চরো দাম বেঁধে দেবে সামাজিক সালিশেরা।

ভোগ-ব্যবহারের যর্ক্তিসম্মত সর্ব্যবস্থাকে ফুরিয়ে ভবিষ্য সমাজের

সবচেয়ে গ্রুত্বপূর্ণ একটা কাজ বলে মনে করতেন। এতেও তাঁর সামনে পড়ে সমষ্টিতন্ত্রের সঙ্গে অসমতাটাকে খাপ খাওয়াবার কঠিন কাজটা। এর নিষ্পত্তির জন্যে তিনি বাতলালেন এই উপায়টা: আলাদা-আলাদা গৃহস্থালি থাকবে না, তার জায়গায় আসবে সাধারণী পরিবেশন আর সার্ভিস, যা বিভিন্ন বর্গে সংগঠিত হবে লোকের সংগতি অনুসারে। ব্যক্তিগত বিলাসিতা হয়ে দাঁড়াবে অর্থহীন, হাস্যকর। সেটার জায়গায় আসবে সাধারণের ঘর-বাড়ির সমারোহ, আমোদপ্রমোদ, উৎসব-আড়ম্বর। ব্যক্তিগত ভোগ-ব্যবহারের অসমতা অনেকাংশে লাঘব হবে এর ফলে। প্রসঙ্গত, ব্যক্তিগত ভোগ-ব্যবহার হয়ে উঠবে সুস্থ সংগত সাশ্রয়ী, আর সেটা সমান-সমান হয়ে উঠতে থাকবে। যেমন, সবচেয়ে ধনী সদস্যও তিনটের বেশি কামরা পাবে না। ভবিষ্য সমাজে মানুষের বিকাশ, মানুষের মানসতা আচরণ আর নীতিবোধ-সংক্রান্ত প্রশ্নটায় বিস্তর মনোযোগ দেওয়া হয় ফুরিয়ের ইউটোপিয়ায়। নারী-পুরুষের সম্পর্ক, সন্তানপালন, অবসর-বিনোদন এবং বিজ্ঞান আর শিল্পকলা বিষয়ে শত-শত পৃষ্ঠা জুড়ে আলোচনা রয়েছে এই মহান ইউটোপিয়া-স্বপ্নদর্শীর রচনাগুলিতে।

সমাজ সম্বন্ধে ফুরিয়ে আলোচনা করেন কতকগুলি ফ্যালাংক্সের পরিমেল সম্বন্ধে যতটা তার চেয়ে অনেক কম সবিস্তারে। রাষ্ট্র-সংক্রান্ত প্রশ্নটাকে তিনি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষা করে গেছেন, তার ফলে পরে নৈরাজ্যবাদীরা তাঁর কোন-কোন ধ্যান-ধারণা তুলে নিতে পেরেছিল। যা-ই হোক, ফুরিয়ের ফ্যালাংক্সগুলির মধ্যে আর্থনীতিক যোগাযোগ আর বিনিময় বিস্তর: সেগুলির মধ্যে শ্রমবিভাগ বিস্তৃত।

ফুরিয়ের ব্যবস্থাটা অসংগতিতে ভরা, ফাঁক বিস্তর। সবকিছু আগেই বুঝে নিয়ে তিনি নিয়ামিত করতে চেষ্টা করেছেন, তবু নিছক আর্থনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্যালাংক্সগুলিতে অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিত থেকে গেছে অনেকিকছু। ফ্যালাংক্সের ভিতরে পণ্য-অর্থ সম্পর্কের প্রকৃতি এবং পরিধিটা কী? সেটার উপ-বিভাগগুলি তাদের শ্রমের উৎপাদ বিনিময় করে কিভাবে? বিশেষত, কাঁচামাল এবং আধা-তৈরি মাল পরবর্তী পর্বগুলিতে চালান যায় কিভাবে? কেনা-বেচা যদি না থাকে, থাকে যদি শুধু কেন্দ্রীকৃত হিসাবরক্ষণ (তাইই বোঝাতে চেয়েছেন ফুরিয়ে), তাহলে ফ্যালাংক্সে পণ্য-বিনিময়ের দরকার কি, যার তিনি বর্ণনা দিয়েছেন সবিস্তারে?

বিদ্যালয়, থিয়েটার, গ্রন্থাগার, বারোয়ারি উৎসব-অনুষ্ঠান, ইত্যাদির জন্যে

সাধারণের ভোগ্য তহবিলের একটা ভূমিকা আছে ফ্যালাংক্সে — এই তহবিল গড়ে ওঠে কিভাবে সেটা অস্পষ্ট। এই সবকিছুর জন্যে মোট আয় থেকে কোন বরাদ্দ দেখা যায় না, ব্যক্তিগত আয়ের উপর কোন করও নেই। সাধারণের প্রকল্পগুলোর জন্যে ধনীরা দরাজ হাতে দান করবে বলে একটা ইঙ্গিত শুধু আছে।

সঞ্চয়ন এবং সেটার সামাজিক দিকগুলো সংক্রান্ত প্রশ্নটা আরও গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজি বিনিয়োগের জন্যে মোট আয় থেকে কোন বরাদ্দের ব্যবস্থা যখন নেই, সঞ্চয়ন তহবিল গড়ে উঠতে পারে তো শুধু ফ্যালাংক্স সদস্যদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকেই — শেয়ার কেনা হতে পারে তার একটা ধরন। কিন্তু ফ্যালাংক্সের অন্যান্য সদস্যদের চেয়ে ঢের বেশি সঞ্চয় করতে পারে পুঁজিপতিরা, তাদের আয় চড়া (আর ভোগ-ব্যবহারের মাত্রা একই)। কাজেই পুঁজি আর আয় সমাহরণের প্রবণতা চালু না থেকে পারে না। হয়ত এটা আশঙ্কা করেই ফুরিয়ে উল্লিখিত শেয়ার-বিষমকরণের কথা তোলেন। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে, ফ্যালাংক্স পুঁজিপতিদের কাছে লোভনীয় হওয়া চাই বলে গরজ অনুসারে তিনি 'অন্যান্য' ফ্যালাংক্সের শেয়ারের মালিক হবার সম্ভাবনা বিবেচনায় রাখেন। খুব সম্ভব এই ব্যবস্থায় পয়দা হয় পুঁজিতন্ত্র এবং আসল পুঁজিপতিরা।

ফুরিয়ের ব্যবস্থার এগুলো এবং অন্যান্য দোষ-ত্রুটির দরুন নিম্নলিখিত দুটো প্রধান সিদ্ধান্ত না করে পারা যায় না।

এক, ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্র যে-ঐতিহাসিক পরিবেশে দেখা দেয় তার দরুন সেটা পেটি-বুর্জোয়া মোহ থেকে মুক্ত হতে পারে নি এবং সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরসাধনের পরিকল্পনায় অবিচলিত থাকতে পারে নি।

দুই, ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে কোন ক্রিয়াপ্রণালী আর আচরণবিধি নির্দিষ্ট করে দেবার এবং তাদের জীবন সবিস্তারে নিয়ামিত করে দেবার যেকোন চেষ্টার ব্যর্থতা অবধারিত।

তবে ফুরিয়ের মোহ আর ভুল-ভ্রান্তিগুলো আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়। পুঁজিতন্ত্র সম্বন্ধে বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যুক্তি তুলে তিনি দেখালেন সমাজতান্ত্রিক সমাজের কতকগুলি বাস্তব সাধারণ নিয়ম — এতেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় মেলে। শ্রমের সুপরিচালন, শ্রম মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজনে পরিণত হবার ব্যাপার এবং প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত বিশেষত লক্ষণীয়। কায়িক আর মানসিক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য ঘুচিয়ে

দেবার প্রশ্নটা তোলেন ফুরিয়ে। ভোগ-ব্যবহার বিচারবুদ্ধিমাফিক করে তোলা, সাধারণী খিদমতের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ, গৃহস্থালির বাঁদীগিরি থেকে নারীর মুক্তি, সমাজতন্ত্রের আমলে মুক্ত সুন্দর প্রেম, আর নবীন পুরুষ-পর্যায়ের মধ্যে কাজ-সংক্রান্ত উপযুক্ত মনোভাব গড়ে তোলা সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান-ধারণাগুলির তাৎপর্য বজায় রয়েছে এখন অবধিও।

রবার্ট ওয়েন এবং ইংলণ্ডের গোড়ার দিককার সমাজতন্ত্র

'বৈঠকখানায় ছোটখাটো ক্ষীণকায় বৃদ্ধ, তুষারধবল তাঁর চুল, আশ্চর্য সদয় মুখখানি, অনাবিল ঝলমলে অমায়িক চোখ দুটি — অপার সদাশয়তা ফুটিয়ে তুলে মানুষের বৃদ্ধবয়সে থাকে যে-শিশুসুলভ চোখ।

'শুভ্রকেশ বৃদ্ধের কাছে ছুটে গেলেন গৃহকর্ত্রীর দুহিতারা; স্পষ্টতই তাঁরা ঘনিষ্ঠ পরিচিত।

'আমি বাগানের দরজায় থেমে দাঁড়ালাম।

''এসেছেন সবচেয়ে ভাল সময়টায়,' বৃদ্ধের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন মেয়েদের মা, 'আপনাকে আপ্যায়ন করার মতো কিছু আজ আছে বটে। পরিচয় করিয়ে দিতে চাইছি আমাদের রুশী বন্ধুর সঙ্গে। আমার মনে হয়,' তিনি বললেন আমার উদ্দেশে, 'আনন্দ পাবেন **আপনাদের প্যাট্রিয়ার্ক'দের** একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।'

''রবার্ট ওয়েন,' বৃদ্ধ বললেন অমায়িক মৃদু হেসে। 'বড় খুশি হলাম দেখা হল বলে।'

'সন্তানোচিত শ্রদ্ধাভরে আমি ধরলাম তাঁর হাত; আমার বয়স একটু কম হলে আমি হয়ত নতজানু হয়ে বৃদ্ধকে বলতাম আমার উপর হাত রাখতে।

''আপনাদের দেশে মস্ত-মস্ত ব্যাপার ঘটবে বলে আমি প্রত্যাশী,' আমাকে বললেন ওয়েন, 'আপনাদের ওখানে ক্ষেত্রটা পরিষ্কার, আপনাদের যাজকেরা তত ক্ষমতাশীল নন, তত প্রবল নয় বদ্ধধারণাগুলো... আর কী শক্তি সেখানে... কী শক্তি!''*

---

* আ. ই. গের্ৎসেন, 'সংগৃহীত রচনাবলি', ১১ খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৭, ২০৬-২০৭ পৃঃ (রুশ ভাষায়)।

১৮৫২ সালে ওয়েনের সঙ্গে সাক্ষাতের এই বিবরণ দেন গের্ৎসেন; ওয়েনের বয়স তখন আশির বেশি। সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে এবং ওয়েন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মার্কস ব্যবহার করেন গের্ৎসেনের লেখায় যা আছে সেই একই 'প্যাট্রিয়ার্ক' শব্দটা, এটা বিশেষক।

গের্ৎসেন নিজে প্রচার করতেন ইউটোপিয়ান কৃষক সমাজতন্ত্র, তাঁর বিবেচনাধারা ছিল স্বভাবতই মূলত পৃথক। তবু মার্কস এবং গের্ৎসেন উভয়ের দৃষ্টিতে ওয়েন হলেন সমাজতন্ত্রের অন্যতম প্যাট্রিয়ার্ক।

দরাজ দিল এই মানুষটির

ওয়েল্স্-এ নিউ টাউন নামে ছোট শহরে রবার্ট ওয়েনের জন্ম হয় ১৭৭১ সালে। বাবা ছিলেন খুদে দোকানদার, পরে পোস্টমাস্টার। সাত বছর বয়সেই ওয়েনকে সহকারী করেছিলেন স্থানীয় স্কুল-শিক্ষক, কিন্তু দু'বছর পরে ওয়েনের স্কুলে পড়া শেষ হয়ে যায়। পকেটে চল্লিশ শিলিং নিয়ে ওয়েনকে বেরিয়ে পড়তে হয় বড়-বড় শহরে ভাগ্যের সন্ধানে। স্ট্যাম্‌ফোর্ড, লণ্ডন আর ম্যাঞ্চেস্টারে কাপড়ের দোকানে-দোকানে তিনি কাজ শেখেন এবং কর্মচারীর কাজ করেন। পড়ার ফুরসত জুটত শুধু মাঝে-মাঝে। ফুরিয়ের মতো ওয়েনও প্রণালীবদ্ধ শিক্ষালাভ করেন নি, তবে সনাতনী পাণ্ডিত্যের বহু বদ্ধধারণা আর গোঁড়ামি থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন।

ম্যাঞ্চেস্টার তখন ছিল শিল্প-বিপ্লবের কেন্দ্র। এখানে বস্ত্র-শিল্পের প্রবল প্রসার ঘটেছিল। কর্মোদ্যোগী চটপটে তরুণ ওয়েন জীবনের পথে পা বাড়াবার সুযোগ পান অচিরে। প্রথমে তিনি ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে একজন অংশীদারের সঙ্গে মিলে সুতাকাটা যন্ত্র তৈরি করার একটা ছোট কর্মশালা খোলেন; এই যন্ত্র তখন দ্রুত চালু হচ্ছিল বস্ত্র-শিল্পে। তারপর তিনি খোলেন সুতাকাটার নিজস্ব ছোট কর্মশালা, সেখানে দু'-তিন জন মজুরের সঙ্গে নিজেও কাজ করতেন। কুড়ি বছর বয়সে তিনি হন একটা বড় টেক্সটাইল মিলের ম্যানেজার এবং পরে সেটার অংশীদার-মালিক।

নিজ কারবারের কাজে স্কট্‌ল্যাণ্ডে গিয়ে ওয়েনের পরিচয় হয় গ্লাস্‌গোর কাছে নিউ ল্যানার্ক নামে শ্রমিক বসতিতে একটা বড় টেক্সটাইল মিলের মালিক ডেভিড ডেইল্‌-এর মেয়ের সঙ্গে। মিস্ ডেইলের সঙ্গে বিয়ের পরে

ওয়েন নিউ ল্যানার্কে উঠে যান ১৭৯৯ সালে, সেখানে যেটা ছিল তাঁর শ্বশুরের মিল সেটার তিনি হন (ম্যাঞ্চেস্টারের কয়েক জন পুঁজিপতির সঙ্গে) অংশীদার-মালিক এবং ম্যানেজার। আত্মজীবনীতে ওয়েন লিখেছেন, শিল্প-সংক্রান্ত এবং সামাজিক পরীক্ষাটার কথা তিনি ভেবে রেখেছিলেন অনেক আগেই, আর নিউ ল্যানার্কে তিনি যান নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে। এঙ্গেলস বলেন: 'এই সময়ে সেখানে সংস্কারসাধক হিসেবে গেলেন উনত্রিশ বছর বয়সের একজন শিল্পপতি — মানুষটির প্রকৃতি শিশুর মতো সরল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হলেন সেইসব বিরল মানুষের একজন যাঁরা নেতৃত্বের ক্ষমতা নিয়েই জন্ম নেন।'*

ওয়েন তখন ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে কিংবা পুঁজিতান্ত্রিক কারখানা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান নি। কিন্তু, বিকট মজুরি-দাসত্ব এবং শ্রমিকদের উপর উৎপীড়ন ফলপ্রদ উৎপাদন আর চড়া লাভের জন্যে অপরিহার্য অবস্থা নয় কোনক্রমেই, এটা প্রমাণ করাটাকে তিনি ধরেছিলেন নিজের কাজ হিসেবে, আর সেটা তিনি প্রমাণ করেছিলেন। তিনি শ্রমিকদের জন্যে শুধু মানুষের মতো কাজ করা আর জীবনযাত্রার প্রাথমিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, আর শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক স্বাস্থ্যের উন্নতি উভয়ত ফল হয়েছিল একেবারে বিস্ময়কর।

শুধু ঐটুকু! কিন্তু ওয়েন এবং তাঁর অল্প কয়েক জন সাহায্যকারীর কত কাজ, অধ্যবসায়, প্রত্যয় আর সাহস সেজন্যে প্রয়োজন হয়েছিল সেটা বোঝা দরকার! নিউ ল্যানার্কে কর্মদিনের দৈর্ঘ্য কমিয়ে করা হয়েছিল সাড়ে-দশ ঘণ্টা (যেখানে অন্যান্য কল-কারখানায় সেটা ছিল তের-চোদ্দ ঘণ্টা), সংকটের দরুন যখন-যখন মিল বন্ধ রাখতে হয়েছিল সেইসব সময়ের জন্যেও মজুরি দেওয়া হত। বেশি বয়সের শ্রমিকদের জন্যে পেনশন চালু করা হয়েছিল; খোলা হয়েছিল পারস্পরিক সাহায্য তহবিল। শ্রমিকদের জন্যে কম-ভাড়ার মোটামুটি ভাল বাসস্থান তৈরি করেছিলেন ওয়েন। ন্যায্য ব্যবস্থায় কমানো দামে জিনিসপত্র খুচরো বিক্রির ব্যবস্থা হয়েছিল, যদিও তাতেও লাভ থাকত।

ওয়েন বিশেষত অনেককিছু করেছিলেন ছোটদের জন্যে। মিলে তাদের

---

* কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, তিন খণ্ডে 'নির্বাচিত রচনাবলি', ৩য় খণ্ড, ১২৩ পৃঃ।

অপেক্ষাকৃত হালকা কাজ দেওয়া হত; বিদ্যালয় বসান হয়েছিল, তাতে দু'বছর বয়স থেকে শিশুদের ভরতি করা হত। পরে আসে যে-কিন্ডারগার্টেন সেটার আদিরূপের মতো হয়েছিল এই বিদ্যালয়। আঠার শতকের দার্শনিকদের একটি মূলনীতি ওয়েন গ্রহণ করেছিলেন, তদনুযায়ী ছিল ছোটদের জন্যে এই উৎকণ্ঠা, সেই নীতিটি এই: মানুষ হয় তেমনি যেমনটা তাকে করে তোলে পরিবেশ; মানুষকে উন্নত করতে হলে সে যেখানে গড়ে ওঠে সেই পরিবেশ বদলানো চাই।

ওয়েনকে অবিরাম লড়তে হত অংশীদারদের সঙ্গে। তাঁদের বিবেচনায় আজগবি এইসব ধ্যান-ধারণার দরুন এবং আরও আজগবি খরচ-খরচার দরুন তাঁরা বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন; লাভের সবটাই শেয়ারহোল্ডারদের পাওয়া চাই বলে তাঁরা দাবি করেন। ১৮১৩ সালে তিনি নতুন-নতুন অংশীদার জুটিয়েছিলেন, এঁরা পুঁজির ৫ শতাংশ বাঁধা লাভে রাজি হয়ে আর সবকিছুতে ওয়েনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেন। ওয়েনের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল ততদিনে; দলে-দলে লোক আসতে লেগেছিল নিউ ল্যানার্কে। লন্ডনে সবচেয়ে উপর-মহলগুলিতে পৃষ্ঠপোষক পেয়েছিলেন ওয়েন: তাঁর শান্তিপূর্ণ লোকহিতৈষী ক্রিয়াকলাপে তখনও কেউ বড় একটা উদ্বেগ বোধ করে নি; অনেকের মনে হত বিভিন্ন কঠিন সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্যে এটা খাসা উপায়ই তো বটে। ওয়েনের প্রথম বই 'A New View of Society, or Essay on the Principles of the Formation of the Human Character' ('নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ, বা মানব-প্রকৃতি গঠনের মূলসূত্রগুলি প্রসঙ্গে নিবন্ধ') (১৮১৩) সাদরে গৃহীত হয়েছিল, কেননা সাবধানী সংস্কার, বিশেষত শিক্ষাক্ষেত্রে এমন্ সংস্কারের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে বড় একটা এগয় নি বইখানার ধ্যান-ধারণা।

কিন্তু লোকহিতৈষণা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারছিলেন না ওয়েন, তাঁর মনের এই অবস্থাটা বেড়েই চলছিল। তিনি লক্ষ্য করছিলেন এতে কিছুটা কাজ হলেও পুঁজিতান্ত্রিক কারখানা ব্যবস্থার মূল আর্থনীতিক এবং সামাজিক প্রশ্নগুলোর নিষ্পত্তি তাতে হতে পারে না। পরে তিনি লেখেন: 'এমন উৎপাদন-ব্যবস্থায় যতটা চলতে পারত তা আমি এই জনসমষ্টির জন্যে হাসিল করেছিলাম অল্প কয়েক বছরের মধ্যে, আর যদিও গরিব মেহনতী জনেরা সন্তুষ্ট ছিল, অন্যান্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠান এবং এই সাবেকী ব্যবস্থার অধীন অন্যান্য সমস্ত মেহনতী জনের সঙ্গে তুলনায় নিজেরা অনেক ভাল

ব্যবহার পাচ্ছিল, অনেক বেশি যত্ন-পরিচর্যা পাচ্ছিল বলে মনে করছিল, সন্তুষ্ট ছিল খুবই, তবু আমি জানতাম সমস্ত সরকারের হস্তগত বিপুল উপায়াদির সাহায্যে সারা পৃথিবীর প্রত্যেকটি জনসমষ্টির জন্যে এখন যা সৃষ্টি করা যায় সেটার সঙ্গে তুলনায় এই জীবনযাত্রা শোচনীয়।'*

ইংলন্ডের আর্থনীতিক অবস্থার অবনতি এবং বেকারি আর গরিবি বৃদ্ধি প্রসঙ্গে ১৮১৫-১৮১৭ সালের আলোচনার প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায়ই লোকহিতৈষী পুঁজিপতি ওয়েন হয়ে ওঠেন কমিউনিজমের প্রচারক। উল্লিখিত সমস্যাগুলো আসানের জন্যে ওয়েন তাঁর পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন একটা সরকারী কমিটির কাছে, তাতে তিনি গরিব মানুষের জন্যে বিভিন্ন সমবায় বসতি স্থাপন করতে বলেছিলেন, ঐসব বসতিতে তারা যৌথভাবে কাজ করবে কোন পুঁজিপতি-মালিক ছাড়াই। তাঁর ধারণাটাকে ঠিকভাবে বোঝা হয় না, তাঁরা রেগে যান। ওয়েন যান জনসাধারণ্যে। ১৮১৭ সালে অগস্ট মাসে বড়-বড় জমায়েতে কতকগুলি বক্তৃতায় তিনি নিজ পরিকল্পনাটাকে বিবৃত করেন সেই প্রথম। সেটাকে তিনি পরে আরও বিকশিত এবং বিস্তারিত করতে থাকেন। একটা নির্দিষ্ট প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গন্ডিবদ্ধ প্রকল্পটি ক্রমে-ক্রমে হয়ে দাঁড়ায় কমিউনিস্ট মূলনীতির ভিত্তিতে সমাজ পুনঃসংগঠনের সর্বাত্মক ব্যবস্থা। ওয়েনের যা পরিকল্পনা ছিল তাতে এই পুনঃসংগঠন বলবৎ বিভিন্ন শ্রম সমবায় কমিউন মারফত, সেগুলি ফুরিয়ের ফ্যালাংস্তেরের মতো কিছুটা, কিন্তু সুসমঞ্জস কমিউনিস্ট মূলনীতি সেগুলির ভিত্তি। এই শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পথে যা প্রতিবন্ধ, সাবেকী সমাজের সেই তিনটে অবলম্বন-স্তম্ভের উপর তিনি আক্রমণ চালান; এই তিনটে হল — ব্যক্তিগত মালিকানা, ধর্ম এবং বিদ্যমান আকারের পরিবার। ১৮২১ সালে প্রকাশিত 'ল্যানার্ক কাউন্টির কাছে বিবরণী'তে ওয়েনের ধ্যান-ধারণা প্রকাশ পায় সবচেয়ে পুরোপুরি।

বুর্জোয়া সমাজের ভিত্তিগুলোর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে বিস্তর সাহস প্রয়োজন হয়েছিল ওয়েনের। তিনি জানতেন বিভিন্ন পরাক্রমশালী শক্তি আর স্বার্থের ক্রোধ তিনি জাগিয়ে তুলবেন, কিন্তু সেটা তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে নি। নিজ কর্মব্রতে সর্বান্তঃকরণ আস্থা নিয়ে তিনি পথ ধরেন, যে-

* R. Owen, 'The Revolution in the Mind and Practice of the Human Race', London, 1850, pp. 16-17.

পথে তিনি চলেছিলেন জীবনের শেষ দিনটি অবধি। ১৮১৭-১৮২৪ সালে ওয়েন ব্রটেনের সর্বত্র সফর করেন, বিদেশে যান, বহু বক্তৃতা করেন, প্রবন্ধ আর পুস্তিকা লেখেন বিস্তর — অবিরাম প্রচার করেন নিজ কর্মব্রত। তিনি মনে করতেন, সমাজের জন্যে তাঁর পরিকল্পনার কল্যাণকর প্রকৃতিটাকে কর্তৃপক্ষ আর ধনীরা উপলব্ধি করবে শিগগিরই। এই সময়ে এবং পরবর্তী বছরগুলিতে ওয়েন নাছোড়বান্দা হয়ে পরিকল্পনাটি পেশ করেন ইংরেজ সরকার আর মার্কিন রাষ্ট্রপতিদের কাছে, প্যারিসের ব্যাঙ্কারগণ আর রাশিয়ার জার ১ম আলেক্সান্দরের কাছে। কিন্তু বৃথা হয় সমস্ত প্রচেষ্টা, যদিও কোন-কোন প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি সেটা সমর্থন করেছিলেন কোন-না-কোন পরিমাণে।

ইংলন্ডের 'শিক্ষিত সমাজ' সম্বন্ধে ওয়েন হতাশ হয়ে পড়েন; তখনকার শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল না; তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি আর রইল না নিউ ল্যানার্কেও — তখন ওয়েন এবং তাঁর ছেলেরা চলে যান আমেরিকায়। সেখানে একটা জমি কিনে ১৮২৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'নিউ হার্মনি' ('নতুন সমন্বয়') কমিউন, সেটার সনদের ভিত্তি ছিল ঢালাও-সাম্য কমিউনিজমের নীতি। ব্যবহারিক চিন্তাধারা এবং অভিজ্ঞতা ছিল বলে অনুরূপ অন্যান্য লোকসমাজ সংগঠকদের বহু ভুল-ভ্রান্তি তিনি এড়াতে পেরেছিলেন। তবু শেষে ব্যর্থ হয় এই প্রতিষ্ঠানটি, যাতে তিনি ঢেলেছিলেন প্রায় সমস্ত বিত্ত-সম্পদ। ১৮২৯ সালে ব্রটেনে ফিরে যান ওয়েন। ছেলে-মেয়েদের (মোট সাতটি) জন্যে টাকা আলাদা করে রেখে তিনি খুবই মিতব্যয়ে জীবনযাপন করতে থাকেন।

তখন তাঁর বয়স প্রায় ষাট। এই বয়সে অনেকের সক্রিয় জীবন শেষ হয়ে যায় — শান্তিতে অবসর নেন তাঁরা। ওয়েন কিন্তু উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে এমন একটা ব্যাপার করলেন যা অন্যান্য ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রীদের সাধ্যে কুলয় নি: নিজের স্থান করে নিলেন শ্রমিকদের গণ-আন্দোলনে।

তখনকার বছরগুলিতে উৎপাদক এবং ব্যবহারক সমবায় সমিতিগুলির দ্রুত প্রসার ঘটছিল, সেগুলিতে সম্মিলিত হচ্ছিল কারিগরেরা এবং, তত বেশি না হলেও, কল-কারখানার শ্রমিকেরাও। ওয়েন অচিরেই গিয়ে পড়লেন ইংলন্ডের সমবায় আন্দোলনের নেতৃত্বে। ১৮৩২ সালে তিনি স্থাপন করেন 'ন্যায্য শ্রম-এক্সচেঞ্জ'। সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য বিক্রেতাদের কাছ থেকে জিনিস নিত শ্রমব্যয়ের ভিত্তিতে কষা হিসাব অনুসারে, আর অন্যান্য

জিনিস বিক্রি করত 'শ্রম-অর্থ' নিয়ে। এই এক্সচেঞ্জ শেষে দেউলে হয়ে যায়, সেটার দেনা শোধ করতে হয়েছিল ওয়েনের নিজের টাকা দিয়ে। শ্রমিক শ্রেণীর আর-একটা আন্দোলনেরও তিনি অন্যতম পথিকৃৎ, পরে মস্ত ভূমিকায় এল যেটা — ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন। পাঁচ লক্ষ সদস্যের প্রথম সমগ্র-জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার চেষ্টা হয়েছিল তাঁর নেতৃত্বে ১৮৩৩-১৮৩৪ সালে। সাংগঠনিক দুর্বলতা, টাকার অভাব এবং সরকারের সমর্থনপুষ্ট কল-কারখানা মালিকদের বিরোধিতার দরুন ভেঙে যায় এই ইউনিয়ন। ওয়েনের চমৎকার পরিকল্প বারবার অকৃতকার্য হয়, কিন্তু কোনটা বৃথা যায় নি।

ওয়েনের সঙ্গে মানিয়ে চলা সহজ ছিল না। তিনি নিজে সঠিক বলে পরম প্রত্যয় থাকার ফলে অনেক সময়ে তিনি জেদী এবং অসহিষ্ণু হয়ে পড়তেন। নিউ ল্যানার্ক আর 'নিউ হার্মনি'-তে তিরিশ বছরের জীবনে তিনি সহযোগ করতে নয়, ব্যবস্থাপন করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। নতুন-নতুন ধ্যান-ধারণা তিনি গ্রহণ করতে পারতেন না। কর্মদক্ষতার সঙ্গে সোৎসাহ মানবিকতা মিলে ওয়েনের যে-মাধুর্য তরুণ বয়সে আর মধ্য বয়সে তাঁকে অমন বিশিষ্ট করে তুলেছিল, যেটা তাঁর কাছে টানত মানুষকে, সেটার জায়গায় কিছু পরিমাণে এসে গিয়েছিল কথাবার্তা আর চিন্তার নাছোড়বান্দা একঘেয়েমি। খুবই স্পষ্ট চিন্তাশক্তি তাঁর বজায় ছিল শেষ অবধি, কিন্তু বার্ধক্যের কিছু-কিছু খামখেয়ালিপনাও ছিল। জীবনের শেষের বছরগুলিতে তিনি প্রেততত্ত্ব ধরেছিলেন, আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন অতীন্দ্রিয়বাদে। কিন্তু বজায় ছিল তাঁর সদাশয়তার মাধুর্য, যা লক্ষ্য করেছিলেন গের্ৎসেন।

১৮৩৪ সালের পরে সমাজে ওয়েনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আর ছিল না, যদিও তখনও লিখতেন প্রচুর, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করতেন, আরও একটা কমিউন গড়ায় অংশগ্রহণ করেন, নিজ অভিমত প্রচার করতে থাকেন অক্লান্তভাবে। তাঁর অনুগামীরা গড়েছিলেন একটা সংকীর্ণ সম্প্রদায়, তাঁরা অনেক সময়ে সমর্থন করতেন বেশ প্রতিক্রিয়াশীল মতাবস্থান।

১৮৫৮ সালের শরৎকালে ওয়েন লিভারপুলে গিয়ে (বয়স তখন ৮৭) সেখানে একটা সভার বক্তৃতামঞ্চে অসুস্থ বোধ করেন। কয়েক দিন শয্যাশায়ী থাকার পরে তিনি হঠাৎ জন্মস্থান নিউ টাউনে যেতে মনস্থ করেন, সেখানে তিনি ছেলেবেলার পরে আর যান নি। সেখানেই তিনি মারা যান ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে।

অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে ওয়েনের মনোভাব ছিল সাঁ-সিমোঁর যেমনটা, বিশেষত যেমনটা ফুরিয়ের, তার থেকে ভিন্ন। এই বিজ্ঞানটাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন নি, বরং উলটে জোর দিয়ে বলতেন অর্থশাস্ত্রের মূলসূত্রগুলিই তাঁর পরিকল্পনার ভিত্তি — এটা তিনি বলতেন স্মিথ আর রিকার্ডোর রচনাগুলির কথা মনে রেখে। এঙ্গেলস লিখেছেন: 'সেটা যে-পরিমাণে আর্থনীতিক প্রশ্নে বিতর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাতে ওয়েনের সমগ্র কমিউনিজমের ভিত্তি রিকার্ডো।'* ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের মূলসূত্রগুলি থেকে পুঁজিতন্ত্রবিরোধী সিদ্ধান্তে পৌঁছন ওয়েন-ই প্রথম।

প্রসঙ্গত বলি, বুর্জোয়া ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্র থেকে ওয়েন গ্রহণ করেন শুধু যা তাঁর দরকার ছিল নিজ তন্ত্রটার জন্যে, আর উপেক্ষা করেন, এমনকি খোলাখুলি প্রত্যাখ্যান করেন তার চেয়ে ঢের বেশি। বিভিন্ন আর্থনীতিক প্রশ্নের তিনি উল্লেখ করেছেন নিজ রচনাগুলিতে, কিন্তু বিশেষভাবে আলোচনা করেন নি সেগুলি নিয়ে। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর প্রধান-প্রধান ভাব-ধারণাগুলি রয়েছে 'ল্যানার্ক কাউণ্টির কাছে বিবরণী'-তে। ওয়েন ছিলেন কাজের মানুষ, নিজ আর্থনীতিক ভাব-ধারণাগুলিকে তিনি কাজে খাটাতে চেষ্টা করেন — প্রথমে নিউ ল্যানার্কে, তারপর আমেরিকায়, আর শেষে সমবায় আন্দোলনে এবং 'ন্যায্য শ্রম-এক্সচেঞ্জে'।

ওয়েনের মতের মূলে রয়েছে রিকার্ডোর শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্ব: শ্রম মূল্য পয়দা করে, মূল্যের পরিমাপ হয় শ্রম দিয়ে; পণ্য-বিনিময় হওয়া চাই শ্রম অনুসারে। কিন্তু রিকার্ডোর থেকে ভিন্ন ধারায় তিনি মনে করেন পুঁজিতন্ত্রের আমলে বিনিময় শ্রম অনুসারে হয় না। তাঁর মতে, শ্রম অনুসারে বিনিময় বলতে বোঝায় শ্রমিক যে-পণ্য পয়দা করে সেটার পূর্ণ মূল্য সে পায়। প্রকৃতপক্ষে সে পায় না অমন কিছুই।

তবে মূল্যের 'ন্যায্য' নিয়মের লঙ্ঘন ব্যাখ্যা করার জন্যে ওয়েন এমন কোন-কোন ধারণার শরণ নেন যা কিছুটা বুয়াগিইবেরের মতো: যত নষ্টের মূল হল অর্থ — এই কৃত্রিম পরিমাপটা যা স্বাভাবিক পরিমাপ শ্রমকে হটিয়ে দিয়েছে।

* কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ২ খণ্ড, ১৩-১৪ পৃঃ।

ওয়েনের অর্থশাস্ত্র চূড়ান্ত মাত্রায় মানভিত্তিক: ঐসব ধারণা তিনি কাজে লাগিয়েছেন নিজের প্রস্তাবিত পরিমাপটাকে দাঁড় করাবার জন্যেই শুধু — তিনি চালু করতে চান মূল্যের পরিমাপ হিসেবে শ্রম ইউনিট, এই পরিমাপের ভিত্তিতে পণ্য-বিনিময়, আর অর্থের ব্যবহার তিনি লোপ করতে চান। তিনি মনে করতেন তাহলে সমাজের সবচেয়ে কঠিন সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে যায়। শ্রমিক তার শ্রম বাবত পাবে ন্যায্য পারিতোষিক। যেহেতু শ্রমিকদের পাওয়া পারিতোষিক হবে পণ্যের প্রকৃত মূল্যের অনুযায়ী তাই অত্যুৎপাদন আর সংকট অসম্ভব হয়ে পড়বে। এমন সংস্কারের ফলে শ্রমিকেরাই শুধু নয়, ভূস্বামী আর পুঁজিপতিরাও উপকৃত হবে: '...দরাজ-হাতে শ্রম বাবত পারিতোষিক দেওয়া হলে শুধু তবেই কৃষি আর শিল্পের উৎপাদ থেকে বেশি লাভ করা যেতে পারে'।*

অর্থ 'ন্যায্য' বিনিময়কে ডাহা ফাঁকিবাজিতে পর্যবসিত করে — ঠিক কিভাবে? বিভিন্ন পণ্যে যে-পরিমাণ শ্রম ন্যস্ত তদনুসারে সেগুলোর বিনিময় যদি না হয় তাহলে শেষে গিয়ে দাম নির্ধারিত হয় কী দিয়ে? শ্রমিক যদি তার শ্রম দিয়ে পয়দা-করা উৎপাদের পূর্ণ মূল্য পায় তাহলে কোথা থেকে আসবে পুঁজিপতি আর ভূস্বামীর আয়? এমন অসংখ্য প্রশ্ন তোলা যেতে পারে ওয়েনের কাছে, তবু উত্তর-গোছের কিছু পাওয়া যাবে না।

উৎপাদন-সম্পর্ক সমেত সমাজের আমূল রূপান্তরের জন্যে ওয়েনের পরিকল্পনার সঙ্গে তাঁর আর্থনীতিক মতগুলির অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ যদি না থাকত, তাহলে, কেবল পরিচলনক্ষেত্রেই বিভিন্ন সংস্কারসাধন করে, বিশেষত অর্থ লোপ করে দিয়ে পুঁজিতন্ত্রের দোষ-ত্রুটিগুলো দূর করা সম্বন্ধে পেটি-বুর্জোয়া বিভ্রান্তির চেয়ে ঐসব মত উন্নত হত না কোন অংশে। দেখা যায়, শ্রমঘটিত মূল্য অনুসারে ন্যায্য বিনিময় হতে হলে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে লোপ করা চাই! যেখানে উৎপাদনের উপায়-উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না, কেবল এমন ভবিষ্য সমাজেই শ্রমিক শ্রম দেবে 'সেটার পূর্ণ মূল্যে'। সেক্ষেত্রে পুঁজিপতি আর ভূস্বামীর কথাই ওঠে না। সমাজ পুনঃসংগঠিত হলে তাদেরও ভাল হবে, সেটা পুঁজিপতি আর ভূস্বামী হিসেবে নয়, **লোক হিসেবে।**

* R. C. Owen, 'The New Existence of Man upon the Earth', Part III, London, 1854, p. XV.

পণ্য-উৎপাদন এবং মূল্য নিয়মের ইতিহাসক্রমিক প্রকৃতি অবশ্য একেবারেই অস্পষ্ট ছিল ওয়েনের কাছে। এসব ব্যাপার তাঁর পক্ষেও তেমনি চিরস্থায়ী আর স্বাভাবিক ছিল যেমনটা রিকার্ডোর পক্ষে। তবে এখান থেকে এগিয়ে রিকার্ডো সিদ্ধান্ত করলেন পুঁজিতন্ত্র চিরস্থায়ী এবং স্বাভাবিক, আর বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন ওয়েন: পুঁজিতন্ত্র 'সাময়িক' এবং 'অস্বাভাবিক'। রিকার্ডোর ঐতিহাসিক দুঃখবাদও ওয়েনের পক্ষে গ্রহণীয় হয় নি, সেটাকে তিনি ম্যালথাস এবং তাঁর জনসংখ্যা তত্ত্বের প্রভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেখেন, এভাবে দেখাটা তো অকারণে নয়। এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেন ওয়েন। উৎপাদনের, বিশেষত কৃষি-উৎপাদনের প্রকৃত এবং সম্ভাব্য বৃদ্ধি-সংক্রান্ত পরিসাংখ্যিক উপাত্ত তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রকৃতি নয়, সমাজব্যবস্থাই মানুষের গরিবির জন্যে দোষভাগী।

ওয়েন-এর কমিউনিজম

ওয়েনের ইউটোপিয়ার **কমিউনিস্ট** প্রকৃতিটার উপর জোর দিয়ে মার্কস এবং এঙ্গেলস সেটাকে ঐ যুগের অন্যান্য ইউটোপিয়া থেকে পৃথক করে ধরেন। মার্কস লিখেছেন: 'অর্থশাস্ত্রের রিকার্ডীয় কালপর্যায়ে সেটার অ্যান্টিথিসিসও [দেখা দিল] — কমিউনিজম (ওয়েন) এবং সমাজতন্ত্র (ফুরিয়ে, সাঁ-সিমোঁ...)।'* আর এঙ্গেলস লেখেন: 'কমিউনিজমের দিকে ওয়েনের পদক্ষেপ হল তাঁর জীবনের সন্ধিক্ষণ।'**

দেখা গেছে, সাঁ-সিমোঁ এবং ফুরিয়ের তত্ত্ব-দুটি ষোলআনা সমাজতান্ত্রিক ছিল না। তাঁদের ভবিষ্য সমাজে এটা-ওটা গণ্ডির মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে, আর বজায় থাকে পুঁজিপতিরাও, তারা কোন-না-কোন ভাবে উৎপাদনের উপকরণের বিলি-বন্দেজ করে, পুঁজি বাবত আয় পায়। ওয়েনের তন্ত্রটির সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতি সুসমঞ্জস, শুধু তাই নয়, তাতে আরও চিত্রিত হয়েছে কমিউনিজমের দ্বিতীয় — উন্নততর — পর্ব, তাতে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং শ্রেণীভেদ একেবারেই বিলুপ্ত, প্রত্যেকের কাজ করা চাই,

---

* কার্ল মার্কস, 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব', ৩য় ভাগ, ২৩৮ পৃঃ।

** কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, তিন খণ্ডে 'নির্বাচিত রচনাবলি', ৩ খণ্ড, ১২৫ পৃঃ।

আর উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধির ভিত্তিতে বণ্টন হয় প্রয়োজন অনুসারে। ওয়েনের ইউটোপিয়ায় কোন ধর্মীয় কিংবা হেঁয়ালির ছোপ নেই একেবারেই। এটার বাস্তববাদিতা লক্ষণীয়; এটা কখনও-কখনও চটপটে-কেজো ধরনের। তাই বলে অবশ্য ওয়েনের তন্ত্রটা কিছু কম ইউটোপিয়ান নয়। যেমন সাঁ-সিমোঁ আর ফুরিয়ে তেমনি তিনিও কমিউনিস্ট সমাজে পৌঁছবার প্রকৃত পথটা দেখতে পান নি।

তবে আসল কথাটা অন্য। ওয়েনের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের গোড়ায় ইংলণ্ড ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজ — সেটার বাস্তব পরিবেশ থেকে উদ্ভূত হল কমিউনিজমের আদর্শ। ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের বহু পেটি-বুর্জোয়া বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত ছিলেন ওয়েন। পুঁজিপতি শ্রেণীর শোষণকর স্বধর্ম সম্বন্ধে এবং পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত মালিকানা একেবারেই লোপ করার প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁর সংশয় ছিল না। সত্যিকারের পরম প্রাচুর্য এবং প্রয়োজন অনুসারে বণ্টন যাতে সম্ভব হয় শ্রমের এমন উৎপাদনশীলতা ঘটাবার নির্দিষ্ট উপায়াদি তিনি ঢের বেশি স্পষ্ট দেখেছিলেন কারখানা ব্যবস্থার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে। আদিম ধরনের, ঢালাও কৃচ্ছ্রতার 'ব্যারাকী' কমিউনিজমের যেসব প্রকল্প দেখা দেয় মাঝে-মাঝে — দুঃখের কথা এখনকার দিনেও অবধি — তার থেকে খুবই ভিন্ন এবং উন্নত হল ওয়েনের কমিউনিজম। উৎপাদন আর সম্পদের বিপুল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেখানে মানুষের নিজের সুষম বিকাশ ঘটবে, যেখানে অপরিমেয় মাত্রায় বেড়ে যাবে ব্যক্তি-মানুষের মূল্য, তেমনি সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন ওয়েন। ওয়েন হলেন তাঁদেরই একজন যাঁরা সর্বপ্রথমে দেখিয়ে দিলেন বুর্জোয়াদের ভাড়াটে ঢাকীরা যতই কুৎসা রটাক — **কমিউনিজম আর মানবিকতা এই ধারণা-দুটোর একটা অন্যটার সঙ্গে খাপ খায় না তা নয়, বরং তার উলটোটাই ঠিক: সত্যিকারের মানবিকতা জেঁকে ওঠে সাচ্চা কমিউনিস্ট সমাজেই।**

ওয়েনের ছকে কমিউনিস্ট সমাজের বুনিয়াদী ইউনিট হল ছোট-ছোট সমবায় সম্প্রদায়, যাতে সদস্যসংখ্যা ৮০০ থেকে ১২০০ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এইসব সম্প্রদায়ে একেবারে কোন ব্যক্তিগত মালিকানা কিংবা শ্রেণীভেদ থাকে না। একমাত্র যে-পার্থক্যের দরুন শ্রমে আর বণ্টনে একটাকিছু অসমতা ঘটতে পারে সেটা হল 'বয়স কিংবা অভিজ্ঞতার পার্থক্য'। বণ্টনের কর্ম-বন্দোবস্ত সম্বন্ধে ওয়েন বিশেষকিছু বলেন নি, তিনি (আবারও ফুরিয়ের মতো) অস্পষ্ট দু'-একটা মন্তব্য করেছেন সম্প্রদায়ের ভিতরে শ্রম-অনুসারে

উৎপাদ-বিনিময় সম্বন্ধে, আর শুধু এই নির্দেশটা দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন: উৎপাদের প্রাচুর্য হলে ‘সম্প্রদায়ের সাধারণী ভাণ্ডার থেকে প্রত্যেককে অবাধে নিতে দেওয়া যেতে পারে তার যাকিছু প্রয়োজন হতে পারে’।

নতুন মানুষ গড়ে ওঠার ব্যাপারে ওয়েন বিস্তর মনোযোগ দিয়েছেন, তাতে তিনি দেখিয়েছেন মানসতার পরিবর্তন প্রধানত দুটো বৈষয়িক কারক উপাদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট — সম্পদবৃদ্ধি এবং প্রয়োজন মেটানো। এইসবের ফলে ‘নিজস্ব সঞ্চয়নের সমস্ত কামনার নিবৃত্তি ঘটবে। জল এই অমূল্য তরলটা সবাই যা ব্যবহার করতে পারে তার চেয়ে বেশি থাকে যেসব পরিস্থিতিতে তখন সেটাকে বোতলে পুরে কিংবা জমিয়ে রাখাটা যেমন তেমনি অযৌক্তিকই তাদের কাছে মনে হবে সম্পদের ব্যক্তিগত সঞ্চয়ন’।*

সম্প্রদায়ের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে সমাজটাকে ওয়েন চিত্রিত করেছেন বহুসংখ্যক এমন ইউনিটের সমষ্টি হিসেবে। ইউনিটগুলির মধ্যে বিস্তর শ্রমবিভাগ; পারস্পরিক বিনিময় চলে শ্রমঘটিত মূল্যের ভিত্তিতে। এই বিনিময়ের জন্যে একটা সম্প্রদায়-সংঘ বিশেষ ধরনের কাগজী শ্রম-মুদ্রা** ছাড়ে ভাণ্ডারগুলিতে মজুত জিনিসপত্র বাবত। ওয়েন বিবেচনা করেছিলেন কিছুকাল যাবত এই নতুন সমাজের সহ-অবস্থান চলবে ‘সাবেকী সমাজ’ আর সেটার রাষ্ট্রের সঙ্গে, এটাকে কর দেবে, সাধারণ মুদ্রা নিয়ে সাবেকী সমাজের কাছে জিনিসপত্র বিক্রি করবে।

ভূমি সমেত অন্যান্য প্রারম্ভিক উৎপাদন-উপকরণ সম্প্রদায়গুলি পাবে কিভাবে এবং কার কাছ থেকে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটাকে ওয়েন বাদ দিয়ে গেছেন। অতি-সরলমনে তিনি যেন ভেবেছিলেন সম্প্রদায়গুলিকে উৎপাদনের উপকরণ খয়রাত দেবে রাষ্ট্র কিংবা শিক্ষাদীক্ষা-পাওয়া পুঁজিপতিরা। তবে আর-একটা জায়গায় তিনি অপেক্ষাকৃত বাস্তবতাসম্মত কথাই বলেছেন যে, সম্প্রদায়ের সদস্যরা ‘সুদ দেবে তাদের শ্রমকে কাজে চালু করার জন্যে আবশ্যক পুঁজি বাবত’। অর্থাৎ কিনা, পুঁজিপতিদের ছাড়া সম্প্রদায়গুলির চলবে না। বড়জোর তারা হাতে রাখতে পারে কারবারী আয়টা, কেননা উৎপাদনের ভার থাকবে তাদের উপর, কিন্তু ঋণ বাবত সুদ — দিতে হবে!

* R. C. Owen, ‘The New Existence of Man upon the Earth’, Part III, p. XXXIV.

** ওয়েনের ‘ন্যায্য শ্রম-এক্সচেঞ্জ’ এমন মুদ্রা বাস্তবিকই চালু করেছিল।

ওয়েনের তন্ত্রটা ইউটোপিয়ান বলে অসংগতি আর অসামঞ্জস্য তাতে বিস্তর। তার প্রধান কারণটা সম্বন্ধে আমরা অবহিত: শ্রেণী-সম্পর্কতন্ত্র অপরিণত থাকার দরুন সমাজ পুনঃসংগঠনের আসল পথটা স্থির করা অসম্ভব ছিল ইউটোপিয়ান চিন্তাবীরদের পক্ষে। শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসনির্দিষ্ট কর্মব্রত না বুঝে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আবশ্যকতা আর অনিবার্যতা না বুঝে সেটা করা যায় না। ওয়েন এবং অন্যান্য ইউটোপিয়ান চিন্তাবীরদের সেটা বোঝা অসম্ভব ছিল বিষয়গতভাবেই।

তবে, সমাজবিদ্যাক্ষেত্রে যে-প্রগতির ফলে মার্কসবাদের উদ্ভব ঘটে ওয়েনের জীবনকালেই সেটাও অসম্ভব হত তাঁদের ভুল-ভ্রান্তিগুলি ছাড়া, তেমনি তাঁদের সাধনসাফল্যগুলি ছাড়া।

শ্রমিক শ্রেণী থেকে চিন্তাবীরেরা

শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থটাকে প্রথম যাঁরা অর্থশাস্ত্রে সচেতনভাবে প্রকটিত করেন তাঁদের সামাজিক-আর্থনীতিক আর ভাবাদর্শগত পটভূমিতে ছিল নেপোলিয়নীয় যুদ্ধবিগ্রহের পরে ইংলণ্ডের আর্থনীতিক সমস্যাগুলো, প্রথম-প্রথম কারখানা আইন আর ট্রেড ইউনিয়নগুলি, রিকার্ডোবাদের প্রতিষ্ঠা, ওয়েনের আন্দোলন। তাঁরা স্থিরচেতা ছিলেন না, তাঁরা পেটি-বুর্জোয়া সংস্কারবাদী সমাজতন্ত্রের মাঝে পড়ে যেতেন অনেকাংশে। তবু মস্ত তাঁদের অবদান। উনিশ শতকের তৃতীয় আর চতুর্থ দশকের এইসব ইংরেজ সমাজতন্ত্রী হলেন একদিকে ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্র এবং ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্র, আর অন্য দিকে মার্কস এবং এঙ্গেলসের বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি যোগসূত্র।

স্মিথ আর রিকার্ডোর বুর্জোয়া ‘উত্তরাধিকারীদের’ থেকে বিপরীত ধারায় তাঁরা ওঁদের মতবাদ কাজে লাগাতে চান প্রগতিশীল, বুর্জোয়াবিরোধী উদ্দেশ্যে — এরই থেকে নির্দিষ্ট হয়ে যায় অর্থশাস্ত্রের ইতিহাসে তাঁদের ভূমিকা। এ'দের কেউ-কেউ ওয়েনের চেয়ে বড় অর্থনীতিবিদ ছিলেন এবং রিকার্ডোর তন্ত্রটাকে আরও যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত আকারে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন, যদিও কোন-কোন ক্ষেত্রে এ'দের রচনাগুলির সরাসর বিষয়বস্তু ছিল তখনকার দিনের শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন নির্দিষ্ট কাজ। কখনও-কখনও রিকার্ডোপন্থী সমাজতন্ত্রী বলে অভিহিত এই গ্রুপটির মধ্যে সবচেয়ে

বিশিষ্ট হলেন উইলিয়ম টম্পসন, জন গ্রে, জন ফ্র্যান্সিস ব্রে। একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন টমাস হড্‌স্কিন; পুঁজির স্বধর্ম, পুঁজি আর শ্রমের মধ্যে সম্পর্ক এবং পুঁজিতন্ত্রের আমলে লাভের হারের গতি সম্বন্ধে কিছু-কিছু চমৎকার ধারণার প্রবর্তক তিনিই।

টমাস হড্‌স্কিন মারা গেলে লন্ডনের একটাও সংবাদপত্র তাঁর নাম উল্লেখ করে নি। ভিক্টরীয় যুগের বিরাট রচনা 'Dictionary of National Biography' ('জাতীয় জীবনী অভিধান')-এ হাজার-হাজার বিশিষ্ট বৃটনদের মধ্যেও স্থান পায় নি তাঁর নামটি। তাঁর রচনা পুনঃপ্রকাশিত হয় নি; শতাব্দীর শেষাশেষি বিস্মৃতির মাঝে তলিয়ে যায় তাঁর নামটি। হড্‌স্কিন 'পুনরাবিষ্কৃত' হন প্রধানত মার্কসের কল্যাণে। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা, বিশেষত অর্থশাস্ত্র বিকাশে তাঁর রচনাগুলির গুরুত্ব দেখিয়ে দেন মার্কস। লেবর তত্ত্ববিদ আর ইতিহাসকারেরা হড্‌স্কিনের নাম উল্লেখ করতে থাকেন শুধু তার পরে। ওয়েব্‌-দম্পতি তো মার্কসকে 'হড্‌স্কিনের মহান শিষ্য' পর্যন্ত বলেছেন। ঐভাবে মার্কসকে অবশ্য হেগেল, রিকার্ডো, ওয়েন এবং আরও বহু চিন্তাগুরুর 'শিষ্য'ও বলা যেত। কিন্তু ঠিক এই কারণেই অমন উক্তি অর্থহীন।

১৭৮৭ সালে একজন সামরিক কর্মচারীর পরিবারে হড্‌স্কিনের জন্ম হয়। তিনি শিক্ষালাভ করেন একটা নৌ-কলেজে; নেপোলিয়নীয় যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে তিনি নৌবাহিনীতে কাজ করেন। স্বাধীনচেতা এই তরুণ অফিসারটির বিরোধ বাধে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে, তিনি বরখাস্ত হন পঁচিশ বছর বয়সে। ১৮১৩ সালে প্রকাশিত তাঁর বইয়ে হড্‌স্কিন বৃটিশ নৌবাহিনীর রূঢ় রীত-রেওয়াজের উপর ধিক্কার দেন। বেন্থাম আর জেম্‌স মিলকে ঘিরে ছিল একটি উদারপন্থী গ্রুপ, তাঁদের নজরে পড়ে বইখানা, হড্‌স্কিন শামিল হন এই গ্রুপে। ১৮১৮ সালে তিনি পড়েন তখন রিকার্ডোর সদ্যপ্রকাশিত বই সম্বন্ধে ম্যাক্‌কুলোখের একটা প্রবন্ধ, আর বইখানাই পড়েন পরে। তাঁর বিভিন্ন রচনা আর চিঠিপত্র থেকে দেখা যায় ১৮২০ সালে তিনি তখনকার দিনের প্রধান-প্রধান রাজনীতিক-আর্থনীতিক ধ্যান-ধারণাগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছিলেন, আর বহু প্রশ্নে গড়ে উঠেছিল তাঁর নিজস্ব মত। তাঁর একখানা চিঠিতে রয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা: 'কাজেই আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি মিঃ রিকার্ডোর মত আমি অপছন্দ করি, কেননা তাতে সমাজের বর্তমান রাজনীতিক পরিস্থিতিটা ন্যায্য প্রতিপন্ন

হয়, আর ভবিষ্য উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের আশাকে গণ্ডিবদ্ধ করে দেওয়া হয়।'*

রিকার্ডোর মতবাদ সম্বন্ধে হড্‌স্কিনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নিম্নলিখিতরূপ: এই মতবাদের বহু উপাদানকে সঠিক বলে মেনে নিয়ে তিনি রিকার্ডোর অসামঞ্জস্যের সমালোচনা করেন, অর্থাৎ তিনি বলতে চান রিকার্ডোর ভাব-ধারণা ব্যবহৃত হতে পারে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। মিল আর ম্যাক্‌কুলোখ প্রসঙ্গে: হড্‌স্কিনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আর্থনীতিক রচনা চালিত হয় অনেকাংশে এঁদের বিরুদ্ধে; এই বইখানার নাম হল 'Labour Defended Against the Claims of Capital' ('পুঁজির দাবির বিরুদ্ধে শ্রমের পক্ষসমর্থন'), তাতে উপ-শিরনামটা শুরু হয় এইভাবে — 'বা পুঁজির অনুৎপাদিতা সপ্রমাণ...'। ১৮২৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত এই ছোট পুস্তিকাখানা ট্রেড ইউনিয়ন বৈধ করাবার আইনের জন্যে আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ছিল। এতে লেখকের পরিচয় গোপন রাখা হয়েছিল 'জনৈক মজুর প্রণীত' এই প্রচলিত অনামায়। এডিনবারোয় কয়েক বছর কাটিয়ে হড্‌স্কিন ততদিনে সপরিবারে লন্ডনে উঠে গিয়েছিলেন। সাংবাদিকতা করে রুজি-রোজগার করার মধ্যে তিনি বেড়ে-চলা শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে পূর্ণগঠিত হয়ে উঠেছিল তাঁর সমাজতান্ত্রিক মত-বিশ্বাস। অর্থশাস্ত্র, সমাজতন্ত্র আর শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস-বিশ্রুত হড্‌স্কিন হলেন ১৮২৩-১৮৩২ সালের হড্‌স্কিন।

শ্রমিকদের শিক্ষাদীক্ষাটাকে হড্‌স্কিন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ বলে মনে করতেন; তিনি ছিলেন লন্ডনে মিস্ত্রিদের শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। অচিরেই স্পষ্ট বোঝা গেল শ্রমিকেরা নিজেরাই এই প্রতিষ্ঠানটির জন্যে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করতে পেরে উঠবে না, তখন বুর্জোয়া উদারপন্থী এবং লোকহিতৈষী পুঁজিপতিরা হড্‌স্কিনকে অপসারিত করল তাঁর 'মানস-সন্তান'টির পরিচালকমণ্ডলী থেকে: তারা কড়ি যোগাল, তাই 'সুরের ফরমাশ' দিতে চাইল স্বভাবতই। যা-ই হোক, হড্‌স্কিনের মুখ্য আর্থনীতিক রচনাগুলি এই শ্রমিক বিদ্যালয়টিতে তাঁর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নিজ ধ্যান-ধারণা সরাসরি প্রচারের জন্যে তিনি এই বিদ্যালয়টিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন; সেখানে শ্রমিকদের কাছে তিনি যেসব লেকচার

---

* Elie Halévy, 'Thomas Hodgskin', London, 1956, p. 67.

দিয়েছিলেন সেগুলি 'Popular Political Economy' ('সাধারণের অর্থশাস্ত্র') নামে প্রকাশিত হয় ১৮২৭ সালে।

হড্‌স্কিনের বইগুলি লোকের বেশ নজরে পড়েছিল ইংলন্ডে। সেগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে ধরেছিল বিশেষত সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধবাদীরা, তারা তাঁর বিরুদ্ধে জড়ো করেছিল সেরা-সেরা উদারপন্থী বুর্জোয়া প্রবন্ধকারদের। ১৮৩২ সালে তিনি প্রকাশ করেন আর-একখানা বই — 'The Natural and Artificial Rights of Property Contrasted' ('স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম মালিকানা-স্বত্বের বৈসাদৃশ্য প্রদর্শন')। হড্‌স্কিনের বিবেচনায় শ্রমিকের মালিকানা স্বাভাবিক, আর মানুষের উপর মানুষের শোষণ যেটার ভিত্তি এমন সমস্ত মালিকানা কৃত্রিম, যেগুলোর অবলম্বন হল রষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট জবরদস্তি আর রীত-রেওয়াজ। সমাজ বিকাশের ধারায় পুঁজিতন্ত্র হল আর্থনীতিক নিয়মানুযায়ী একটা পর্ব, এটা মানতেই তিনি প্রকৃতপক্ষে অস্বীকার করেন।

১৮৩২ সালের পরে হড্‌স্কিন রাজনীতিক এবং বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র থেকে অদৃশ্য হয়ে অখ্যাত পত্র-পত্রিকায় মজুরি-করা কলমচির কাজের পাঁকে ডুবে যান। ততদিনে তিনি সাতটি সন্তানের বাপ। ব্যর্থতা ছিল তাঁর পদে-পদে। তখন উদারপন্থীদের পৃষ্ঠপোষকতায় সবে প্রতিষ্ঠিত লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ পাবার আশা করেছিলেন, তা হল না। নিয়মিত রোজগারের অন্য কোন উপায় ছিল না। পরিবার প্রতিপালনের একমাত্র অবলম্বন ছিল সাংবাদিকতার কলমটা। হয়ত ছিল অন্যান্য কারণও। ততদিনে হড্‌স্কিনের মতবিরোধ শুরু হয়েছিল শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে, তাঁরা ছিলেন প্রত্যক্ষ রাজনীতিক কার্যকলাপের সপক্ষে, তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করেন নীতি অনুসারেই। ওয়েনবাদীদের থেকে ভিন্নমত হয়ে তিনি মনে করতেন সমবায় আন্দোলনের কোন ভবিষ্যৎ নেই। ওয়েনের সাম্প্রদায়িক কমিউনিজমও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। আসলে দেখা যায় কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচি তাঁর ছিল না আদৌ। ১৮৬৯ সালে সুপরিণত বৃদ্ধ বয়সে হড্‌স্কিন মারা যান।

সমাজতন্ত্রীরা শ্রমঘটিত মূল্য তত্ত্ব গ্রহণ করেন যে-আকারে সেটাকে দাঁড় করিয়েছিলেন রিকার্ডো। এর মধ্যে উপাদানটাকে বিকশিত করে সেটার স্বাভাবিক পরিণতি ঘটান তাঁরা। কেবল শ্রমই পণ্যের মূল্য পয়দা করে। কাজেই পুঁজিপতির লাভ আর ভূস্বামীর খাজনা সরাসরি কেটে নেওয়া

হয় এই মূল্য থেকে, যেটা স্বভাবতই শ্রমিকের। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রের অসংগতিটা: এমন মূলসূত্র যেটার ভিত্তি সেই অর্থশাস্ত্র পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে, শ্রমের উপর পুঁজির শোষণটাকে স্বাভাবিক এবং চিরস্থায়ী বলে বিবেচনা করতে পারল কেমন করে?

বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীদের প্রলেতারিয়ান বিরুদ্ধবাদীদের মুখ দিয়ে নিম্নলিখিত নিন্দাবাদ বের করালেন মার্কস: 'শ্রমই বিনিময়-মূল্যের একমাত্র আকর এবং উপযোগ-মূল্যের একমাত্র সক্রিয় স্রষ্টা। একথা বলছেন আপনারা। পক্ষান্তরে আপনারা বলছেন **পুঁজিই সবকিছু**, আর শ্রমিক কিছুই না কিংবা পুঁজির উৎপাদন-পরিব্যয়ের একটা দফা মাত্র। আপনারা নিজেরাই নিজেদের খণ্ডন করলেন। শ্রমিককে ঠকানো ছাড়া **কিছুই নয়** পুঁজি। **সবকিছু** হল **শ্রম**।'*

---

* কার্ল মার্কস, 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব', ৩ খণ্ড, ২৬০ পৃঃ। উপযোগ-মূল্যের (সম্পদের) স্রষ্টা হিসেবে শ্রমের সংজ্ঞার্থে 'সক্রিয়' শব্দটা লক্ষণীয়। উৎপাদনের উপকরণ যা আদি আকারে প্রকৃতির একটা উপাদান (অহল্যা ভূমি, মণিকের আকর, পড়ন্ত জলের শক্তি, ইত্যাদি) কিংবা প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান যেগুলিতে আগে শ্রমের ক্রিয়া ঘটেছে (কাঁচামাল, জালানি, শ্রমের সরঞ্জাম, ইত্যাদি) সেগুলি উৎপাদন-প্রক্রিয়ার নিষ্ক্রিয় অংশগ্রাহী উপাদান। 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা'-য় মার্কস বলেছেন: 'শ্রম সমস্ত সম্পদের **আকর নয়। প্রকৃতিও** শ্রমেরই মতো সম পরিমাণে বিভিন্ন উপযোগ-মূল্যের আকর (আর এগুলো নিশ্চয়ই এমনসব উপযোগ-মূল্য যা মিলিয়ে হয় বৈষয়িক সম্পদ!), যেখানে শ্রম আপনিই হল প্রকৃতির একটা বলের অভিব্যক্তি মাত্র — মানুষের শ্রমশক্তি' (কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, তিন-খণ্ডে 'নির্বাচিত রচনাবলি', ৩ খণ্ড, ১৩ পৃঃ)। উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় শ্রম আর উৎপাদনের উপকরণ কিছু পরিমাণে বিনিময়। (ব্যবহার্য উৎপাদন-উপকরণ হিসেবে) পুঁজি একেবারেই অনুৎপাদী, এই ধারণাটা ভুল; যেসব অর্থনীতিবিদ রিকার্ডোর মতবাদে বলা যেতে পারে 'বামমুখো মোচড়' লাগান তাঁদেরই এই ধারণাটা। মার্কস বলেছেন: 'পুঁজির উৎপাদনকরতা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হড্‌স্কিন এটা কি পরিমাণে উপযোগ্য-মূল্য কিংবা বিনিময়-মূল্য পয়দা করার প্রশ্ন তার মধ্যে পার্থক্য ধরেন নি অনবধানতাবশত' (কার্ল মার্কস, 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব', ৩য় ভাগ, ২৬৭ পৃঃ)। উৎপাদনকে টেকনিকাল-আর্থনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে — উপযোগ-মূল্য সৃষ্টি এবং রূপান্তরের প্রক্রিয়া হিসেবে — বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিচার-বিবেচনা করে দেখা দরকার উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে শ্রম সংযুক্ত হয় কোন্‌-কোন্‌ আকারে, অবস্থায় এবং অনুপাতে, এই মর্মে উল্লিখিত ধারণাটা প্রসঙ্গে মার্কসের ঐসব উক্তি গুরুত্বপূর্ণ।

এই 'বিবৃতি'টাকে মোটামুটি নিম্নলিখিত ধারায় চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে। বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীদের উদ্দেশে সমাজতন্ত্রীরা বলছেন, আপনারা নিশ্চয় করে বলেন শ্রম উৎপন্ন করতে পারে না পুঁজি ছাড়া, কিন্তু আপনাদের যুক্তিতে পুঁজি হল জিনিস — যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, রিজার্ভ। সেক্ষেত্রে নতুন, তাজা শ্রম ছাড়া পুঁজি নিষ্প্রাণ। পুঁজি যদি হয় নিছক জিনিস তাহলে সেটা কেমন করে দাবি করে লাভ, শ্রমের পয়দা-করা মূল্যের একটা হিস্সা? তার মানে সেটা দাবি তুলছে জিনিস রূপে নয়, কিন্তু একটা সামাজিক শক্তি রূপে। কোন্ শক্তি? ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানা। সমাজের কোন একটা গঠন প্রকাশ পায় ব্যক্তিগত মালিকানায় — কেবল এই আকারেই পুঁজি ক্ষমতাশালী হয় শ্রমের উপর। শ্রমিকের খাওয়া-দাওয়া হওয়া চাই, তার জন্যে তাকে কাজ করতে হয়। কিন্তু কাজ করতে সে পারে শুধু পুঁজিপতির অনুমতি হলে — তার পুঁজির সাহায্যে।

হড্স্কিনের লেখার যে-অংশটা সম্বন্ধে মার্কস বলেছেন, 'অবশেষে এখানে সঠিকভাবে উপলব্ধ হয়েছে পুঁজির স্বধর্ম',* তাতে তিনি (হড্স্কিন) প্রায় ঐকথাই বলেছনে অক্ষরে-অক্ষরে। তার মানে: এখানে পুঁজিকে দেখা হয়েছে এমন একটা সামাজিক সম্পর্ক হিসেবে যেটা আদতে মজুরি-শ্রম শোষণ।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবদানও আছে ইংলণ্ডের অর্থনীতিবিদ-সমাজতন্ত্রীদের। পুঁজি বাবত আয়ের সার্ব আকার হিসেবে উদ্বৃত্ত মূল্য সম্বন্ধে উপলব্ধির কাছাকাছি তাঁরা পেঁৗছেছিলেন রিকার্ডোর চেয়ে বেশি। মজুরি তহবিল সম্বন্ধে বুর্জোয়া-সাফাইদারী তত্ত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন সর্বপ্রথমে তাঁরাই। তবে বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁদের সমালোচনায় ছিল বেশকিছু দুর্বলতা, তাতে প্রকাশ পায় তাঁদের মতের ইতিহাসনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা আর ইউটোপিয়া। যেখানে স্মিথ আর রিকার্ডোর বিবেচনায় পুঁজিতন্ত্র হল বিভিন্ন স্বাভাবিক এবং চিরন্তন নিয়মের বাস্তব প্রতিষ্ঠা, সেখানে সমাজতন্ত্রীদের বিবেচনায় পুঁজিতন্ত্র হল ঐ একই নিয়মাবলি লঙ্ঘিত হবার ফল। বুর্জোয়া সনাতনী পণ্ডিতদের মতো এঁরাও আঠার শতক থেকে চলে-আসা স্বাভাবিক নিয়ম-সংক্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে

---

* কার্ল মার্কস, 'বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব', ৩য় ভাগ, ২৯৭ পৃঃ।

নিয়মটার ব্যাখ্যা দেন ভিন্ন ধরনে, এই মাত্র। এই রকমের সমাজতন্ত্র শুধু ইউটোপিয়ান-ই হতে পারত।

ওয়েনের মতো এইসব অর্থনীতিবিদ মনে করতেন শ্রম আর পুঁজির মধ্যে বিনিময়ে শ্রমঘটিত মূল্য নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। বুর্জোয়া অর্থনীতি-বিজ্ঞানে লাভের আর্থনীতিক যৌক্তিকতা দেখান হয়, সেটাকে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেন, এটা সঠিক, কিন্তু সেটার জায়গায় যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ তাঁরা দিতে পারেন নি। তাঁদের তন্ত্রের 'স্বাভাবিক' আর্থনীতিক নিয়মাবলির কাঠামের ভিতরে পুঁজি বাবত লাভ খাপ খায় না, তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা লাভের কারণ হিসেবে দেখালেন জবরদস্তি, প্রতারণা এবং অন্যান্য অর্থনীতি-বহির্ভূত উপাদান। পুঁজিতন্ত্রের জায়গায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সপক্ষে যুক্তিটা তার ফলে হয়ে দাঁড়ায় অনেকাংশে নৈতিক ধরনের: ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হওয়া চাই। এই ন্যায়ের সারমর্মটা হল এই যে, শ্রমিকের পাওয়া চাই পূর্ণ শ্রমফল।

এই 'পূর্ণ (অখর্ব) শ্রমফল' সংক্রান্ত ধারণাটার দীর্ঘায়ু অবধারিত ছিল। দাবিটা ইউটোপিয়ান একেবারে শুরু থেকেই: উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজেও শ্রমিক 'পূর্ণ শ্রমফল' পেতে পারে না ব্যক্তিগত ভোগ-ব্যবহারের জন্যে, কেননা সে তা পেলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না সঞ্চয়ন, সাধারণের প্রয়োজন, প্রশাসনযন্ত্র চালু রাখা, বৃদ্ধ আর শিশুদের প্রয়োজন, ইত্যাদির জন্যে। শ্রমিকেরা তাদের পূর্ণ শ্রমফল পায় না, এটা নয় পুঁজিতন্ত্রের আমলে আসল কথাটা, সেটা হল এই যে, একটা বিশেষ শোষক শ্রেণী আত্মসাৎ করে উদ্বৃত্ত উৎপাদ। যা-ই হোক, উনিশ শতকের তৃতীয় আর চতুর্থ দশকে প্রগতিশীল ছিল এই স্লোগানটা, কেননা সবে শুরু হয়েছিল শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম, তাতে এটা আনুকূল্য করত।

ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞান

মার্কস যখন ইংলণ্ডে যান (১৮৪৯) তখন সেখানে ছিল বহু-খণ্ডে তিন দশকের সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য। ব্রাসেল্সে যে-গবেষণা শুরু করেছিলেন সেটা তিনি এখানে চালিয়ে যান বিস্তারিতভাবে। সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে আর ওয়েনের ভাব-ধারণার মতো ইংলণ্ডের এইসব সমাজতন্ত্রীদের

রচনাগুলি হল পূর্ববর্তী চিন্তাবীরদের ঐতিহ্য যা মার্কস কাজে লাগান সমাজ সম্পর্কে তাঁর বৈপ্লবিক মতবাদ গড়ে তোলার জন্যে।

'গোড়ার দিককার সমাজতন্ত্র... ছিল **ইউটোপিয়ান** সমাজতন্ত্র,' লিখেছেন ভ. ই. লেনিন 'মার্কসবাদের তিনটি আকর এবং তিনটি অঙ্গ'-শীর্ষক প্রবন্ধে। 'সেটা পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সমালোচনা করে, ঐ সমাজকে ধিক্কার আর অভিসম্পাত দেয়, ঐ সমাজের বিনাশের স্বপ্ন দেখে, সেটার মানসপটে ছিল উন্নততর ভবিষ্য সমাজ, আর ধনীদের সেটা বোঝাতে চেয়েছিল শোষণটা দুর্নীতি।

'কিন্তু আসল মীমাংসাটার হদিস দিতে পারে নি ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্র। পুঁজিতন্ত্রের আমলে মজুরি-দাসত্বের আদত প্রকৃতির ব্যাখ্যা সেটা দিতে পারে নি; পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের নিয়মাবলি উদ্‌ঘাটন করতে, কিংবা নতুন সমাজের স্রষ্টা হয়ে উঠতে পারে কোন্ **সামাজিক শক্তি** তা দেখাতে পারে নি।'*

এইসব মস্ত-মস্ত কাজ হাসিল করল মার্কসবাদ। সমাজতন্ত্রকে ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানে পরিণত করলেন মার্কস এবং এঙ্গেলস। পূর্ববর্তী কালে সমাজবিদ্যাক্ষেত্রে সবচেয়ে আগুয়ান চিন্তাবীরদের গড়ে তোলা সমস্ত ভাব-ধারণার বৈচারিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে আমূল নতুন তত্ত্বতন্ত্র, আমূল নতুন বিশ্ববীক্ষা গড়ে তুলতে হয়েছিল সেটা করার জন্যে। জার্মান ক্ল্যাসিকাল দর্শন, ইংলণ্ডের ক্ল্যাসিকাল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র এবং ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রের প্রগতিশীল বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণাগুলির বৈচারিক অবধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে মার্কসবাদের শিক্ষা।

মার্কসের আর্থনীতিক মতবাদের ভিত্তিপ্রস্তর হল উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর যা একেবারে সারমর্মটা — মজুরি-শ্রমের উপর পুঁজির শোষণ — সেটার ব্যাখ্যা দেয় এই তত্ত্ব। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা দেখিয়েছেন, উনিশ শতকের গোড়ার দিককার চিন্তাবীরেরা, বিশেষত রিকার্ডো এবং তাঁর সমাজতন্ত্রী ব্যাখ্যাকারেরা উদ্বৃত্ত মূল্য ব্যাপারটা বোঝার কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। তবে, শ্রমের পয়দা-করা উৎপাদের মূল্য থেকে পুঁজি আর ভূমির মালিকরা যা কেটে নেয় সেটাই উদ্বৃত্ত মূল্য, এই মর্মে কমবেশি সঠিক বর্ণনা দিলেও তাঁরা সেখান

* ভ. ই. লেনিন, 'সংগৃহিত রচনাবলি', ১৯ খণ্ড, মস্কো, ১৯৬৮, ২৭ পৃঃ।

থেকে আর এগন নি। এই অবস্থাটাকে স্বাভাবিক এবং চিরন্তন বলে ধরে নিয়ে ক্ল্যাসিকাল সম্প্রদায়ের অর্থশাস্ত্রীরা শুধু বের করতে চেষ্টা করেন শ্রম আর পুঁজির মধ্যে মূল্য বণ্টনের মাত্রিক অনুপাত। সমাজতন্ত্রীরা দেখতে পান এই বণ্টনটা অন্যায্য; তাঁরা বিভিন্ন ইউটোপিয়ান পরিকল্পনা রচনা করেন অন্যায় দূর করার জন্যে।

তাঁদের বেলায় যেটা হল চূড়ান্ত অবস্থান, মার্কসের পক্ষে সেটা হল শুধু আরম্ভস্থল। উদ্বৃত্ত মূল্য কিভাবে দেখা দেয় পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর বিষয়গত নিয়মাবলির ভিত্তিতে, তার বিবরণ দিয়ে মার্কস গড়ে তুললেন সুসম্বদ্ধ প্রগাঢ় আর্থনীতিক মতবাদ। পুঁজিতন্ত্র বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার ক'রে মার্কস বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রতিপাদন করলেন সেই বিকাশের মূল গতিমুখটাকে — সেটা হল বৈপ্লবিক উপায়ে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর জায়গায় সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা। মার্কস দেখালেন, যে-সামাজিক শক্তি এই বিপ্লব নিষ্পন্ন ক'রে হয়ে দাঁড়াবে নতুন সমাজের স্রষ্টা সেটা শ্রমিক শ্রেণী।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৫ম কংগ্রেসে দেওয়া বিবরণীতে ল. ই. ব্রেজনেভ বলেন: 'পুঁজিতন্ত্রের 'আপনা থেকে পতনে'র ভবিষ্যদ্বাণী কমিউনিস্টরা করে না আদৌ। এখনও সেটার যথেষ্ট সম্বল-সংগতি রয়েছে। কিন্তু গত ক'বছরের ঘটনাবলি থেকে আবারও জোরসে প্রতিপন্ন হয়েছে যে পুঁজিতন্ত্র এমন সমাজ যেটার ভবিষ্যৎ নেই।'*

* 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৫ম কংগ্রেসের দলিলপত্র', মস্কো, ১৯৭৬, ২৯ পৃঃ (রুশ ভাষায়)।

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন,
১৭, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

ИБ № 1195

Редактор русского текста *Н. К. Сазанович*
Контрольный редактор *А. Н. Романов*
Художественный редактор *Я. А. Маликов*
Технические редакторы *И. К. Дергунова, В. Ю. Никитина*
Корректор *И. Ю. Илюхина*

Сдано в набор 22.09.80. Подписано в печать 05.01.83. Формат $84 \times 108^1/_{32}$.
Бумага типографская № 1. Гарнитура Бенгали. Печать высокая. Условн.
печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 14,83. Уч.-изд. л. 34,40. Тираж 6120 экз. Заказ
№ 1195. Цена 2 р. 91 к. Изд. № 33076. Ордена Трудового Красного Зна-
мени издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 119021, Зубовский
бульвар, 17. Ордена Трудового Красного Знамени Московская типография
№ 7 «Искра революции» «Союзполиграфпрома» Государственного коми-
тета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Мо-
сква, 121019, пер. Аксакова, 13.

অতীতের বিভিন্ন আর্থনীতিক মতবাদের সঙ্গে প্রধান-প্রধান আধুনিক মতধারা আর ভাব-ধারণার যোগসূত্রটাকে তুলে ধরা হয়েছে এই বইখানায়। পাঠকের সামনে হাজির করা হয়েছে আগেকার বহু অর্থনীতি-চিন্তাবীরকে — বুয়াগিইবের, পেটি, কেনে, তিউর্গো, স্মিথ, রিকার্ডো, সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে, ওয়েন এবং আরও অনেক। যে-যে যুগে তাঁদের জীবন আর কর্ম সেগুলির পটভূমিতে তুলে ধরা হয়েছে তাঁদের ধ্যান-ধারণা। এই বইয়ের লেখক, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর।